~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই

শিশির কর

আ ন ন্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-137-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

BRITISH SHASANE BAJEAPTO BANGLA BOI
[Essay]
by
Sisir Kar

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ
শ্রদ্ধেয় শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর
করকমলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই লেখকের অন্যান্য বই

নিষিদ্ধ নজরুল

বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে অন্য কাহিনী

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

সূচনা

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার কারণ ২৬
গোয়েন্দা রিপোর্ট—২৬, রাউলাট কমিটির রিপোর্ট—২৬ কণ্ঠরোধ সার্কুলার—২৯

তৃতীয় অধ্যায় : নিষেধ আইন ৩১
সিডিশন বিল—৩১, লিবার্টি অব প্রেস অ্যাক্ট—৩২ প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট, সিডিশন পাবলিকেশন অ্যাক্ট, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, নিউজ পেপারস অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান পোস্ট অফিস অ্যাক্ট—৩২, কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর—৩২, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড—৩৩, প্রেস অ্যাক্ট—৩৩, ইণ্ডিয়ান প্রেস এমার্জেন্সি পাওয়ারস অ্যাক্ট (১৯৩১)—৩৩, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন—৩৩, সামুদ্রিক শুল্ক আইন—৩৪

চতুর্থ অধ্যায় : লেখকের সাজা ৪৬
'বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও মোছলমানদের কর্তব্য' বাজেয়াপ্ত আদেশ—৪৭, প্রকাশকের সাজা—৫০, মুদ্রকের সাজা—৫৩, আপত্তিকর বইপত্র প্রচারে দণ্ড—৫৪, ইস্তাহারের জন্য শাস্তি—৫৬

পঞ্চম অধ্যায় : জাতীয়তাবোধের প্রেরণাদাতা বঙ্কিমচন্দ্র ৬৫
আনন্দমঠ—৬৫, চন্দ্রশেখর—দেবী চৌধুরাণী—৭৬, সরকারী কোপে বন্দেমাতরম—৭৭, বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপের উপর সরকারী রোষ—৮০, মুসলমান সমাজের একাংশের আপত্তি—৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : স্বামী বিবেকানন্দ ৯১
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব—৯১, 'পত্রাবলী' বাজেয়াপ্তের প্রস্তাব—৯৩, রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে অভিযোগ—৯৭

সপ্তম অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ১০২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি গোয়েন্দাদের নজর—১০৩, হিন্দুমেলার [illegible] রাশিয়ার চিঠি—১১১, চার অধ্যায়—১১৪, চার অধ্যায় নিয়ে বিতর্ক—১১৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায় : রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ গ্রন্থ ১২৬
সিপাই যুদ্ধ—১২৬, বঙ্গভঙ্গ—১২৭, বৈপ্লবিক আন্দোলন—১২৭, কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন—১২৮, কমিউনিস্ট আন্দোলন—১২৮

নবম অধ্যায় : সামাজিক কারণে নিষিদ্ধ গ্রন্থ ১২৯
সাম্প্রদায়িকতা—১২৯, অশ্লীলতা—১২৯, সুরেন্দ্র বিনোদিনী—১৩১, সধবার একাদশী—১৩৪, সখের জলপান—১৪১

দশম অধ্যায় : নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ১৪৪
দেশের ডাক (সখারাম)—১৪৪, বর্তমান রণনীতি—১৪৭, মুক্তি কোন পথে—১৪৮, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—১৪৯, ফাঁসির সত্যেন—১৫৭, সাম্যবাদ—১৫৯, বিপ্লবের বলি—১৬৯, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—১৭২, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই—১৮০

একাদশ অধ্যায় : নিষিদ্ধ উপন্যাস ১৮৯
সোফিয়া বেগম—১৯০, রাখী কঙ্কন—১৯১, ভৈরবী চক্র—১৯৩, নতুন দিনের আলো—১৯৪, পথের দাবী—১৯৭, বিপ্লবের আহুতি—২১৫, অনাগত—২১৬, চলার পথে—২১৮

দ্বাদশ অধ্যায় : নিষিদ্ধ নাটক ২২৪
গিরিশচন্দ্র—২২৪, দ্বিজেন্দ্রলাল—২৩০, ক্ষীরোদপ্রসাদ—২৩১, মুকুন্দদাস—২৩২, অন্যান্য—২৩৭

দ্বাদশ (ক) অধ্যায় : দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ২৫৩
ইংরাজি নীলদর্পণ নিয়ে মামলা—২৫৪, লঙের সাজা—২৫৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় : নিষিদ্ধ কবিতা-গান ২৬৩

চতুর্দশ অধ্যায় : নবীনচন্দ্র সেন ২৬৯
পলাশীর যুদ্ধ—২৬৯, প্রবাসের পত্র—২৭৪

পঞ্চদশ অধ্যায় : নজরুল ২৮১
নানা প্রভাব—২৮১, বিদ্রোহী—২৮২, যুগবাণী—২৮৪, বিষের বাঁশি—২৮৫, ভাঙার গান-প্রলয় শিখা—২৮৭, চন্দ্রবিন্দু—২৯৪, সঞ্চিতা-অগ্নিবীণা-ফণিমনসা-সর্বহারা—২৯৬, রুদ্রমঙ্গল—৩০০, কারাদণ্ড ও ধূমকেতু—৩০৪

ষোড়শ অধ্যায় : ইস্তাহার, পুস্তিকা ৩০৯

পরিশিষ্ট : পত্র-পত্রিকা ৩২২
যুগান্তর ও ভূপেন্দ্রনাথ—৩২২, সন্ধ্যা ও ব্রহ্মবান্ধব—৩২২, ভারত—৩২৫, দেশ—৩২৬ মহম্মদী—৩২৯, বসুমতী—৩৩১, যুগান্তর—৩৩২, আনন্দবাজার পত্রিকা—৩৩৩, বন্দেমাতরম—৩৩৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট : অশ্লীলতা ৩৩৬

সজনীকান্তের চিঠি—৩৩৭, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—৩৩৭

সংযোজন : বাজেয়াপ্ত বই পড়ে আইন অমান্য ৩৩৯

যতীন্দ্রমোহনের কারাবরণ—৩৩৯

নির্ঘণ্ট—৩৪৩

চিত্র সূচি

★ বাজেয়াপ্ত বই পড়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কারাবরণ
★ কয়েকটি নিষিদ্ধ পুস্তকের প্রচ্ছদের ছবি
★ রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে সরকারি ফাইলে আমলাদের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য
★ 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' গোপন ইস্তাহারের ফটোকপি
★ অনল প্রবাহ, বঙ্কিমচন্দ্রের বই, পথের দাবী, সঞ্চিতার ফাইলের ফটোকপি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচনা

সূচনারও সূচনা আছে। যে শহরে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বাজেয়াপ্ত বাংলা বই 'পথের দাবী' লেখা হয়েছিল, সেই শহরেরই এক স্কুলের (হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশান) ছাত্র ছিলাম। আমাদের স্কুল ও আশ্রমের (হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম) আবহাওয়ায় ওতঃপ্রোত ছিল স্বাধীনতা চেতনা। স্কুলের প্রতিটি অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান গাইতেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় প্রয়াত মৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী বিপিন বিহারী বসু। অনেক অনুষ্ঠানে আসতেন দেশবরেণ্য নেতারা। প্রায়ই দেখতাম গোপন ইস্তাহার স্কুলের দেওয়ালে। কোনো-কোনো শিক্ষক ক্লাসেই তা পড়তেন। কতদিন স্কুলে গিয়ে দেখেছি ক্লাস বন্ধ করে মিছিল যাচ্ছে পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে, বিদেশী শাসনের প্রতি ধিক্কার জানাতে। কোন দিন স্কুলে গিয়ে শুনি, বিপিনবাবুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, কোনদিন বা দ্বিজেনবাবুকে (দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র), তাই ক্লাস হবে না। পাঠ্য বইয়ে পড়তাম, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।' পড়তাম, স্বামী বিবেকানন্দের 'হে ভারত, এই পরানুবাদ পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা···। এই লজ্জাকর কাপুরতা সহায়ে তুমি বীর ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ?' মুক্তির স্বপ্নে বিভোর দেহমন রোমাঞ্চিত। এই সব দেশাত্মবোধক লেখা থেকেই আমার মনে বর্তমান বইয়ের জমি তৈরির কাজ যেন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পর বাঁধাধরা কর্মজীবন। তারপর ১৯৭৪, সেপ্টেম্বরে শ্রীমান তুষার কান্তি কর ও ডাঃ নির্মল কুমার করের চেষ্টায় লন্ডন যাওয়ার সুযোগ এল। ওখানে শ্রী হিমাংশু সেনের বাড়িতে নৈশভোজের সময় ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর কথা উঠল। সেটি অবশ্য দর্শনীয়। কারণ সেখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য বাংলা বই আছে। লন্ডন হাইকোর্ট পাড়া পেরিয়ে টেমসের ওপারে ব্লাক ফায়ার্স রোডে এক-সুরম্য ভবনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী। সেখানে অবিলম্বে হাজির হলাম।

লাইব্রেরীর কর্মী শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাসের মুখে চিত্তাকর্ষক সংবাদ পেলাম। তিনি জানালেন, 'আমাদের লাইব্রেরীতে বাজেয়াপ্ত বাংলা বইয়ের ভাল সংগ্রহ আছে।' উনি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রাখা বাংলা বাজেয়াপ্ত বইয়ের একটা তালিকাও আমাকে দিলেন। দেখে আশ্চর্য। কে জানত এত বাংলা বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ? নেশা লেগে গেল। দারুণ-দারুণ আকর্ষণ ছেড়ে আমি দিনের পর দিন ওই লাইব্রেরীতে নিষিদ্ধ পুস্তক পড়তে যেতে লাগলাম। আমার আগ্রহ দেখে শ্রীমতী বিশ্বাস প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এবং কিছু বইয়ের ফটোকপি দিয়ে আমাকে সাহায্য করলেন।

দেশে ফিরে ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী ও রমাপদ চৌধুরীর উৎসাহে একটা বড় প্রবন্ধ লিখলাম আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৮১)। হাওড়ার 'বিবরণ' পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত শশধর রায় নিজে উদ্যোগী হয়ে মোটামুটি ওই লেখাটাই তড়িঘড়ি বই করে দিলেন 'নিষিদ্ধ বাংলা'। ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নিমাই সাধন বসু, অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু প্রমুখ বইটি পড়ে এ নিয়ে ব্যাপক আকারে কিছু করার পরামর্শ দিলেন। একদিন আশ্রমে শঙ্করীবাবুর সঙ্গে কথা হল। উনি বললেন, 'তোমার বিষয়টা যদিও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত, তবে ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই গবেষণা করতে হবে। সেজন্য কোনো ঐতিহাসিকের নির্দেশনায়

~ www.amarboi.com ~

ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সেটি)। বিশেষ গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা নিয়ে সরকারী আমলাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখা গেছে। যেমন, চার অধ্যায় নিয়ে।

আরও কয়েকটি অল্পালোচিত বা অনালোচিত বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যমূলক আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ব্যবহার ও তার নিষিদ্ধকরণ বহু আলোচিত হলেও সরকারী আমলাদের মধ্যে, যথা স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর মনে নিষিদ্ধকরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ছিল। সে নথি আমরা ব্যবহার করছি। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা উপন্যাসের নাট্যরূপ নিষিদ্ধ হয়। সে বিষয়ে গোপন নথিসহ বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থেই প্রথম করা হল।

জাতীয় আন্দোলনে ও বিপ্লব আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা সর্ববিদিত। বিপ্লবীদের আস্তানা থেকে পুলিশ প্রায়ই স্বামীজীর বই আটক করত। এবং সেসব বই রাখা অপরাধ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু সরকারীভাবে স্বামীজীর বই কখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি। অথচ তাঁর পত্রাবলীকে তলে তলে নিষিদ্ধ করার জন্য আমলারা সক্রিয় হয়েছিলেন,সে বিষয়ে চিত্তাকর্ষক কিছু সংবাদ এই গ্রন্থে আছে।

নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশেষভাবে আলোচিত। প্রধানত তাঁর অভিনয় ক্ষমতা, নাট্যালয় সংগঠনে নেতৃত্ব এবং পৌরাণিক ও সামাজিক নাট্য রচনায় তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কালে তাঁর কয়েকটি চাঞ্চল্যকর নাটক নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার জন্য তিনি লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এসব কথার সামান্য উল্লেখই মাত্র তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা গোপন নথিপত্র থেকে এবিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি ; তার ফলে গিরিশচন্দ্রের মন ও জীবনের ওপর নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। বিস্তৃত আলোচনা আছে মুকুন্দ দাস সম্পর্কেও।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নিষিদ্ধ গ্রন্থ (অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড) সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য এই গ্রন্থে আছে। যেমন রয়েছে সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও নগেন্দ্র নাথ দাসের নিষিদ্ধ পুস্তক পুস্তিকা সম্বন্ধে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের জন্য একমাত্র যে মুসলমান লেখকের গ্রন্থগুলি নিষিদ্ধ হয়, তিনি হলেন সৈয়দ ইসমাইল সিরাজী, প্রধান কাব্য গ্রন্থটির নাম 'অনল প্রবাহ'। সে সম্বন্ধে তথ্যগুলি আকর্ষক। টলস্টয়, লেনিনের বইও বাজেয়াপ্ত হয়। বিস্তৃত আলোচনা আছে টলস্টয়ের 'বিপ্লবের আহুতি' নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অসীম জনপ্রিয় নজরুল ইসলামের সাহিত্য বিশেষত দেশাত্মবোধক রচনার উপর অজস্র আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। তবু সরকারী দফতর সন্ধান করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি (যা ইতিমধ্যে আমার কয়েকটি প্রবন্ধে ও 'নিষিদ্ধ নজরুল' পুস্তকে কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছে) তা সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে বলে বিশ্বাস। পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলি ও গ্রন্থটি ইতিমধ্যে ওপার বাংলায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

যাঁদের লেখা রাজরোষে পড়েছিল, তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন ছিলেন পদস্থ রাজপুরুষ। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চণ্ডীচরণ সেন, নবীন চন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এঁদের সকলের লেখা সরাসরি বাজেয়াপ্ত না হলেও এঁদের প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকের জন্য এঁরা সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁদের চাকুরি জীবনেও তার ছায়া পড়েছিল।

ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত অধিকাংশ ইস্তাহারে থাকত, আমরা দেখেছি, উপনিষদের বাণী', উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান'—কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক অনূদিত এবং বিপ্লবীদের কাছে মন্ত্ররূপে গৃহীত তার রূপ 'অ্যারাইজ অ্যায়োয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দি গোল ইস রিচড'।

বাজেয়াপ্ত তালিকায় আছে অসংখ্য গোপন পত্র-পত্রিকা। নিবেদিতা যাদের উচ্ছ্বসিত উল্লেখ করেছেন বার বার। এই সিক্রেট প্রেস সম্পর্কে নিবেদিতা বলেছেন 'If it is the highest morality to break a wicked law—then the true child of God at this moment is the conduction of a secret press.' (Letters of Sister Nivedita.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Edited by Prof. S. P. Basu. Vol II, p. 1093.) ওইসব গোপন পত্রপত্রিকা বা ইস্তাহারে আছে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। একাধিক ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ। মেলে যেমন, 'স্টাফোর্ড ক্রিপসকে সুভাষচন্দ্রের খোলা চিঠি'।

নিষিদ্ধকরণের পদ্ধতি বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে বইপত্র বাজেয়াপ্তের ফাইলপত্র চালাচালি হত। প্রথমে গোয়েন্দা রিপোর্ট, পুলিশের এফ আই আর ; তারপর আমলাদের নোট, আইনজ্ঞদের পরামর্শ, এবং সবশেষে সংশ্লিষ্ট বই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি। দেখা গেছে নজরুলের 'সঞ্চিতা' সম্পর্কে গেজেট বিজ্ঞপ্তি তৈরি হয়েও আইনজ্ঞের সায় না মেলায় শেষ পর্যন্ত সই হয়নি।

এই প্রকার ও আরও নানাপ্রকার অজানিত তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশনের চেষ্টা করেছি।

সরকারী ফাইলে গোয়েন্দা ও পুলিশ রিপোর্টে যে ভাষা আছে, হুবহু তাই রাখা হয়েছে—ভাষার উৎকর্ষতার জন্য কোনোরকম পরিমার্জন বা সংশোধন করিনি।

শিশির কর

বীরেন্দ্র ভবন
১৪/৩/১ শ্রীবাস দত্ত লেন,
হাওড়া-৭১১১০১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়
প্রস্তাবনা

॥ ১ ॥

প্রাচীনকাল থেকেই বইপত্রের উপর রাজশক্তির খড়্গ নেমেছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নানা রাজশক্তির আমলে বইপত্র নিষিদ্ধ হয়েছে। এবং লেখকরা শাস্তি পেয়েছেন। স্বাধীন পরাধীন সব দেশের ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে। যখনই রাজশক্তি বা রাষ্ট্র কোনো রচনাকে নিজ স্বার্থের প্রতিকূল মনে করেছে, তখনই তার কণ্ঠরোধে তৎপর হয়েছে, সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ বা ধ্বংস করেছে।

দূর অতীতে ধর্মান্ধতাই গ্রন্থধ্বংসের প্রধান কারণ। অন্ধ কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য অতীতে কত লক্ষ বই যে আগুনে পুড়িয়ে বা অন্যভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার হিসাব নেই। খ্রীস্টীয় যাজকতন্ত্রের ক্ষমতার যুগে ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে সামান্যতম কটাক্ষের শাস্তিও ছিল ভয়াবহ। তুচ্ছতম বিরূপ মন্তব্যেও তাঁরা হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, অমানুষিক প্রতিহিংসা তার ফল। সে যুগে এই যাজকদের ক্ষমতার পুঁজি ছিল মানুষের অন্ধ বিশ্বাস। কারো লেখায় সেই বিশ্বাসের ভিত টললে এঁরা হিংসায় জ্বলে উঠতেন।

বিশ্বের বহু মহৎ সৃষ্টি রাজশক্তির কোপ এড়াতে পারেনি। আমরা দেখি, হোমারের ওডিসিকেও এক সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্লেটো ৩৮৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হোমারের ওডিসিকে কাটছাঁটের সুপারিশ করেন। প্লেটো অপরিণত পাঠকদের পক্ষে হোমারকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেছিলেন। ওডিসি-র উপর আঘাত পরেও এসেছে। তার মধ্যে গ্রীক স্বাধীনতার আদর্শের অভিব্যক্তি ছিল বলে রোমের এক শাসক ক্যালিগুলা একে নিষিদ্ধ করতে চান। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক কনফুসিয়াসের সৃষ্টি সুপ্রাচীনকাল থেকে চীনের নানা রাজশক্তির রোষে পড়েছে। ২৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চীনের তৎকালীন শাসকরা এই দার্শনিকের শত শত অনুগামীকে জীবন্ত কবর দেন। সরকারী রোষে পড়েছেন এমন বিশ্ববিশ্রুত লেখক ও দার্শনিকদের মধ্যে আছেন দান্তে, কোপারনিকাস, ম্যাকিয়াভেলি, শেকস্‌পীয়র, গ্যালিলিও, ব্রুনো, ভলটেয়ার, মিলটন, মলিয়ের, রুশো, ডিফো, বায়রন, গ্যেটে, ক্যান্ট, ব্যালজ্যাক, শেলি, কীটস্‌, হুইটম্যান, মার্কস, টলস্টয়, ডারউইন, মিল, ফ্লবেয়ার, সুইনবার্গ, জোলা, মোপাসাঁ, রসেটি, হেনরি মিলার, রেমার্ক, লরেন্স, জেমস জয়েস, এইচ জি ওয়েলস, সিনক্লেয়ার, লুথার, ওসকার ওয়াইল্ড, পাবলো নেরুদা, পাস্তেরনাক, সলঝেনিৎসিন, টমাস মান, ভ্লাদিমির নবোকভ, সারভেনটিস, ইরাসমাস। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, তিলক, সখারাম, মুকুন্দদাস, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখের লেখাও সরকারী কোপে পড়েছে।

প্রাচীন যুগ থেকে এ পর্যন্ত যে অসংখ্য বই নিষিদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও কিছু বইয়ের নাম করা যায়। ৪২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রচিত অ্যারিস্টোফেনিসের 'ক্লাউড' নাটকে কর্তৃপক্ষ দেখেন ধ্বংসাত্মক কার্যের সমর্থন আছে। ফলে তা কোপভাজন হয়। অ্যারিস্টোফেনিস এথেন্সের রাজনীতিজ্ঞ ক্লিওনকে স্বেচ্ছাচারী বলেছিলেন, ফলে তাঁর 'দি আচার নিয়ান্স' রাজরোষে পড়ে। ওভিদ-কে 'আর্সআনাটোরীয়' গ্রন্থ রচনার জন্য নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয় (খ্রীঃ পূঃ ৪৩)। আগাস্টাস ন্যারিয়েনাসের রচনাসম্ভার পুড়িয়ে দেওয়া হয় সরকারের সমালোচনা করার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রিটেনে প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম টিণ্ডা বাইবেল (Tynda Bible)। ডিভোর্সের ব্যাপারে অষ্টম হেনরির স্পর্শকাতরতাই বইটি নিষিদ্ধ হবার কারণ। উক্ত বইয়ের লেখক উইলিয়াম টিনডেল-এর দু' হাজারের বেশি বাইবেল পুড়িয়ে দেওয়া হয় ১৫২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে। স্যর টমাস ম্যানবীর 'দি বার্থ,লাইফ অ্যাণ্ড অ্যাকটস অব দি কিং আর্থার অ্যাণ্ড হিজ নোবেল নাইটস অব দি রাউণ্ড টেবিলস'—বইটিও ষোড়শ শতকে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে।

অনেক সময় সংশ্লিষ্ট রাজশক্তির খেয়াল খুশীমত বইপত্র নিষিদ্ধ হয়েছে, যা এযুগে হাস্যকর মনে হবে। যেমন, 'গ্যালিভারস ট্রাভেলস'-এর মতো নির্দোষ বইও আয়ারল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হয়েছিল অশ্লীলতার অভিযোগে। 'এলিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডস নিষিদ্ধ হয়েছিল চীনের হুনান প্রদেশে ১৯৩১ খ্রীঃ। অ্যাণ্ডারসনের 'ওয়াণ্ডার স্টোরিজ' বইটি নিষিদ্ধ হয় রাশিয়ায় প্রথম নিকোলাসের আমলে। তিনি 'আংকল টমস্ কেবিন' ও 'দি স্কারলেট লেটার' বই দুটিরও প্রচার বন্ধ করে দেন। লেলা টাউসলির 'পেনি অ্যাণ্ড পিটার', 'হোয়াট দে ডিড টুডে' ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় নিষিদ্ধ হয়। হ্যানস ক্রিসটিয়ান অ্যাণ্ডারসনের 'ওয়াণ্ডার স্টোরিজ' ১৯৩৫ সালে রাশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি পায়নি। কারণ ওতে রাজকুমারের মহিমা ছিল। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা রাষ্ট্রে 'রবিনহুড' নিষিদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছিল, তাতে নাকি কমিউনিজমের ছাপ আছে। ১৯২৯ সালে বস্টনে ভলটেয়ারের 'কাঁদিদ' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩৯ সালে ফ্রাঙ্কো স্পেনে গ্যেটের সব লেখা ধ্বংসে মেতেছিলেন। তার অনেক আগে জার্মানিতে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে গ্যেটের ফাউস্টের বিরুদ্ধে অভিযান হয়েছিল। আরও আগে (১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে) জার্মানির অনেক জায়গায় এবং মিলানে ও ডেনমার্কে গ্যেটের লাইডেন ডেয়ার যুঙ্গেন ভ্যার্থার (তরুণ ভ্যার্থারের জীবন যন্ত্রণা) গ্রন্থের বিরুদ্ধে জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। রুশোর 'কনফেসান' আমেরিকার কাস্টমস্ নিষিদ্ধ করে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৯৩৫-এ তাঁর সব লেখাই রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯২৯ সালে রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয় আর্থার কোনান ডয়েলের 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমস'। হিটলারের 'মেইন ক্যাম্প' বেলজিয়ামে নিষিদ্ধ হয়েছে।

অশ্লীলতার দায়ে রাজরোষে পড়েছে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লোকের রচনাই।

শেকস্‌পীয়রের নাটকও রেহাই পায়নি। ১৮৩২ সালে ইংলণ্ডে যে দুর্নীতি-দমন সমিতি হয়, তাঁরা শেকস্‌পীয়রের লেখাও কাটছাঁট করেন। অশ্লীল বলে শেলীর 'অ্যালাস্টর'-এর উপরও আক্রমণ চলে। একই অভিযোগ ওঠে কীটস্, বায়রনের বিরুদ্ধে, ভলটেয়ারের 'কাঁদিদ'-এর বিরুদ্ধেও। টলস্টয়ের 'দি ক্রুয়ৎসার সোনাতা' অশ্লীলতার দায়ে রাশিয়ায় নিষেধের কবলে পড়ে। আমেরিকাতেও এর বিরুদ্ধে জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। ভারতেও ইংরেজ আমলে টলস্টয়ের বই (বাংলা অনুবাদ) রাজরোষে পড়েছে—অবশ্য অশ্লীলতার জন্য নয়, রাজনৈতিক কারণে।

অশ্লীলতার দায়ে জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' গ্রন্থের মুদ্রণ নিষিদ্ধ হয় ব্রিটেনে, আমেরিকায় তাঁর বই পোড়ানো হয়।

অশ্লীলতার মাপকাটি যুগে যুগেই কেবল পৃথক নয়, দেশে-দেশেও ভিন্ন। এলিসের 'সাইকোলজি অব্ সেকস্' ব্রিটেনে ছাপানো চলতো না। অথচ আমেরিকায় কোনো বাধা ছিল না। এ যুগেও সেকসের বইপত্র সম্পর্কে ব্রিটেনের আইন যত কঠোর, ফ্রান্সের তত নয়।

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বইয়ের একটি লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার'। ১৯২৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই বই নিয়ে চলে বিচারের পর বিচার। আমেরিকার কাস্টমস্ বইটি আটকেছিল, ১৯২৯-এ। ১৯৬১-তে ভারতেও এর বিচার হয়। শেষ পর্যন্ত রেহাই পায়। এই ম্যারাথন বিচার নিয়ে 'দি ট্রায়াল অফ্ লেডি চ্যাটার্লি' নামে একটা বই পর্যন্তও বেরিয়েছে। অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে এইচ জি ওয়েলস্-এর 'অ্যান ভেরোনিকা'র বিরুদ্ধে, হুইটম্যানের 'লিভস অব গ্রাস', ভ্লাদিমির নবোকভের 'লোলিতা'র বিরুদ্ধেও।

বঙ্গদেশে নীতিবাদীদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' বিরুদ্ধে অশ্লীলতার ব্যাপক অভিযোগ। সাম্প্রতিককালে বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভোর বৃষ্টি', ও সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা হয়েছে। রাজরোষের সঙ্গে স্মর্তব্য প্রকাশকদের আতঙ্ক। অনেক প্রকাশক রাজরোষ আশঙ্কা করে বই ছাপতে রাজি হননি। এমনকি অতিরিক্ত ভীতিতে পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলে দেন, যা ঘটেছিল বায়রনের স্মৃতিকথার ক্ষেত্রে। এই অমূল্য পাণ্ডুলিপি প্রকাশক ধ্বংস করেন, আর সাহিত্য-জগতের সেই সম্পদের বিনাশে আর্তনাদ করেছিলেন শেলী।

আমরা দেখি, আমেরিকায় প্রকাশক চার্লস স্ক্রিবনার ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে মার্কসের ক্যাপিটলের অনুবাদ প্রকাশে অসম্মত হয়েছেন। সিনক্লেয়ারের 'জঙ্গল,' আর্নল্ড বেনেটের 'দি ওয়াইভস্ টেল'-এর মতো ক্লাসিক গ্রন্থও আমেরিকার প্রকাশকরা প্রত্যাখ্যান করেন।

উল্টোটিও ঘটেছিল। নৈতিক শুচিতার পক্ষে লিখে একজন লেখক দারুণ শাস্তি পেয়েছিলেন—ইংলণ্ডে রাজা জেমসের আমলে। উক্ত লেখক প্রিন তাঁর বইয়ে সমালোচনা করেছিলেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের নীতিহীনতার বিরুদ্ধে। যে প্রকার একটি নাটক রাজমহলে অভিনীত হয়েছিল এবং স্বয়ং রানী পর্যন্ত তাতে অভিনেত্রী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এর পরে রাজখড়্গ নামবেই, যাতে আক্ষরিকভাবে অপরাধী লেখক প্রিনের দুকান কাটা হয়। (রাজান্তঃপুরের কান কাটার লজ্জা ঢাকবার জন্যই নিশ্চয়!), এবং জেলেও যেতে হয়েছিল লেখককে।[১]

শাসকদের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত গ্রন্থের লেখকদের উপর অত্যাচার ও শাস্তি প্রসঙ্গটি আরও একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাক। অত্যাচার অনেক সময়ে অমানুষিক। এর থেকে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনীষীরাও বাদ যাননি। গোঁড়া যাজকতন্ত্র কিভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে সে সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "ইউরোপের সর্বপ্রকার মনীষিগণ—ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লমারিয়ঁ, ভিকটর হুগো কুল—বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত। আজ যদি ইউরোপে ক্রিশ্চানী শক্তি থাকত, তাহলে পাস্তের (Pasteur), কক (Koch) এর ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত, আর ডারউইন কল্পদের শূলে দিত।"[২]

৩৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে নাস্তিকতা প্রচার ও সুরুচি দূষিত করার অভিযোগে অ্যারিস্টোফেনিসের মৃত্যুদণ্ড হয়। ওভিডকে নির্বাসন দণ্ড (খ্রীঃ পূঃ ৪৩) দেওয়া হয় আর্সঅ্যানাটোরীয় গ্রন্থ রচনার জন্য।

মধ্যযুগে এই অত্যাচার আরও নৃশংস, বর্বর রূপ ধরেছে।

যাজকতন্ত্রের রোষে কত লেখকের কপালে নির্বাসন দণ্ড, অন্ধ কারাগারে যাবজ্জীবন নরকযন্ত্রণা, প্রাণদণ্ড অঙ্গচ্ছেদ, আগুনের ছেঁকা, রচনাসহ লেখককে আগুনে নিক্ষেপের মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। ফ্রান্সের আবেলার পীয়র (১০৭৯—১১৪২ খৃঃ) সত্যসন্ধানী মানুষ। সত্য প্রকাশ করার জন্য তাঁর রচনা পুড়িয়ে তাঁকে নিক্ষেপ করা হয় কারাগারে। তাঁর চিন্তা-নির্গত সত্যের জ্যোতিকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার জন্য ইটালির পোপ তাঁকে 'ইনফারনাল ড্রাগন' বলে ঘোষণা করেন। এই একই ধরনের অপরাধে ফ্রানসের বেকন রজারের (১২১৪—১২৯২ খৃঃ) কপালে জুটেছিল দীর্ঘ বন্দিদশা।

ফ্লোরেন্সের স্যা ভোনা রোলাকে (১৪৫২-১৪৯৮ খৃঃ) জাঁতা কাঁধে তুলে দিয়ে এমন পৈশাচিক নির্যাতন করা হয় যে, তাঁকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগকে স্বীকার করে নিতে হয়। তাঁর অপরাধ, তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন ধর্মযাজকদের স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে,—দাবি করেছিলেন গির্জার সংস্কার। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত যাজকরা তাঁর সমস্ত লেখা, উপদেশ নিবন্ধাদি সহ তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন ঘটা করে। সুপণ্ডিত অ্যাগ্রিপ্পার (১৪৮৬-১৫৩৫ খৃঃ) বিরুদ্ধেও এসেছিল ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ। তিনি তাঁর দেশ (নেদারল্যাণ্ডে) থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তাঁর বই দেশে বাজেয়াপ্ত হয়। ভিনদেশেও (বেলজিয়ামে) তাঁর হয় কারাদণ্ড ১৫৩০ খ্রীঃ। মনীষী উইলিয়াম টিনডেলকে (১৪৯২-১৫৩৬ খ্রীঃ) খোঁটায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। স্পেনের মনীষী মাইকেল সারভেন্টাসের (১৫১১-১৫৫৩ খৃঃ) কপালেও তাই জুটেছিল। তাঁর অপরাধ ঈশ্বরের 'ত্রিনিটি' তত্ত্ব তিনি স্বীকার করেননি, এবং অস্বীকার করেছিলেন ঈশ্বর পুত্রের অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। ইটালির ধর্মযাজকদের সমালোচনার জন্য টমাস উইলিয়ামের (১৫৫২ খৃঃ) ফাঁসি হয়। তারপর তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। যাজকতন্ত্রের নিন্দা করায় আলেকজাণ্ডার লেটনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

(১৫৬৮-১৬৪৯ খৃঃ) টানতে টানতে লণ্ডনের নিউগেটে নিয়ে গিয়ে শেকলে বেঁধে ইঁদুর ভর্তি মারাত্মক এক কুকুরের খুপরিতে রাখা হয়। তারপর অমানুষিক অত্যাচার, বেত্রাঘাত, কান কেটে, নাক কেটে অন্ধকার গারদে সারা জীবন বন্দিত্ব।

রোমের সম্রাট টাইবেরিয়ানের আমলে ঐতিহাসিক করডাসকে বন্দিদশায় না খেতে দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করা হয়। কারণ তিনি সম্রাটের কাজের সমালোচনা করেন তাঁর লেখায়। 'দি ডিসকভারি অফ এ গেপিং গালফ হয়ার ইনটু ইংল্যাণ্ড ইজ লাইকলি টু বি সোয়ালোড বাই অ্যানাদার ফ্রেঞ্চ ম্যারেজ' বইটি লেখার জন্য জন স্টারসের (১৫৪৩-১৫৯১ খৃঃ) ডান হাত কেটে দেওয়া হয়। 'এ কনফারেন্স অ্যাবউট দি নেকসট সাকসেশান টু দি ক্রাউন অব ইংলন্ড' (১৫৯৪) বইয়ের মুদ্রাকরের ফাঁসি হয় ১৬৮৩তে। লেখক রবার্ট পার্স রেহাই পান, কারণ তখন তিনি ধরাধামে নেই। 'হিস্টরি অফ ইটালি'র লেখক টমাস উইলিয়ামের ফাঁসি হয় ১৫৫৪ খ্রীঃ। তাঁর বইও পুড়িয়ে ফেলা হয়। ড্যানিয়াল ডিফোর জরিমানা, কারাদণ্ড হয় 'দি শর্টেস্ট ওয়ে উইথ অল দি ডিসেন্টার্স' নামে ব্যঙ্গ লেখাটির জন্য। বুমোকেও গা-ঢাকা দিতে হয়েছিল 'আপত্তিকর' লেখার জন্য। চতুর্থ লুইয়ের রোষে পড়েন বোমারসে—তাঁর কারাদণ্ড হয়। বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ রচনার জন্য ফেনেলের নির্বাসন দণ্ড হয়।

'দি রাইটস অব ম্যান' লেখার জন্য টমাস পেইন এর কারাদণ্ড হয়। রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে রাদিশচেফ-এর মৃত্যুদণ্ড হয়। অভিযোগ, তাঁর গ্রন্থে ফরাসী বিপ্লবের কথা প্রচার করা হয়েছে। ফাঁসোয়া নোয়েল ব্যাবোফের গিলোটিনে প্রাণনাশের হুকুম হয়। আঁদ্রে শোনিএ-ও গিলোটিনে প্রাণ হারান। ভলটেয়ারের কপালে জোটে নির্বাসন দণ্ড। রুশোকেও পালাতে হয় দেশ ছেড়ে।

মধ্যযুগে যাজকতন্ত্রের অন্ধ নির্মমতার চেহারা কল্পনাতীত। পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য ঘোরে না—জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার নিকাস, জিওরডানো ব্রুনো ও গ্যালিলিও প্রচলিত এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে যাজকরা বরদাস্ত করতে পারেননি। কারণ বাইবেলে যে অন্য কথা আছে। এত বড় স্পর্দ্ধা যে, ওরা বাইবেলের মতের বিরুদ্ধে যায়। কোপার নিকাস তাঁর ৩৯ বছর বয়সে যে সত্য আবিষ্কারের কথা বইয়ে লিখেছিলেন, নানা দ্বিধা, বাধার পর সে বই যখন ছাপা হল তখন বিজ্ঞানী মৃত্যুশয্যায়। দীর্ঘ ৩০ বছরের প্রতীক্ষার পর এই বিজ্ঞানীর হাতে তাঁর বইটি মুদ্রিত আকারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিরকালের জন্য চোখ বুজলেন। তাই বেঁচে গেলেন নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে। ব্রুনো একই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করেছিলেন বলে গির্জার ভয়াবহ রোষে পড়েন—১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে খোঁটায় বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। এরপর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনীষী গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে সত্য বলে প্রমাণ করলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর যুগান্তকারী বই ডায়ালগো ১৬৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাপার অক্ষরে বের হল—তখন বিজ্ঞানী নিজের জন্য ডেকে আনলেন কী ?—অন্য কিছু নয়—যাজকদের ক্রোধ ও উৎপীড়ন। রোগে শয্যাশায়ী বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে রাখা হল বন্দী আবাসে। নিজ আবিষ্কারকে সত্য জেনেও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে প্রাণের দায়ে অপরাধ স্বীকার করতে হল। কিন্তু পিতার জন্য মর্মান্তিক উদ্বেগে প্রাণ হারাল বিজ্ঞানীর যুবতী কন্যা। এবং গ্যালিলিও নিজগৃহে বন্দিদশায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—১৬৪২ সালে। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে গেলেন, **I have Committed no Crime.**

নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের জন্য রোজার বেকনেরও জেল হয় দশ বছর।

এ যুগেও স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য বহু লেখকের কপালে জোটে নির্বাসন দণ্ড ও অন্যান্য শাস্তি। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখকরা রেহাই পাননি। রাশিয়ার পাস্তেরনাক, সলঝেনিৎসিন প্রমুখের ভাগ্যে কত না লাঞ্ছনাই জুটেছে। অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশ, লাতিন আমেরিকার দেশ চিলি (নেরুদা) প্রভৃতিতে এ ধরনের ঘটনার অনেক নজির আছে। লেখক, শিল্পী, কবিদের কণ্ঠরোধ, সাজা, উৎপীড়ন সেই আদিম যুগ থেকে আজও চলে আসছে দেশে দেশে।

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে লেখার জন্য অনেকের শাস্তি হয়েছে। যেমন, বাল গঙ্গাধর তিলকের ৬ বছর কারাদণ্ড ও মান্দালয়ে নির্বাসন হয় সরকারের সমালোচনা করার জন্য। মুকুন্দদাস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নজরুল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের দণ্ড হয় লেখার জন্য। সন্ধ্যা পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চলাকালে মারা যান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কোনো একটি বিশেষ বইয়ের উপর যেমন তেমনি পুরো গ্রন্থাগারের উপর পাইকারী আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে বার বার। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত মিউজিয়াম-লাইব্রেরীতে সঞ্চিত ছিল সেরা চিন্তাবিদ, মনীষীদের গ্রন্থ। ৩২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে দিগ্বিজয়ী অ্যালেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর প্রথম টলেমি এটি গড়েন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের যথা ইউক্লিড, থিয়োক্রিটাস, টলেমি প্রমুখের লেখায় গড়ে ওঠে এই রত্নভাণ্ডারটি। এখানে ছিল চার লক্ষের বেশি অমূল্য পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ সংগ্রহটি ধ্বংস করে দেয় আরবরা। তারা এর উপর বারবার হামলা করেছিল। শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার ধ্বংস হয়ে গেল সপ্তম শতাব্দীতে, আরবদের আমলে।

দূর অতীতে বইপত্রের উপর এই রকম ব্যাপক হামলার আর একটি ঘটনা ঘটে প্যালেস্টাইনে। ১৬৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আনটিভ্কাস এপিফেলিস প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে দেন চীনে দার্শনিক কনফুসিয়াসের লেখার উপর পাইকারী রোষের কথা আগেই বলেছি। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্র বিচারের পরে পরাভূত বৌদ্ধ দার্শনিকের পুঁথি পোড়ানোর কথা শোনা যায়। লোকায়ত দর্শনের গ্রন্থের উপর নাকি আক্রমণ হয়েছিল। মুসলমান যুগে মন্দির ও শাস্ত্র ধ্বংসের বহু কথাই জানা গেছে। বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য রত্নরাজি। মুসলিম বিজেতারা তা ধ্বংস করেন। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ এল ব্যাশম তাঁর 'দ্য ওয়াণ্ডার দাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন

'In the first rush of the Muslim advance down the Ganga Nalanda and other great monasteries of Bihar was sacked, libraries were burnt, and monks were put to sword. The survivors fled to the mountains of Nepal and Tibet, and Buddhism in India was dead.' (২ক)

এ যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর পাইকারিভাবে রাজরোষের ঘটনা ঘটে হিটলারের জারমানিতে। সেই প্রকার সর্বাধিক শোচনীয় ঘটনার দিনটি হল ১৩ মে, ১৯৩৩। ওইদিন ফ্যাসিস্ট নাজীরা বারলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পুড়িয়ে ফেলে ২৫ হাজার বই। শুধু ইহুদি লেখকদের বই নয়, ম্যাকসিম গোর্কি, স্টিফান জাইগ, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড, হেলেন কেলার, হেমিংওয়ে, লেনিন, স্টালিন প্রমুখ লেখকের রচনা সেদিন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। ৪০ হাজার লোক, বহু ছাত্রও তাদের মধ্যে ছিল, এই বহ্ন্যুৎসব দেখে। হিটলারের একান্ত অনুগত গোয়েবলস্ এই সমাবেশে বই পোড়ানোর সমর্থনে ভাষণও দেন। জারমান পণ্ডিত ও মনীষীরাও হিটলারের অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। টমাস মান প্রমুখ জারমান মনীষীরা যাঁরা এই হিটলারী কাণ্ডকারখানার নিন্দা করেন, তাঁদের কপালে জোটে নির্বাসন-দণ্ড। এখানে উল্লেখ্য, হিটলারের জারমানিতে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় লেখাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। কোনো শাসকশক্তির দ্বারা সরাসরিভাবে নয়, বিশেষ কারণে উত্তেজিত গোষ্ঠীর দ্বারা পাইকারি গ্রন্থনাশের ঘটনাও ঘটছে এযুগে, আমেরিকাতে। আইসেনহাওয়ারের আমলে আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণীর বইপত্রের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট সাহিত্যের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব গড়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে বিভিন্ন লাইব্রেরী, শিক্ষাসংস্থায় ওইসব বইয়ের বহ্ন্যুৎসব চলে। আমেরিকার বহু লাইব্রেরিয়ান, পাবলিশার ও অন্যান্যেরা এক সম্মেলনে (২-৩ মে, ১৯৫৩) মিলিত হয়ে অবাধ মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে এই অভিযানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন কাউনসিল প্রভৃতি সংস্থাও এই সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি সমর্থন ও অনুমোদন করেন। বইপড়ার স্বাধীনতার পক্ষে তাঁরা যেসব প্রস্তাব নেন, তার একটি এখানে উল্লেখ করা হল

'It is in the public interest for publishers and literarians to make available the widest diversity of views and expressions including those which are orthodox or unpopular with majority'.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বইপত্রের উপর এরকম সংঘবদ্ধ বেসরকারী আক্রমণ অন্য দেশেও ঘটেছে। যেমন আমাদের দেশে নকশাল আন্দোলনের সময়, বিশেষ করে ১৯৭০-১৯৭৩ সালে, বহু মনীষী, চিন্তাবিদের বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। এমন কি অনেক মনীষী, লেখকের আলোকচিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তিও বিনষ্ট করা হয়েছিল। স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠাগারে চলে এই হামলা। স্বাধীন চিন্তার ধ্বংস সাধনের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেটি পঠন-পাঠনের ও অবাধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে এক মূল্যবান দলিল। ১৯৫৫, ১৪ই জুন ডর্টমাউট কলেজে/তিনি এই ভাষণটি দেন। তিনি বলেছিলেন "লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন বই পড়তে ভীত হোয়ো না,/যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ব্যক্তিগত শালীনতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করছে। তোমার শালীনতার আদর্শই তোমার পক্ষে একমাত্র সেন্সরনীতি।"

"কেমন করে কমিউনিজমকে পরাস্ত করবে, যদি না জান যে, তা কী শিক্ষা দেয়, কেন মানুষের কাছে তার এত আবেদন, কেন এত সংখ্যক মানুষ তার সম্পর্কে আনুগত্যের শপথ নেয়। নিম্ন অঞ্চলের মানুষদের কাছে তা তো প্রায় ধর্মেরই চেহারা নিয়েছে।"

বইপড়ার স্বাধীনতার পক্ষে এর আগেও বিভিন্ন দেশের মনীষীরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ১৬৪৪ সালে মিল্টন এ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন।[৪]

'He who kills a man kills a reasonable creature, God's image ; but he who destroys a book kills the image of God, as it were, in the eye. Many a man lives a burden to the earth, but a good book is a precious life-blood of a master-spirit, embalmed and treasured on a purpose to a life beyond life'.

ইংরেজ আমলে ভারতের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থই রাজরোষে পড়েছে। এছাড়া বিদেশে প্রকাশিত অনেক বইপত্র ও পত্রিকা ইস্তাহার এ দেশে পাঠানো ও প্রচারের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবীরা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বইপত্র, প্রচার পুস্তিকা ছাপিয়ে দেশে পাঠাতেন এখানকার মুক্তি সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা দিতে। এ সবের অধিকাংশই ইংরাজীতে। তবে জার্মানীতে ছাপা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক বাংলা লেখার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগরে বিপ্লবীদের ঘাঁটি ছিল। এখান থেকেও বইপত্র, লিফলেট ছাপিয়ে দেশে বিতরণ ও প্রচার করা হত। এগুলির অধিকাংশই বাংলায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে, বৃটিশ ভারতে গোপন প্রেসে ছাপা বইয়েও লিখে দেওয়া হত চন্দননগরে মুদ্রিত, আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য। গোপন প্রেসের মতো নানাস্থানে গোপন পাঠাগারও গড়ে উঠেছিল। যাদের মাধ্যমে সরকারের চোখে আপত্তিকর কিংবা নিষিদ্ধ বই ও পত্র পত্রিকার লেনদেন চলত। ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বইগুলি সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, এই তালিকায় সাহিত্যের কোনো ধারাই বাদ যায়নি। এতে আছে প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, সঙ্গীত। সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার মাধ্যম, পুস্তক পুস্তিকা, ইস্তাহার, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, এমনকি কার্টুন, আলোকচিত্র প্রভৃতিও বাদ যায়নি।

বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আছেন : মুকুন্দদাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর, গিরিশচন্দ্র, সৈয়দ আবু মহম্মদ ইসমাইল সিরাজী, শরৎচন্দ্র, নজরুল, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সৌমেন ঠাকুর, সোমনাথ লাহিড়ী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক। টলস্টয় লেনিনের লেখার বাংলা অনুবাদ, সান-ইয়াৎ সেনের জীবনীও সরকারের রোষে পড়েছে।

বাজেয়াপ্ত হয়নি অথচ সরকারের রোষে পড়েছিল এমন উল্লেখযোগ্য বাংলা বইয়ের সংখ্যাও অনেক। এ তালিকায় বহু চিন্তাবিদ ও মনীষীর লেখা আছে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, প্রবাসের পথে, স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী', অরবিন্দের ভবানীমন্দির, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি।[৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'রাশিয়ার চিঠি' ও 'নীলদর্পণের' মূল বাংলা বই সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নেননি। আপত্তি উঠেছিল এদের অনুবাদ সম্পর্কে।

বিস্ময়কর হল—বিশ্ববিশ্রুত ধর্মগ্রন্থও সরকারের রোষ থেকে অব্যাহতি পায়নি। যথা ভগবদ্‌গীতা। এ গ্রন্থ অবশ্য বাজেয়াপ্ত হয়নি, কিন্তু পুলিশ বা গোয়েন্দারা তল্লাসীর সময় পেলেই আটক করত। সরকারের পক্ষে ব্যস্ত হবার কারণ অবশ্য ছিল। গীতার কর্মযোগ সে যুগে তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল। বিবেকানন্দ গীতার আদর্শের কথা বজ্রকণ্ঠে প্রচার করেছেন। গীতার ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ। ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে গীতা অপরিসীম প্রভাব সৃষ্টি করে। গীতার মন্ত্র বিপ্লবীদের নিষ্কাম কর্মে প্রণোদিত করেছে, রাজনৈতিক হত্যাকে সাধারণ খুনের থেকে ভিন্ন বস্তু, আদর্শকৃত্য বলে ভাববার মানসিকতা দিয়েছে। সে যুগে গীতা পাঠ ছিল বিপ্লবীদের পক্ষে আবশ্যিক। মৃত্যু পথ-যাত্রী বীর ক্ষুদিরাম অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন 'আমি গীতা পড়েছি, মৃত্যুকে ভয় করি না।' কোনো কোনো বিপ্লবী সংস্থার সদস্যদের মুণ্ডিত মস্তকে গীতা হাতে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হত। এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য "Bhagabat gita was listed by Police as a highly seditious literature and cases were not rare the sacred book of Hindus was taken by Police in course of search for dangerous weapons and seditious literature."[৬]

কেবল বিপ্লব বা মুক্তি আন্দোলনে সরাসরি প্ররোচনাদানকারী বইপত্রই রাজরোষে পড়েনি। বিপ্লবীদের জীবনী এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ সম্বলিত বইপত্রও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভারতের অতীত গৌরবের পটভূমিতে লেখাও রাজরোষে পড়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, তিলক, গান্ধীজী সম্পর্কে লেখাও। অন্য দেশের গণ আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসও তাই হয়েছে। যেমন, চীন, রাশিয়া, ইটালি, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে লেখা। মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, সান ইয়াৎ সেনের কাহিনী রাজরোষে পড়েছে বা নিষিদ্ধ হয়েছে।

নাটকের ক্ষেত্রেই সরকারের মনোভাব ছিল সবচেয়ে কঠোর। কারণ রঙ্গমঞ্চ প্রত্যক্ষভাবে, তীব্রভাবে মানুষকে প্রভাবিত করতে সমর্থ। যতদূর জানা গেছে, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রথম রাজরোষ পড়েছে নাটকের উপরই। প্রথমে তা পড়েছে নীলদর্পণের (১৮৬১) উপর, তার পরে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর (১৮৭৬) উপর। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো উপন্যাস নিষিদ্ধ না হলেও একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্পর্কে, এবং তাদের অভিনয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ উঠে গেলেও তার অভিনয়ের উপর নিষেধ আদেশ থেকেই যায়। মঞ্চের কণ্ঠরোধেই এদেশে প্রথম আইন হয়—১৮৭৬ সালে—'দি ড্রামাটিক পারফরম্যানস কনট্রোল অ্যাকট', অভিনয় ও মঞ্চের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আসে তখন থেকেই।

ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যকর কারণেও বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দেশাত্মবোধক বইপত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে সরকারের অতি উৎসাহ বা অস্বাভাবিক তৎপরতার দরুনই তা ঘটেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই, ১৯৩৫ সালে ফরিদপুরে 'রক্তচক্ষু' নামে একটি উপন্যাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অথচ বইটিতে আপত্তিকর কিছু ছিল না। এটি এডগার ওয়ালেসের 'দি ক্রিমসন সারকেল' থ্রিলারের অনুবাদ। বইটির প্রচ্ছদে ছিল লাল শাড়ী পরিহিতা একটি মেয়ে, তার হাতে উদ্যত পিস্তল, ছবির চারধারে লাল বর্ডার। শ্রীশৈবাল গুপ্ত তখন ফরিদপুরের জেলা জজ। তিনি পুলিশের নির্বুদ্ধিতার কথা জেলাশাসক পোর্টারকে বলেন। পোর্টার এই ঘটনা শুনে হাসেন। কিন্তু সেই সঙ্গে পুলিশের কাজের সাফাই করে বলেন "The picture was suggestive and it might 'give ideas' to young boys and girls and turn them as revolutionaries."[৭]

শুধু বইপত্রই নয়, গ্রামাফোন রেকর্ডও রাজরোষে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' সঙ্গীত, গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের উদ্দীপক অংশ বিশেষের রেকর্ডের উপরও নিষেধ আদেশ বলবৎ হয়েছিল। গ্রামাফোন রেকর্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির খবরটি ৯-১২-১৯০৮ তারিখের সন্ধ্যা'য় বের হয়।[৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর এক রকম স্বদেশী ধুতি উঠেছিল। তার পাড়ে লেখা থাকত, 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। ১৯১০ সালের ১২ই মার্চ এক আদেশে এই ধুতির পাড়ও নিষিদ্ধ হয়। 'বন্দেমাতরম' লেখা উত্তরীয়, ধুতির উপরও অনুরূপ নিষেধ আদেশ জারি হয়। নিষেধাজ্ঞা জারি হয় দেশলাইয়ের উপরও।

এই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপ নিবেদিতা এস এস রাটক্লিফকে (স্টেটস্‌ম্যানের প্রাক্তন সম্পাদক) লেখা চিঠির পর চিঠিতে খুলে ধরেছেন। সরকারী নিপীড়নের নিষ্ঠুরতা এবং অসহ্য কণ্ঠরোধ কিভাবে গুপ্ত সংবাদপত্রের আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে তা নিবেদিতা একাধিক পত্রে লিখেছেন। তেমনই একটি পত্রে (৭ এপ্রিল, ১৯১০ সালে লেখা) তাঁর বক্তব্য "Now just consider the situation. They want to leave no adverse voice. A paper must be broken up if it shows the slightest independence. Evidently the Govt. is thirsting for the day when the porpaganda of assassination shall be the only method of service for men who desire to give their lives to their country. And the more they make patriotism the test, the more will such men arise. Under these circumstances, the only possible reply for the people would be a secret press—and already I hear there are several papers—English and Vernacular. But I don't congratulate the Government on this : I suppose they think that would be easy to stamp out. But will it be so ? they say the publ of our grave friend is also likely to be stopped. If so they must be mad—whom the God would destroy—. Will the Dalailama business lead to war with China. If so apparently about Tibet—it would really be a life and death struggle for opium. The Govt. here is bankrupt. Between the secret service and the New Province and diminishing opium and accelerating military charges—they must be at their wit's end. Now suppose the secret press open a war on credit ? You must remember secret press, by its very nature, is unbridled. No need for discretion there : Siva : Siva : Well—bless you dears. I suppose I must stop. My mind is full of the one thing."

Loving ever—[৯]

কেবল লেখক, কেবল মুদ্রাকর বা প্রকাশক শাস্তি পেয়েছেন ?—না। পাঠকদেরও অব্যাহতি ছিল না। তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়। অনুবাদকও পেয়েছেন শাস্তি, দৃষ্টান্ত নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদের জন্য পাদ্রী লঙ এর শাস্তি। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা অবশ্য করেছিল নীলকররা। দেশাত্মবোধক বই লেখার জন্য নিষ্ঠাবান পদস্থ রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রকে হেনস্থা হতে হয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও একবার প্রাসঙ্গিক কারণে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল। হুঙ্কার নামে একটি বাজেয়াপ্ত বইয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী দিতে হয়। কবির অপরাধ এই বইটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়।[১০]

নির্দেশিকা

১। নানা সূত্র থেকে অভিযুক্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক ও তাঁদের রচনার নাম সংগ্রহ করেছি। এদের মধ্যে Banned books by Anne Byon Haight বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিষিদ্ধ গ্রন্থের লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হোমার-প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক। কবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি জন্মান, কতদিন জীবিত থাকেন তার কোন প্রামাণ্য রেকর্ড নেই। দুই মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি তাঁর লেখা বলে বিদিত। কনফুসিয়াস—(৫৫১—৪৯৭ খ্রীঃ পূঃ) চীনা ধর্মগুরু ও দার্শনিক। জু বা কনফুসিয়াসিজম দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। দান্তে—(১২৬৫—১৩২১) খ্রীস্টীয় মধ্যযুগের মহান কাব্য ডিভাইন কমেডির লেখক। গ্যালিলিও—(১৫৬৪—১৬৪২) জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ভলটেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮) দার্শনিক। মিলটন (১৬০৮—১৬৭৪) কবি। মলিয়ের (১৬২২—১৬৭৩) ফরাসী লেখক। মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬) জার্মান ধর্ম সংস্কারক। ইরাসমাস—(১৪৬৬—১৫৩৬) ডাচ পণ্ডিত ও লেখক। মাইকেল সারভেনটিস (১৫১১—১৫৫৩) স্পেনীয় পণ্ডিত। শেকসপীয়র (১৫৬৪—১৬১৬) কবি। ব্রুনো (মৃত্যু ১৬০০, ১৭ ফেব্রুয়ারী) জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ড্যানিয়েল ডিফো—(১৬৬০—১৭৩১) গল্পলেখক। নিকোলাস কোপার নিকাস—(১৪৭৩—১৫৪৩) জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গ্যেটে—(১৭৪৯—১৮৩২) কবি ও দার্শনিক। রুশো—(১৭১২—১৭৭৮) দার্শনিক। ম্যাকিয়াভেলি—(১৪৬৯—১৫২৭) দার্শনিক। ইমানুয়েল ক্যান্ট—(১৭২৪—১৮০৪) দার্শনিক। মিল—(১৮০৬—১৮৭৩) দার্শনিক। ব্যালজাক—(১৭৯৯—১৮৫০) ঔপন্যাসিক। শেলী—(১৭৯২—১৮২২) কবি। কীটস্—(১৭৯৫—১৮২১) কবি। বায়রন—(১৭৮৮—১৮২৪) কবি। ডারউইন—(১৮০৯—১৮৮২) বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। টলস্টয়—(১৮২৮—১৯১০) ঔপন্যাসিক, দার্শনিক। রেমার্ক—(১৮৯৮—১৯৭০) জারমান ঔপন্যাসিক। রসেটি—(১৮৩০—১৮৯৫) কবি। সুইনবার্গ—(১৮৩৭—১৯০৯) কবি, নাট্যকার। জোলা—(১৮৪০—১৯০২) লেখক। মোপাসাঁ—(১৮৫০—১৮৯৩) গল্পলেখক। হেনরি মিলার—(১৮৯১—) লেখক। টমাস মান—(১৮৭৫—১৯৫৫) দার্শনিক। ফ্লবেয়ার—(১৮২১—১৮৮০) দার্শনিক। জেমস জয়েস—(১৮৮২—১৯৪১) কথা সাহিত্যিক। লরেন্স—(১৮৮৫—১৯৩০) কথা সাহিত্যিক। এইচ জি ওয়েলস—(১৮৬৬—১৯৪৬) কথা সাহিত্যিক। হুইটম্যান—(১৮১৯—১৮৯২) কবি। মার্কস—(১৮১৮—১৮৮৩) দার্শনিক। ওসকার ওয়াইল্ড—(১৮৫৪—১৯০০) ঔপন্যাসিক। ভ্লাদিমির নবোকভ—কথা সাহিত্যিক। পাবলো নেরুদা—কবি। সলঝেনিৎসিন—কথা সাহিত্যিক। ('গুলাগ আর কিপেলাগো'-এর লেখক)। পাস্তেরনাক —কথা সাহিত্যিক। 'জিগাভো' রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়)।

২। স্বামী বিবেকানন্দ, 'বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১২—১৩।(উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত)।

২। (ক) A. L. Basham, 'The Wonder That was India', P-266

৩। Haight. Banned Books—

৪। Ibid.

৫। 'ভবানী মন্দির' মূল গ্রন্থটি ইংরাজীতে লেখা। এর বাংলাও হয়।

৬। Kalicharan Ghose, 'The Roll of Honour', P. 70

৭। রাইটার্স বিল্ডিংসের লাইব্রেরীতে শ্রীগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। জানুয়ারি, ১৯৮০

৮। কালীচরণ ঘোষ, 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', (১ম খণ্ড। পৃঃ ২২৬)

৯। Letters of Sister Nivedita. edited with introduction by Sankari Prosad Basu, Voll. II. P. 1087.

১০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবন কথা' পৃঃ ৮২, আনন্দ সং।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার কারণ

ভারতের ইংরাজ সরকার বুঝেছিল শুধু কঠোর শাসনের দ্বারা এ দেশের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। ভারতীয় মন ও চিন্তার উপর লাগাম পরাতে না পারলে এ দেশে ইংরাজ শাসন কায়েম থাকবে না। তারা ভারতীয়দের বশংবদ জাতি হিসাবে গড়তে চেয়েছিল। মেকলে সগর্বে বলেছিলেন, "এমন এক জাতি গড়ে তুলব, যারা চেহারায় চরিত্রে হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তায় হবে ইংরাজ।" ইংরাজ শাসকরা ভয় পেত এদেশের মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে, নির্ভীক চেতনাকে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, বোমার চেয়ে বইপত্রের ব্যাপারে তাদের আশঙ্কা কম ছিল না। অবশ্যই তারা ভলটেয়ার, রুশো প্রমুখ লেখকদের কথা জানত যাঁদের রচনায় উপ্ত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের বীজ। হয়তো তারা আতঙ্কের সঙ্গে স্মরণ করেছিল হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টৌঈ-কে যাঁর 'আংকল টমস্ কেবিন' আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের ইন্ধন হয়েছিল, ঘটিয়েছিল দাসপ্রথার অবসান। তাই এ দেশে ইংরেজরা লেখক, কবি, চিন্তাবিদ মনীষীদের কণ্ঠরোধে তৎপর হয়। তারা বিশেষভাবে ভয় পেত দেশাত্মবোধক লেখাকে। কেননা সেইসব রচনার ভাব ও আদর্শ জনগণের কাছে পৌঁছলে এ-দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কবর খোঁড়া শুরু হয়ে যাবে। এইসব লেখাই তো মুক্তি সংগ্রামের তাজা বারুদ। বাংলায় মসীর দারুণ প্রভাব ইংরেজ সরকার এমন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে গোপন প্রতিবেদনে বার বার বলা হয়েছে, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও বইপত্র এ-দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর Terrorism in India (1917-36) নামে একটি অত্যন্ত গোপনীয় দলিলে ১৯১৭ সালের আগে বাংলার সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে

"The movement was started in 1906 through the newspaper 'Jugantar' in Calcutta and in Dacca. Other newspapers then combined to pour forth a steady stream of sedition, abuse and incitement to murder. A heavy list of outrages was the result, and it became increasingly difficult to cope with the conspiracies under the existing law" (1)

দেখা গেল, গোয়েন্দা ব্যুরোর মতে, ১৯০৬ সালে বাংলায় যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, 'যুগান্তর' পত্রিকাই তার প্রেরণা-উৎস। আমাদের দেশে মুক্তি-সংগ্রামে পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকার এই অগ্রণী ভূমিকায় তৎকালীন ভারত সরকারের গোয়েন্দারা কতখানি উদ্বিগ্ন ছিল তা এই বইয়ের আর এক জায়গায় আছে

"By the end of July 1931, it was evident that the existing legislature was not sufficient to cope with the terrorism menance. The day in which the Press lend itself to constant and violent propaganda in favour of assassains has already been referred to. The murders which had taken place could be traced, in no small measure to incitement by the press, and Bengal Government were convinced that action to control the Press was a vital necessity.

১৯১৭ সালে বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত রাউলাট কমিটি বা সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য আছে

"নিজেদের মতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁদের পাঠ্যসূচির মধ্যে ছিল ভগবৎগীতা, বিবেকানন্দের রচনা এবং ম্যাৎসিনী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্যারিবল্ডির জীবনকথা। বিচারপতি মুখার্জির ভাষায় : ঈশ্বরেচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ধর্মীয় নীতিসমূহের মত নীতিগুলিকে মতলববাজ ও দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিরা দুর্বলচিত্ত লোকেদের প্রভাবিত করার শক্তিশালী উপায় হিসাবে প্রয়োগ করত। এবং এইভাবে জঘন্য অপরাধে প্রবৃত্ত হবার হাতিয়ার হতে তাদের বাধ্য করত ; তা না হলে তারা হয়তো একাজে লিপ্ত হতে গেলে ভয়ে শিউরে যেত।"

বিশেষভাবে উত্তেজক ধরনের বা ক্ষতিকর তিনটি বই সম্পর্কে আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

'ভবানী মন্দির' (ভবানী, মা কালীরই একটি রূপ) ভবানীকে শক্তির আধার রূপে চিত্রিত করেছে। ভারতীয়দের অবশ্যই মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। তাদের জাপানের পথ অনুসরণ করতে হবে। ধর্ম থেকে তাদের শক্তি আহরণ করতেই হবে। কীভাবে তা করতে হবে এই বইয়ে আবেগময় ও বলিষ্ঠ ভাষায় তার বর্ণনা আছে। ধর্মীয় আদর্শগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃত করার এক উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত হল এই বইটি।

'বর্তমান রাজনীতি'তে বলা হয়েছে যে, উৎপীড়ন যখন কিছুতেই বন্ধ করা যায় না, তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কর্ম হচ্ছে সম্পদ এবং মুক্তির পথ ; এবং কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতেই শক্তির আরাধনা করে হিন্দুরা। কর্মই বাঞ্ছনীয়। অনিয়মিত যুদ্ধে দেশে যুবসমাজের শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। তখন তারা ক্রমশ নির্ভীক হবে এবং তরবারি খেলার পারদর্শিতা অর্জন করবে। তাদের বিপদের মুখোমুখি হতে হবে এবং বীরোচিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। তারপর 'মুক্তি কোন পথে' বইটি। এই বইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এতে আছে কিভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা স্বীয় দেশবাসীর ধনসম্পদ ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করতো এবং সে কাজের সমর্থন। সমগ্র বইটি যুগান্তরে প্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত নিবন্ধের সংকলন। এখানে খোলাখুলিভাবে আন্দোলন অভিযানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আভাস দেওয়া হয়েছে—যা প্রকৃত সংঘটিত হয়েছিল। এই বইয়ের গোড়ার দিকে 'জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার' নিন্দা করা হয়েছে। আন্দোলনের জন্য কীভাবে কর্মী সংগ্রহ করতে হবে, তার নির্ভুল মনোভাবের আভাস এতে আছে। কর্মীরা সব সময়েই এই ধরনের আন্দোলনে এবং বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে—যা দেশের বর্তমান নেতারা সবসময়ে আমাদের কাছে চায়।...

"আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ সম্পর্কে কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলনের অভাব নেই ; এবং ভগবানের কৃপায়, দেশের প্রতি ভালবাসায় এবং স্বাধীনতালাভের দৃঢ় সংকল্পে বাঙালীরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টার উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। অতএব কোনমতেই যেন একে অবজ্ঞা না করা হয়। কিন্তু এই আন্দোলন যদি স্বাধীনতার আদর্শ ছাড়াই হৃদয়ে পোষণ করা হয়, তাহলে প্রকৃত শক্তি ও শিক্ষা তাদের থেকে কখনই লাভ করা যাবে না। সেজন্য দলের সদস্যরা এক দিকে যেমন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দলের শক্তি বাড়াবে, অন্যদিকে তাদের সক্রিয় ও কর্মঠ থাকতে হবে এই আন্দোলন ও কাজে দেশকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে।"

এই বইয়ে আরও দেখানো হয়েছে যে, ইউরোপীয়দের গুলি করতে খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না, এবং নীরবে, গোপনে অস্ত্রসম্ভার গড়ে তোলা যায়। অস্ত্র বানানো শেখানোর জন্য ভারতীয়দের বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। ভারতীয় সৈন্যদেরও সাহায্য অবশ্যই পেতে হবে।...(২)

পদস্থ প্রশাসক জেমস ক্যাম্বেল কারও একই মন্তব্য করে গেছেন। তিনি কেবল মুক্তি সংগ্রামীদের উপর বইপত্রের বিপুল প্রভাবের কথাই বলেননি। কী ধরনের বই পড়া হত সে সম্পর্কে তথ্যও দিয়েছেন

এই পরিচ্ছেদে যে-সব বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন তল্লাসীতে এই প্রতিটি বইয়ের অনেকগুলি কপি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঢাকার অনুশীলন সমিতির কয়েক শত বই আছে এবং ওখানে পাওয়া বই-ইস্যুর এক তালিকা থেকে এইসব বইয়ের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে। সহজেই প্রথম প্রিয় বইটি হচ্ছে 'জালিয়াৎ ক্লাইভ', যা ওই সময়ের মধ্যে ১৩বার নেওয়া হয়েছিল। বইটির চরিত্র জানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পক্ষে এর নামই যথেষ্ট। যার উদ্দেশ্য, এটাই দেখানো যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়েছে জালিয়াতির মাধ্যমে। যেসব তরুণ অনুশীলন সমিতির লাইব্রেরী থেকে এই বইটি নেয়, তাদের একজন বই-ইস্যুর রেজিস্টারে সই করেছে, 'প্রফুল্লচন্দ্র চাকি' বলে। মজঃফরপুরের খুনীদের একজনের নামগ্রহণে দেখা যাচ্ছে সে কী ভাবছে, যখন সে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিনগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা করছে। এই ধরনের আর একটি বই 'মহারাজ নন্দকুমার'ও বহুবার ঐ লাইব্রেরী থেকে ইস্যু হয়েছে। এই বইটিও একই কারণে জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঠকদের কাছে এর পরই জনপ্রিয় ছিল রাণা প্রতাপ সিংয়ের জীবনী। বইটি ১৯০৬ সালে কলকাতায় ছাপা হয়। বইটি বাংলার ছাত্র সমাজকে উৎসর্গ করা' হয়েছিল এই আশায় যে, নিজের মাতৃভূমির জন্য প্রতাপ যেমন বীরত্বের সঙ্গে আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তারাও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে। পাঠকদের কাছে সমান প্রিয় ছিল 'শিখের বলিদান' ও 'ভগবৎ গীতা'। প্রতিটি বই ওই সময়ে ৮ বার করে ইস্যু হয়েছিল। প্রায় একই রকম জনপ্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। যা ৬ বার ইস্যু হয়েছিল ওই সময়ে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য এবং তরুণ বিপ্লবীদের কাছে সবচেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টি করেছিল 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি। সহজেই দেখা যায়, এইসব পুস্তক পাঠে কীভাবে একজন যুবককে সহজে ও সরাসরি ধর্ম ও দর্শনের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ থেকে রিভলভার্ ও বোমা ব্যবহারে নিয়ে যেত। (৩) [ভাবানুবাদ]

মুক্তি সংগ্রামে বইপত্রের প্রভাবের কথা প্রসঙ্গে জেমস ক্যাম্বেল কার তাঁর বইয়ে আরও বলেছেন যে, ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাঠাগারে শুধুই গীতাই ছিল ১৭ খণ্ড।

মানিকতলা বাগানের আস্তানা থেকেও তিন কপি গীতা পাওয়া যায়। বিপ্লবীদের পাঠাগারে 'চণ্ডী'ও ছিল একাধিক।

'বিপ্লবীদের বইপত্রে যে দুটি ধর্মগ্রন্থ প্রাধান্য পেত, তা হল ভগবৎ গীতা ও চণ্ডী। ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে ১৭ খানা গীতা, মানিকতলার বাগানে ৪টি চণ্ডী ও ৩টি গীতা গ্রন্থ পাওয়া যায়।' (৪) [অনূদিত]

দেশাত্মবোধক বইপত্র সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের রূপ এইপ্রকার অসংখ্য উদ্ধৃতি ইংরেজ আমলের সরকারি ফাইলপত্র থেকে উপস্থিত করা যায়।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রমুখের রচনা, সেইসঙ্গে যুগান্তর সন্ধ্যা প্রভৃতি সংবাদপত্রও যেমন দেশে ছড়িয়েছিল বিদ্যুৎবাণী এইসঙ্গে ইংরাজি বন্দে মাতরমে ও অন্যান্য কাগজে অরবিন্দ, বিপিন পাল, নিবেদিতার উদ্দীপ্ত রচনাও ছিল। আবার পরবর্তীকালে 'ধূমকেতু', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি অগ্নিস্রাবী লেখা ও নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের দেশাত্মবোধক কবিতা উপন্যাস তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

মুক্তি সংগ্রামী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ইতিহাস লেখকরাও এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। নজরুল জীবনীকার মুজফফর আহমেদ লিখেছেন

"শুধু যে তরুণেরা নজরুলের নিকট আসছিলেন তা নয় ; সন্ত্রাসবাদী 'দাদা' রাও (নেতারা) এসে তাকে আলিঙ্গন করে যাচ্ছিলেন। ১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের দুটি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলছিলেন যে, 'ধূমকেতু' তাঁদেরই কাগজ।" (৫)

নজরুল ১৯২২ সালে ১৩ই অক্টোবর তারিখে ধূমকেতুতে অগ্নিঝরা ভাষাতে লিখেছিলেন

"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।" (৬)

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহিত্যের সব শাখাই সেদিন সরব হয়েছিল। সরকার বুঝেছিলেন, এইসব লেখা বন্ধ করতে না পারলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করা যাবে না। তাই একের পর এক সার্কুলার জারি করে, একের পর এক আইন করে সরকার এইসব বইপত্র, সাময়িক পত্রিকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে তৎপর হন।

এই উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে যে অসংখ্য সার্কুলার জারি করেছিলেন, তার একটি (১৯০৯ সালের) এখানে তুলে দিলাম

"A number of seditious publications have been printed and circulated in the province during the last three years. The majority of these have been registered in the ordinary way, and all that have been so registered up to the present are being dealt with in the Special Branch and the office of the Director of Public Instruction.

In order that a watch may be kept on all publications to facilitate the immediate detection of seditious books, it seems desirable that officers should cause all books and pamphlets, which are deposited in future in the subdivisional and district officers for transmission to the Director of Public Instruction for registration, to be carefully examined immediately they have been so deposited and that thay should report through you as to any that may be found harmful or seditious. In forwarding any such book on pamphlet for registration a copy of the note sent up to the commissioners should be transmitted with it to the Director of Public Instruction."(৭)

১৯০৯ সালের মাঝামাঝি জারি হয় ওই সার্কুলারটি। দেশাত্মবোধক রচনা সম্পর্কে অতিশয় উৎকণ্ঠিত সরকারের 'আপত্তিকর' বইপত্র সম্পর্কে তন্ন তন্ন করে খোঁজ চালাতে চীফ সেক্রেটারী নির্দেশ দিয়েছেন ওই সার্কুলারে। এমনি সার্কুলার জারি হয়েছে বারবার। মুক্তিসংগ্রামের একজন ইতিহাস লেখকের ভাষায়

বইপত্র প্রায়ই নিষিদ্ধ হত। কর্তৃপক্ষ যখনই নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করতে পারতেন, তখনই বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত। লঘু অভিনব ভারতকথা (সাভারকরের মারাঠী কবিতা), মুক্তি কোন পথে, বর্তমান রণনীতি, ভবানী মন্দির, স্বাধীনতার ইতিহাস, ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনী, দেশের কথা (বাংলা) প্রভৃতি গ্রন্থের উপর বিশেষ নজর রাখা হত। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, অনল প্রবাহ, নব উদ্দীপন, রণজিতের জীবন যজ্ঞ প্রভৃতি গ্রন্থও এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। পুলিশের তালিকায় ভগবৎগীতা অত্যন্ত বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থ। এবং এমন ঘটনা কম নয় যে, বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র ও বিদ্রোহাত্মক গ্রন্থের খোঁজে তল্লাসীর সময় পুলিশ হিন্দুদের এই পবিত্র গ্রন্থটিও আটক করেছে।...(৮) [অনূদিত]

কিন্তু এত করেও সরকার সফল হননি। সরকার নিজেই সেকথা কবুল করেছেন। সিডিশন কমিটির প্রতিবেদনে (১৯১৮) এ স্বীকারোক্তি আছে:

"এই বছর ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট (অ্যাক্ট অব ১৯১০) বিধিবদ্ধ হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারী ওই আইনটি গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন পায়। ভূমিকায় আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশদ্রোহকর পত্র পত্রিকা সমূহের তীব্রতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৮ সালের নিউজপেপার অ্যাক্টে (অপরাধের প্ররোচনা দান) যেসব সংবাদপত্রে সন্দেহাতীত ভাবে অপরাধের উসকানি দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি ছাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রেসসমূহ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শীঘ্রই 'যুগান্তরের' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯১০ সালের আইন অনুসারে যেকোন ছাপাখানার পরিচারককে (Keeper) জামানত দিতে হত। এই আইনের ফলে অধিকাংশ দেশদ্রোহকর সাহিত্য গোপন ছাপাখানায় ছাপা হতে লাগল।" (৯) [অনূদিত]

সরকারের এই প্রতিবেদনের অনুরূপ কথা নিবেদিতার সমসাময়িক পত্রেও আছে:

Wednesday, May 19 or 20, 1910

To
MR. S. K. RATCLIFFE
Friend,

Your letter reached me yesterday afternoon. I have in any case in

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

these troublous times to send you weekly bulletins. Last morning various house in this neighbourhood were raided—and goods and boys seized in the name of the Khulna Dacoity. Khulna where one takes the steamer for Barisal, you will remember. Of course that I havn't troubled to follow. We expected to hear of R's (Ramananda's) arrest. That was not made, but some decrepit old gentleman of impassioned oratory called Devi prosanna Roy was—said to be 60—Editor of something they want to crush—and arrested on charge of sedition for printing a book by a mohammedan which is some years old : Anal Bharata—name I think but meaning I don't know. Younger man also was arrested—and subsequently a raid was made on alleged offices of secret press—and recent Yugantar seized with some members of its entourage. Of course you will understand that at present there is no war so holy as the work of the secret press."[১০]

সাংবাদিক র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা সেদিন গোপন প্রেসকে ধর্মযুদ্ধের অস্ত্র বলে লিখেছিলেন। আর এক জায়গায় তিনি গোপন সংবাদপত্রের পরিচালককে ঈশ্বরের খাঁটি সন্তান বলেছেন। ১৯১০ সালের ২৮ এপ্রিল মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে তিনি লেখেন

'Himself (Dr. Bose) was saying the other night how thankful we all ought to be that you are not here now ! You would have broken your heart, yet could not have done anything. Personally, I feel like a S. Kulker and 'cu-cumber of the earth'. **But there is nothing to be done but wait and trust to underground forces. If it be the highest morality to break a wicked law—then the true child of God at this moment is the conductor of a secret press'...**[১১]

আইনের বাঁধন যতই কঠোর হয়েছে, এই সব বইপত্র ততই অন্তরালে চলে গেছে। গোপনে বিনা মলাটে ছাপা হয়েছে, গোপনে ঘুরেছে তরুণদের হাতে হাতে। এইসব বিধি নিষেধের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বরং আপত্তিকর বই পড়ার উৎসাহ বেড়েই গেছে।

নির্দেশিকা

১। Terrorism in India (1917-36)...

২। Sedition committee's Report P. 24.

৩। James Campbell Ker, I C S, 'Political Trouble in India' (1907-1917)/ P. 44.

৪। Do—P. 45.

৫। মুজফফর আহমেদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'

৬। ঐ—পৃঃ ২৯৩

৭। No 7454—58. S. B. dated 27.7.1909. To all Commissioners in E. Bengal & Assam. By Chief Secretary, E. Bengal &Assam.

৮। Kalicharan Ghose, 'The Roll of Honour',—page-70.

৯। Sedition committee's Report. page-48.

১০। Letters of Sister Nivedita. Edited by Sankari Prasad Basu, Vol. 11 Page-1115.

১১। Do—page 1099.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়
নিষেধ আইন

"আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোনো কারণ নাই। দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনো গৌরব নাই।"[১]

প্লেগ প্রতিরোধের নামে মহারাষ্ট্রে প্রচণ্ড দমননীতির সময় চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের বুলেটে র‍্যান্ড ও আয়াস্টের হত্যা (২২ জুন, ১৮৯৭), তার প্ররোচক সন্দেহে তিলকের বিচার ও সাজার[২] সময় দেশবাসীর কণ্ঠরোধের জন্য প্রস্তুত হয় 'সিডিশন বিল'। দেশের সর্বত্র 'দায়িত্বহীন' লেখা বন্ধ করাই ছিল এই বিলের উদ্দেশ্য। ১৮৯৮ সালে সেই বিল পাশ হবার ঠিক আগে এর প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে আহূত জনসভায় রবীন্দ্রনাথ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন, যার থেকে ওপরের অংশ উদ্ধৃত। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মত প্রকাশের বিরুদ্ধে রাজশক্তির নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ওই নিবন্ধে আরও লিখেছেন

"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রখিয়াছিল। আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতাসূত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী ছিলাম। আমরা দুর্বল জাতির হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্ত হৃদয়ে উন্নতমস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিয়াছিলাম।..."আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই, রাজকার্য চালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপথতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হইবে ; যে সম্বন্ধের মধ্যে আদান-প্রদানের একটি সঙ্কীর্ণ পথ খোলা ছিল ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে ; রাজার প্রতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয়।

"এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।"

এই সিডিশন বিলের অনেক আগে থেকেই শাসকশক্তি নানা আইনের বেড়াজালে পত্র পত্রিকা এবং পুস্তক পুস্তিকাকে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেন। মোটকথা ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই এদেশে মানুষের কণ্ঠরোধ শুরু হয়েছে—নানা আইন, অর্ডিন্যান্স ও ফতোয়ার দ্বারা।

যতদূর পেয়েছি, ১৭৯১ সালে প্রথম ভারতে সংবাদপত্র ও বইপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই ব্যবস্থা চালু হয় বোম্বাইয়ে। এর কয়েক বছর পরেই লর্ড ওয়েলেসলির আমলে, চালু হয় 'প্রেস রেগুলেশন'[৩]—১৭৯৯ সালের ১৩মে।[৪]

জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের বাঁধন আরও শক্ত হয়েছে যেমন, তেমনি এর সংখ্যাও বেড়েছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরাধে প্রথম প্রেস আইন হয় ১৮২৩ সালে। তখনকার বড়লাট জন অ্যাডম ৪ এপ্রিল ঐ আইন জারি করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এই আইন অনুসারে কোন সাময়িকপত্র প্রকাশ করার আগে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ করে সেই হলফনামা চীফ সেক্রেটারির কাছে পাঠাতে হবে, এবং তিনিই লাইসেন্স দেবেন। আপত্তিকর কিছু বের হলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের লাইসেন্স বাতিল হবে এবং অর্থদণ্ডও। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর এই হস্তক্ষেপ সেদিন রাজা রামমোহন রায় বরদাস্ত করতে পারেননি। এইসব অবমাননাকর শর্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদে তিনি তাঁর ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 'মীরাতে উল আকবর' পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন।[৫] এর শেষ সংখ্যায় তিনি লেখেন :

"যে সম্মান হৃদয়ের শতরক্ত বিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত ওহে মহাশয়, কোনো অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না"[৬] (অনূদিত)

শুধু পত্রিকা বন্ধ করেই তিনি নীরব থাকেননি, এই আইনের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন পাঠান : আবেদন পাঠান সপারিষদ রাজা চতুর্থ জর্জের কাছেও ইংলন্ডে। সুপ্রীম কোর্টে যে আবেদন করা হয়, তাতে রাজা রামমোহন ছাড়া কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যাক্তিও সই করেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ; গৌরীচরণ ব্যানার্জী ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।[৭]

পরে প্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা মাঝে উঠে যায়। ১৮৩৫ সালের ৩ আগস্ট 'লিবার্টি অফ দি প্রেস' আইন পাশ হয় এবং মেটকাফের আমলে ১৮৩৫ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর তা কার্যকর হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর, লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ সালের ১৩ জুন থেকে প্রেসের উপর বিধিনিষেধ আবার চালু করেন। এই সময় কয়েকটি সংবাদপত্র 'দূরবীন', 'সুলতান-উল আকবর', 'সংবাদ সুধাবর্ষণ' নিষিদ্ধ হয়। দশ বছর পর চালু হয় 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট।' লর্ড রিপন 'সিডিশন পাবলিকেশন অ্যাক্ট' চালু করেন ১৮৮২ সালের ১৯ জানুয়ারী, 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইন' পাশ হয় এর আগেই ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এবং ৫০৫ ধারা চালু হয় ১৮৯৩ সালে। এতে চলমার-কৃত সিডিশন আইন সংশোধিত হয়েছে।[৮] এ ছাড়া ১৮৯৮ সালের কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের ৯৯ এ এবং ভারতীয় পেনাল কোডের ১২৪ এ ধারানুসারেও বইপত্র ও পত্র পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি চালু হয় পূর্ণাঙ্গ আইন। তার আগে হয়েছিল 'নিউজ পেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট'—১৯০৮ সালের ৮ই জুনে। বৈপ্লবিক আন্দোলন জোরদার হবার পর ১৯৩১ সালের ৯ অক্টোবর কার্যকর হয় 'ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার) অ্যাক্ট' ১৯৩১। ওই আইনে বইপত্র, সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার প্রভৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর হয়েছে। এছাড়া আরও আইন বলে বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন,১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর ড্রামাটিক পারফরম্যান্স আইন অনুসারে রঙ্গমঞ্চের উপর ও অভিনীত নাটকের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ জারি হয়। ওই বছরই জারি হয় 'সি কাস্টমস অ্যাক্ট'। এই আইন বিদেশে থেকে কোনো কিছু এদেশে আনা বা পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, নিষেধাজ্ঞা জারি হয় ডাকযোগে পাঠানো বইপত্রের উপরও। এজন্য ১৮৯৮ সালের ২২ মার্চ জারি হয় 'দি ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস অ্যাক্ট।'

দেখা যায়, ইংরেজ আমলে প্রধানতঃ চারটি আইন বলেই বইপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেগুলি হল

১। 'কোড অব্ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর'-(১৮৯৮)-এর ৯৯-এ ধারা,
২। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪ এ ধারা,
৩। ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট ১৯১০ (I অব ১৯১০)-এর ধারা (১)-এর ৪ ও ১২ উপধারা।
৪। ইন্ডিয়ান প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্টের (১৯৩১) ১৯ ধারা।

দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট, ১৮৯৮

১৮৯৮ সালের কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর-এর ৯৯-এ ধারা অনুসারে সরকার বইপত্র বাজেয়াপ্ত করার ও তল্লাসী পরোয়ানা জারির ক্ষমতা হাতে নেন। যে সব লেখা বিদ্রোহাত্মক এবং দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে ও কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয়, সেইসব লেখা এই আইনের আওতায় আসে। এই আইনে এ ধরনের যে-কোনো লেখা, সংবাদপত্র নথিপত্র সরকার গেজেটের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে পারবেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (১২৪এ)

ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে এমন কোনো লেখা বা কথার (বক্তৃতা প্রভৃতি) জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড—দুই-ই।

প্রেস আইন

সংবাদপত্রে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের প্ররোচনা দান করার জন্য 'নিউজ পেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট VII অব্ ১৯০৮ হয়। এই আইন হয়েছিল ১৯০৮ সালে জুনে।[৯] পূর্ণাঙ্গ প্রেস আইন হয় ১৯১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।[১০] প্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করার জন্যই এই আইন। শুধু সংবাদপত্রই নয়, এর ছাপাখানা—সবই। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত প্রেসকে জামানত জমা দিতে হবে এবং তা বাজেয়াপ্ত করা যাবে, তাছাড়া তল্লাসী পরোয়ানা জারি করাও যাবে। সন্দেহ হলে কোনো প্যাকেট আটক করা যাবে এবং প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের কপি বিনামূল্যে সরকারকে দিতে হবে।

ভারতে সংবাদপত্র ও বইপত্র নিয়ন্ত্রণে প্রথম ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ আইন হল ১৯১০ সালেই। পূর্ববর্তী আইনগুলির এই ব্যাপকতা ছিল না। এই পূর্ণাঙ্গ প্রেস আইনের জন্য সরকার বিল আনে ১৯১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। বিলটি ওঠার পর দেশে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। তখনকার সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় এর রিপোর্ট আছে। বিলটি সম্পর্কে ৪-২-১৯১০ তারিখে ইংলিশমানের প্রতিবেদন

'At today's meeting of the Imperial Lagislative Council the Hon'able Sir Herbert Risley will move to leave to introduce a bill for the better control of the press'.

এখানে উল্লেখ্য, ওই আইনটি পরে বাতিল হয়ে যায়—প্রেস ল রিপীল অ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, অব্ ১৯২২-এ। ১৯২২ সালের ২৯ মার্চ ওই আইন হয়।[১১]

১৯৩১ সালের ইমারজেন্সি প্রেস আইনের আগে বে-আইনী সংবাদপত্রের ও খণ্ডপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার অর্ডিন্যান্স হয়। গোপনে বিনা ডিক্লারেশনে যেসব পত্র ছাপা হত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই এই অর্ডিন্যান্স। ১৯৩০ সালের ২ জুলাই এটি হয়।[১২]

১৯৩১ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার) আইনটি কার্যকর হয় ১৯৩১ সালের ৯ অক্টোবর। সংবাদপত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য ১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশেষ গেজেটে যে অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়, সেই অর্ডিন্যান্সে সরকার যে সব ক্ষমতা হাতে নেন, সেইগুলিই ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) অ্যাক্টের (১৯৩১) অন্তর্ভুক্ত হয়।

হিংসাত্মক কার্যকলাপ বা হত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের বিবরণ কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান এই আইনে আছে। এতে প্রেসের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কঠোর হয়েছে। এবং বে-আইনী সংবাদপত্র ও খণ্ডপত্রের বিরুদ্ধে কঠোরতর বিধানের ব্যবস্থা হয়েছে। এই আইনে সরকার যে কোনো সংবাদপত্র, খণ্ডপত্র, ইস্তাহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা হাতে নেন। যখনই বলা হবে, তখনই প্রেসের মালিকরা জামানতের টাকা জমা দিতে বাধ্য হবেন এবং জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও সরকার ওই আইনে হাতে নেন। অপর যেসব ক্ষমতা এই আইনে সরকার হাতে নেন, তার মধ্যে উল্লেখ্য, বেআইনী সংবাদপত্র ও খণ্ডপত্র আটক ও ধ্বংস করা। যে সব প্রেসে ওইসব বেআইনী সংবাদপত্র, খণ্ডপত্র প্রভৃতি ছাপা হবে সেইসব প্রেস আটক বা নিষিদ্ধ করার ও বাজেয়াপ্ত করাও যাবে, বিদেশ থেকে পাঠানো এবং ডাকে পাঠানো প্রকাশনও আটকের ক্ষমতা সরকার এই আইনে হাতে নেন।

পরে বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল 'অ্যামেন্ডমেন্ট, অ্যাক্ট-৭ (১৯৩৪, ৩১ মার্চ) আইনে সংবাদপত্রের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্ররোচনাদায়ক যে-কোন সংবাদপত্র বা তথ্য সরকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে বা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবেন এই সংশোধিত আইনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সন্ত্রাসবাদী মামলা সংক্রান্ত সংবাদ ছাপানোর ব্যাপারেও ওই আইনে বিধি নিষেধ জারি হয়।[১৩]

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)

সরকারের চোখে আপত্তিকর নাটকের প্রচার বন্ধের জন্য ১৮৭৬ সালে ড্রামাটিক পারফরম্যান্স কন্ট্রোল অ্যাক্টটি চালু হয়। এর দ্বারা দেশাত্মবোধক নাটকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবং এসবের অভিনয়ের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। লর্ড লিটনের (ভাইসরয় ১৮৭৬) আমলে আইনটি চালু হয়, ১৮৭৬ সালে ১৬ মার্চ আইনটি পাশ হয়। ১৮৭২ সালে কলকাতায় জাতীয় রঙ্গমঞ্চ '(ন্যাশানাল থিয়েটার) স্থাপিত হবার পর দেশপ্রেম ও স্বাধিকারের যে ঝড় তুলেছিল নাটক ও নাট্যশালাগুলি, তাতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুনেছিলেন। বিভিন্ন দেশাত্মবোধক নাটকের ক্রমাগত অভিনয় সাফল্যে শাসকগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়। নাটকের মাধ্যমে দেশে যে জাগরণ ও বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির বাসনা জেগে ওঠে, তা স্তব্ধ করে দেবার জন্যই সরকার তৎপরতার সঙ্গে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ করেন।

আইন সচিব হব হাউস ১৮৭৬ সালের ২০ মার্চ সুপ্রীম কোর্ট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল'[১৪] উত্থাপন করেন এবং ২৫ মার্চ আইনটি গেজেটে বিজ্ঞাপিত হয়।[১৫]

এই আইনের বিরুদ্ধে সেদিন কলকাতা ও দেশের নানা স্থানে প্রতিবাদ ওঠে। এর বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়ট রোষে ফেটে পড়ে। ৪ এপ্রিল ১৮৭৮ জজ দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়িতে প্রতিবাদ সভা হয়। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রেজ এ্যান্ড রায়তের সম্পাদক) সভাপতিত্ব করেন। প্রাণনাথ পণ্ডিত, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অংশ নেন, তবে কিছু শিক্ষিত বাঙালী এই আইনের সমর্থনও করেন। যেমন রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর।[১৬]

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনে সরকারী আমলাদের ক্ষমতা দেওয়া হয় 'আপত্তিকর' নাটকের অভিনয় বন্ধের। সরকারি ভাষ্য অনুসারে যে-সব নাটকে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা হয়, তাই আপত্তিকর। অবশ্য সাম্প্রদায়িক, অশ্লীল, মানহানিকর নাটকও এর আওতায় আসে।

আদেশ অমান্য করে এই ধরনের নাটকের অভিনয় হলে অভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড—দুয়েরই ব্যবস্থা ছিল ওই আইনে। অভিনয়ের আগে কী ধরনের নাটক অভিনয় হবে, কোথায় অভিনয় হবে ওই আইনে তা সরকারকে জানাতে বাধ্য করা হয়। এইসব তথ্য না জানালে সাজার ব্যবস্থাও আইনে ছিল। রঙ্গমঞ্চে ঢুকে কাউকে গ্রেফতার বা কোন কিছু আটকের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশকে পরোয়ানা দিতে পারবেন ওই আইনে।

সামুদ্রিক শুল্ক আইন, ১৮৭৮

১৮৭৮ সালের সি-কাস্টমস অ্যাক্টেও বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে দেশের বাইরে থেকে পাঠানো 'আপত্তিকর' বইপত্রের দেশে আনা ও প্রচার বন্ধের জন্যই এই আইন প্রয়োগ করা হয়। বিপ্লবীরা অনেক সময় দেশাত্মবোধক বইপত্র ও প্রচারপত্র বিদেশ থেকে ছাপিয়ে এনে দেশে প্রচার করতেন। ব্রিটেন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে ছাপা বইপত্র এদেশে প্রচার করা হত। ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে চন্দননগরেও বহু বাংলা বই ছাপতেন সে যুগে বিপ্লবীরা। বিশেষ করে চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।[১৭]

এই সি কাস্টমস ১৮৭৮ আইনে বিদেশে থেকে কোনোকিছু এদেশে আনা ও পাঠানোর উপর বিধি নিষেধ আরোপ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট জিনিস আটক বা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও সরকার হাতে নেন।

১৮৭৮ সালের ৮ মার্চ এই শুল্ক আইন সারা ভারতে বলবৎ হয়।[১৮]

দৃষ্টান্ত : সামুদ্রিক শুল্ক আইনের প্রয়োগ

কিভাবে উপরের আইনটি জারি করা হত, তার একটি দৃষ্টান্ত সরকারের গোপন ফাইল থেকে উপস্থিত করছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারত সরকারের সেক্রেটারি এ সি ম্যাকওয়ারেন ১৯২৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে এক আদেশবলে "বিপ্লবের বলি", প্রথম খণ্ড লেখক : যতীন্দ্র মুখার্জি বইটি ১৮৭৮ সালের সি কাস্টমস্ আইনের ১৯ ধারা বলে ভারতে ঢোকা নিষিদ্ধ করেন। বইটি চন্দননগরের বিঃ প্র প্রেসে ছাপা। প্রকাশক : বসন্তকুমার চক্রবর্তী। যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, নীরেন এবং মনোরঞ্জনের বীরত্ব কাহিনী এতে আছে। তবে টেগার্ট তাঁর নোটে জানান, বইটি আসলে কলকাতার সরস্বতী প্রেসেই ছাপা। আইনের চোখে ধুলো দেবার জন্য চন্দননগর থেকে প্রকাশিত বলে বইয়ে লেখা হয়।

ওইসব বইয়ের বিরুদ্ধে সি কাস্টমস্ অ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থা নেবার জন্য বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি L Birly ভারত সরকারের সেক্রেটারিকে ১৯২৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এই পত্র লেখেন (পত্রটি অনুবাদ করছি)

(১৯) প্রেরক এল বারলি, সি ই ঈ, আই সি এস, মুখ্য সচিব,

বাংলা সরকার

প্রাপক বাংলা সরকারের সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্র বিভাগ)

তাং ২৭-২-১৯২৯

বিষয়—চন্দননগরের সাধনা প্রেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব।

এক, আপনাকে এই অনুরোধ জানাতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে চন্দননগরে সাধনা প্রেসে মুদ্রিত বা চন্দননগরে প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত কোনো বই, সংবাদপত্র, বা সাময়িকী জলপথে বা ভূপথে ব্রিটিশ ভারতে আনা নিষিদ্ধ করে ১৮৭৮ সালের সি কাস্টমস্ আইনের ১৯ ধারা মতে এক আদেশ জারি করার জন্য ভারত সরকার সমীপে প্রস্তাব করা হোক।

দুই, এ সম্পর্কে আমি আমার ১৯২৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের চিঠির (লেটার নং ১১৬৪ পি ডি) উল্লেখ করতে চাই। উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর ভারত সরকার চন্দননগরের মতিলাল রায়ের 'কানাইলাল' নামে একটি বইয়ের বিরুদ্ধে সি কাস্টমস আইন অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ওই বইটি প্রবর্তক পাবলিশিং হাউসের রামেশ্বর দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং সাধনা প্রেসে মুদ্রিত। এই বইয়ের কানাইলাল দত্ত ও সতেন্দ্রনাথ বসুর (যাঁরা ১৯০৮ সালে আলিপুর জেলে একজন রাজসাক্ষীকে হত্যা করেন) এবং অন্য খুনীদের আলোকচিত্র আছে। সপারিষদ রাজ্যপালের মতে এই বইটির উদ্দেশ্য হল হত্যায় উসকানি দেওয়া।

তিন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসংখ্য ব্যাপারে প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউসের বইপত্র সপারিষদ রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'কানাইলাল' বইটি বস্তুত ১৯২২ সালের জুন এবং জুলাইয়ের প্রবর্ত্তক পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সমূহেরই পুনর্মুদ্রণ। এবং এইসব নিবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখনই সপারিষদ রাজ্যপাল এর ধরন সম্পর্কে চন্দননগরের প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই ধরনের নিবন্ধাদি ছাপা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে তাঁকে বলেন। প্রশাসক প্রিণ্টারকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু এরপর ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে 'কানাইলাল' সম্পর্কে আরও নিবন্ধ বেরোয় এবং ১৯২৩ সালের আগস্টে ওইসব নিবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

চার, ১৯২৩ সালের নভেম্বরে ভারতে ফরাসী অধিকৃত এলাকাগুলির রাজ্যপালকে 'কানাইলাল' সম্পর্কে নিবান্ধাদি ও বই সম্পর্কে পত্র লেখা হয়, এবং তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, বিপ্লবী সংস্থাগুলির নেতারা তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেন, এই ধরনের বই প্রকাশ তারই একটি। ১৯২৪ সালের ৪ জানুয়ারির চিঠিতে ভারতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের রাজ্যপাল (নং আই সি, তাং ৪ জানুয়ারি, ১৯২৪) ওইসব লেখার বিপজ্জনক চরিত্রের স্বীকার করেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর এলাকার প্রেসগুলিতে যা ছাপা হবে সে সম্পর্কে তিনি নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখবেন এবং আপত্তিকর নিবন্ধগুলি নোটিশে আনবেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রয়োজন হলে প্রবর্ত্তক বন্ধ করার জন্য মামলা দায়ের করার আদেশ জারিতে তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না।

মিঃ মবারলির পত্রসহ (নং ১৫৪৪ পি তাং ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪) এই পত্রের কপি আপনাকে পেশ করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাঁচ, ১৯২৪ সালে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সম্পর্কে প্রবর্ত্তক মে মাসে একটি কাহিনী ছাপায়। পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় কি করে তিনি পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে, সুযোগ মতো আঘাত করেছেন, তারই উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ এতে আছে। অনেকগুলি আপত্তিকর অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি হল এই :—'সর্বদা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইংরেজদের অসংখ্য শত্রু আছেন, যাঁরা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ দিয়ে ভারতকে সাহায্য করতে এবং তাদের পতন ঘটাতে আনন্দিত হবেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে প্রবর্ত্তক 'বিপ্লবী যুগ' এবং বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা' নামে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ নিবন্ধাদি ছাপে। এই দুটি নিবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে সপারিষদ রাজ্যপাল চন্দননগরের প্রশাসককে পত্র লেখেন। আপত্তিকর লেখা ছাপার জন্য ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে ভারতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের রাজ্যপাল এক আদেশ জারি করে প্রবর্ত্তক পত্রিকা তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেন।

ছয়, সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বারবার দরবার করার ফলে প্রবর্ত্তক পত্রিকাটি তিন মাসের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। বর্তমান প্রশাসক মঁশিয়ে চ্যাম্পিয়ন যে ভবিষ্যতে এই পত্রিকার প্রকাশের উপর বিধি নিষেধ জারি করতে সবকিছু করবেন, তাঁর সেই ইচ্ছা সম্পর্কে সপারিষদ রাজ্যপালের কোনই সন্দেহ নেই। তবে কেবল প্রবর্ত্তক পত্রিকার উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় সপারিষদ রাজ্যপাল সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

সাত, বাংলার যুবকদের মনে সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণার উসকানি দেওয়ার ব্যাপারে যেসব সংস্থা মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে, বস্তুত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাদেরই একটি। এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র চন্দননগরে। এবং বাংলায় এর ব্যাপক প্রভাব আছে।

আট, আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রবর্ত্তক পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ দিয়েই 'কানাইলাল' বইটি ছাপা। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে 'শতবর্ষের বাংলা' প্রথম খণ্ড লেখক মতিলাল রায়' নামে একটি বই প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় এবং সাধনা প্রেস থেকে ওটি মুদ্রিত। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফল সম্পর্কে ওই বইয়ে তীব্র নিন্দা করা হয়। এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল : 'এইভাবে তিলে তিলে মরার চেয়ে (গত দেড়শো বছর ধরে যা চলেছে) তারা (বাঙালীরা) যদি পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তাহলে অনেক ভাল হত। এইভাবে দু'কোটি মানুষের কঙ্কালের উপর ব্রিটিশ রাজ তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এখনও এ দেশকে এই একই মনোভাব নিয়ে শাসন করে চলেছে।' তারপর এতে বাংলার কয়েকজন জাতীয় ও বিশিষ্ট নেতার বিবরণ আছে। প্রথম খণ্ডের শেষ দিকে এদেশে বিপ্লবীদের শোষণের কথা লেখক বলেছেন। কীভাবে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অনুচ্ছেদেই তা সুস্পষ্ট ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাটেনকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। সারা দেশ সচকিত হয়ে উঠল। প্রত্যেকে বুঝতে পারল যে, রক্তাক্ত পথের অনুগামীরা অভিযানে নেমেছে। এই লোমহর্ষক ঘটনার পর কুস্টিয়ায় মিশনারি মিঃ হিগিং বোথেমকে গুলি করা হয়। এইসব ঘটনায় প্রত্যেকেই নতুন করে গর্ব ও উত্তেজনা বোধ করল। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এসব নিয়ে গোপনে সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা হতে লাগল।

নয়, নব সঙ্ঘ সাপ্তাহিক পত্রিকাটিও সাধনা প্রেসে ছাপা হয় এবং ওই পত্রিকায়ও প্রায়ই আপত্তিকর নিবন্ধাদি বের হয়। স্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার' নামে একটি পত্রিকাও নবশক্তির (ইংরাজি সংস্করণ) সঙ্গে সংযোজিত।... মতিলাল রায় একে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একটি মুখপাত্র বলে উল্লেখ করায় নবশক্তির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুস্পষ্ট। এবং ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এতে ধারাবাহিকভাবে 'শতবর্ষের বাংলা' বের হতে শুরু হয়। প্রবর্ত্তক পত্রিকা থেকে এখানে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

দশ, যুগান্তরের হিংসাত্মক লেখা পড়ার পর ১৯০৮ সালে অনেক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করেন। সপারিষদ রাজ্যপালের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এখানকার চক্রান্তকারীরাও একই ধরনের প্রচারে মেতেছে।

এগার, সপারিষদ রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, সি কাস্টমস্ আইনের ১৯ ধারা মতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আদেশ জারি করা হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে

(১) কলকাতার বাইরে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৫০ ধারা অনুসারে এবং কলকাতায় কলকাতা পুলিশ অ্যাকসনের ৮১ ধারা অনুসারে একজন পুলিশ অফিসার বইপত্র আটক করতে পারবেন।

(২) ব্রিটিশ ভারতে যে কেউ নিষিদ্ধ বইপত্র আনলে সি কাস্টমস আইনের ১৬৭ ধারা অনুসারে তাঁকে অভিযুক্ত করা যাবে।

(৩) সি কাস্টমস্ আইনের ১৬৭ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ বইপত্র বাজেয়াপ্ত করা যায়।

বার, পরিষদের (রাজ্যপাল) বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তাঁরা যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করছেন, তা এখানের ফরাসী কর্তৃপক্ষের পক্ষে গ্রহণীয় হবে না। খুব শীঘ্রই 'শতবর্ষের বাংলা দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হতে পারে তাই আমি অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ সম্পর্কে অবিলম্বে আদেশ জারি করা হোক। এবং সারা বাংলায় এই বইয়ের প্রচার রোধ করার জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"[১৯] (অনুদিত)

এক সময় দেশাত্মবোধক বইপত্রের খোঁজে জাহাজে জাহাজে তল্লাসীর নির্দেশও দেওয়া হয়। ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি ইলিসিয়ান রো'র গোয়েন্দা দপ্তর থেকে দিল্লিতে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সহকারী ডিরেক্টর ক্লেরীর কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়

"My dear cleary, on 24th November 1924 a customs Detective Officer seized a Bengali booklet entitled 'Abahan' from one Jamint Ali, a tindal of the 55' city of Athens". The latter stated he had got the book from two men, (a Hindu and a Muhamadan) who distributed a large number of copies of the same, free to the people at the Pontoon in Bombay. The booklet did not contain the name of either the printer, publisher or the press at which it was printed. It appeared, however, from the advertisement of the cover that copies were available from the author **Md. Enamal Hag, Debatabari, village Sultanpur, P.O. Tenali, Dist, Chittagong.**

A review with translations of selective passages of the books by the Bengali translator was sent to the Public Prosecutor, Calcutta who recommended proscription of the book under section 99A of the C.P.C. as amended the 3rd schedule of the Press Law Repeal and Amendment Act 1922, but did not advise a prosecution against the tendal. The book has accordingly been proscribed by the Government of Bengal in their political development No. 423 dated the 12th January 1925.

I have requested the collector of Customs, Calcutta, to be on the look out for seditious literature on all vessels manned by Indian crews which come into the port, particularly those from continental ports.[২০]

মূলতঃ যে-সব আইন বলে বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত, সেই সবের মূল ইংরাজি বয়ান পরিশিষ্টে দেওয়া হল :[২১]

নির্দেশিকা

১। ক) 'রবীন্দ্র' রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড পঃ বঙ্গ সরকার, পৃঃ ৯৬২

খ) ১৩০৫ সালে বৈশাখে ভারতী পত্রিকায় 'কণ্ঠরোধ' নিবন্ধটি বের হয় ;

'রবীন্দ্র জীবনকথা' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ সং, পৃঃ ৫১।

২। তিলকের জেল "'On September 1897 he (Tilak) was sentenced to eighteen months imprisonment."

—Dictionary of Nation Biography vol IV p 353. (institute of historical studies, calcutta-1974 p. 353.

৩। **The Footprint on the Road of Indian Independence,** by K. C. Ghose, p. 3.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪ । Ibid.

৫ । **The Life And Letters of Raja Rammohan Roy,** by Sophin Dobson Collet, p. 455 (See Also Appendix I).

৬ । রাসবিহারী রায়, 'ভারত-গৌরব রাজা রামমোহন রায়', পৃ ৫৩—

৭ । **The Life And Letters of Raja Rammohan Roy,** by Collet, p. 453.

৮ । "Indian Act (IV) Chalmer's Sedition Law Amended (Sec 124 & sec. 505 I. P. C. for control of the Press introduced.) dt. 1893, Dec. 27"—**The Footprint On the Road To Indian Independence,** by K. C. Ghose, p. 4.

৯ । "The Act provide for prevention of incitements to murder and to other offence in newspapers.

Under this Act S.3 (1) all copies of offending newspapers are to be confiscated, and printing presses are liable to be attached ex parte", S. 3(3).

"Under S.4(1) the police is empowered to seize, detain, or carry away property ordered to be forfeited.

"The declaration by a Printer made under the Press and Registration of Books (Act XXV of 1867) may be annulled under S.7".—**The Roll of Honour,** K. C. Ghose, p. 621.

১০ । Bengal Act (1) for control of the Press comes into force 9. 2. 1910.—**The Footprints On the Road of Indian Independence.** P. 7.

১১ । "To repeal Indian Press Act, 1910, the Newspaper (Incitement to offences) Act, 1908, and to make provisions in regard to liability of editors of newspapers, and to facilitate the registration of printers and publishers, and to provide for the seizure and disposal of offesive documents".এই হল ১৯২২ সালের "রিপীল ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট" (The **Roll of Honour. P. 627**)

১২ । Ibid. p. 631. The 'unauthorised News-sheets and Newspapers ordinance' **VII of 1930, (July 2, 1930).**

'It is to provide for the central of unauthorised news-sheets and newspaper. Power is taken to seize and forfeit **undeclared** presses which the police may enter and search without **warrant**" (S. 5.).

১৩ ।(ক) **Terrorism In India.** (1917-1936) serial No. 21. **compiled** in the Intelligent Bureau, Home Dept. Govt. of India, Printed by the Manager, Govt. of India Press, Simla, 1937. p. 46. (See also Appendix II)

১৩ ।(খ) "A new sec (2A) is added to what is contained in sec. 2 of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931 under which the government may (S. 6) prohibit either absolutely or put restriction on publication in any newspaper, etc. of any class of information which...lends to excite sympathy with or secure adherents to the terrorist movement". —**The Roll of Honour,** p. 637.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৪। ক) **Indian Stage by H. N. Dasgupta. p. 282.**
খ) "গিরিশচন্দ্র"—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দে বুক সং পৃ-১২৭
১৫। **Indian Gazette,** 25th March, 1876. p. 346.
১৬।(ক)H. N. Dasgupta, **Indian Stage,** page. 283.
১৬।(খ) অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, "গিরিশচন্দ্র" পৃ ১২৮
১৭। ভারত সরকারের সেক্রেটারিকে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারির চিঠি। তাং ২৭-২-১৯২৯।
১৮। **Air Manual,** 2nd Edition, Vol. 24, 1962.
১৯। FL. No. 257/25 Home (Pol.), 1929.
২০। I. B. Records, 1925.
২১। নানা সূত্রে আইনের তথ্যগুলি সংগৃহীত
(ক) **Air Manual,** 2nd Edition, Vol. 24, 1962;
(খ) **Roll of Honour.** K. C. Ghose
(গ) **Indian State,** H. N. Dasgupta.
(ঘ) 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব', ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য।
(ঙ) **Torrorism In India.** I. B. Home Dept. (Govt. of India).

Appendix-I

Act No. XIX of 1876 (16th December, 1876)
An Act for the better control of Public Dramatic Performance.
THE DRAMATIC PERFORMANCE CONTROL ACT, 1876.

Preamble

Whereas it is expedient to empower the Governmemt to prohibit Public dramatic performance which are scandalous, defamatory, seditious or obscene; it is hereby enacted as follows:

Short title Local extent

1) This Act may be called the Dramatic Performances Act, 1876. It extends to the member of British India.

Magistrate defined.

2) In this Act 'Magistrate' means, in the Presidency power, Magistrate of Police, and elsewhere the Magistrate of the District.

Power to prohibit certain dramatic performances.

3) Whenever the local Government is of opinion that any play, pantomine of other drama performed or about to be performed in a public place is—

a) of a scandalous or defamatory; or

b) likely to excite feelings of dissatisfaction to the Government established by law in British India.

or

c) likely to deprave and corrupt person present at the performance;

The Local Government, or outside the presidency-power and Rangoon the local Government on such Magistrate as it may empower in this behalf, may by order prohibit the performance. Explanation:- Any building or enclosure to which the public are admitted to witness a performance on payment of money shall be deemed a 'public place' within the meaning of this section.

Power to serve order of prohibition penalty for disobeying order.

4. A copy of any such order may be served on any person about to take part in performance so prohibited, as on the other or occupier of any house, room as

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

place in which such performance is intended to take place; and any person on whom such copy is served, and who does, are willingly permit, any act in disobedience for such order, shall be punished or convicted before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to notify order.

5. Any such order may be notified by proclamation, and a written or printed notice thereof may be struck up at any place or places adapted for giving information of the order for the persons intending to take part in or to witness the performance as prohibited.

Penalty for disobeying prohibition.

6) Whenever after notification of any such order:-

a) takes part in the performance prohibited thereby or in performance substantially the same as the performance so prohibited, or

b) in any manner assists in conducting any such performance, or

c) is in wilful disobedience to such order present as a spectator during the whole or any part of any such performance, or

d) being the owner or occupier, or having the use of any house, room or place, opens, keeps or uses the same for any such performance, or permit the same to be opened, kept or used for any such performance.

shall be punishable in conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to call for **information.**

7. For the purpose of ascertaining the charactar of any intended public dramatic performance, the local Govt., **or such officer** as it may specially empower in this behalf, may apply to the **author,** proprietor or printers of the drama about to be performed, as to the owner or occupier of the place in which it is intended to be performed, for such information as the Local Govt. or such Officer thinks necessary.

Every person so applied who shall be bound to furnish the same to the best of his ability, and whoever contravene, as offence under Section 176 of the Indian Penal Code.

Power to grant to enter and arrest & seize.

8. If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used, as is about to be used, for any performance prohibited under this act, he may, by his warrant, authorise any Officer of Police to enter with such assistance as may be requisite, by night or by day, and by force, if necessary, any such house, room or place, and to take into custody all person whom he finds therein, and to seize all scenary, dresses and other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be intended to be used, for the purpose of such performance.

Saving of prosecution under Penal Code, Sections, 124 A and 994. XLV of 1860.

9. No conviction under this Act shall has a prosecution under section 1?4-A. as Sec. 294 of the Indian Penal Code.

Power to prohibit dramatic performance in any local area, except under license.

10. Whenever it appears to the Local Govt. that the provision of the section are required in any local area, it may declare, by notification in the local Official Gazette, that such provision are applied to such area from a day to be fixed in the notification.

On and after that day, the Local Government may order that no dramatic performance shall take place in any place of public entertainment within such area, except under a license to be granted by such local Goverment, or Officer as it may specially empower in this behalf.

The Local Govt. may also order that no dramatic performance shall take place in any place of Public entertainment within such area, unless a copy of

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

the piece, if and so far it is written, or some sufficient account of its purport, if and so far as it is in pantomine has been furnished, not less than three days before the performance, to the local Govt. or to such Officer as it may appoint in this behalf.

A copy of any order under this section may be served on any keeper of a place of Public entertainment; and if thereafter he does or willingly permit any act in disobedience to such order, shall be punishable on connection before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fines or with both.

Power exercisable by Governor-General.

11. The Power conferred by this Act on the Local Govt. may be exercised also by the Governor General in Council.

Execution of performance at religious festivals.

12. Nothing in the Act applies to any Jatra or performances of a like kind at religious festivals.

THE SEA CUSTOMS ACT 1878 SECTION-19

Power to prohibit or restrict importation or exportation of goods.

The Central Government may from time to time by Notification in the official Gazette prohibit or restrict the bringing or taking by sea or by Land goods of any specified description into or out of India (Across any Customs Frontier as defined by the Central Government).

19 a: Detention or confiscation of goods whose importation is prohibited.

(1) Before detaining any such goods as are or may be specified in or under Sec. 18 or Sec. 19, as the case may be or taking any further proceeding with a view to the confiscation thereof under their Act, the Chief Customs Officer or other officer appointed by the Chief Customs Authority in this behalf may require the Regulation under this Sec. whether as to information security, conditions or other matter, to be complied with, and may satisfy himself in accordance with those regulation that the goods are such as are prohibited to be imported.

(2) The Central Government may make regulation, other general or special, respecting the detention and confiscation of goods the importation of which is prohibited, and the conditions, if any, to be fulfilled before such detention and confiscation, and may by such regulation determine information, notices and security to be given, and the evidence requisite for any of the purposes of this section and made of varification of such evidence.

(3) Where there is on any goods a name which is identical with, or a colourable imitation of, the name of a place is the United Kingdom (India) or (Burma), that name, unless accompanied in equally large and conspicuous letters, (in the English Language) by the name of the Country in which such place is situated, shall be treated for the purposes of Section-18 and 19 as if it were the name of a place in the United Kingdom (India) or (Burma),

(4) Such regulations may apply to all goods the importation of which is prohibited by Section 18 or under Section 19, as different regulation may be made respecting different classes of such goods or of offences in relation to such goods.

(5) The regulation may provide for the information reimbursing and any public office and the (Central Government) all expenses and damages incurred in all respect of any detention made on his information, and of any proceeding consequent on such detention.

(6) All regulations under the Section shall be published in the Gazette of India, with the consent of the State Govt. concerned, with official Gazette of each State.

(Air Manual 2nd Edition. Vol.-14, 1962 page 163-165)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (1898) 99A.

99A power to declare certain publications forfeited and to issue search-warrants for the same-(1) Where-

(a) Any newspaper, or book as defind in the Press and Registration of Books Act, 1867.

or

(b) any document, wherever printed, appear to the State Govt. to contain any seditious matter (or any matter which promotes or is intended to promote feelings of enmity or hatred between different classes of (the citizens of India) (or which is deliberately and maliciously intended to outrage the religious feelings of any such class by insulating the religion or the religious beliefs of that class), that is to say, any matter the publication of which is punishable under Section 124A (or Section 153A) (or Section 295A) of the Indian Penal Code. The State Govt. may by notification in the official gazette, stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter, and every copy of such book or other document to be forfeited to Govt., and thereupon any Police Officer may seize the same wherever found in (India) or any Magistrate may be warrant to authorise any Police-Officer not below the rank of Sub-Inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be (2) In-Sub-secn. (i) 'document' including also any painting, drawing or photograph, or other visible representation.

INDIAN PENAL CODE (124-A)

124A. sedition: Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Govt. established by Law in India, shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

INDIAN PRESS ACT 1910

Power to declare security forfeited in certain cases.

4. (i) whenever it appears to the Local Government that any Printing Press in respect of which any security has been deposited as required, by Section 3 is used for the purpose of Printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, sign, or visible representation which are likely or may have a tendency, directly or indirectly, whether by inference, suggestion, allusion, metaphor, implication or otherwise:

(a) to incite to murder or to any offence under the Explosive substance Act, 1908, or to any act of violence, or

(b) to seduce any Officer, Soldier or Sailor in the Army or Navy of His Majesty from his allegiance or his duty, or

(c) to bring into hatred or contempt His Majesty or the Government established by Law in British India or the Administration of justice in British India or any Native Prince or Chief under the suzerainty of His Majesty, or any Class or Section of His Majesty's subjects in British India, or to excite disaffection towards His Majesty or the said Government or any such prince or Chief, or

(d) to put any person in fear or to cause annoyance to him and thereby induce him to deliver to any person any property or valuable security or to do any act which he is not legally bound to do or

(c) to encourage or incite any person to interfere with the administration of Law and Order,

Or

(f) to convey any threat of injury to a public servant, or to any person in whom that public servant is believed to be interested with a view to inducing that

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

public servant to do any act or to forbear or delay to do any act connected with the exercise of his Public function.

The local Government may, by notice in writing to the keeper of such Printing Press, stating as discriminating the words, signs, or visible representations which in its opinion are of the nature described above, declare the security deposited in respect of such Press, all copies of such newspaper, book or other documents wherever found to be forfeited to His Majesty.

Prower to declare 12(1) certain publication forfeited and to issue search warrants for the same.

12. (i) Where any newspaper, book or other document whenever printed appears to the Local Government to contain any words, signs, or visible representation of the nature described in section-4-Sub-section (1) the Local Govt. may by notification in the local official gazette stating the ground of its opinion declare such newspaper, book or other document to be forfeited to His Majesty, and thereupon any P. O. may seize the same wherever found, and any Magistrate may by warrant authorise any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector to enter upon and search for the same in any premises where the newspaper, book or other document may be or may be reasonably suspected to be.

THE INDIAN PRESS (EMERGENCY POWERS) ACT, 1931
(ACT XXIII OF 1931)

Power to declare security or press forfeited in certain cases.

4. (1) Whenever it appears to the (provincial Government) that any printing press in respect of which any security has been ordered to be deposited under section-3 is used for the purpose of printing or publishing any newspaper, book or other document containing any words, sign or visible representations which-

(a) incite to or encourage, or tend to incite to or to encourage, the commission of any offence of murder or any cognizable offence involving violence. or

(b) directly or indirectly express approval or admiration of any such offence, or of any person, real or fictitious, who has committed or is alleged or represented to have committed any such offence,

Or which tend, directly or indirectly,

(c) to seduce any Officer, Soldier, sailor or airman in the military, naval or air forces of His Majesty or any Police-Officer from his allegiance. or his duty, or

(d) to bring into harted or contempt His Majesty or the Government established by law in British India or the administration of Justice in British India or any class or section of His Majesty's subjects in British India, or to excite disaffection towards His Majesty or the said Government, or

(e) to put any person in fear or to cause annoyance to him and thereby induce him to deliver to any person any property or valuable security or to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which he is legally entitled to do, or

(f) to encourage or incite any person to interfere with the administration of the law or with the maintenance of law and order, or to commit any offence, or to refuse or defer payment of any land revenue, tax, rate, cess or other due or amount payable to Government or to any local authority, or any rent of agricultural land or anything recoverable as arrears of or along with such rent, or

(g) to induce a public servant or a servant of a local authority to do any act or to forbear or delay to do any act connected with the exercise of his public functions or to resign his office, or

(h) to promote feelings of enmity or hatred between different classes of His Majesty's or

(i) to prejudice the recruiting of persons to serve in any of His

দুনিয়ার পাঠক এক হও

Majesty's forces, or in any Police force, or to prejudice the training, discipline or administration of any such force or,

(j) which give any information in contravention of a notification published under Sec. 2-A, or

(k) disclose the i dentity of any witness in contravention of the provision of Sec. 2-B;

the (Provincial ·Government) may, by notice in writing to the keeper of such printing-press, stating or describing the words, signs or visible representations which in its opinion are of the nature described above,—

(i) where security has been deposited, declare such security, or any portion thereof to be forfeited to His Majesty, or

(ii) where security has not been deposited, declare the press to be forfeited to His Majesty,

and may also declare all copies of such newspaper, book of other document wherever found in British India to be forfeited to His Majesty.

Provided that no such declaration shall be made in a case which clause (I) applies unless the keeper of the Printing Press has had an opportunity of showing cause why such declaration should not be made.

(ii) After the expiry of ten days from the date of the issue of a notice under sub-section (i) declaring a security, or any portion thereof, to be forfeited, the declaration made in respect of such press under Section 4 of the Press and Registration of Books Act, 1867 shall be deemed to be annulled.

Special provisions relating to the seizure of certain documents.
Power to declare certain forfeited and to issue search warrants for same.

19. Where any newspaper book or other document wherever made appears to the (provincial Government) to contain any words, signs or visible representations of the nature described in Section-4, sub-section (1) the (Provincial Government) may, by notification in the (Official Gazette), stating the ground of its opinion, declare every copy of the issue, of the newspaper, and every copy of such book or other documents to be forfeited to His Majesty, and thereupon any police-officer may seize the same wherever found in British India, and any Magistrate may by warrant authorise any Police Officer not below the rank of Sub-inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be.

Appendix-II
Terrorism in India

Compiled by the Intelligence Bureau,
Home Department,
Government of India (published 1937)

Supplementary Legislation: By the end of July 1931 it was evident that the existing legislation was not sufficient to cope with the terrorist menace. The way in which the Press lend itself to constant and violent propraganda in favour of assassins has already been referred to. The

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
murders which had taken place could be traced, in no small measure to incitement by the press, and the Bengal Government were convinced that action to control the Press was a vital necessity. As concerning the powers of arrest and detention conferred by the Criminal Law Amendment Act 1930, it was found essential to ask that its scope should be widen so that action could be taken not only against persons actually concerned in the commission of terrorist association. On the 9th October 1931, Act XXIII of 1931 (an act to provide against publication of matter inciting to or encouraging murder or violence) was passed, and on the 29th October the Government of India promulgated Ordinance IX of 1931 conferring the powers asked for in regard to arrest and detention and widening the shedule of offences by the inclusion of sections relating to the waging of war against the King or the harbouring of absconder. A month later on the 30th Novermber the Bengal Emergency powers Ordinance XI of 1931 was issued. Chapter I of the ordinance provided for emergency powers which would apply immediately to the Dist. of Chittagong......Chapter II provided for special tribunals and special magistrates and a procedure designed to overcome delaying tactics.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

নিষেধ আইন অনুসারে সাজা

ইংরেজ-আমলের গোড়া থেকেই একের পর এক আইন হয়েছে বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য। ওইসব আইন অনুসারে অসংখ্য বই আপত্তিকর, নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, গোপন নির্দেশ বা সরকারী, আধা সরকারী সার্কুলার অনুযায়ী কোনো বই 'আপত্তিকর' বা 'নিষিদ্ধ' বিবেচিত হলেও তা কিন্তু বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ভিন্ন বাজেয়াপ্ত হয়নি। আমলাদের, গোয়েন্দা বিভাগের বা পুলিশ কর্তাদের মর্জিতে কোনো বই বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। তার জন্য আইনজ্ঞদের পরামর্শ ও মতামত বারবার নেওয়া হত। আরও দেখি, ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত বইপত্র বাজেয়াপ্ত করেই সরকার ক্ষান্ত হয়েছেন। অন্যক্ষেত্রে আবার এইসব বইয়ের লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক, বিক্রেতা, পাঠক প্রভৃতির বিরুদ্ধেও দেশদ্রোহের মামলা আনা হয়েছে এবং সাজাও দেওয়া হয়েছে। সে দণ্ড অনেকক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর—দীর্ঘ সশ্রম কারাদণ্ড। মুকুন্দ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদ ইসমাইল সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলামের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে যুগান্তরের জন্য এবং হীরালাল সেন[১], সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমুখকে বইয়ের জন্য কারাগারে যেতে হয়। দেশাত্মবোধক লেখার জন্য জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, নগেন দাস, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক সন্ধ্যা), মণীন্দ্র রায় (কাকোরী ষড়যন্ত্র), আশানুল হক প্রমুখের সাজা হয়। দেশাত্মবোধক বই ছাপার জন্য ব্রজবিহারী বর্মণের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আপত্তিকর পুস্তিকা 'পন্থা' প্রকাশের জন্য কিরণচন্দ্র মুখার্জির দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' বই প্রকাশের দায়ে 'নব্যভারত' প্রেসের মালিক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাস জেল হয়—১৯১০, ৮ সেপ্টেম্বর। আপত্তিকর বইপত্র, ইস্তাহার রাখা ও বণ্টনের জন্যও অনেকের সাজা হয়েছে। যেমন, পাবনায় উপেন্দ্রনাথ ঘোষের এবং কলকাতায় ধরণীধর সরকারের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[২] অন্যত্র এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রেসের মালিক, প্রকাশকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাও ঘটেছে। জামানত জব্দ তো হামেশাই হয়েছে।

সরকারের চোখে কোনো বই আপত্তিকর (objectionable) মনে হলেই তা নিষিদ্ধ (proscribed) বা বাজেয়াপ্ত (confiscated) হত না। গোপন সার্কুলারে বা একজিকিউটিভ আদেশে অনেক বই-ই আপত্তিকর ছিল। যেমন গীতা, আনন্দমঠ প্রভৃতি। (এ নিয়েও পরে আলোচনা আছে।) কিন্তু ওসব বই কোনদিন বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ হয়নি। কোনো আপত্তিকর বই সম্পর্কে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হলেই এবং দেশদ্রোহকর বলে ঘোষিত হলেই তা নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করা হত। আবার নিষিদ্ধ হলে সর্বক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হত তা নয়। যেমন, বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি সার্কুলার জারি করে নিষিদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বাজেয়াপ্ত হয়নি।[৩] নিষিদ্ধ করণ বা বাজেয়াপ্ত করণের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে ধাপে-ধাপে এগোতে হত। যেমন, প্রথমে কোনো বই সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট, তারপর আমলাদের মন্তব্য, তারপর সরকারী আইন বিশারদদের মতামত, তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও গেজেটে ঘোষণা। গেজেটে কোনো বই বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত হলে তা যুগপৎ নিষিদ্ধ বলেও গণ্য হত। সবক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করেই সরকার থেমে যেতেন না। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বাজেয়াপ্ত বইয়ের লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশকের বিরুদ্ধেও দেশদ্রোহের মামলা আনা হত এবং শাস্তি দেওয়া হত।

কীভাবে একটি আপত্তিকর বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য ও লেখককে অভিযুক্ত করতে সরকার ধাপে ধাপে এগোতেন তা বোঝার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি আপত্তিকর বই বেছে নেওয়া যায়। সরকারী ফাইলপত্র থেকে তথ্যযোগে বিষয়টি আমি উপস্থিত করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমটি লেখকের শাস্তির ঘটনা। লেখক হলেন, মহম্মদ আশানুল হক আফেনদি। বইটির নাম—'বর্তমান সংকট ও মোছলমানদের কর্তব্য'। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—প্রকাশকের সাজা।

[লেখকের সাজা]

আমরা দেখি, রংপুরের শাসক প্রথম এই বইটি সম্পর্কে পদস্থ আমলার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৯ সালের ৩১ মার্চের চিঠিতে তিনি বইটির আপত্তিকর অংশগুলির দৃষ্টান্ত দিয়ে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারিকে এই মর্মে চিঠি দেন:

Sir,

In forwarding herewith the copy of a pamphlet bearing caption : 'বর্তমান রাজনৈতিক সংকট ও মোছলমানদের কর্তব্য' (The present political Juncture and the duty of Mussalmans).I have to submit the following for your consideration and order :-

The book considered as a whole seems to come within the mischief of section 124 A of penal code (section) and both the Author and printer are liable under that section. It has been decided that the Government established in British India means British rule in India and its representatives as such, the existing political system as distinguished. from a particular set of Administration.

ওই পত্রে বইটির যেসব অংশ আপত্তিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল

(ক) কে এদেশের মোছলমানদের হাত হইতে এছলামের ঝাণ্ডা ঝিনাইয়া লইয়াছে!

(খ) কে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে……জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে?

(গ) ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সমগ্র মানবজগতের মধ্যে এছলমাকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে ইহার আগে কখনও কোন জাতি বা কোন দেশ উহাকে এরূপ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই।

(ঘ) এইরূপ কঠোর অত্যাচারী ও এছলামের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

(ঙ) মোছলমানগণ। বলুন, সত্যকথা বলুন ইহারা কে? ভারতের ২২ কোটি হিন্দু না কংগ্রেস না ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট?

(চ) কে এদেশের মোছলমানদিগকে দীর্ঘ এক শতাব্দী পর্যন্ত ডাবাইয়া রাখিয়া হিন্দু ভ্রাতাদিগকে উপরে চড়াইয়াছে…

কিছু কিছু আপত্তিকর অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে

By a search of the relevent places, all the available copies of the pamphlet have already been seized; the manuscript has also been seized from the press.

The district of Rangpur has of recent months come to be the seat of an appreciable measures of political activity; peasants meetings and conferences are being frequently held at every part of the interior of the district and it is my decided estimate of the local situation that attempts at inflaming the mass-mind (75 p.c of the population of this district being Musalmans) at the present juncture of time ought to be put down with a strong head.

I, therefore, beg to request that necessary statutory sanction may be accorded for the prosecution of the persons named and described in the schedule below under section 124 A and 153A Indian Penal Code as early as practicable. The book may be described as seditious.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Schedule

1. Muhammad Ashanal Hag Afendi of Sonarai,
   P.S. domar, Dist. Rangpur.
2. Nibaran Chandra Chakrabarty of Nawabganj,
   Rangpur Town—Proprietor of Kalikrishna Machine,
   Press, Rangpur.
3. Printer (Name could not be ascertained yet.)

ধরে নিতে পারি, বইটি সম্বন্ধে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সংবাদ সরবরাহ করেছিল। তদনুযায়ী পুলিশ কর্তৃপক্ষ পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে।

জেলা শাসকের ওই সুপারিশগুলি সরকার মোটামুটি গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালের ২৬শে জুলাইয়ের চিঠিতে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জেলা শাসককে জানান

'Dear Khan Bahadur,

I am desired to refer to your letter No. 212-C dated 31.3.39 and to say that Govt. have decided to accept your proposal for prosecuting the author and printer of the pamphlet in Bengali entitled 'Bartaman Rajnaitik Sankat O Musalmander Kartabya' and also the proprietor of the press at which it was printed. But in order to issue formal orders the following information is necessary, which may kindly be supplied as early as possible.

(I) The name and address of the printer.
(II) The name of the police officer who will prefer complaint.
(III) Whether the case will be tried by you or a special Magistrate, who will have to be appointed u/s. 14 of the Cr. P.C.

2. I am to say that if the name of the printer has not yet been ascertained, it will not be possible to issue an order of prosecution against him. The pamphlet does not contain the names of the printer & publisher as required under S. 3 of the Press and Regn. of Books Act, 1867. I am, therefore, to enquire whether any action under that Act is contemplated by you'.

এরপর রংপুর জেলা অফিস থেকে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রেসের মালিক নিবারণ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা চালাতে পুলিশ রাজি নয়। তবে লেখককে অভিযুক্ত করার আদেশ জারি করতে বলা হয়

Confidencial
D.O.No.: 527C

Rangpur District Office
The 16th August, 1939.

Dear Mr. Heetchings,

With reference to your P.O. No. 1650 P.S. dated the 26th July, 1939, regarding the proposal for prosecuting the author and printer of the pamphlet in Bengali entitled, 'Bartaman Rajnaitik Sankat O Musalmender Kartabya, and also the proprietor of the press at which it was printed, I write to inform you that a case under section 12 of the press Act was instituted against Nibaran Chakrabarty, the keeper of the press. He is an old man and a priest by profession who committed the offence more through ignorance than anything else. The case against

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

him was since been withdrawing on his furnishing an undertaking not to print such pamphlets in future. The name of the printer has been ascertained, but as his evidence will not be of material importance in the case against the author of the pamphlet, the Superintendent of Police does not recommend his prosecution.

I would in the circumstances request you to issue formal orders of prosecution against the author only under section 124 A and 153 A I.P.C.

Sub-Inspector Sabiruddin Biswas, officer-incharge of Kutawali police Station will prefer the complaint.

The case may be tried by Raja Surendra Nath Roy Bahadur, sadar Sub-divisional officer, Rangpur, who may be appointed as Spl. Magt. Under Sec. 14 of the criminal Procedure code.

এর পর বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে গেজেট বের হয়

Notification.

No. 4193—7th August, 1939.

In exercise of the power conferred by section 99A of the code of criminal procedure, 1898 (Act V of 1898), the Governor hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of a pamphlet in Bengali entitled, 'Bartaman Rajnaitik sankat O Musalmander Kartabya' by Muhammad Ashanal Hag Afendi of Sonarai, Domar, Rangpur and printed at the Kalikrishna Machine press, Rangpur on the ground that the said pamphlet contains matter which brings or attempts to bring into hatred or contempt and excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law in British India, and also, promotes or attempts to promote feelings of enmity or hatred between different classes of His Majesty's subjects, the publication of which is punishable under sec 124 A & 153A of the Indian Penal Code.

By order of the Governor
EN Blandy.
Secy to the Govt. of Bengal.

এই গেল আপত্তিকর বইটি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ। এবার সংশ্লিষ্ট লেখককে অভিযুক্ত করার আদেশ জারি হ'ল

No. 4620P. Dt. 31.8.39.

Where it has been made to appeal to the Governor that there is reason to believe that Muhammad Ashanal Hag Afendi of Sonarai P.S. Domar, Dt. Rangpur, has committed an offence under Section 124A & 153A of the Indian Penal Code in respect of the pamphlet in Bengali entitled, 'Bartaman Rajnaitik Sankat O Musalmander Kartabya, (The present political juncture & the duty of Musalmans) of which he is the author. Now, therefore, under the provisions of section 196 of the code of criminal procedure Sub-Inspector Sabiruddin Biswas, O/C of Kotawali P.S. Rangpur, is hereby ordered and authorised to prefer a complaint against and to prosecute under the said section (s) of the Indian Penal Code of the said Muhammad Ahsanal Hag Afendi for the said offence in respect of the said pamphet.

Home Dept. Aug. 1939 political.

By order of the Governor
Secy. to the Govt. of Beng.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেলা শাসকের প্রস্তাবমত রংপুরের সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রায় সুরেন্দ্রনাথ রায়ের উপরে লেখকের বিচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

Notification

In exercise of the power conferred by section 14 of the code of criminal procedure, 1898 (Act V of 1898), the Governor is pleased to confer upon Raj Surendra Nath Roy Bahadur, Sadar (Sub-divisional Magistrate) Rangpur.., power to try the case Emperor vs. Ahsanal Hag Afendi u/s 124 A & 153 A, of the I.P.C.

মহম্মদ আশানুল হক আফেন্দির বিচার নিয়ে রংপুর জেলা শাসক ও স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিভাগের মধ্যে দীর্ঘদিন নোট ও ফাইল চালাচালি চলে। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২১ জুনের পত্রে রংপুরের জেলাশাসক বাংলা সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারিকে জানান যে, ১৯৪০ সালের ৩১শে মে ওই মামলায় আসামীর (লেখক) মোট দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

সেই চিঠি

Sir,

In continuation of this office letter No-1744J dated the 30th May, 1940, I have the honour to forward herwith a copy of the Judgement of the case against Muhammad Ashanal Hag Afendi convicted on 31.5.40 under Section 124 A & 153 A. I.P.C.

রায়ের বয়ান

As regarding sentence it goes without saying that the offences are grave. At the same time this is the first offence Committed by the accused. He has got a good social position and he is a jotedar. Taken all these things into consideration I think that the sentence of R.I. for 18 months on each head will sufficiently meet the end of justice. I sentence the accused to R.I. for 18 months u/s. 124A, I.P.C. and to R.I. for 18 months u/s. 153 A, I.P.C. The sentences are to run concurrently.

Rangpur — sd/- Surendra Nath Roy
31-5-40 — Special Magistrate

'বর্তমান সংকট ও মোছলমানদের কর্ত্তব্য' বইটি শুধু বাজেয়াপ্ত হল না, এর লেখককেও রাজদ্রোহের উসকানি দেবার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অনেকক্ষেত্রেই নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লেখকরা হাইকোর্টে আপীল করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখক আশানুল হক আপীল করে উচ্চতর আদালতে সুবিচার প্রার্থনা করেননি। অন্ততঃ সরকারী নথিপত্রে এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন তথ্য মেলেনি।[৫]

প্রকাশকের সাজা

এবার দেখা যাক, কোনো আপত্তিকর বইয়ের প্রকাশ, মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কিভাবে সরকার ব্যবস্থা নিতেন।

পুলকেশ দে সরকারের 'ফাঁসির আশীর্বাদ' বইটি ১৯৩০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি বাজেয়াপ্ত করেই সরকারের রোষ থামেনি। লেখককে শায়েস্তা করার জন্যও সরকার তৎপর হন। কী করে লেখককে সাজা দেওয়া যায়, সে নিয়ে পুলিশ, গোয়েন্দা, আমলা ও সরকারী আইন বিশারদদের মধ্যে চলে সলা-পরামর্শ। এবং ফাইল চালাচালি। শেষ পর্যন্ত আইনজ্ঞদের পরামর্শে সরকারকে এই মতলব ত্যাগ করতে হয়। তখন সরকার বইটির প্রকাশক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ব্রজবিহারী বর্মণকে সাজা দিতে উদ্যোগী হন। ব্রজবিহারী নিজে একাধিক 'আপত্তিকর' বইয়ের লেখক। তাঁর বইও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তাছাড়া তিনি আরও অনেক দেশাত্মবোধক বইয়ের প্রকাশক ও মুদ্রাকর। তাঁর উপর সরকারের আক্রোশ অনেক দিনের।

তখনকার পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু ১৯২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারকে ব্রজবিহারী বর্মণ সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন

'Braja Behari seems to be a mischievous rat who has been concerned in publication of several other similar books. Justice demands that his activities should be curbed and he should be trapped'.

পরের চিঠিতে (১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০) পাবলিক প্রসিকিউটর লেখককে ছেড়ে দিয়ে প্রকাশককেই অভিযুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ কমিশনারকে তিনি লেখেন

Dear sir, I agree that it would not be save to prosecute the author, as Braja Behari is not likely to give evidence against the author. That being so, we may proceed Braja Behari Barman, who is the declared keeper of the Mahamaya press, where from the book was printed. He is also the proprietor of the Burman publishing House, where several incriminating Exhibits were found. His name appears in the corporation Registration as the proprietor of the Burman publishing House and a little intelligent enquary will establish whether he is the lessee of the place or not. I would request you to have that enquary made. If that evidence is found, I would proceed against that name (B. B. Barman) under sec. 124A I.P.C. and I will call the author Pulakesh De Sarker for the evidence, as he is prepared to give.

The papers are returned herewith.

পাবলিক প্রসিকিউটরের অভিমত পাবার পর পুলিশ কমিশনার টেগার্ট চীফ সেক্রেটারিকে এই মর্মে নোট দেন

C.S. The PPS opinion is that Braja Behari Barman, the keeper of the press, might be prosecuted'.

তারপর ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ডব্লুডি আর প্রেনটিস্ এ সম্পর্কে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সের মত জানতে বলেন।

ফাইলে এম সি ঘোষের নোট **'I agree'.**

এরপর বাজেয়াপ্ত বই 'ফাঁসির আশীর্বাদে'র প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মণকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারানুসারে অভিযুক্ত করার সিদ্ধান্তের বিষয় চীফ সেক্রেটারি পুলিশ কমিশনারকে জানান। (১৭-২-১৯৩০)

'Sir, I am directed to say that the Governor in council sanctions the prosecutiom under Sec. 124A of the I.P.C. of Brajabehari Barman, keeper of the Mohamaya Press, Calcutta in respect of the publication of the books 'Fanshir Ashirbad', I am accordingly forward herewith an order in Duplicate authorising Mr. E. A. Hartley to prefer a complaint against and to prosecute the same person. I am to request you to keep Government informed to the progress of the procedings'.

ব্রজবিহারীকে অভিযুক্ত করার সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি ১৯৩০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বের হয়

No. 912 P.S. Govt. of Bengal Political Depr. (Political Branch)

Calcutta 19th Feb. 1930

Order

Whereas it has been made to appear to the Governor in council that there is reasson to believe that Braja Barman has committed an ofence

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

under Sec. 124A of I.P.C. in respect of Publication of the book entitled 'Fanshir Asirbad'. Now, therefore, under the provisions of sec. 196 of the code of criminal procedure Mr. E. A. Hatley Asst. Commissioner of Police Detective Department, Calcutta, authorised to prefer a complaint against and to prosecute under the said Sec. of the I.P.C. the said Braja Behari Barman for the said offences in respect of said publication.

By order of the Governor of Bengal
Chief Secy, to the Govt. of Bengal.

এই মামলা সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের সঙ্গে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তরের একাধিক চিঠি লেখালেখি চলে। গোপন ফাইলে তা আছে। এইসব চিঠির কিছু কিছু এখানে দেওয়া হল।

১৯৩০ সালের ২০শে মার্চ টেগার্ট চীফ সেক্রেটারিকে লেখেন :—

"Sir, I have the honour refer to the Political Department letter No. 913 P.S. dated the 19th Feb. 1930 and enclosure and to report for the information of Government that on the 11th March, 1930 Mr. E.A. Hatley Asst. Commr. of Police, Detective Dept. Calcutta lodged a formal complaint under Sec. 124A of the I.P.C. before the Chief Presidency Magistrate, Calcutta against Braja Behari Barman, keeper of the Mahamaya Press, Calcutta in respect of publication of the book entitled 'Fanshir Ashirbad' and obtained a warrant or arrest only which was duly executed. The case has been fixed for hearing on the 20th March, 1930".

এর দুদিন পর টেগার্ট আবার চীফ সেক্রেটারিকে লেখেন। তাতে বলা হয়েছে, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এই মামলা হবে।

'Sir, In continuation of this office confidential letter No. 1225 D.D.P. dated the 21st March, 1930, I have the honour to report for the information of Government that on the March 1930, the Chief Presidency Magistrate, Calcutta took up the cases under sec. 124A of the Indian Penal code against Braja Behari Barman, in respect of publication of the book entitled, 'Fanshir Ashirbad', After examination of the two prosecution witnesses, the case adjourned till the 26th March, 1930 for further evidence.'

এই মামলার বিষয়টি ভারত সরকারের গোচরেও আনা হয়। বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে ভারত সরকারের সচিবকে লেখা হয়

To
The Secy to the Govt. of India,
Home Dept.
From: Home (Political) Dept. Bengal Govt.
Date : 26th March, 1930.
Sub: Prosecution of Braja Behari Barman, Keeper of the Mahamaya Press, Calcutta, U.S. 124A I.P.C.

Sir, In reference with standing order I am directed to report for the information of the Government of India that Braja Behari Barman, Keeper of Mahamaya Press, Calcutta is being prosecuted under sec. 124A. I.P.C. in respect of publication of the book entitled 'Fanshir Ashirbad', which has been proscribed by the Government. A review of the book enclosed.

2. Govt. of India will be informed of the result of the Prosecution."

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা যাচ্ছে, এইসব বাজেয়াপ্ত বই সম্পর্কে মামলা-মোকর্দ্দমার বিষয়ে ভারত সরকারকেও ওয়াকিবহাল রাখা হত।

১৯৩০ সালের ২৬শে মার্চ ব্রজবিহারী বর্মণের বিরুদ্ধে 'চার্জ ফর্মড' হয়। ওই তারিখেই টেগার্ট চীফ সেক্রেটারিকে তা জানান

Sir, In continuation of this office confidential letter No. 1246. D.D.P. dated the 22nd March, 1930, I have the honour to report for the information of Government ; that on the 26th inst. the Chief Presidency Magistrate, Calcutta took up the case under sec. 124A. of the Indian Penal code against Braja Behari Barman in respect of the publication of the book 'Fanshir Ashirbad'. After examination of the seven prosecution witnesses charge was formed against the accused and the case was adjourned till the 8th April, 1930 for cross-examination."

টেগার্টের পরবর্তী পত্রে (৯-৪-৩০) জানা যায় যে ব্রজবিহারী বর্মণ অসুস্থতার জন্য ৮-৪-৩০ তারিখে আদালতে হাজির হতে পারেননি। এই মামলা আবার ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত মুলতুবী হয়ে যায়।

এই মামলা আসামী পক্ষে জেরা শেষ হবার কথাও টেগার্ট চীফ সেক্রেটারিকে জানান ৮-৫-৩০ তারিখের চিঠিতে

'......that the Chief Presidency Magistrate Calcutta took up case under sec. 124A. I.P.C. against Braja Behari Barman in respect of publication of the book entitled 'Fanshir Ashirbad'. On the 5th May and 7th May, 1930 on which dated the cross examination of the prosecution witness was concluded.The case was then adjourned till the 15th May 1930 for arguments'.

শেষ পর্যন্ত 'ফাঁসীর আশীর্বাদ' মুদ্রণের দায়ে ব্রজবিহারীর ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই তথ্য জানিয়ে টেগার্ট আবার চিঠি লেখেন ১৯-৫-১৯৩০ তারিখে

"Sir,In continuation of this office confidential letter No. 2038 D.D.P. dated the 8th May, 1930, I have the honour to report for the information of government, that on the 16th May. 1930 the Chief Presidency Magistrate, Calcutta passed orders the case against Braja Behari Barman in respect of publication of the book entitled 'Fanshir Ashirbad'. The accused was convicted under sec. 124A. I.P.C. and sentenced to 2 years R.I. copies of the judgement will be forwarded government in due course".

তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এই রায় দেন। কোন দেশাত্মবোধক বই প্রকাশের জন্য একজন প্রেস মালিকের এত কঠোর সাজা সম্ভবত এর আগে হয়নি।

রায় বের হয় ১৯৩০ সালের ১৫ই মে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে বলেন

I, therefore, find the accused Braja Behari Barman guilty under sec. 124A. of I.P.C. He is sentenced to two years rigorous imprisonment. Sd/-T. Raxburgh, Chief Presidency Magistrate, Calcutta 15-5-30.

(রায়ের পূর্ণ বিবরণ Appendix c-৫)

এই সাজার বিরুদ্ধে ব্রজবিহারী বর্মণের পক্ষে আপীলও করা হয়। সরকারী ফাইলে সে তথ্য আছে

In the High Court of Jurisdiction Fort William in Bengal.
19th Dec. 1930
Present
The Hon'ble Mr. Justice Lord William
The Hon'ble Mr. Justice S. K. Ghose.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Appeal No. 478 of 1930 (Mr. T. Roxburgh, C. P. Magistrate)
Braja Behari Barman—Appellant.
For Appellant— Messars. Santosh Kumar Bose & Manindra Nath Banerjee , Advocate.
For the crown:- Mr. B. M. Sen Council.
&
Mr. Anil Ch. Roy Chowdhury, Advocate.

ওই আপীলে ব্রজবিহারীর পক্ষে ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ সন্তোষকুমার বসু ও মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।[৫] আর সরকার পক্ষে ছিলেন বি এম সেন এবং অনিলচন্দ্র রায়চৌধুরী বিচারপতি উইলিয়াম এবং এস কে ঘোষের এজলাসে এই আপীল হয়। শাস্তি বহালই থাকে। ব্রজবিহারীকে শেষ পর্যন্ত কারাগারে যেতে হয়। আপীলের রায় বের হয় ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০। (পূর্ণ বিবরণ Appendix C এ)

আপত্তিকর বইপত্র রাখায় ও প্রচারে দণ্ড

সরকার কোনো বই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হতেন না, সেইসব বইয়ের প্রচার বন্ধে তৎপর হয়েছেন। নিষিদ্ধ বইয়ের খোঁজে তাঁরা তল্লাসি চালিয়েছেন। যাঁদের কাছ থেকে সেরকম বইপত্র পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের উপর চলেছে নানারকম উৎপীড়ন। এঁরা অনেকে আদালতে শাস্তিও পেয়েছেন। গোপন সরকারী নথিপত্র থেকে এসব তথ্য কিছু কিছু উদ্ধার করা গেছে।

দেশাত্মবোধক ইস্তাহার বিতরণের দায়েও অনেকের দণ্ড হয়েছে। 'স্বাধীন ভারত' ইস্তাহার বিতরণের জন্য মালদহের ধরণীধর সরকারের ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়—১৯৩২ সালের ৩ ডিসেম্বর (পরে আলোচনা আছে) 'সোনার বাংলা' ইস্তাহার বিতরণের জন্য ক্ষুদিরামকেও একবার পুলিশ ধরেছিল।

নিষিদ্ধ বইপত্র ও আপত্তিকর ফটো (শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর) রাখার জন্য পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানার মোহনপুর চরের উপেন্দ্রনাথ ঘোষের ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে মোট ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ সালের 'বেঙ্গল সাপ্রেশন অফ টেরোরিস্ট আউটরেজেস' আইনের ৩৫ ও ৩৩ ধারা অনুসারে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দণ্ডিত হন। তাঁর কাছ থেকে কিছু আপত্তিকর বইপত্র ('বাংলার বিপ্লববাদ', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রভৃতি), বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর ফটো এবং কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পাবনার জেলার শাসক বি বি সরকার, রায় বাহাদুর এ সম্পর্কে রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারকে এই মর্মে চিঠি লেখেন

Sir/ I have the honour to inform you that the Superintendent of Police, Pabna reports that some proscribed books, some resolutions and rules of the Pabna District Jubak Samity and a photo of Rajendra Nath Lahiri, who was sentenced to death in Kakori conspiracy cases, have been recovered from the possession of one Upendra Nath Ghose of Char Mohanpur, P.S. Ullapara, of the District and recomends his prosecution under the Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act. The Government Pleader was consulted and he has given it as his opinion that the photo of Rajendra Nath Lahiri taken with the first resolution of the Jubak Samity implies direct approval of the work done by Rajandra and admiration of his death and as this is likely to outrage the commission of similar offences, the man is liable under sec. 36 of the Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act, and also under sec. 35 for possession of proscribed literature. I agree with Govt.Pleader and I am of opinion that this man should be prosecuted under sec. 35 and 36 of the Act. I request therefore that Government may be moved for sanctioning this prosecution under sec. 38 of the Act.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

I have etc.
Sd/-B.B. Sarkar
(D.M. Pabna)

জেলা শাসকের এই পত্রের পর উপেন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে 'বেঙ্গল সাপ্রেশন অব্ টেরোরিস্ট আউটরেজেস অ্যাকটে' ৩৫ ও ৩৬ ধারা অনুসারে মামলা দায়েরের সুপারিশ করে রাজশাহীর ডিভিসনাল কমিশনার বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে চিঠি দেন। রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনার এফ ডবলু রবার্টসন ১৫-৯-১৯৩৫ তারিখে চীফ সেক্রেটারিকে এই মর্মে পত্র লেখেন

Sir, I have the honour to forward herewith copy of a letter No. 668 C dated the 12th Sept. 1935 from the District Magistrate of Pabna regarding the prosecution of an Upendra Nath Ghose under sec. 35 and 36 of the Bengal Suppression of Terrorist outrages Act and to recommend that orders may be passed under sec. 38 of the Act authorising the District Magistrate to prefer a complaint against the said Upendra Nath Ghose under section 35 and 36 of the Act..

বেঙ্গল সাপ্রেসন অব্ টেরোরিস্ট আউটরেজেস অ্যাকট, ১৯৩২-এর ৩৫ ও ৩৬ ধারানুসারে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর যথাক্রমে ৬ ও ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। (১৯৩৫ সালের ২০শে ডিসেম্বরের পত্রে তৎকালীন পাবনা জেলাশাসক এল সি গুহ বাংলা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারিকে (রাজনৈতিক বিভাগ, প্রেস শাখা) ওই তথ্য জানান।

তিনি লেখেন আপনার পত্রের (নং ২৩৬৭৩, তাং ৩১ অক্টোবর, ১৯৩৫) জবাবে জানাচ্ছি যে, ১৯৩২ সালের বেঙ্গল সাপ্রেসন অব্ টেরোরিস্ট আউটরেজেস আইনের ৩৫ ও ৩৬ ধারায় উপেন্দ্রনাথ ঘোষের যথাক্রমে ৬ মাস ও ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[6]

নিষিদ্ধ বই রাখার দায়ে যশোহরের জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং ডঃ সুনীলকুমার দত্তের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয় ১৯৩২ সালের বেঙ্গল সাপ্রেসন অব টেরোরিস্ট আউটরেজেস অ্যাকটের ৩৫ ধারানুসারে। ১৯৪১ সালের ৩রা ডিসেম্বর যশোহর জেলা অফিস থেকে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারি পোরটারকে এক পত্রে জানানো হয় যে, তাঁদের বাড়ী থেকে (১) রক্ত পতাকা (নগেন দাস) (২) On the eve of October revolution বইগুলি পাওয়া যায়। তবে আইনজ্ঞের সম্মতি না মেলায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়নি। যশোহরের সরকারী উকিল ১৭-৭-৪৯ তারিখের নোটে জানান

'So a charge under the above section would not stand'.[7]

নিষিদ্ধ বই রাখার দায়ে বীরভূমের নলহাটির শৈলজামোহন সেন ও তাঁর পুত্র জলেশ্বর সেন ওরফে অশোকানন্দের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালের বেঙ্গল সাপ্রেসন অব্ টেরোরিস্ট আইন অনুসারে অভিযোগ আনা হয়। ১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বীরভূমের জেলাশাসক বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারকে যে পত্র লেখেন, তাতে জানা যায় যে, তাঁদের কাছ থেকে এইসব আপত্তিকর বই পাওয়া যায় (১) ফুলঝুরি (২) সঞ্চিতা (৩) রাষ্ট্র ও আবর্তন (৪) বিলাতী বর্জন (পুস্তিকা)। বাংলার সন্ত্রাসবাদী দমন আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে তাঁরা অভিযুক্ত হন। তাঁদের সাজার বিশদ বিবরণ পাইনি।[8] গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, স্কুলের ছেলেকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। সৈয়দ সিরাজীর বাজেয়াপ্ত বাংলা বই 'অনলপ্রবাহ' রাখার জন্য দিনাজপুরের ঠাকুর গাঁওয়ের বিদ্যালয় ছাত্র সমীরুদ্দিন আহমদকে তল্লাসী করা হয়। একজন এস আই তার কাছ থেকে 'অনলপ্রবাহ' বইটি আটক করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইস্তাহারের জন্য শাস্তি

আপত্তিকর পুস্তিকা ও প্রচারপত্র রাখার জন্য অনেকের শাস্তি হয়েছে। এগুলির বিষয়ে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিভাগকে সজাগ রাখার জন্য মাঝে মাঝে সার্কুলার, নোট, নির্দেশ প্রচারিত হত। এমনি একটি সার্কুলারের বয়ান

1940. File No-W-1105
Sl. No-1.

Procedure for dealing with objectionable leaflets and pamphlets. Memorandum No. 337 p.s. dated Calcutta, 23rd Jan. 1941.

From A.E. Porter, ESQ.I.C.S. Additional Secretary to Govt. of Bengal Home Dept.

To all district officers and commissioners of police, Calcutta.

Govt. have recently had under consideration the action to be taken in dealing with of objectionable leaflets and pamphlets and the undersigned is directed to communicate the conclusion reached as a result thereof.

2. All such leaflets and substantial number of such pamphlets are unauthorised as defined in section 2(10) read with section 2(6) of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931. It is, therefore, possible for local officers, without reference to Govt. to take action upon them under section 16 to 18 of that Act. Such publication may by seized, warrant for search may be obtained and an order may be procured from a magistrate for the destruction of any copies seized (Sec. 16) and these provisions apply both to printed documents and to documents, copies of which are multiplied by means other than printing. If they are printed and the press in which they are printed can be traced, the magistrate can declare the press forfeited if it is an 'undeclared' press (sec. 17) or a prosecution can be instituted whether it is a declared or undeclared press (sec. 18) and the successful conduct of such prosecution should present no special difficulties. Moreover, under the defination of 'press' in section 2(7) of the Indian Press (emergency power) Act, any machine, implement, plant or parts thereof or material used for multiplying documents are included. So that cyclostyle machine and even the device recommended by Mr. Gandhi for the discrimination of prejudical matter in such a way as to evade the provisions of law would be liable to the same action, these provisions give the local officers substantiale powers for dealing with leaflets and pamphlets nuisance upon their own responsibility and initiative without resort to the defence of India Rules, and those powers can be applied even in dealing with documents to which the Defence of India Rules do not apply.

3. Those rules can be invoked only in respect of such publication as are documents containing a prejudicial report within the defination in Defence of India Rules 34 (7). Government are of opinion, however, that there is no substantial advantage in applying the Defence of India Rules to such publications referred to in this memorandum as can be dealt with under sec. 16 to 18 of the Indian Press (Emergency Powers) Act. It is true that an order under Defence of India Rules 40 (1) (b) makes it an offence to reprint a prohibited publication: on the other hand even in the absence of such an order a reprint of an unauthorised news-sheet will be liable to the same action under the Indian Press (Emergency

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Power) Act as the original publication. Further more the proscr iption of a prejudicial document under rule 40 confers no substantial advantage in respect of a subsequent prosecution for possession of the document under rule 39 of the Defence of India Rule. Even without proscription and forfeiture, prosecution will be under rule 39 if it can be established that the document does not in fact, contain a prejudicial report. Moreover, the question whether the document is, in fact one containing a prejudicial report will be one for the decision of the court in the exercise of its independent judgement, and the opinion of the provincial government, which is conclusive for the purpose of rules 40, does not come into consideration at all in a proscription under rule 29. In such a prosecution under rule 40 would apparently be atmost to place on the accused, the burden of proving that he did not know and had no cause to know that the document and its possession were actionable against this very slight advantage is to be set the fact that prosecution under rule 40 of the reference of India Rules confers a certain amount of publicity which in these cases is disproportionate to the importance of the publication as an incitement to the commission of prejudicial acts. The machinery of proscription moreover imposes upon the local officers and upon more than one department of govt. Considerable labour which in many cases is proportionate to the importance of the publication.

4. It has therefore been decided that local officers should not ordinarily report for proscription under the Defence of India Rules, any document with which they have powers to deal with their own motion under sec. 16 to 18 of the India Press (Emergency Power) Act. 1931.

(Memo No. 237 (28)/1(6) P.S. dated Calcutta, the 24th January, 1941)

Copy of the above forwarded for information (and guidance) to all commissioners of Divisions, and The Inspector General of Police, Bengal (with spare copies for distribution to Deputy Inspector General and Superintendent of Police.)

ইস্তাহার প্রকাশ, বিতরণ ও রক্ষার দায়ে রাজরোষে পড়ার বিষয়ে সরকারি নথিপত্র থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করা গেছে। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে 'স্বাধীন ভারত' ইস্তাহার বিতরণের জন্য পূর্বোক্ত ধরণীধর সরকার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হন। ১৯৩২ সালের ৬ ডিসেম্বর মালদহের জেলাশাসক বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগকে জানান যে ধরণীধর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ এবং ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের, ১৯৩১, ৯৮ ধারায় অভিযুক্ত হয়েছেন। মালদহের জেলাশাসক জে এ তালুকদার ১৯৩২ সালের ৩রা ডিসেম্বর ধরণীধর সরকারকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

(ক) সম্রাট বনাম ধরণীধর সরকার

ধরণীধর সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ালে বৈপ্লবিক ইস্তাহার লাগানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

(খ) ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশ যখন বৈপ্লবিক ইস্তাহারের খোঁজে নিয়োজিত ছিল, তখন একজন কনস্টেবল (লালবিহারী দাস) আসামীকে ভোর ৫টায় একটি খালি বাড়ির দেওয়ালে ইস্তাহার লাগাতে দেখেন। সরকার পক্ষের অভিযোগ ১৭ই সকালে কনস্টেবল আসামীকে গ্রেপ্তার করেন এবং চেঁচিয়ে লোকজন ডাকেন। যেহেতু কেউ আসেনি তাই তিনি আসামীকে ঘটনার প্রায় ৫০ গজ দূরে বাবু যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাড়িতে নিয়ে যান। যতীনবাবু বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে তোলা হয়। কী ঘটেছে কনস্টেবল তাঁকে বলেন এবং তাঁকে ইস্তাহারটি এবং কিছু গঁদের আঠাসহ একটু কাগজ দেখান। যতীনবাবু কনস্টেবলের সঙ্গে যান এবং বাড়িতে দেওয়ালে গঁদের আঠার চিহ্ন দেখেন। তারপর তাঁরা যতীনবাবুর বাড়িতে ফিরে আসেন। ধরণীকান্ত দত্ত তখন তাঁর কারখানায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আসামীর দেখা হয়। এরপর কনস্টেবল, আসামী ও যতীনবাবু পুলিশ ফাঁড়িতে যান এবং পথে ক্ষিতীন্দ্রলাল সাহার সঙ্গে দেখা হয়। ফাঁড়ি থেকে আসামীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কনস্টেবল ওই ইস্তাহার ও গঁদ সাব ইন্সপেক্টর মৌলা বক্সের হাতে তুলে দেন। যতীনবাবুও থানায় যান। ইন্সপেক্টর দুর্গেশচন্দ্র বসু কিছুক্ষণ পর সেখানে আসেন। সাব-ইন্সপেক্টর মৌলা বক্স সেইদিন সকালে আসামীর বাড়ি তল্লাসি চালায়। 'একজিবিট ১'-এর মত আর একটি ইস্তাহার আসামীর বিছানার তলায় পাওয়া যায়। ইস্তাহার ও বইটিকে যথাক্রমে একজিবিট ৬ ও ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর দুপুরে আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেট বাবু এস পি রায়ের এজলাসে হাজির করা হয়। তিনি স্বীকারোক্তি করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট তা নথিভুক্ত করেছেন। স্বীকারোক্তির পর ওই দিন একটি অতিরিক্ত বিবৃতিতে আসামী এই বলে আবেদন করেন যে, পুলিশের উৎপীড়নে তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন।

এই মামলার রায়ে বলা হয়: "অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার (একজিবিট-১) প্রকাশের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা এবং ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সী পাওয়ার্স) আইনের ১৮ ধারায়—যা বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের (১৯৩২) সালের অর্ডিন্যান্স ১০) ৭৭ ধারায় সংশোধিত—আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

"এই ইস্তাহারটি যে অত্যন্ত দেশদ্রোহকর কাউকে তা বোঝানোর জন্য বেশি যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন নেই। এতে বলা হয়েছে বর্তমান সরকার উৎপীড়নের দৈত্য এবং বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যৌক্তিকতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে দেশের জনগণকে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ না করতে বলা হয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থনে এটি জনগণের কাছে একটি আবেদন। এই ইস্তাহারে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

"আসামী পক্ষের সওয়ালে বলা হয়েছে যে, আসামীর কাজে ইস্তাহার প্রকাশ বোঝায় না—যা এই ধারায় বলা হয়েছে।

"এ ব্যাপারে সম্রাট বনাম পরিমল চ্যাটার্জী মামলাটি (সি এ এ. ৯৮২ পৃষ্ঠা) আমাকে দেখানো হয়েছে। ওই মামলায় আসামী দেওয়ালের মাঝখানে ইস্তাহার লাগিয়েছিলেন এবং পুলিশ সেটি অপসারণ করে বলে লোকেরা তা দেখতে পায়নি। ওই মামলায় বলা হয়েছিল যে, আসামী কেবল প্রস্তুতির জন্যই ওই কাজ করে। এই মামলায় সকালবেলা ইস্তাহার আটকানো হয়। তাছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের প্ররোচনা দান ১২৪ এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের প্ররোচনা দেওয়াই এখানে অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আসামী প্রয়োজনীয় সবকিছু পন্থাই অবলম্বন করেছে। এর বেশি তার কিছু করার নেই, আমি মনে করি। তার আচরণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের প্ররোচনা দেবার সামিল।

"সুতরাং আমি মনে করি যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ইণ্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সী পাওয়ার্স) অ্যাক্টের ৪ (১১) ধারা অর্ডিন্যান্স Xয়ের ৭৭ ধারায় অত্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৩২ সালের ৩০শে জুন বাংলা সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে (নং ১৪৭৩১ পি) এই প্রদেশেও এটি সম্প্রসারিত হয়েছে। পূর্বোক্ত ইস্তাহারটি প্রেস অ্যাক্টের ৪(১) ধারার মধ্যেও পড়ে।

"এই আইনের ২ ধারায় অনুচ্ছেদ (৬) এবং (১০) অনুসারে এটি একটি বে-আইনী ইস্তাহার। সুতরাং তিনি এই আইনের ১৮ ধারা অনুসারে অপরাধ করেছেন।

"সুতরাং আমি আসামীকে উভয় অভিযোগেই দোষী দেখছি। শাস্তি দেওয়ার সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই ইস্তাহারে যখন হিংসাত্মক কাজের প্রচার ও সমর্থন আছে, তখন নিশ্চয়ই সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে এটি এসেছে। আসামীর নিশ্চয় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে। তা না হলে তিনি এই ইস্তাহার পেতেন না। তাঁর উপর নিশ্চয়ই তাঁদের আস্থা আছে। তিনি বলতে পারেন না যে, তিনি নির্দোষ (যদিও তিনি তা করেননি)। আসামী কিছু শিক্ষা পেয়েছেন এবং তাঁর কাজে গুরুত্ব বোঝার মত জ্ঞান তাঁর আছে। আমি তাই আসামীকে কঠোর শাস্তি দেবার প্রস্তাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

করছি—যাতে অন্যরা এ কাজে বিরত থাকে। তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ইন্ডিয়ান প্রেস (এমার্জেন্সী পাওয়ার্স) অ্যাক্টের ১৮ ধারায়ও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

উভয় দণ্ডই এক সঙ্গে চলবে।

স্বাঃ জে এন তালুকদার, জেলাশাসক মালদহ ৩-২-৩২"[১১]

অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে 'স্বাধীন ভারত' নাম দিয়ে ইস্তাহার বের করা হত। এ সম্পর্কে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তার "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" বইয়ে লিখেছেন "অনুশীলন সমিতির কর্মীরা গোপনে দুইখানা সংবাদপত্র বাহির করিতে লাগিল, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী, বাংলা পত্রিকার নাম 'স্বাধীন ভারত' এবং ইংরেজীখানার নাম ছিল 'লিবার্টি'। অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ১২নং নবদ্বীপ ওস্তাগর লেনে একটি ছাপাখানা ছিল, তাহাদের এই গোপন ছাপাখানায় তাহারা রাত্রে গোপনে কাগজ ছাপাইত। পত্রিকা ছিল সাময়িক অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট তারিখে তাহা বাহির হইত না। পত্রিকা যখন বাহির হইত তখন কোন নির্দিষ্ট তারিখে পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ তাহা প্রকাশ পাইত। স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত, গৃহে, রাস্তায় দেওয়ালে, হোস্টেলে ছাত্রদের টেবিলের উপর, বিভিন্ন স্থানে তাহা দেখা দিত। কেহ কেহ ডাকযোগেও পাইতেন। 'স্বাধীন ভারত' ও 'লিবার্টি' যখন প্রকাশ হইত তখন পুলিশের কর্মতৎপরতা বাড়িয়া যাইত। পুলিশ বহুস্থান খানাতল্লাস করিত।"[১২]

"বিপ্লবী ইস্তাহারের" জন্য বিশিষ্ট বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্যান্যালেরও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারানুসারে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।[১৩]

'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' নামে একটি আপত্তিকর ইস্তাহারের লেখকও ছিলেন শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল। বাংলার পত্র পত্রিকা সম্পর্কে পাক্ষিক সরকারী প্রতিবেদনে আছে (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫)

Four persons arrested in Calcutta on the 25th February included Sachindra Sanyal who has long been avoiding arrest. The three other were found with him. Sachindra's name was printed as the author of a leaflet entitled 'Deshbasir Prati Nibedan' which was proscribed in January.

এই ইস্তাহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে আছে।

নির্দেশিকা

১. "হীরালাল 'হুঙ্কার' নামে একখানি কাব্য লিখে কবিকে উৎসর্গ করেছিলেন—সেকথা কবি পরে জানতে পারেন। কাব্যখানির জন্য লেখকের জেল হল : রবীন্দ্রনাথকে এজন্য সাক্ষী দিতে খুলনায় যেতে হল।"
—'রবীন্দ্র জীবন কথা' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃ-৮২। তবে সরকারী নথিপত্রে হীরালাল সেনের সাজার তথ্য পাইনি।

২ বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত
ক) State Committee For Compilation of History of Freedom Movement in India, Bengal Branch- এর Paper No. 18 & others.
খ) Bengal Intelligence Branch Records: 81, 477/1907, Sonar Bangla; 5-58/1909 Anal Prabhah & other seditious Books; V-23/1909 'Pantha' seditious vernacular leaflets.
Fl. No. 821, Home (Pol.), 1930.
FL. No. 257/25, Home (Press), 1925 etc.

৩. ক) ১০ অক্টোবর, ১৯০৫ জারি হয় কার্লাইল সার্কুলার।
খ) "৮ নভেম্বর (১৯০৫) পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারি লায়ন ঢাকা বিভাগের কমিশনারের কাছে দুটি সার্কুলার পাঠালেন। তাতে রাস্তায় প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া, প্রকাশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্থানে রাজনীতিমূলক আলোচনার জন্য সভা সমিতি করা, দলবদ্ধভাবে 'বন্দেমাতরম্' গান করা নিষিদ্ধ হল।" —'বন্দেমাতরম্' —জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ-৫৬

৪. FL. No. 189/39, Home (Pol.) Confidential, 1939.
৫. FL. No. 67 (1-2), Home (Pol.) Confidential, 1939.
৬. FL. No. 917/3-5, Home (Pol.) confidential, 1935,
৭. FL. No. 293/41, Home (Pol.) confidential, 1941
৮. FL. No. 137/36, Home (Press) see also Appendix-A
৯. FL. No. 360 of 1911, Home (Pol.) confidential
১০. FL. No.-W-1105, SL. No. 1.
১১. FL. No. 921/32, Home (Pol.) confidential.
১২. —ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ ২৪৮
১৩. I.B. Records, 1925.
১৪. ক) Bengali Police Abstract, dt. 17-1-25.
খ) Fortnightly Newspaper Report, 2nd Half, Feb. 1925.

Appendix-A

File No. Press 137/36

Prosecution : Proposed prosecution of Sailaja Mohan Sen and Janeswar Sen U/S 36 of the B.S.T.O. Act.
From : H. C. Bose Esq. M.A.B.L.
Dist Magistrate, Birbhum. Dated: Suri, the 4th Sept. 1936.
To: The Commissioner of the Burdwan Division

Sir,

In continuation of this office No. 1181/c dated the 25th Aug. 1936. I have the honour to request you to be so good as to move government to authorise the officer-in-chagre of the police station, Nalhati, under Sec. 38(1) of the Bengal Suppression of terrorist outrages Act, 1932, to file a complain under section 36 of the said Act against (X) Sailaja Mohan Sen aged about 55 years and his son (2) Janeswar Sen (a) Asoknanda aged about 24 years of Nalhati of this district for the possession of the following proscribed and inflamatory and seditious literatures :- (1) Fuljhuri (2) Sanchita (3) Rastro-O-Abartan and (4) a pamphlet entitled 'Belati-Barjan'.

2. Of the above No. 1 Fuljhuri is a proscribed one—vide government notification No. 5017 pub. dated the 20th February, 1935, and the other three are inflamatory and seditious.

3. I am also satisfied that all the books and literature mentioned above contain words, which tend to further or encourage the terrorist movement or the commission of any office in connection with the movement and that the persons concerned intended or knew fully well that these books and literature could be used for the purpose of disseminating any doctrine tending to further encourage that terrorist movement. Moreover, it appears from the police report that Janeswar Sen is a member of the terrorist party and is an active organiser and the books and literature in question were found in the house of Sailaja Mohan Sen in such a condition that both the father and son had full knowledge of their existence in their house and in fact the son Janeswar Sen admitted the ownership of the books in the presence of the search

দুনিয়ার পাঠক এক হও

witnesses.

4. The books and literature mentioned in para: 1 are sent herewith the request to forward them to government for their perusal and return when done with.

5. Details of the objectionable parties in the books and literature mentioned above are given in the annexed statement.

6. The opinion of the Govt. pleader regarding the case is enclosed herewith.

I have the honour to be Sir/
Your most obedient servant
Sd/- H.C. Bose, Dist. Magistrate. Birbhum 4. 9. 1936.

Appendix-B

Prosecution under Press Act Sonar Bangla, Jugantar and Navasakti.

1. The following three young men were prosecuted before the Presidincy Magistrate for printing and publishing without necessary declaration under sec 15 of the Press Act the three periodical, vvi, 'Sonar Bangla' 'Jugantar' and Navasakti.

2. The three youngmen were, (1) Keshab Chandra Sen, proprietor of the 'Keshab Printing works' (2) Srimanthan Roy Chowdhury, printer of the above press, and (3) Basudev Bhattacharjee, alleged publisher and editor of 'Sonar Bangla' a periodical newspaper.

3. The prosecution's contention was that these paper were printed secretly there to avoid prosecution for sedition. The defence contention was that it was merely an oversight, and the counsel on behalf of Keshab pleaded guilty to the technical charge but disowned the contents of the papers and regretted very much for what appeared in the periodicals. But by putting up such defence Keshab could not escape punishment.

4. Srimathan was also sentenced for having printed 'Sonar Bangla' without usual declaration.

5. Basudev Bhattacharjee was convicted and sentenced to a fine of Rs. 200/ for being editor of 'Sonar Bangla' without formal declaration under sec 15 of Press Act. According to the Magistrate, 'Sonar Bangla' was said to have died immediately after its birth. The two issues of the papers for which prosecution was launched contained articles with the words "The Firinghees have set Gundas at Jamalpur" and "the abduction of Hindu Girls at Mymensingh"

Pantha Sedition Case.

1. Kiron Chandra Mukherjee, a young man, was arrested and prosecuted for publishing a seditious booklet named 'Pantha' under Sec 124A. I.P.C. berfore the Chief Presidency Magistrate, Calcutta ,Kiron babu was already in Jail being prosecuted at Bogra under Sec 109, for bad livelihood (a convenient section of the I.P.C to rope in political suspects, when the Govt. finds other course inconvenient).

2. Kiron Babu addmitted publication at Calcutta but pleaded not guilty to the charge of sedition.

3. Mr. Fhornhill in course of his judgement observed that "the general drift of the whole; the reference to 'Yugantar' a paper of the most voilent type, given some idea of the intention of the author. I am satisfied that the word 'Asura' is meant to denote Englishmen and British Govt. There is the cry for independence against alleged

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

barbarism. I am satisfied that the booklet was published with intention of bringing into hatred and spreading disaffection against the Govt of India. I accordingly find the accused guilty and council him to undergo sentence of 18 months rigorous imprisonment". The judgement was delivered on 23/2/09.

Anal Prabaha sedition case

1. Ismail Hossain Siraji of Pabna was convicted to two years R.I. by Mr. Swinhoe, Chief Presidency Magistrate, Calcutta, for writing a book entitled 'Anal Prabaha' under Sec 124A-I.P.C. and 153A.I.P.C. i,e for sedition as well as for exciting racial animosities between different classes of Indian community on 14/9/10.

2. Sri Debi Prassana Roy Chawdhury who was convicted and sentenced to pay a fine of Rs. 750/- for printing and publishing the said 'Anal Prabaha' by the Chief Presidency Magistrate was reduced to Rs. 300/- appeal to the High Court on 2/2/10.

(State committee for compilation of History of Freedom Movement in India, Bengal Region.)

Appendix C

JUDGEMENT

EMPEROR

VS

BRAJA BEHARI BURMAN

124-A, I.P.C.

The accused has charged as the keeper of the Mahamaya Press, with getting the book exhibit-1 'Fansir Ashirbad' printed at that press, and published at the Burman Publishing house of which he is the proprietor and thereby committing an offence under Sec. 124-A of the Indian Penal code . For the first time in my experience the prosecution have not proved the responsibility of the accused.

Little need be said about the work itself, I have perused the translation, and the work in what one would expect from the title 'The Blessing of Hanging', and from the author, who is announced as also the author of 'India on the Path of Revolution'. The 'Hanging is for Revolutionaries , and revolutionaries in India, these are glorified and the whole work is one of propaganda to encourage and create revolutionaries, men so disaffected towards government that they will risk their lives in attempts to overthrow it and attack it. The book clearly bring everyone responsible for it within the purview of sec 124-A of I.P.C.

The only question then is as to the responsibility of the accused. The book itself shows that the author of 'India on the path of Revolution', who is admitted to be one Pulokes Chandra De. This book shows this person as publisher, and has a note, printed by the author, Mahamaya Press. 193, Cornwalis Street. The accused's contention is that he is not the printer as the book shows the 'author' as printer, and claims that this absolves him of all liability, the mere fact that he is the declared keeper of the Mahamaya Press, only shows, according to him that he is the owner of the Press at which the book was printed and does not show that he had any connection with the book. Prima-facie, once it is shown that the work was printed at his press, and that he is the declared keeper of that press, his responsibility is established, and it is for him to show in fact that he had nothing to do with the work. But in the present case there is far more than the mere fact of printing.

The accused was arrested at 194, Cornwallis Street, the present shop of the Burman Publishing house, which was formerly at 193, Cornwallis Street, where this book was published (as shown on the book itself). There are two rooms, one the Mahamaya Press and one the Burman Publishing House. The accused's name appear in the Municipal Register as the Proprietor of the Burman Publishing

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

House at 193, Cornwallis Street and he is the declared keeper of the Mahamaya Press. At the time of search, the manuscript Exhibit-1/2, part of the manuscript of the book was found, also the poster Exhibit 1/5 advertising that the book was just cont' also three blocks for the picture of shackled feet, which appears on the book, and lastly a large poster announcing the fact, and also annoucing the coming of a book called 'Biplaba Jay Jatra'. In the face of all this the prima-facie evidence established by the fact that he is the declared keeper of the press at which the book was printed in overwhelmingly corroborated. It is useless in the face of all this for him sincerely to argue that he had no responsibility for the book. He says that it appeared in the ordinary course. We may accept this with the note, that the ordinary course appears to have been to publish sedition. It might still have been possible for him to establish by evidence in the face of even all this that he was not responsible, but he cannot do this by mere argument. The mere fact that he took a precaution of putting in on the work that the 'Printer' was the 'author' cannot absolve him in any way, the work came from his press and publishing house, and the evidence as it stands shows beyond all doubt that he knew of the work and was responsible for it.

The landlord Nandalal Ghosh has also been called to support the prosecution case, which it is suggested for the defend that he is a false witness put up by the police. I do not believe this to be the case.

I, therefore, find the accused Braja Behari Burman guilty under Sec. 124-A of IPC. He is sentenced to two years rigorous imprisonment.

Sd/-T. Roxburgh, Chief Presidency Magistrate, Calcutta. 15-5-1930.

Appendix-D

In the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.
The 19th December, 1930.
Criminal Jurisdiction.

Present:
The hon'ble Mr. Justice Lord Williams,
The Hon'ble Mr. Justice S. K. Ghosh.
Appeal No 478 of 1930 (Mr. T. Roxburgh C. P. Magte.)
Braja Behari Burman.......Appellant.
For Appellant:- Messrs. Santosh Kumar Bose and Manindra Nath Banerji, Advocates.
For the Crown:- Mr. B. M. Sen, Counsel and Mr. Anil Chandra Roy Chowdhury, Advocate.

In this case the appellant was charged under Section 124A of the Indian Penal Code and convicted and sentenced by the Chief Presidency Magistrate to two years' rigorous imprisonment. He is the registered keeper of the Mahamaya Press and the Proprietor of the Burman Publishing House which businesses were carried on at 193 Cornwallis Street and are now carried on at 194 Cornwallis Street. In that press was printed a book "Fanshir Ashirbad" which without any doubt is a siditious work. It has not been contended otherwise by the appellant. The only point raised by him is that although he is the registered owner of the press and proprietor of the press and the publishing house carried on in conjunction with that printing business he is not liable to be convicted under this section because it has not been shown that he had knowledge of the contents of this work and therefore it cannot be presumed that he intended to excite disaffection by printing it. The evidence is that he was arrested in these premises which consist of only two rooms, that when a search was made a part of the manuscript of the book was found, also posters advertising the publication, and three blocks for a certain picture called the "picture of the sackled feet" which appears in this books and a large poster was displayed announcing the publication. All these were in the premises for anybody to see. The contention of the appellant is that nevertheless he might have been present carrying on his business in these premises wothout having any knowledge of the contract for

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
publishing this work. The evidence of which I have referred is ample to show that a prima facie case has been established. The man who is the proprietor and owner of the press and the publishing house connected with it cannot be allowed to contend that he can shut his eyes to everything going on upon his premises and then pretend, that he has no knowledge of the contents of the publications printed and issued by him. As I have said there is a complete prima facie case against him. It is quite true that if he had liked and if he had been able to do so he could have called evidence to show that inspite of this circumstantial evidence against him, in fact he was away from the premises during the whole time that the book was being printed and published and that he had not been informed either of the printing and publication or of the contents of the book. He has called no such evidence and the result is that he has been rightly covicted. It is said that there is no proof that he had the intention to excite disaffection. But a man is presumed to intend the reasonable consequences of his own acts, and if he chooses to print and publish a document such as this the intent to excite disaffection is to be presumed. On the question of sentence it should be recognised that just as receivers are probably worse than thieves because without receivers there would be less thieves so the position of printers of such documents is probably worse than that of the authors because the seditious acts of the author would be far less extensive in their operation if it were not for the existence of persons able and willing to print and publish them.

For these reasons this appeal is dismissed.

The 19th December 1930 — Sd/- John Lord Williams.

S. K. Ghose J. — sd/-Head Assistant.

I agree.

The 19th December 1930. sd/- S. K. Ghosh.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয়তার প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র

॥ ১ ॥

এদেশের জাতীয় চেতনার বিকাশে সাহিত্যের অসামান্য প্রেরণাময় ভূমিকা। উনিশ শতকে যেসব সাহিত্যিকের দেশাত্মবোধক রচনা শাসক গোষ্ঠীকে উদ্বিগ্ন করেছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ও নবীনচন্দ্র সেন। হেমচন্দ্র ছাড়া এঁরা সকলেই ছিলেন পদস্থ রাজকর্মচারী। এঁদের তিনজন—দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র রাজরোষে পড়েছিলেন। যদিও এঁদের কারো বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। এই তিন সাহিত্যিকের রচনাকাল মোটামুটি এই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩-১৮৯৪, দীনবন্ধু ১৮৬০-১৮৭৩ এবং নবীনচন্দ্র ১৮৭১-১৯০০। এই কালপর্ব জাতীয় আন্দোলনের পূর্ববর্তী। এই পর্বের শেষ প্রান্তের দিকে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। কিন্তু তখনকার কংগ্রেস প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কথা একেবারেই চিন্তা করেনি। সবেমাত্র সৃষ্ট এই কংগ্রেস আবেদন নিবেদনকে একমাত্র করণীয় কর্তব্য ধরেছিল। তাদের সেই কর্মনীতি আরও কিছুকাল বর্তমান ছিল। আলোচ্য পর্বে আমরা দেখি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পক্ষে আপদজনক সিপাহী বিদ্রোহের শেষ হয়েছে। এবং এই শ্রেণীর মানুষেরা ব্রিটিশ শাসনাধীনে জমিদারী অথবা সরকারী চাকুরীর সুখাশ্রয়ে অবস্থান করতে উৎসুক। দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ ইত্যাদি বহু দূরবর্তী ব্যাপার।

এই তিনজন সরকারী কর্মচারী সাহিত্যিক অল্পবিস্তর মেধাবী ছাত্র এবং শিক্ষাজীবনে কৃতী। স্বভাবতই তাঁরা সেকালের পরম প্রার্থিত সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছিলেন। তখন সাহিত্যের বাজারদর এত বেশি ছিল না যে, কেবল সাহিত্যের উপর নির্ভর করে তাঁরা জীবনধারণ করতে পারতেন। ব্যবহারিক জীবনে তাই তাঁরা পুরোপুরি চাকুরীজীবী। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা সাহিত্যিক—সূক্ষ্মতন্ত্রীযুক্ত বীণাযন্ত্র—যাতে সামান্যতম আঘাতেও অনুরণন ওঠে। পরাধীনতা, অত্যাচার, অপমান, শোষণ—তার জ্বালাকে তাঁরা অনুভব করেছিলেন, এবং তাকে কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ না করেও পারেননি। সরাসরি ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান তাঁদের পক্ষে শোনানো সম্ভব ছিল না। তাঁদের মানসিক দ্বিধা এবং সরকারী চাকুরীর বন্ধন সে সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরোক্ষে যতখানি তাঁরা প্রকাশ করেছেন, এবং তাতেই দেশপ্রেমের যে উন্মাদনা তাঁরা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তা ইংরেজ শাসকদের কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল। ফলে এঁরা নানাভাবে সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে যখন এঁদের স্থাপন করে বিচার করা যায়, তখন এঁদের সাহস ও ঝুঁকি নেবার শক্তি আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় মনে হয়।

দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের একাধিক গ্রন্থ সেকালে জনমানসে সাড়া তুলেছিল ও রাজশক্তিকে বিচলিত করেছিল। যেসব বই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি হ'ল : দীনবন্ধুর নীলদর্পণম নাটকম্ (১৮৬০), নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২)।

॥ ২ ॥

আনন্দমঠ ও জাতীয়তা : আনন্দমঠে বঙ্কিমকৃত রূপান্তর

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করে বাঙালীর পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতির দ্বারা তিনি সেই কাজ করেছেন। আনন্দমঠের কাহিনী সন্তান সেনাদের নিয়ে। সবরকম অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর যে শক্তি প্রকাশিত হয়েছে, সমগ্র ভারতবাসীই তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। তাঁর অতুলনীয় 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল জাতীয় সঙ্গীত—'বন্দেমাতরম' শব্দ—জাতীয়তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

মন্ত্র। আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সন্নিহিত কালের বিরাট ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলেছেন। আনন্দমঠের অনুকরণে তিনি ভবানী মন্দিরের কাহিনী রচনা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের উপন্যাসটি মুসলমান ইতিহাসের আশ্রয়ে আমাদের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম ও সঙ্গে সঙ্গে পরজাতি বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলে। চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠে সেকালের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরের ইংরেজ বিদ্বেষকে প্রকাশ্যভাবে ফুটাইয়া তুলে। এইরূপে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়ের ভূমি গড়িবার পূর্বে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা খুব ভাল করে পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এ বিরোধটা কিন্তু পাকিয়া উঠে নাই। পাকিয়া উঠে তাঁহার স্বর্গারোহণের দশ-বার বৎসর পরে, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কোন পথে এই সাংঘাতিক বিরোধের সমন্বয়ের সম্ভাবনা আছে তাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন

'উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের উন্মেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বাংলা সাহিত্যের। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ্য, তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠেই আছে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি। এই গানটিই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল।' [২] [অনূদিত]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আর কোনো বাংলা বই এইভাবে বাংলার যুব মানসকে প্রভাবিত করেনি। তাঁর ভাষায় : 'আর কোনো বাংলা বই, বা, অন্য কোনো ভাষায় লেখা কোনো বই বাঙালী যুবকদের এত গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেনি। এর পঁচিশ বছর পরে লেখা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' হয়তো সমভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরের উপন্যাসটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ প্রতিবাদ। যেমন আগেরটি, অন্তত লোক দেখানো ভাবে, মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।'[৩] [অনূদিত]

স্বামী বিবেকানন্দও আনন্দমঠের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। দেশের তরুণ সমাজকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তে বলেছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ করতে কীভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, তার সাক্ষ্য হেমচন্দ্র দিয়েছেন

'সন্ন্যাসী দেশপ্রেমিক তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। এবং বললেন, 'মানুষ তৈরিই আমার জীবনের মিশন। হেমচন্দ্র! তুমি তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে আমার এই মিশন কাজে ও বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করো। বঙ্কিমচন্দ্র পড় এবং তাঁর দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করো।' [৪] [অনূদিত]

স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভাবৈক্য, এবং বিপ্লবীদের উপর আনন্দমঠের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে বিখ্যাত বিপ্লবী (পরে মার্কসবাদী) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

'স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের আদর্শে দেশকে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁর জীবনের লক্ষ ছিল ভারতের নিদ্রিত সিংহকে জাগানো এবং দেশ গঠনের কাজে লাগানো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বৈপ্লবিক উপন্যাস আনন্দমঠে যে জাতীয়তাবোধের আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর আদর্শও তাই ছিল। তাঁদের উভয়ের কাছেই ভবিষ্যৎ ভারতমাতার রূপ হচ্ছে দেবী দুর্গা। যাঁর মুখ ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত, যাঁর হাতগুলি সবরকম অস্ত্রে অলঙ্কৃত, বাম হাতের মুঠোয় অসুরের চুল, আর ডান হাতে সকলকে অভয় দিচ্ছেন। এই আদর্শ সে যুগে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতমাতার সম্মানে যেমন আনন্দমঠের বিপ্লবীরা বন্দেমাতরম গাইতেন, পরবর্তীকালে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিকও গেয়েছেন এই গান এবং এ জন্য অশেষ দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেছেন।'[৫] [অনূদিত]

বাঙালি তরুণদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষে আনন্দমঠের এই অবদানের কথা আধুনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঐতিহাসিকও উল্লেখ করেছেন : তিনি বলেছেন :

"বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অনুশীলন সমিতি এবং বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতাদির প্রভাব সামগ্রিকভাবে দেশপ্রেমিক ও অশান্ত যুবকদের উপর খুবই স্বাভাবিক এবং তা এতই সুবিদিত যে এর বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।"[৬]

ইংরাজ প্রশাসকরাও আনন্দমঠের প্রভাব স্বীকার করেছেন। মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড তাঁর 'হার্ট অব্ আর্যাবর্ত' গ্রন্থে বলেছেন 'বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলি আনন্দমঠের আদর্শে গড়ে ওঠে।' বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতেও প্রেরণা দিয়েছিল আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার লেখনী স্তব্ধ করে দেবার জন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিম নিজে যা নবীনচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, তা নবীনচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনীতে' লিখে গেছেন :"—বঙ্কিমবাবু বললেন,...বহরমপুরে বদলী হইয়া গেলাম। একে ত রোডসেস ইত্যাদি এক রাশি কার্যের ভার। কলেক্টর বেটা জিদ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল।"[৭]

বঙ্কিমচন্দ্রকে কিন্তু সম্পূর্ণ দমানো যায়নি। পদস্থ সরকারি পদে থেকেও তিনি নির্ভয়ে সরকারের পক্ষে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছেন, তার মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছে।

১৮৮২ খৃঃ আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হয়। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও আরও দু'দশক পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই পড়েছিল। তথাপি বইটির বিপজ্জনকতা সরকার অবিলম্বে বুঝেছিল। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সন্দেহ হয়েছিল এ উপন্যাস রাজদ্রোহমূলক, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও সূক্ষ্ম প্রচার। ইংরেজের সপক্ষে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তি থাকলেও আনন্দমঠের মূল সুর ব্রিটিশ বিরোধী। এই বইয়ে আগাগোড়া লেখকের মুখপাত্র সত্যানন্দই। স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের উসকানি এতে আছে! লুপ্তপ্রায় নবাবী শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং সমকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই উপন্যাসের ছিল প্রচ্ছন্ন আয়োজন। চিকিৎসক যাই বলুন, সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সত্যানন্দের কর্মনীতিতে এই বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই জন্যই আনন্দমঠ বাঙালীর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবনবেদ।

আনন্দমঠ রচনার জন্য ইংরেজ রাজপুরুষদের ক্রোধের প্রভাব পড়ে বঙ্কিমের কর্মজীবন ও লেখকজীবনের উপর। এই ক্রোধের তীব্রতা ও পরবর্তী আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত আনন্দমঠের এমনকি প্রথম সংস্করণের থেকেও ইংরেজ বিরোধিতার প্রসঙ্গগুলি পরবর্তী সংস্করণে অনেক কাটছাঁট করেছেন। মোলায়েম করেছেন। আনন্দমঠের তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন।

"এবার পরিশিষ্টে বাঙলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।"

এই নতুন সংযোজন লেখকের আত্মরক্ষার জন্য, তাতে সন্দেহ নেই।

আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে বের হবার পর থেকে পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত (বঙ্কিমের জীবদ্দশায় এটিই শেষ সংস্করণ) বারবার ভাষার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লেখার উৎকর্ষ সাধনের চেয়ে ইংরেজের চোখে ধুলো দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। ১২৮৭ সালের চৈত্রে শুরু হয়ে ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে বের হয়। ১২৮৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে বের হয়। তাতে আনন্দমঠের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ৬টি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়। এখানে ইংরেজের প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাপ্টেন টমাসের যে চরিত্র আঁকা হয়, তাতে কালির ছিটে আগাগোড়া। যেমন, 'টমাস সাঁওতাল রমণীদের প্রতি আসক্ত, সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে টমাসের সৈন্যদল"চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ষিত হইতে লাগিল।" সাতজন সন্তান বন্দী করে টমাস কলকাতায় রিপোর্ট পাঠাল ২১৫৩ জন সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। 'কাপ্তেন টমাস ব্রেনহিম বা রসবাকের মত দ্বিতীয় যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁফ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন।'[৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইংরেজদের প্রতি শ্লেষাত্মক মন্তব্য সম্বলিত বঙ্গদর্শনে এই সংখ্যাটি সরকারি দফতরে জমা পড়ার (জমা দেওয়া তখন আবশ্যিক ছিল) কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে বাংলা সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ১৮৮১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হন এবং ১৮৮২, ২৩ জানুয়ারি মিঃ ব্লাইদকে চার্জ বুঝিয়ে দেন। ওই লেখা বের হবার পর বাংলা সরকার তাদের কেন্দ্রীয় দফতরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বঙ্কিমচন্দ্রকে রাখা নিশ্চয়ই নিরাপদ মনে করেননি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একজন অত্যন্ত দক্ষ অফিসার ছিলেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে এই অবিচার ইউরোপীয় মহলেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি, স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়

"Baboo Bamkim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments—and we confess our inability to understand the reason that justify the step".

এই ঘটনার পর আনন্দমঠ পুস্তকাকারে বের হয়—১৮৮২, ১৫ ডিসেম্বর। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক ভেবেচিন্তে বই বের করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জেনে নিয়ে লিখেছেন, 'অনেক বিবেচনার পর তিনি আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।'* কিছু পরিবর্তন করে আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ বের হয়। বিশেষ লক্ষণীয় পরিবর্তন উপক্রমণিকার শেষ বাক্যে। বঙ্গদর্শনে ছিল 'তখন উত্তর হইল, তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।' প্রথম সংস্করণে লেখা হয়—'তখন উত্তর হইল, ভক্তি।' শুধু তাই নয়, প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে তিনি ইংরাজের প্রশংসাও করলেন

"বাঙালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'

আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের সর্বশেষ বাক্য দুটি ছিল 'সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়াছিলেন তাহা সহজে নিভিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।' 'সে কথা' ঝাঁসীর রানীর কাহিনী। ইচ্ছা সত্ত্বেও সে কাহিনী তিনি লিখতে পারেননি। পরে আনন্দমঠে এ অংশ বাদ দেওয়া হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন…'নিজের সৃষ্ট স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে আবার বলিলেন, "এ দেশে স্ত্রীরাই মানুষ. সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল ঝান্সীর রানীর চেয়ে কেউই উচ্চ নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন নায়িকা আর নাই। ইংরাজ সেনাপতি রানীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক 'আনন্দমঠে'ই সাহেবরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।"[১১]

স্পষ্ট ও সত্য কথা বলার অসামর্থ্যের গ্লানি বঙ্কিমচন্দ্র মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। রুশ ভারততত্ত্ববিদ বনরফের কাছে তিনি একবার একথা স্বীকার করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন

"১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ—

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রাশিয়ার বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ প্রফেসর বনরফ বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, এবং বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি কলুটোলায় তাঁহার বাসায় সমবেত হন। প্রবীণ প্রফেসর নববিজিত বর্মামুলুক প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন সে দেশ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোন পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে কিনা? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিজয়ের অনুকূল নহে, কিন্তু কোন পুস্তিকা (Pamphlet) কেহ লেখেন নাই। প্রফেসর পুনরায় বিশেষভাবে উহার কারণ জানিতে কৌতূহলী হইলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন আসল কথা স্পষ্ট করিয়া মতামত দিতে কাহারও সাহস হয় না।"[১২]

আনন্দমঠের দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে আনন্দমঠের উপরে কেশবচন্দ্র সেনের ভাই, রাজভক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণবিহারী সেনের সুদীর্ঘ সমালোচনার একাংশ প্রথমে ভূমিকার মর্যাদা দিয়ে ছাপা হয়। ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার জন্যই এই ব্যবস্থা, আনন্দমঠ পুস্তকাকারে বের হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয়, কেশব সেন যদি লিখে দেন যে, এতে ইংরেজ বিদ্বেষ নেই, তাহলে সাহেবরা বিশ্বাস করতে পারেন, কেশব সেন ইংরেজদের খুব আস্থাভাজন ছিলেন, রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর গুণগ্রাহী, কেশব সেনের সঙ্গে বঙ্কিমের সৌহার্দ্য ছিল। বঙ্কিম কেশব সেনকে আনন্দমঠের সমালোচনা লিখে দেবার অনুরোধ করলে তিনি বলেন : 'এখন আমি বইয়ের সমালোচনা লিখি না। তুমি বরং কৃষ্ণবিহারীকে (তাঁর ভাই) বল। সেই পত্রিকা দেখাশুনা করে।' এরপর কৃষ্ণবিহারী তাঁর সম্পাদিত 'দি লিবারেল অ্যান্ড দি নিউ ডিসপেনসেশান'-এর ১৮৮৩, ৮ এপ্রিল সংখ্যায় আনন্দমঠের সমালোচনা লিখলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন 'মুসলমান প্রভুত্ব দূর করে ইংরেজ রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করাই সন্তানদের লক্ষ্য ছিল।' সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ঐ রচনার প্রয়োজনীয় অংশ আনন্দমঠের দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকার মর্যাদা দিয়ে ছাপলেন।

কিন্তু এতেও সরকারের রোষ থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। তখন সরকারের সন্দেহ দূর করার জন্য বঙ্কিম দুটি উপায় অবলম্বন করলেন। আনন্দমঠের কাহিনীটি যে মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সমসাময়িক কোন রাজদ্রোহমূলক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়, তা দেখানোর জন্য তৃতীয় সংস্করণের প্রথমে বলা হয়, গল্পের ভিত্তি সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। তাছাড়া ব্রিটিশ বিরোধিতার কথাগুলি যথাসম্ভব পরিবর্তন করে ইংরেজের প্রশংসাসূচক নানা কথা যোগ করলেন।

আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ থেকে পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত বারবার পরিবর্তন করেছেন বঙ্কিম। এই পরিবর্তনের সংখ্যা শতাধিক। সব পরিবর্তনই রাজরোষ এড়ানোর জন্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার উৎকর্ষ প্রভৃতির জন্য। ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দ্বিতীয় খণ্ডের বিংশ পরিচ্ছেদের। এই পরিবর্তনের কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :—

প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ—

১ম সংস্করণ ছিল, '...বাঙলার অন্যান্য অংশের ন্যায় বীরভূমের কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার বীরভূমের রাজার উপর।'

(আনন্দমঠ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃঃ ১১) পরে অর্থাৎ ৫ম সংস্করণে আছে

'অতএব বাঙলার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৬৭০) ১ম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ—প্রথম সংস্করণে ছিল

"সেই সময়ে "হরি ! হরি ! হরি !" শব্দ করিয়া দুইশত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘেরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ির কাছে আসিয়া লাইন ফরম করিবার আজ্ঞা দিলেন।..." (আনন্দমঠ, সাক্ষরতা পৃঃ ১৪)

পঞ্চম সংস্করণে আছে

"সে সময়ে 'হরি ! হরি !' শব্দ করিয়া দুইশত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ির কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না..." (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ৬৭২)। [দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—১ম সংস্করণে ছিল

'ক্যাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া সাঁওতাল কুমারীদের গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন। তখনকার ভারতীয় ইংরেজরা এখানকার ইংরেজদিগের ন্যায় পবিত্র চরিত্র ছিলেন না।' (আনন্দমঠ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৬০)

এই অংশটি পঞ্চম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে টমাসকে কিঞ্চিৎ ভাল করে আঁকা হয়েছে

'শ্মশ্রুমান্ বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সুতরাং বিনা বাক্য ব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন' (বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, পৃঃ ৭০৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদের শেষে (১ম সং) ছিল—"জীবানন্দের সন্তানসেনা...বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। তাহারা যখন আম্রকাননে প্রবেশ করে, তখন গাছের উপর হইতে একজন বলিল, 'গাছে উঠ ! গাছে উঠ ! নহিলে বনের ভিতর ঢুকিয়া ইংরেজ তোমাদিগকে মারিবে।' ত্রস্ত সন্তানেরা গাছের উপর উঠিল।"

পঞ্চম সংস্করণে আছে—

"জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াট্‌সন তাহাদিগকে দুইদিক হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।" (বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ পৃঃ ৭২০)

১ম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে গোড়ায় যে যুদ্ধ বর্ণনা ছিল, পরে তার অনেকাংশ বাদ দেওয়া হয়। প্রথম সংস্করণে ছিল—

'লেপ্টেনান্ট ওয়াট্‌সন দুর্বুদ্ধিক্রমে আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলিলেন। দুর্বুদ্ধিই বা কি, জীবানন্দের দক্ষিণে কাপ্তেন হে যাইতেছে দেখিয়া ওয়াট্‌সন মনে করিলেন যে, আমি ঠিক বামে গিয়া ঘেরিব, এই ভাবিয়া আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলিলেন। তখন অকস্মাৎ দুড় দুড় দুড় দুড় শব্দে গাছের উপর হইতে তাহার সৈন্যপৃষ্ঠে বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। লেপ্টেনান্ট ওয়াট্‌সন তখন উপরে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, 'আকাশ হইতে গুলি পড়ে নাকি!' নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে একজন বলিল, 'না সাহেব, আমরা গাছ থেকেই মারিতেছি, ঐখানে দাঁড়াইয়া গাছের উপর দু-চারিটা গুলি চালাও না।"

আর একজন বলিল, "সাহেব, ঐখানে একটু দাঁড়াইয়া দেখ, শুনিয়াছি জীবানন্দ নাকি যীশুখ্রীষ্ট ভজিবে, ঐ আসছে।"

লেপ্টেনান্ট ওয়াট্‌সন দেখিলেন বেগোছ, ইহাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না। সৈন্যগণকে বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র অগ্রসর হও, একটু দূরে গেলে, গাছের বাঁদরে আর কামড়াইতে পারিবে না।"

তখন গাছের বাঁদরের বন্দুকের দৌড়ের বাহিরে সৈন্য লইয়া ওয়াট্‌সন দ্রুতবেগে জীবানন্দের আক্রমণে চলিলেন।

শান্তি তখন গাছের উপর হইতে বলিল, "ভাই বাঁদরের দল, একবার লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া রাঙামুখোদের বাঁদরের কামড়ের জ্বালাটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।" শান্তি মনে মনে বলিতে লাগিল, "যদি মেয়ে মানুষ না হইতাম তো।"—সকলটুকু লিখিতে পারিলাম না। আগে নবীনানন্দ গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল, সঙ্গে ঝুপ ঝাপ করিয়া বৃক্ষস্থ সকল সন্তান লাফাইয়া পড়িল, তখন নবীনানন্দ বলিলেন, "ধীরে ভাই, ধীরে, মিলে মিশে, গোল কর না ; সার বাঁধ, বন্দুক কাঁধে, বল্লম হাতে ছুট। দৌড়। বল বন্দে মাতরম্।" তখন বন্দেমাতরং গাহিতে গাহিতে তাহারা লেপ্টেনান্ট ওয়াটসনের ব্যাটেলিয়ানের উপর ধাবমান হইল।

শান্তি পিছাইয়া পড়িল—বলিল, "ছি ! কি করিতেছি ? স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে যাই কেন ? আমার ধর্ম তো এ নয়। আমি গাছের বাঁদর গাছেই থাকি।" এই বলিয়া শান্তি ফিরিয়া আসিয়া গাছের উপর উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

জীবানন্দ প্রায় পুল পাইয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে বন্দেমাতরং কানে গেল। জীবানন্দ বলিল, "ভাই, দূর হইতে বন্দেমাতরং শুনিতেছি, ভাই মরি মরবো, পুলে কাজ নাই, চল একবার উহাদের সঙ্গে গিয়া বন্দেমাতরং গাই।" জীবানন্দের সেনারা আর প্রাণভয়ে পলান হইল না, বন্দেমাতরং গায়িতে গায়িতে সেই হতাবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সন্তানসেনা লেপ্টেনান্ট ওয়াটসনের দিকে ধাবমান হইল এবং বজ্রের মত লেপ্টেনান্ট ওয়াটসনের সেনার উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিল। এক দিকে জীবানন্দের সৈন্য, আর এক দিকে নবীনানন্দের প্রেরিত সৈন্য দুই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে দৃঢ়বল পর্বততুল্য ইংরেজ সেনা ক্ষয়িত হইতে লাগিল। ক্ষয় হয় তবু ভাঙ্গে না। ইংরেজের অতুল বল, অতুল সাহস, অতুল অধ্যাবসায়। রাউন্ডের পর রাউন্ড, ফায়ারের পর ফায়ার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, মেঘের উপর আরো মেঘ। পৃথিবী অন্ধকার হইল, গগন প্রতিধ্বনিতে বিদারিত হইতে লাগিল, কাননে ঝড় বহিল, পশু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

পক্ষী ভয়ে বিবরে লুকাইল, অজয়ে তুফান উঠিল, নবীনানন্দ বৃক্ষ হইতে ডাকিল "মার মার যবন মার। ঐ ওপাশে, এই সেনার পরে জীবানন্দ আছে, যাও ফৌজদারী বাদসাহী ভেদ করিয়া যাও ভাই। মার মার মার ফৌজদারী মার।" তখন দক্ষিণ বামে বিদ্ধ হইয়া, আহত নিহত বিপ্লুত স্থানচ্যুত বিদ্রাবিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনা ছিন্ন ছিন্ন ভাবে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। মাঝখানে জীবানন্দের দলে এবং নবীনানন্দের প্রেরিত দলে দেখা হইল। তখন শান্তি আর থাকিতে পারিল না : "ছি! নারীজন্মেই ধিক।" এই বলিয়া শান্তি আবার গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। যেখানে দুই বিজয়ী সন্তানসেনার সম্মিলন হইয়াছে সেইখানে কুরঙ্গীর ন্যায় শান্তি ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রের মাঝখানে নবীনানন্দে দেখা হইল। দুইজনে দুইজনকে আলিঙ্গন করিল। যখন একটু অবসর পাইল তখন জীবানন্দ বলিল, "শান্তি, আজ তোমার সমক্ষে মরিলে কি সুখ হইত।"

নবীনানন্দ বলল, "মরিবার এখনও সময় আছে, তুমি পুরুষ মানুষ তোমার তো বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, মরিবার দরকার হইলে আমায় বলিও, আমি পথ দেখাইয়া দিব ; যাও দেখি যদি ঐ পথে মৃত্যু নামে অমূল্যনিধি খুঁজিয়া পাও।" এই বলিয়া শান্তি কাপ্তেন হের সৈন্য দেখাইয়া দিল। যাইবার সময়ে জীবানন্দের কানে কানে বলিয়া দিল ;

"আজ মরিতে পাইবে না, সত্যানন্দের আদেশ।"

"তখন বন্দেমাতরং গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ অশ্বারোহণে সসৈন্যে কাপ্তেন হের প্রতি ধাবমান হইলেন। শান্তি বিষণ্ন মনে নারীজন্মকে ধিক্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গাছে উঠিয়া "গেছো মেয়ে" বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিল। কাপ্তেন হেও দেখিলেন যে, যাহার পলায়ন অবরোধ করিবার জন্য যাইতেছিল, সেই স্বয়ং আবার সম্মুখে আসিতেছে। কাপ্তেন হে ফিরিয়া জীবানন্দকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার অভিমুখী হইলেন। যেমন দুইটি পর্বতনিঃসৃত নদী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া উপত্যকায় এক গহ্বরে পরস্পরকে প্রহ্নত করে—উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার ফেননিচয় আকাশে প্রেরিত করে, শব্দে পর্বতকন্দর বিদীর্ণ করে, তেমনি হে ও জীবানন্দের সেনাদ্বয় তুমুল সংগ্রামের সংঘর্ষণে সংঘর্ষিত হইল। জয় পরাজয় নাই, শত শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজ সেনা "হুররে" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া শত শত সন্তান দলিত করিতেছে। জয় পরাজয় নাই, কি হয় বলা যায় না। কাপ্তেন হের কাছে ইংরেজের বাছা বাছা সেনা, বিশেষ গোরা অনেক—পরাজয় কাহাকে বলে তাহারা ইউরোপে বা ভারতবর্ষে কখনও তা জানে না। প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর শ্রেণীবৎ তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহিল। সন্তানেরা যত উদ্যম করিল কিছুতেই গোরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তাহারা শত শত সন্তান নিহত করিতেছে কিন্তু একপদ পথ পশ্চাদগামী হয় না। ইংরেজের ভাগ্যক্রমে।"···

এই অংশটি পঞ্চম সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিচ্ছেদেই এর পরে ভবানন্দের মুখে ও অন্যত্র 'ইংরেজ' শব্দগুলির স্থলে যবন হয়। যেমন—'ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিল। ভবানন্দ বলিল, "ভাই, ইংরেজ ভাঙ্গিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতোবৎ সন্তানের দল, নুতন উৎসাহে স্থল পারে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরেজের উপর পড়িল। ইংরেজ যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথী তরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্বতাকার মত্তহস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি ইংরেজদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ইংরেজরা দেখিল পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভুতলশায়ী হইল। ইংরেজের দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, ইংরেজ সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইল। ইংরেজের সব তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াটসন ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, 'আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি। আর প্রাণীহত্যা করিও না!' জীবানন্দ ভবানন্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মুখপানে চাহিল, ভবানন্দ মনে মনে বলিল, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিল,'মার মার'।"(আনন্দমঠ, ১ম সং পৃঃ ৮২-৮৩)

পঞ্চম সংস্করণে এর বদলে লেখা হয়েছে :

"ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতোবৎ সন্তানের দল নতুন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথী তরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল বিধর্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ বিধর্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইল। সর্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌স্‌ন ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণীহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার।" [বঙ্কিম রচনাবলী (সাক্ষরতা) উপন্যাস খণ্ড পৃঃ ৭২১] দেখা যাচ্ছে, প্রথম সংস্করণে যে যে স্থানে 'ইংরাজ' ছিল, এখানে সেখানে 'নেড়ে' ও 'যবন' হয়েছে।

এর পর দ্বাদশ পরিচ্ছেদেও অনুরূপ পরিবর্তন হয়েছে। যেমন : সত্যানন্দ বলিলেন : এতদিন যে জন্যে আমরা সর্বধর্ম সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে ইংরেজের সেনা আর নাই, মুসলমানের যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না। তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও।

জীবানন্দ বলিলেন, "চলুন এই সময়ে গিয়া নগর অধিকার করি।"(আনন্দমঠ সাক্ষরতা পৃঃ ৮৫)

পঞ্চম সংস্করণে হয়েছে—

'...সত্যানন্দ বলিলেন, এত দিনে যে জন্য আমরা সর্বধর্ম সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, এক খণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও।'

জীবানন্দ বলিলেন, 'চলুন এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।' (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৭২২)

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদে ছিল 'বীরভূমি ইংরেজ মুসলমানের হাত ছাড়া হইয়াছে। ইংরেজ মুসলমান কেহই একথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন কতকগুলো লুঠেরাতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতার গভর্নর জেনারেল। ওয়ারেন হেস্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত। অগৌণে বীরভূমি শাসনার্থ উড নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা হইয়া উপস্থিত হইলেন।" (আনন্দমঠ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৯২)

এর বদলে পঞ্চম সংস্করণে হয়েছে :

"উত্তর বাঙলা মুসলমানের হাত ছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই একথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন...

অগৌণে সন্তানশাসনার্থে Major Edwards নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নতুন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।" (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৭২২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের বিংশ পরিচ্ছেদে আছে :···যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত্র হইয়া আমায় অনুসরণ কর।" (আনন্দমঠ, ১ম সং, সাক্ষরতা, পৃঃ ১০৩)

পরবর্তী সংস্করণগুলি চিকিৎসকের মুখে ইংরেজের প্রশংসা আরও বেশি করে করা হয়েছে।

৫ম সংস্করণে আছে (৪র্থ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)

"চিকিৎসক বলিলেন, 'সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণ জয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নেই।···

যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান, আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যেই প্রজা সুখী হইবে —নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত্র হইয়া আমায় অনুসরণ কর'।" (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৭৩৫)

এই পরিচ্ছেদের প্রথম সংস্করণে ছিল—

"ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও?" (আনন্দমঠ, সাক্ষরতা, পৃঃ ১০৩)

পঞ্চম সংস্করণে হয়েছে :

'···ব্রত সফল হইয়াছে···মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে।' (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ১০৫)

এর পরে প্রথম সংস্করণে ছিল—

'মহাপুরুষ' তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুইবাহু ছিন্ন হইয়াছে তোমার আর পরমায়ু নাই।' (আনন্দমঠ, সাক্ষরতা, পৃঃ ১০৩)

এর বদলে পঞ্চম সংস্করণে লেখা হয়—'মহাপুরুষ' শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজ্য। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই। (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৭৩৬)

আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণে সব শেষে ছিল "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।' (আনন্দমঠ, সাক্ষরতা, পৃঃ ১০৪)

এই আগুনের শিখা রাজরোষের আশঙ্কায় এখানে নিভিয়ে দেওয়া হয়। এর বদলে পরবর্তী সংস্করণে শুধু লেখা হয়—'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।' (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা, পৃঃ ৭৩৬)

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময়েও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত আনন্দমঠের কোনো কোনো পাঠ পরিবর্তন করেছেন। তার দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য যেমন :—

বঙ্গদর্শনে ছিল "···ঐ যে দেখিতেছি লাল কাল জরদা সবুজ ও পাঁচরঙা মুগের লাড়ু, ইহাতে ফৌজদারী বাদসাহী ইংরেজ আছে, চল ভাই বৈষ্ণব সেবায় সব লাগাই।" (আনন্দমঠ, আদিপর্ব, শতবার্ষিকী সংস্করণ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৮৬)

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবানন্দের এই উক্তি প্রথম সংস্করণে ও পরবর্তী সংস্করণে বাদ যায়।

আর এক জায়গায় বঙ্গদর্শনে ছিল

'···জয় পরাজয় নাই, শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজ সেনা "hurrah" বলিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া শত শত বৈষ্ণব দলিত করিতেছে··· (আনন্দমঠ আদিপর্ব, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৮৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণে এর বদলে লেখা হয়

"...জয় পরাজয় নাই, সব শত শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজ সেনা 'হুররে' বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া শত শত সন্তান দলিত করিতেছে"...(আনন্দমঠ, ১ম সং, সাক্ষরতা, পৃ ৮১)

এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদে বঙ্গদর্শনে ছিল

...'বিষ্ণু মণ্ডপ শূন্য হইল।' (আনন্দমঠ, আদিপর্ব, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ ১১৩)

এখানে প্রথম সংস্করণে লেখা হয় : 'বিষ্ণু মণ্ডপ জন শূন্য হইল' (আনন্দমঠ, ১ম সং, সাক্ষরতা, পৃ ১০৪)

এই সব পরিবর্তন থেকে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের রোষ থেকে রেহাই পাবার জন্য অসংখ্য জায়গায় 'গোরা', 'লালমুখ', 'ব্রিটিশ' এবং 'ইংরেজে'র বদলে 'মুসলমান', 'নেড়ে', 'যবন', 'বিধর্মী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া আনন্দমঠের কাহিনীর ভিত্তি যে সম-সাময়িক কোনো ঘটনা নয়, তা বোঝানোর জন্য তিনি এর তৃতীয় সংস্করণে (১৮৮৬ খৃঃ) দুটি পরিশিষ্টে Glieg's Memoirs of the life of Warran Hestings এবং Hunter's Annals of Rural Bengal বই থেকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ 'ঐতিহাসিক পরিচয়' দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'র (১৮৮৪) বিজ্ঞাপনে লেখেন 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে পর অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে। কিন্তু পাঠককে সেকথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।'

এই ব্যাপক পরিবর্তনের ফলেই কি 'আনন্দমঠ' বাজেয়াপ্ত হয়নি ? প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সমালোচক বিমানবিহারী মজুমদার সে কথাই বলেছেন

"The changes introduced by Bankim Chandra served their purpose. The book was not proscribed and the English officers were pacified. Their attitude towards it may be illustrated from the writings of Lovett and Ronaldsay".[১২]

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজদের রোষ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আনন্দমঠে এত কিছু পরিবর্তন করলেন, কিন্তু এসব সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিপথ থেকে বইটি সরে গেল না।

সেকথা ইংরেজ গভর্নর রোনাল্ডশে কবুল করেছেন তাঁর 'দি হার্ট অব্ আর্যাবর্ত বইয়ে :**"It was a curious irony of fate, surely, that it should have been upon this very book that revolutionaries should have drawn so deeply for inspiration'.[১৩]**

এর কারণ কি ? একজন ইংরেজ রাজপুরুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হয়নি। সে যুগের দেশপ্রেমিক তরুণদের কাছে তো 'আনন্দমঠ' স্বাধীনতার জীবনবেদ। এত পরিবর্তন সত্ত্বেও আনন্দমঠ আনন্দমঠই থেকে গেছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-প্রাবন্ধিক বিমানবিহারী মজুমদারের ভাষায়

"But a tree is known by the effect it produced not on the mind of a few Englishmen but on that of the thousands of Bankim Chandra's fellow countrymen".[১৪]

বইটির প্রভাব সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের মন্তব্য :

'ইতিহাস ছাড়াও অন্য নানা কারণে 'আনন্দমঠে'র প্রসিদ্ধি। এই উপন্যাস ও ইহার অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বদেশ ও বিদেশে যত আলোচনা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন রচনা লইয়া তত আলোচনা হয় নাই। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষে যে স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা দেশের অপামর সাধারণকে চঞ্চল এবং শাসক সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল ; সরকারি ও বেসরকারি সকল সমালোচক, সন্তান বিদ্রোহের সহিত তাহার যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করিয়াছেন ; এই কারণে 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরমে'র কম দুর্গতি হয় নাই। ক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায় এই পুস্তকে ইসলাম বিরোধিতা এবং উক্ত সঙ্গীতে পৌত্তলিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়াছেন, এই আন্দোলনের শেষ এখনও হয় নাই।'

আনন্দমঠ নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়নি। কিন্তু সরকার নানাভাবে আনন্দমঠের প্রচার বন্ধে সচেষ্ট ছিলেন। একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছেন, সরকার তল্লাসীর সময় যেখানে আনন্দমঠ পেয়েছেন, নিয়ে গেছেন।[১৫]

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখক তাঁর বইয়ে লিখেছেন : 'বইখানি (নীলদর্পণ) নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় স্থান না পেলেও সবরকমে এর প্রচার বন্ধ হয়েছিল। সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ির তল্লাসীতে বইখানি পেলেই পুলিশ নিয়ে যেত, যেমন হয়েছিল গীতা, আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থের দুরবস্থা।'[১৬]

আনন্দমঠ ও বঙ্কিমচন্দ্র যে সরকারের বিষনজরে ছিলেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেও তা জানা যায়। পুলিশ কমিশনার ২২-৭-১৯২২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' সম্পর্কে একটি রিভিউ আন্ডার সেক্রেটারি এইচ এম ভিতচ আই সি এসকে লেখেন। এই রিভিউর উপসংহারে আনন্দমঠ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে

"In this connection it is necessary to bear in mind that the author of the book is also author of 'Ananda Math' and similar other publications which have played so important a part in the dying (let us hope) mischievous movement of Bengal",*[১৭]

পদস্থ আমলা হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র সরকারি চাকুরিকে সব সময় দাসত্ব বলেই মনে করেছেন। এ সম্পর্কে কবি নবীনচন্দ্রকে তিনি যা বলেছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় তা লিখে গেছেন :'পরদিন প্রাতে আমি বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচার প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন,— 'বটে। বঙ্গদর্শন বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু কি করিব ? আমি একে ত দাসত্বভাবে পীড়িত ; তাহার উপর স্বাস্থ্যের ও পরিশ্রম শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং 'বঙ্গদর্শনের' প্রায় তিন মাস লিখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল।'[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরি জীবনে নানা উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু দেখা যায়, আনন্দমঠ প্রকাশের পরে তাঁর প্রশংসায় কেবল ভাঁটা পড়েনি, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কটূক্তিও করা হয়েছে। ১৮৮৩-৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় ছিলেন। ওই বছরের বর্ধমান ডিভিসনের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে কালেক্টরের মন্তব্য **Requires looking after in order to keep him upto mark.**

ওই সময়েই কমিশনারের মন্তব্য **I do not agree with the collector. Is a clever and experienced officer, though at times a little eccentric.**

আনন্দমঠে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের জন্যই কি এই বিরূপ মন্তব্য ? ১৮৮৬-৮৭ সালের বর্ধমান ডিভিসনের কালেক্টরের মন্তব্যটি আরও কড়া

'An average officer; might take more interest in his official work'.

১৮৮৭-৮৮ সালে বর্ধমান ডিভিসনাল কমিশনার **Mr. Alexander** লিখেছেন : **'did not do his judicial work well. Is a fairly good officer.'**

১৮৯০ সালে ২৪ পরগনার সেসন জজ গ্যারেট তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : **'The officer tries his cases very carefully, his Judgements are sometimes rather verlose and he occasionally, takes some what extraordinary views in cases...'**

তবু বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ ৩৩ বছরের (১৮৫৮-৯১) কর্মজীবনে মাত্র ৩/৪ বারই তাঁর সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্যারেকটার বুকে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। হয়তো তার কারণ তার ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং সাহিত্যকর্ম। সারা ক্যারেকটার বুক জুড়ে তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাই পাই। তাঁর অবসর গ্রহণের সময় কালেক্টর লেখেন

'I have the highest opinion of him and regard his retirement as a public misfortune'.

যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর 'ক্যারেকটার বুকে' তাঁর উর্ধ্বতন আমলাদের ভূয়সী প্রশংসা, যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর গ্রহণে বলা হয়েছে, 'পাবলিক মিসফরচুন'—সেই বঙ্কিম সরকারি চাকুরিকে কেন বারবার ধিক্কার দিয়েছেন, বলেছেন 'দাসত্ব' ? দেশপ্রেমিক বঙ্কিম ও রাজপুরুষ বঙ্কিমের মধ্যে সংঘাতই সারা জীবন বঙ্কিমকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। যে বঙ্কিমের আদর্শ দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা,বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, যে বঙ্কিম চেয়েছিলেন, তাঁর দেশ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক সুমহান জাতিতে পরিণত হোক, সেই বঙ্কিমকে রুজি-রোজগারের জন্য ইংরেজের দাসত্ব করতে হয়েছে। তিনি যতই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রাজপুরুষ হোন না কেন, তিনি কখনও এজন্য শ্লাঘা করেননি। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ভোলেননি যে, এ চাকরি ইংরেজের দাসত্ব। তাঁর উক্তি বা কথায় কোথাও তিনি তাঁর এই উচ্চমর্যাদার চাকুরির জন্য বিন্দুমাত্র গর্বপ্রকাশ করেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল রাজশক্তির সঙ্গে উৎপীড়িত প্রজাশক্তির সংঘর্ষ দেখানো। রাজশক্তি হল ইংরাজ ও মুসলমান শক্তি। উৎপীড়িত প্রজার প্রতিনিধিত্ব করছিল হিন্দু সন্ন্যাসী সন্তান দল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আনন্দমঠের আদিরূপে অর্থাৎ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রূপে (তৎসহ প্রথম সংস্করণে) ইংরাজ ও মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সমভাবে কঠোর আক্রমণ করেছেন। পরে যখন সরকারি কর্মচারী হিসাবে ইংরেজ শক্তিকে আক্রমণের বিপজ্জনকতা বুঝলেন, তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্যকে তিনি বহুলাংশে কমিয়ে দিলেন বা বদলে দিলেন। তার ফলে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে তিক্ত মন্তব্য ভারসাম্যহীনভাবে প্রকট হয়ে রইল। কোন সন্দেহ না রেখে বলা যায়, বঙ্কিম মানসিকতায় ইংরাজ শক্তি ও মুসলমান শক্তি উভয়েই উৎপীড়ক, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি আপস করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ উঠবার সুযোগ ঘটেছে। একটি জিনিস বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই সংগ্রাম হিন্দু ও মুসলমানের নয়। উৎপীড়ক রাজশক্তির সঙ্গে উৎপীড়িত প্রজাশক্তির সংগ্রাম। তবে যেহেতু উৎপীড়ক মুসলমান রাজশক্তি ধর্মের নামে অত্যাচার করছিল, সেই কারণে উৎপীড়ক হিন্দু প্রজাশক্তি ধর্মের নামেই প্রতিরোধ সংগ্রাম করছিল। এটি স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা ছাড়া কিছু নয়।

দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী ইংরাজ শাসকদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন কত কঠোর ছিল, তা আনন্দমঠের পূর্বে প্রকাশিত চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কয়েকটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়।

আনন্দমঠ ছাড়া বঙ্কিমের একাধিক রচনায় ইংরাজ চরিত্র আছে। আনন্দমঠের ক্যাপ্টেন টমাসের বিষয়ে আগেই বলেছি। এই উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে মেজর এর্ডওয়ার্ডস ও মেজর লিন্ডলের কথা আছে। আর সাধারণভাবে ইংরেজের কথা এই উপন্যাসের অনেক স্থলেই আছে। যেমন, 'ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে।' (৪র্থ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)

ইংরাজ প্রশাসকরা বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনার পুরো সংবাদ নিশ্চয় রাখতেন না। নচেৎ দেখতে পেতেন—আনন্দমঠের পূর্বেকার একাধিক উপন্যাসে ইংরাজ চরিত্রের গুণাবলীর সঙ্গে দোষের বিরুদ্ধে বহু তীব্র মন্তব্য করা হয়েছে। চন্দ্রশেখরের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে ; '...যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।' এ জন্যই তো প্রতাপ বাংলা থেকে ইংরেজের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। আর আছে চন্দ্রশেখরের লরেন্স চরিত্র। এখানে তিনি এক কামুক ও লম্পট ইংরেজের ছবি এঁকেছেন। চন্দ্রশেখর ১৮৭৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার আগেই এটি বঙ্গদর্শনে বের হয়। চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় খণ্ড ও সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে গলস্টন ও জনসন। এর পঞ্চম খণ্ড ও প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরিচ্ছেদে রয়েছে আমিয়টের চরিত্র। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কথা। তবে এই ঐতিহাসিক চরিত্রটি তিনি সরাসরি কাহিনীতে আনেননি। অন্যের মুখে তাঁর কাজ ও কথার উল্লেখ আছে।

দেবী চৌধুরাণীতেও ইংরেজ চরিত্র আছে। এটিও আনন্দমঠের আগেই বই হিসাবে বের হয়, এপ্রিল, ১৮৮০। তবে বঙ্গদর্শনে এটি আনন্দমঠের পর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দেবী চৌধুরাণীর দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদে আছে গুডল্যাড সাহেব।

তিনটি উপন্যাসে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আছে। আনন্দমঠে চতুর্থ খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, চন্দ্রশেখরের ষষ্ঠ খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং দেবী চৌধুরাণীর পঞ্চম খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের ছবি আছে। আনন্দমঠে সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় ঘটে। দেবী চৌধুরাণীতে ইংরেজদের হার হয়েছে। তবে চন্দ্রশেখরে মীরকাসেমের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ সেনার জয় হয়েছে। শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমিক প্রতাপের আত্মবলিদানের জন্যই যেন এই যুদ্ধ। মুসলমানরা যেখানে কাপুরুষের মত পালাচ্ছে। একমাত্র প্রতাপই সেখানে আমৃত্যু শৌর্য ও বীর্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। পলাশীর যুদ্ধে মীরমদনের মতই।

বঙ্কিমের আঁকা ইংরেজ চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদিও ইংরেজের অনেক প্রশংসা আছে তাঁর একাধিক উপন্যাসে, কিন্তু একটিও উজ্জ্বল ইংরেজ চরিত্র নেই। চন্দ্রশেখরের লরেন্স ফস্টার তো একজন লম্পট। তাঁর সম্পর্কে প্রতাপের সিদ্ধান্ত 'ফস্টারকে এবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া এবার অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে---গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাংলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফস্টার আছে। (চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

চন্দ্রশেখরে ওয়ারেন হেস্টিংসের সুখ্যাতি থাকিলেও তিনি ঠিক উপন্যাসের চরিত্র নন। তার কথা লেখক অন্য চরিত্রের মাধ্যমে ও নিজে একাধিক বার বলেছেন। তাঁর কথায় ওয়ারেন হেস্টিংস 'দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ' ছিলেন। (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ খণ্ড)

দেবী চৌধুরাণীর গুডল্যাড সাহেব ও লেঃ ব্রেনাম ঐতিহাসিক নাম। ফস্টার বা টমাসের মত কল্পিত নয়। লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে সিপাহী সৈন্যরা বন্দুক নিয়েও দেবীর লাঠিধারী বরকন্দাজদের কাছে হেরে গেল। দেবী চৌধুরাণীর উপস্থিত বুদ্ধি ও রণকৌশল ইংরেজ লেফ্টেনান্টের চেয়ে কত উন্নত, উপন্যাসে তাই দেখানো হয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত তিনটি উপন্যাসেই ইংরেজের অনেক প্রশংসা থাকলেও বঙ্কিম একটিও বলিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও শ্রদ্ধেয় ইংরেজ চরিত্র আঁকেননি।

॥ ৬ ॥

সরকারি কোপে বন্দেমাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি তাঁর মৃত্যুর পর, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, গুরুত্ব পায় এবং ওই সময়েই রাজরোষে পড়ে। বন্দেমাতরম সঙ্গীতই শুধু নয়, এই ধ্বনিও সরকারি কোপে পড়েছিল। বিভিন্ন সময়ে সরকারি সার্কুলার জারী করে এই সঙ্গীত ও ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়। এই বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও ধ্বনি, সামগ্রিকভাবে আনন্দমঠ উপন্যাস, আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে। এই অনন্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতটি শতবর্ষেরও আগে রচিত—১৮৭৫-য়। এবং ১৮৮২ সালে প্রকাশিত আনন্দমঠ উপন্যাসে প্রথম সন্নিবেশিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও ধ্বনি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার উল্লেখ করেছেন "শাসকগণ আমাদের দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করায় আমরা যখন জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রাম করি, সেই সংগ্রামের সময় ইহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে প্রচলিত হয়। পরবর্তী সময়ে বন্দেমাতরম্ যখন জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়, তখন ইহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য আমাদের বহু বিশিষ্ট বন্ধু যে আত্মত্যাগ করিয়াছে, তাহা ভুলিতে পারি না।"[১৯]এই সঙ্গীতটি সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য

"১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্দেমাতরম্ ছিল ভারতের দেশপ্রেমিক সন্তানদের রণধ্বনি এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে শত শত দেশপ্রেমিক ব্রিটিশ পুলিশের লাঠির আঘাতে প্রাণ দিয়েছে এবং ফাঁসির মঞ্চে উঠেছে।"[২০]

সিডিসন রিপোর্টের ৯৪ পাতায় আছে তখন দেশের গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থাগুলিকে যেসব শপথ নিতে হত, তাতেও এই বন্দেমাতরম শব্দ ব্যবহার হত। ঢাকা অনুশীলন সমিতির 'ওম বন্দেমাতরম' দিয়ে শপথ শুরু হত।

এই বঙ্গভঙ্গের যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি যেন মৃত্যু ঘণ্টা হয়ে উঠেছিল। এই ধ্বনি বন্ধ করার জন্য তারা জুলুম চালিয়ে যায় ; একের পর এক নির্দেশ, সার্কুলার জারি করে। ১৯০৫ সালের ১০ই অক্টোবর চীফ সেক্রেটারি আর ডবলু কালাইল এক গোপন সার্কুলার জারি করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেন। ওই সার্কুলারে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে,কোনো ছাত্র স্বদেশী সভায় যোগ দিলে বা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিলে তাকে স্কুল থেকে বিতাড়ন করা হবে। এই অন্যায় সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অ্যান্টি সার্কুলার সমিতি গঠিত হয়। ওই বছরই ৮ নভেম্বর পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারি লায়ন ঢাকা বিভাগের কমিশনারের কাছে দু'টি সার্কুলার পাঠালেন। তাতে পথে বা প্রকাশ্যে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া, দলবদ্ধভাবে বন্দেমাতরম সঙ্গীত করা নিষিদ্ধ হল। এই বন্দেমাতরম সার্কুলার সম্পর্কে অমলেশ ত্রিপাটি লিখেছেন 'বাংলা সরকারের অস্থায়ী চীফ সেক্রেটারি আর ডি কালাইল ১৯০৫ সালের ১০ অক্টোবর ১৬৭৯ নং সার্কুলার জারি করেন। তার উপর ভিত্তি করে জেলা শাসকরা মফঃস্বলের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধানদের উপর বিশেষ সার্কুলার জারি করেন। তাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয় এবং এই আদেশ অমান্য করলে 'গ্র্যান্ট' বাতিল করার, এমনকি বিদ্যালয় বা কলেজের অনুমোদন ও বাতিলের হুমকি দেওয়া হয়। যেসব কলেজের ছেলে ১৯০৫ সালের ৩ অক্টোবর বয়কট আন্দোলনে যোগ দেন, ডি পি আই আলেকজান্ডার পেডলার তাদের কলেজ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানান। (পত্র) নং টি ২৯২, তাং ২১ অক্টোবর, ১৯০৫)। ১৯০৫ সালের ৮ নভেম্বর নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারি পি সি লায়ন শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বন্দেমাতরম্ সার্কুলার জারি করেন। বন্দেমাতরম সার্কুলারে ঢাকা ডিভিসনে প্রকাশ্যে বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।[২১] (অনূদিত)

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল 'বন্দেমাতরম' নামে একটি সম্মেলন আহূত হয়। তার বিরাট প্রস্তুতি দেখে কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়েন। বরিশালের জেলাশাসক এমার্সন সভায় মিছিলে 'বন্দেমাতরম' গান ও ধ্বনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এমন কি শাসকগোষ্ঠী এমনই বন্দেমাতরম আতঙ্কে ছিল 'বন্দেমাতরম উত্তরীয়' পরিধানও নিষিদ্ধ হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম' লেখা পাড়ের ধুতি পড়লেও পুলিশ জুলুম হয়েছে। আর বলাই বাহুল্য, বন্দেমাতরম রেকর্ড নিষিদ্ধ হয়। বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়ায় রংপুর জেলার প্রায় ২০০ ছাত্রের জরিমানা হয়। ১৯০৫ সালের নভেম্বরে ঢাকায় এক স্কুলের ছাত্রদের লিখতে বলা হয় : 'বন্দেমাতরম বলা মূর্খের কাজ'। হেডমাস্টার মশাইকে ভয় দেখানো হয় যে, তা না হলে স্কুলের গ্রান্ট বন্ধ হবে। কলকাতায় শ্যামপুকুর এলাকায় কিছু ছেলে বন্দেমাতরম ধ্বনি করায় তাদের অভিভাবকদের পর্যন্ত মারধর করা হয়। বন্দেমাতরম ধ্বনি সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন মিছিলও নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে জলপাইগুড়ির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ওই আদেশ দেন।

বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বাখেরগঞ্জে মেয়েরা চুলবাঁধা বন্ধ করেন।[২২]

বরিশালে একটি বাড়ির গায়ে 'বন্দেমাতরম' লেখা ছিল বলে বাড়িটি ভেঙে ধূলিসাৎ করা হয়। বাড়ির রান্নাঘরে বন্দেমাতরম ধ্বনি করার জন্য ১০/১২ বছরের একটি ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে ত্রিভূজাকৃতি কাঠের ফ্রেমে তার হাত পা বেঁধে তাকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়।

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার হুকুম জারি করে প্রকাশ্য স্থানে বন্দেমাতরম ধ্বনি, সভা সমিতি নিষিদ্ধ করেন। কোন ছাত্র বা যে কেউ বন্দেমাতরম ধ্বনি দিলে তাকে সাধারণ কয়েদীর মত গ্রেফতার করা হত। ফুলারের বশংবদ বরিশালের পুলিশ সুপার কেম্প-সাহেব বন্দেমাতরমের জন্য যে উৎপীড়ন চালিয়েছিলেন, তার নজির মেলা ভার। এ সম্পর্কে সমকালীন এক সাংবাদিক লিখেছেন, 'স্যার বাম্‌ফিলড ফুলারের আদেশে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশবাসীগণ প্রকাশ্যস্থানে জননীর নামোচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।' [২৩]

বরিশাল সম্মেলনে বন্দেমাতরম ধ্বনি করায় কেম্প-এর নেতৃত্বে যে পুলিশী তাণ্ডব চলে সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

"...কেম্প সাহেব অগ্রসর হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিনিধিগণের গমনে বাধা দিল। এবং শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর বক্ষ হইতে 'বন্দেমাতরম' উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। শচীন্দ্রপ্রসাদ বন্দেমাতরম উত্তরীয় ত্যাগ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া হস্তদ্বারা বক্ষ আবরণ করিলেন, অমনি কেম্প সাহেব শচীন্দ্র প্রসাদকে ঘুঁসি মারিল। পুলিশের বড় সাহেব যখন সর্বাগ্রে এই পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করিল তখন তাহার অনুচরগণ সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বিলম্ব করিল না। কেম্প সাহেব শচীন্দ্রপ্রসাদকে প্রহার করিবার পর সুবেদার বাবুরাম সিং 'সালা লোককো মারো হুকুম হুয়া'—এই বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল, অমনি কনেস্টেবলদিগের দীর্ঘ বংশ যষ্টি প্রতিনিধিদিগের উপর পতিত হইল। সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করিবার মত ভাষা সম্পদ আমাদের নাই। আত্মরক্ষার জন্য যাহাদের হস্তে কিছুই ছিল না; এমন কতকগুলি নিরাশ্রয় যুবককে পিচাশের দল অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিল। পুলিশের আসুরিক অত্যাচার আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিনিধিগণ সকলে নীরব ছিলেন। কিন্তু যখন পুলিশ মাতৃভক্ত সন্তানদিগকে বিনা কারণে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যখন সন্তানের রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিতা হইলেন, তখন চর্তুদিক হইতে ভীমনাদে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

য়্যান্টি সার্কুলার সমিতির সভ্যগণ প্রহার সহ্য করিয়াও কেহ পলায়ন করিলেন না—পিচাশের দল আরও উন্মত্ত হইল—অধিকতর বেগে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে প্রহার করিতে করিতে কয়েকজনকে রাজপথে পশ্চিমপার্শ্বস্থ রাস্তার নর্দমায় ফেলিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন যখন জলের মধ্যে দণ্ডায়মান তখনও পুলিশ তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। পুলিশ প্রহার করিতেছে আর চিত্তরঞ্জন জল মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া উর্ধ্বমুখে গাহিতেছেন 'বন্দেমাতরম'। চিত্তরঞ্জন নিজে বলিয়াছে—'অবশেষে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল, আমি জগৎ শূন্যময় দেখিলাম, মনে হইল বুঝি আর এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।" সাংবাদিক প্রিয়নাথ গুহ ওই বিবরণ লিখেছেন তাঁর 'যজ্ঞভঙ্গ' বইয়ে।

একটি সঙ্গীত বা ধ্বনির প্রতি এই ধরনের আক্রোশের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও মিলবে না। পরে প্রধান প্রশাসক পর্যন্ত এই ধরনের উন্মত্ত ক্রোধের অযৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন

"It would have been better if the peaceful procession and meeting were left alone. Surendranath Banerjee deliberately—wooed arrest, and he was helped succeed by police...since the action of the local authorities had not been entirely legal, it caused additional concern to the Governor General...As for the arrest of Surendranath Banerjee, the interference with the procession, its legality was not clear. Further more, declaring the slogan of Bande Mataram illegal was a misconstruction of Law."[২৪]

এই মন্তব্য আর কারো নয়, স্বয়ং বড়লাট মিন্টোর। বন্দেমাতরমের প্রচার বন্ধের জন্য সরকার যতই তৎপর ও সতর্ক হোন না কেন বাস্তবে দেখা গেছে দিন দিন তার প্রভাব ও প্রচার বেড়েই গেছে। পুলিশের নির্যাতন বন্দেমাতরমের জনপ্রিয়তাই বৃদ্ধি করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এখানে উল্লেখ্য, সরকারি কোপ ছাড়া বেসরকারি রোষও এই সঙ্গীতের উপর পড়েছে। বহু মুসলিম সংস্থা (মুসলিম লিগ সহ) এবং মুসলিম নেতা এই সঙ্গীতটি সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন পৌত্তলিকতার ধুয়া তুলে। পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের অনুষ্ঠানে ও আইনসভায় এই অজুহাতে বন্দেমাতরম গান গাওয়ার বিরুদ্ধে গোঁড়া মুসলমানদের তরফে আপত্তি করা হয়। ১৮৯৬ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনেও বন্দেমাতরম গান গাওয়া হত। পরে বন্দেমাতরমের শেষাংশ গাওয়া নিষিদ্ধ হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে বলে। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে এক প্রস্তাবও নেন ১৯৩৭ সালে। বিস্ময়ের কথা, যাঁরা পরবর্তীকালে বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ, যেমন মৌলনা আক্রম খাঁ, একদা বন্দেমাতরম সঙ্গীতের পরম ভক্ত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাট্যরূপের উপর সরকারী রোষ

ঔপন্যাসিক হিসেবেই বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি। তিনি দেশের অগ্রণী প্রাবন্ধিক। কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু একটিও নাটক লেখেননি। তবু বঙ্গরঙ্গমঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অশেষ ঋণী। তাঁর জনপ্রিয়তার পিছনে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ভূমিকা সবিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব ক'টি উপন্যাস বছরের পর বছর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালের মধ্যেই তাঁর উপন্যাস দৃশ্যায়িত হয়ে অভিনীত হয়েছে। কলকাতার বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩ সালে ডিসেম্বরে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে অশ্বপৃষ্ঠে জগৎসিংহের ভূমিকায় অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষের আগমন সেদিন দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৪ সালের ৭ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরূপ কপালকুণ্ডলা প্রথম অভিনীত হয়। ওই বছরেরই ২১ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমের আর একটি উপন্যাস মৃণালিনী অভিনীত হয়। এরও নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রের। ১৮৭৫ গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে বিষবৃক্ষের অভিনয় হয়। ১৮৭৭ সালে বেঙ্গল থিয়েটার পর পর বঙ্কিমের তিনটি উপন্যাস মঞ্চস্থ করেন—মৃণালিনী ১৬ এপ্রিল, কপালকুণ্ডলা ১৮ এপ্রিল, দুর্গেশনন্দিনী ২১ এপ্রিল। ১৮৭৮ সালে আবার বেঙ্গল থিয়েটারে (৮ জুন) ও ন্যাশানালে (২২ জুন) দুর্গেশনন্দিনী মঞ্চস্থ হয়। ১৮৮১ সালের ৩০ মার্চ আবার কলকাতার মঞ্চে মৃণালিনী অভিনীত হয়। এবার পশুপতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র। বঙ্কিমের জীবদ্দশায় ন্যাশনাল থিয়েটারে আনন্দমঠ মঞ্চস্থ হয়। এই অভিনয় বঙ্কিমন্দ্রের ভাল লাগেনি। দেবী চৌধুরাণীর অভিনয়ও তিনি দেখেছিলেন। এটিও তাঁর ভাল লাগেনি। ১৮৯২-এ এমারল্ড থিয়েটারে কৃষ্ণকান্তের উইল মঞ্চস্থ হয় ডিসেম্বরে। এমারেল্ডে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলাও অভিনীত হয়।

বঙ্কিমের মৃত্যুর পরও কলকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন স্থানে তাঁর উপন্যাস মঞ্চস্থ হয়েছে।

বঙ্কিমের জীবৎকাল থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাস মঞ্চস্থ হয়ে আসলেও ১৯১৪-১৫ সালের আগে এইসব অভিনয়ের বিরুদ্ধে কেউ কোন আপত্তি তোলেননি। অন্তত সরকারি নথিতে সেরকম আপত্তির বিষয়ে তথ্য আমরা পাইনি। উল্লিখিত কালে বঙ্কিমের একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়। কোথাও আবার অনেক পরিবর্তনের পর অভিনয়ের অনুমতি মেলে। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ের সময় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। মৃণালিনী নিয়েও আপত্তি ওঠে। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে এর সাক্ষ্য মেলে। আর সাক্ষী আছে সমসাময়িক পত্র পত্রিকাগুলো। তখন কলকাতার দুটি বিখ্যাত থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নিয়মিত অভিনীত হত। দুটি নাট্যরূপ সম্পর্কেই আপত্তি উঠেছিল। একটি অমৃতলাল বসুর করা, অভিনীত হত স্টারে, অন্যটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের করা, অভিনীত হত মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯১৩ সালের ১ জানুয়ারি পুলিশ কমিশনার স্বরাষ্ট্র দফতরে যে চিঠি (ডি ও নং ৫০২ সি, ১৬-১-১৯১৯) লেখেন, তা থেকে ওই তথ্য পাওয়া যায়।[২৫]

১৯১০ সালের ৭ই মে মিনার্ভা থিয়েটার চন্দ্রশেখরের নাটকের যে পাণ্ডুলিপি সরকারি দফতরে পাঠান, তার আপত্তিকর অংশগুলি সরকারি ফাইলের নোটে আছে। তার কিছু কিছু অংশ এই :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Act 1 scene 1 Page-8.
Saibalini, bathing in the bank in her native village and Foster watching her from a grove.

Saibalini (soliloquiring):
Ha! Ha! Ha! (Laughs) why shall I glea...

Sings...the two blue eyes...

Page 21. Nabab Mirkassim and Dalani Begum.

Nabab: I have no other alteration but to fight the English...

Page 42.

Ratan: Many daughters of Hindus and Mahommedan have thus been carried away by the Sahebs of the Factory.

Page 45

Saibalini soliloquiring while runing away with Faster. 'I am now in the hands of the Firinghes...again'.

নোটে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, চন্দ্রশেখর নাটকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মীদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা হয়েছে।

'Vilifies the conduct of the servants of the East India Company. 'English' used here in a general sense.'[২৬]

১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি পুলিশ কমিশনার আন্ডার সেক্রেটারির (স্বরাষ্ট্র বিভাগ) চিঠি থেকে জানা যায়, মিনার্ভা-কর্তৃপক্ষ চন্দ্রশেখরের কাহিনীতে পরিবর্তন করেন। এতৎসত্ত্বেও ১৯১৩ সালের ২৮ জানুয়ারির আদেশে অভিনয় বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়

Notification

No 710 p. The 28th January 1913.

whereas the Governors in council is of opinion that a play in the Bengali Languages entitled 'Chandra Shekhar', written by Amritalal Bose, is of the nature described in Sec. 3(b) of the Dramatic Performance Act 1876 (XIX of 1876), in as much as established by the British India.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sec. 3 of the said Act, the Governor of council hereby prohibits the performance of the said play'

C.J. Stevensons More
Chief Secy. to the Govt.
of Bengal[২৭]

কলকাতার সাহেবী কাগজগুলি চন্দ্রশেখর অভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। সরকার তাতেই প্রভাবিত হয়। সমকালীন সংবাদপত্র থেকে তেমন সংবাদ কিছু কিছু উদ্ধার করা গেছে। স্টারে চন্দ্রশেখরের অভিনয়ের বিরুদ্ধে ১৯১২ সালের আগস্টের ইংলিশম্যানের তীব্র আপত্তি এই :

"......It will be remembered that a feature of the story is the kidnapping of a Hindu girl by Laurence Foster, an indigo planter, and on a representation being made to the Mughal Emperor he is arrested and condemned to death. There are also three officers of the East India Company in the cast. The effort to make these officers as ludicrous as possible in dress, arrogance and imperiousness was certainly highly exaggerated but the object was to create amusement, and in this the actors succeeded."

ইংলিশম্যানের এমন মন্তব্যের পরে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। গোয়েন্দা সূত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষ চন্দ্রশেখর সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং পদস্থ আমলাদের গোচরে তা আনা হয়। পুলিশ কমিশনারের অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের ফাইলের একটি নোট তাৎপর্যপূর্ণ—[২৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"Sl. 1. From Commissioner of Police, Calcutta
D.O. No. 502-C, dated 16-1-1913.
Sl. 2. D/O 586 of 18-1-13 from Commissioner of Police. On receipt of the alone (Sl. 1) the case was re-examined more closely and it has been ascertained un-officially (by personal reference to the Calcutta S.B) that there are two different versions of the play Chandra Shekhar being performed in Calcutta.

(1) dramatised by Amritalal Bose and being performed at Star Theatre and (2) dramatised by Girish Ch. Ghose and being performed at Minerva theatre.

No where in his various letters has the commiossioner of Police made this point and it was naturally presumed that only the one version that Government was cognisant of, was being performed at both places of amusement.

Girish Chandra Ghose has now forwarded and submitted and amended version which has been passed by the Commissioner of Police as suitable for public performance. No action is therefore necessary with regard to this and then amended draft below may issue.

The manager of the Star Theatre seems, however, to be still obdurate: he has been continually trying to dodge the Commissioner of Police with spacious promises and unnecessary delays. At a conference held in May 1912, he agreed to expunge certain objectionable passages (which was printed out by commissioner from the play) but in spite of this he repeatedly staged it in the unexpurgated form. In August last the matter was again brought to the Manager's notice, but upto date he has not furnished the necessary undertaking required by the Commissioner of Police, in terms of the Govt. standing order on the subject. Both Chief Secretary and H. M. have already agreed as to the necessity for prohibiting the performance of this version of Chandra Shekhar under sec 3 of the Dramatic Performance Act, and their orders at p 5 and may now be given effect to?"

এই নোটের পর ফাইলে ১৯-১-৮০ তারিখের নোটে আছে :

"decided to proscribe,'

'Orders may therefore be carried out'.

(স্বাক্ষর দুর্বোধ। সম্ভবত আণ্ডার সেক্রেটারির)

চন্দ্রশেখরের অভিনয় নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে আইনজ্ঞের অভিমতও নেওয়া হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের ফাইলে (File No. 122 of 1912) সে তথ্য আছে। বাংলা সরকারের আইন বিশারদ এই নাটকটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত দেন। তৎকালীন রিমামব্রান্স অব্ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বি বি নিউবোলড ১৯১২ সালের ৮ মে চীফ সেক্রেটারিকে লেখেন

"... in reply I have the honour to state that in my opinion the performance of the play should be prohibited under the Dramatic Performance Act XIX of 1876 as it is likely to incite feelings of disaffection to the Govt. established by law in British India.

The Indian Press Act I of 1910 does not empower the local Government to 'proscribe' any book."

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, যে চন্দ্রশেখর ৩০ বছরের বেশি সময় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয়ে আসছে এতকাল পর সরকার তা আপত্তিকর মনে করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশা থেকেই এটি বাংলার রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়। চন্দ্রশেখরের অভিনয় নিষিদ্ধ হবার পর দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতার শিক্ষিত সমাজ সরব হয়ে উঠেন। সম-সাময়িক বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিবাদে মুখর হয় ।বেঙ্গলি, ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় নিবন্ধও লেখা হয় । এখানে তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল । ১৯১৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকায় এই মর্মে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয় :

"প্রখ্যাত লেখক স্বর্গত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে এই নাটকটি লিখিত । বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্নাতীত আনুগত্যের একজন দক্ষ সরকারী কর্মচারীই শুধু ছিলেন না, পরন্তু সরকারের কাছ থেকে ডবল সম্মানে ভূষিত, রায়বাহাদুর এবং সি আই ই । তাছাড়া দুজন শিক্ষিত ভারতীয় কর্তৃক এটি অনূদিত । তাঁদেরও আনুগত্য প্রশ্নাতীত । বহু ভারতীয় ও ইংরেজ কর্তৃক এটি প্রশংসিত ও পঠিত । অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে এই নাটকটি যে দেখেছেন, তাও আমাদের জানা উচিত । এর উচ্চ শিল্প গুণসম্পন্ন ও প্রশংসিত অভিনয় সম্পর্কেই কেবল মন্তব্যটি করা হয়েছে । ক্ষমতার এমনই বেপরোয়া প্রয়োগ যে, বিশ বছর পরও কলমের এক খোঁচায় এই নাটকটি বাজেয়াপ্ত করা হল এই বলে যে এতে সরকারের বিরুদ্ধে 'অসন্তোষ' জাগিয়ে তোলা হচ্ছে । ডিমোক্রাসের তরবারির কাছে জনগণ সর্বদা কত অসহায়, সেই গুরুতর বিপদেরই এটা একটা অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত । আমরা এখানে সিডিশন আইনের কথাই বলছি ।"

এর আগে 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় ৩০শে জানুয়ারি, ১৯১৩ তারিখের 'সাপ্রেসিং দি প্লে অফ চন্দ্রশেখর' শীর্ষক এক নিবন্ধেও সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় । সেই সুদীর্ঘ নিবন্ধটির কিছু অংশের এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হল 'আমাদের কি বুঝতে হবে যে, যে নাটকটি প্রায় ২৪ বছর ধরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মঞ্চস্থ হয়ে আসছে এবং সরকার এর অভিনয়ে এতদিন কোনো হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেননি সেই নাটকের চরিত্র হঠাৎ বদল করা হয়েছে এবং এর অভিনয় করতে দেওয়া আর নিরাপদ নয় ?'

'বাস্তবিকই সরকারের বোঝা উচিত যে, এ ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা একেবারেই যুক্তিহীন ।'

'আমরা একে বলতে চাইছি 'হাস্যকর' । এ ধরনের ক্ষেত্রে অন্তত জনগণের এ অধিকার আছে যে তারা আশা করবে, সরকার প্রকাশ্যে জানাবে বা আভাস দেবে যে এই নাটকের কোন্ কোন্ অনুচ্ছেদগুলি সম্পর্কে তাদের আপত্তি, যাতে জনগণ নিজেরাই তাদের কাজ বিচার করতে পারে এবং নাটকের লেখক নিজেই, যদি সে প্রয়োজন মনে করে, আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়ে নাটকের নতুন একটা সংস্করণ বার করতে পারে । তাদের একথা জানার অধিকারও আছে যে, যেসব অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আপত্তি করা হয়েছে, সেগুলি বাদ দেবার সুযোগ মঞ্চের কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল কিনা ।'

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজেও এ সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ বের হয় । তার কিছু উদ্ধৃতি দিলাম

'এত দীর্ঘকাল পর ওই নাটকটি নিষিদ্ধ করণের কোন ব্যাখ্যা করা যায় না । এই নাটকটি পুলিশ ও জনগণের সর্বপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ । ১৯০৫ ও ১৯০৭ সালে বাংলায় আন্দোলনের সেই চরম দুর্দিনেও এই নাটকটির উপর নিষেধ আদেশ জারির কথাও ভাবা হয়নি । এখন এই প্রদেশে যখন শান্তি ফিরে এসেছে, তখন এই নাটকটি নিষিদ্ধ করাটা উদ্ভট বলেই মনে হয় ।'

'এটা আমাদের কাছে সব সময় রহস্য যে কলকাতায় কিভাবে নাটকগুলি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ হয় এবং আমরা মনে করি, যতদিন সেনসরের দায়িত্ব সি আই ডি'র অধস্তন কর্মীদের উপর ন্যস্ত থাকবে ততদিন এটা রহস্যজনকই হয়ে থাকবে ।'

ক'দিন পর এ সম্পর্কে বেঙ্গলিতে আবার নিবন্ধ বের হয় । ২রা ফেব্রুয়ারির (১৯১৩) নিবন্ধে বলা হয় : 'সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির উস্কানি দিতে পারে, এই যুক্তিতে চন্দ্রশেখরের অভিনয় নিষিদ্ধ করে কলকাতা গেজেটের গত সংখ্যায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের বৃহস্পতিবারের সংখ্যায় তার প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি । কঠোরভাবে সরকারের এই কাজের নিন্দা করা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি, যা আমাদের মনে হয় এবং অপরেরও মনে হয়েছে যে, কেবল অস্বাভাবিকই নয়, এমন কি বেআইনী ও উদ্ভটও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বাস্তবিকই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, সরকারের এই কাজে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের অনেক সমকালীন পত্রপত্রিকা আরও তীব্র ভাষায় এর সমালোচনা করেছে।'

রাজরোষ এড়ানোর জন্য চন্দ্রশেখরের কাহিনীর কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু তাতেও বাজেয়াপ্ত হওয়া এড়ানো যায়নি। সবচেয়ে উল্লেখ্য পরিবর্তন করা হয় লরেন্সের চরিত্রের। এই চরিত্রটির বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি আপত্তি উঠেছিল। নীল কুঠিয়াল ইংরেজ সন্তান লরেন্স পরিবর্তিত হয়ে হল মাদ্রাজের একজন সামরিক অফিসারের দত্তক পুত্র। যে ছিল ইংরেজ, সে হল ভারতীয়। এই ধরনের কিছু কিছু পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম 'ফিরিঙ্গী' বদলে 'কুঠিয়াল' (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য এবং অন্যত্র), 'সাহেব' শব্দের বদলে 'কুঠিয়াল' (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।

পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে এ সম্পর্কে ১৪-৫-১৯২২ তারিখের চিঠিতে চীফ সেক্রেটারিকে লিখেছেন

"...আমার অভিমত এই যে, এখন যে ভাবে এর নাট্যরূপ পেশ করা হয়েছে, তাতে এটি মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। লরেন্স ফস্টারের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বদল হয়েছে। এবং মূল চরিত্রটি এখন একজন দেশীয় বলে চিত্রিত করা হয়েছে, সে এখন মাদ্রাজের এক সামরিক অফিসারের পালিত পুত্র, যে তার শিক্ষা পেয়েছে ইংলণ্ডে।"(২৯)

এই পরিবর্তন ছাড়া চন্দ্রশেখরের নাট্যরূপের কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়াও হয়। যেমন, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—(শ্রীনাথ শিবুকে বলেছে) সাহেবরাই দেশের প্রভু। তারা যদি এভাবে পীড়ন চালায় আমাদের কোন বিকল্প নেই। কি উপায় করা যাবে?

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

(শৈবলিনী) 'আমি এখন ম্লেচ্ছদের হাতে—ফিরিঙ্গীদের সব কিছু দিয়েছি তাদের সঙ্গে ঘৃণিত জীবন কাটাচ্ছি।'

দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য (চন্দ্রশেখর)

নিষ্ঠুর ও বদমাইস ইংরেজরা কি তাকে খুন করেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

(গুরগান খান)...কে আমার কামানের মুখে দাঁড়াতে পারে। আমি একবার ইংরেজের সঙ্গে লড়তে চাই। আমি বাংলা থেকে ইংরেজের নাম মুছে দেব।

তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

(গৌলস্তান) কপাট ভেঙে ফেল...

এই নাট্যরূপটি গিরিশচন্দ্রের রচনা। এ সম্পর্কে মন্তব্যে (File No. P28 of 1912, Home (Pol.) বলা হয়েছে)

'This is asocio-historical drama, dramatised by Late Girish Ch. Ghose, the whole plot deals with situation of Bengal during the administrationof East Bengal Company, when there were several indigo factories in the country, just after the battle of Plassey and on the eve of downfall of the Mahamedan sovereignty in Bengal.

The play on the whole criticises the character and conduct of the young officers of the factories.'[৩০]

চন্দ্রশেখরের কিছু কিছু যে বাদ দেওয়া হয় এবং পরিবর্তন করা হয়, ১৯১৩ সালের ৬ই জানুয়ারি পুলিশ কমিশনার এক চিঠিতে তা আন্ডার সেক্রেটারিকে জানান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Office of the commissioner of Police
Calcutta, 16th Jan, 1913.

My dear Vitch,

I send here with an extract from the Commission's Registrar of Dramas regarding the play 'Chandra Shekhar' submitted by the manager of the Minerva Theatre on the 15th Nov. 1912.

On pages 10, 19, 20, 33, 36, 40, 41, 43, 51, 54, 55, 80, 120, 121, 123, 124, 127, 133, 148 & 151, certain objectionable portions have been expunged.

The manager of the Theatre has been informed as usual that the Commissioners of Police,Calcutta notes that the play is intended to be staged at the Minerva Theatre.

An extract from the commission's of Drama regarding the above-mentioned play together with this office File No. P-28 of 1912, has been forwarded to the intelligent Branch of C.I.D, Bengal. for information and publication in the Abstract.

your sincerely.[৩১]

এতসব পরিবর্তন সত্ত্বেও সরকার কেন অভিনয় নিষিদ্ধ করলেন ? এর কারণ সম্ভবত অভিনয়ের সময় সরকারী নির্দেশ ঠিক ঠিক মানা হচ্ছিল না। চীফ সেক্রেটারিকে লেখা পুলিশ কমিশনারের একটি চিঠি থেকে ওই তথ্য জানা যায়। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার স্যর এফ এল হ্যালিডে ১২-১১-১৯১২ তারিখে চীফ সেক্রেটারিকে ওই পত্রটি লেখেন

"মহাশয়,

আপনার 'চন্দ্রশেখর' নাটক সম্পর্কে ১৯১২ সালের ২৪ অক্টোবরের চিঠি (নং ৩৪১৪ পি ডি) সম্পর্কে সরকারের অবগতির জন্য আমি নিম্নলিখিত রিপোর্টটি পেশ করছি।

২। ১৯১২ সালের ১৪ মে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার 'চন্দ্রশেখর' নাটক থেকে কিছু আপত্তিকর অংশ (যার কথা উল্লেখ করা হয়) বাদ দিতে সম্মত হন। এবং সেই মর্মে সরকারের কাছে একটি রিপোর্টও পেশ করা হয়। (উল্লেখ্য, সরকারী চিঠি নং ৩৯২৩-সি, তাং ১৪ই মে, ১৯১২)।

৩। এরপর যখন ১৯১২ সালের ১৪ আগস্ট নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়, তখন দেখা যায় যে, যেসব ব্যক্তিকে বাদ দেবার কথা, তাদের সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংলাপের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর আমি ম্যানেজারের ইন্টারভিউ নিই এবং ১৯১২ সালের ২৯শে আগস্ট তাঁকে ওই নাটকের একটি স্টেজ কপি পেশ করতে বলি। বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ১৯১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজার আমার অনুরোধ মতো কাজ করেননি। এবং আপত্তিকর নাট্যরূপে বারবার নাটকটি অভিনয় করা হয়েছে।"[৩২] (অনূদিত)

চন্দ্রশেখরের মতোই মৃণালিনী সরকারের কোপে পড়েছে। তবে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সারের অসম্মতির কারণে অভিনয় নিষিদ্ধ হতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশা থেকেই মৃণালিনী অভিনীত হয়ে আসছে। এটি রাজরোষে পড়ে দীর্ঘ ৩৩ বছর অভিনীত হবার পর। মৃণালিনীর অভিনয়ের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলেন পুলিশ কমিশনার ১৯১২ সালে। এ নিয়ে তিনি আণ্ডার সেক্রেটারি এইচ এম ভিংচকে চিঠি লেখেন ১২ই জুলাই, ১৯২২। এই পত্রে অভিযোগ করা হয় যে, মৃণালিনী ধর্ম বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছে। আর যেসব বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়, তা হল : বইটির কয়েকটি চরিত্র, যুদ্ধ পন্থার উল্লেখ, ক্লাইভের প্রসঙ্গ প্রভৃতি। ওই নোটে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও তির্যক মন্তব্য আছে। পুলিশ কমিশনার অবিলম্বে মৃণালিনী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করেন। ওই নোটে এক জায়গায় বলা হয়েছে : "...এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, বইটির লেখকই আনন্দমঠ ও ওই ধরনের আরও কয়েকটি বইয়ের লেখক এবং ওই বইগুলি বাংলাদেশের দুরভিসন্ধিমূলক আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা নিয়েছে। আমার মনে হয়, লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কী করে বিদেশীর কবল থেকে ভারতকে স্বাধীন করা যায়, তাই বলা।"[৩৩]

মৃণালিনী পুলিশ কর্তার এতই বিষনজরে পড়ে যে, তিনি পরিশেষে মন্তব্য করেছেন, নতুন প্রেস আইনে বইটি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বইটি থেকে যত অংশই বাদ দেয়া যায় না কেন, আপত্তিকরই থেকে যাবে।

১৯১২ সালের প্রথম দিক থেকে 'মৃণালিনী' নিয়ে সরকারী ফাইলে নোট চালাচালি হয়েছে। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ফাইলে দেখা যাচ্ছে ১৯১২ সালের ২৭শে মার্চ তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এফ এল হ্যালিডে 'মৃণালিনী'র অভিনয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি লেখেন। তার বয়ান

Sir, With reference to the Government letter no. 1425-P dated the 15th February, 1912 para 2, I have the honour to report that the manager of the Star Theatre, Babu Amarendra Nath Dutta called at this office on 19.3.1912 with a view to obtain permission to stage the following plays :

a) Pratapaditya,
b) Mrinalini,
c) Chandra Sekhar.

He argued that as these plays have not been proscribed or prohibited by Government, he intends to put them on the stage shortly and asked for my permission. It was pointed out to him that these plays were held to be extremely objectionable and permission to revive these plays on the stage cannot possibly be given. In this connection, I would venture to invite the attention of the government of this office letter No. 5163-C dated the, 16th September, 1910 regarding 'Mrinalini', this play was repeatedly reported to Government, as an objectionable one, therefore beg to enquire whether the Government have accepted my view and consider that my objection to this play being staged holds good.[৩৪]

এই চিঠির ভিত্তিতে চীফ সেক্রেটারি সরকারী আইনজ্ঞের অভিমত জানতে চান। তিনি ১৯১২ সালের ২রা এপ্রিল চীফ সেক্রেটারি সি জে স্টিভেনসেন মুর বেঙ্গল হাইকোর্টের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অ্যান্ড রিমেমব্রান্সর অব্ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্সকে এই মর্মে চিঠি দেন

"মহাশয়,

আমাকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, তিনি এই মর্মে সংবাদ পেয়েছেন যে, শীঘ্রই কলকাতায় 'মৃণালিনী' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার অভিলাষ আছে পুলিশ কমিশনার এই নাটকটি আপত্তিকর বলে বিবেচনা করেন এবং ড্রামাটিক পারফরম্যানস আইন অনুসারে এর অভিনয় নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি সরকারী আদেশ চেয়েছেন।"[৩৫]

'মৃণালিনী' সম্পর্কে তীব্র আপত্তি তুলে এর পরও পুলিশের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র দফতরে চিঠি লেখা হয়। দেখা যায়, ১৯১২ সালের ২২শে জুলাই মৃণালিনীর একটি রিভিউ তৎকালীন 'আণ্ডার সেক্রেটারি এইচ এম ভিংচক আই সি এসকে পাঠানো হয়েছে। এই রিভিউ'র শেষে মৃণালিনী সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এই কাহিনীটি অত্যন্ত আপত্তিকর এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক। সেটি এখানে উদ্ধৃত করলাম

"আমি যা বুঝি, এইসব বই প্রকাশের উদ্দেশ্য দুটি—শিক্ষা দেওয়া ও আনন্দদান। ক্ষতিকর না হলে দুয়েতেই কোন আপত্তি নেই। যে বইটি এখানে রিভিউ করা হচ্ছে, তাতে লেখক যাদের যবন বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ভরা—এদের চরিত্র, কার্যপদ্ধতি, যুদ্ধ পন্থা, ইতিহাস, সামরিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অসামরিক রাজনীতি এবং কি যে নয়, এজন্য লেখক কোন প্রামাণ্য দলিলের উদ্ধৃতি দেননি। সেজন্যই এই আক্রমণের একেবারেই কোন যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। এই কাহিনীতে বক্তিয়ার খিলজির সময়ের ঘটনার বর্ণনা আছে। কাফের কথাটা এমনিতেই আপত্তিকর এখানে কেবল যদিও মুসলমানদের সম্পর্কে তা প্রযোজ্য। কিন্তু আসলে কখনই কেবল মুসলমানদের বর্ণনা করতে এই কথাটা ব্যবহৃত হয়নি—নইলে ক্লাইভের কথা এখানে বলা, বা তাঁর সম্পর্কে বলা যে তিনি কেবলমাত্র প্রতারণা করে বাংলা জয় করেছিলেন এটা অবাস্তব হয়ে পড়ে। এই উপন্যাসে একজন মুসলমান হিন্দুধর্মকে গালি দিয়েছে এসব বর্ণনাও রয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলাই এইসবের লক্ষ্য। তাছাড়া তথাকথিত যবনদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত এবং দৈব ইচ্ছানুসারে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার কাজের পবিত্রতার কথাও আছে। ধর্মীয় আবেগের উদ্রেগ করাই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া হিন্দুরা সহজে সক্রিয় হয় না। এ সম্পর্কে একথা মনে রাখা দরকার যে এই বইটির লেখকই 'আনন্দমঠ' এবং ওই ধরনের অন্যান্য বইয়েরও লেখক—যেসব বাংলার মৃতপ্রায় (আসুন, আমরা সেই আশাই করি) দুরভিসন্ধিমূলক আন্দোলনে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আমার মনে হয় লেখকের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কী করে ভারতকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করা যায়, স্বাধীন করা যায়, তা একটা ধর্মীয় কর্তব্য —এইসব বলা।

আমি মনে করি, পূর্বোক্ত কারণের জন্য এই বইটি অত্যন্ত আপত্তিকর এবং নতুন প্রেস আইনের ধারা অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। আমার মতে এ বই থেকে যত অংশই বাদ দেওয়া হোক না কেন এর অন্তর্নিহিত ভাব দূর করে একে আপত্তিকরের বাইরে আনা যাবে না।"[৩৬]

এই রিভিউতে মৃণালিনীর আপত্তিকর অংশগুলির উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। যেমন

'Page 5-Madhab : I have heard all the news of Delhi...why come you to have his life?

P-7, P-12, 20, 63-64, 65, 79, 82, 90 pages 55-57 (conversation between Baktiar and Mohommad Ali) P-202-205, 206.

(Such is Bengali's destiny...cunning Clive is the second instance of the kind).

P 118, 207, 210-11, 212-13, 203, 235 etc.'

পুলিশের এই কড়া মন্তব্য ও রিভিউ সত্ত্বেও সরকারী আইনজ্ঞ মৃণালিনীর অভিনয় নিষিদ্ধ বা বইটি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে মত দেননি। ই এফ চামনন (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অ্যান্ড রিমেমব্রান্সর অব্ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স) ১৯১২ সালের ২রা এপ্রিল তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি স্টিভেনসন মুরকে (আই সি এস) লেখা এক চিঠিতে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, মৃণালিনীতে আপত্তিকর কিছু নেই। চিঠি তুলে দিলাম

"My dear Stevenson More,

I have considered the enclosed letter and the annexure to it. I cannot say that it is sufficiently clear that the English are referred to by the word: jabans. I would not take any action myself but you may think it right to advise what action should be taken-Halliday would probably arrange for the modification of these passages.

Yours sincerely/
E.F. chamnan."[৩৮]

সম্ভবত চামননের এই অভিমতের পর মৃণালিনীর অভিনয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি পরিত্যজ্য হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

॥ ৮ ॥
[বঙ্কিমের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের একাংশের আপত্তি]

বঙ্কিমের কোন কোন কাহিনীর অভিনয়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের পক্ষে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন। যেসব কাহিনীর অভিনয় সম্পর্কে এই আপত্তি সেইগুলি দীর্ঘ ৫০/৬০ বছর ধরে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে এসেছে। যেমন দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, আনন্দমঠ। এই সাম্প্রদায়িক আপত্তির ফলে দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ১৯৪৩ সালের আগের নয়। সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র দুটি নাট্যরূপ নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। একটি মহেন্দ্র গুপ্তের ও অপরটি অতুল মিত্রের করা। তবে পরে আবার দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় হয়েছে। সম্ভবত কিছু পরিবর্তনের পর। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের নাট্যরূপটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৪৬ সালে।

দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামের অভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আপত্তি তুলেছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস লিগ। এ ঘটনা ১৯৪৪ সালের। এ নিয়ে দীর্ঘদিন চিঠি লেখালেখি হয় তার কিছু কিছু সরকারী নথিপত্র থেকে উদ্ধার করা গেছে।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা মে তারিখের চিঠিতে তারা দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামের অভিনয় বন্ধের দাবি জানান।

All Bengal Muslim Students League
Central Office, 5 Wellesly
1st Lane, Calcutta.

"The working Committee of the ABMSL strongly, protests the performance of 'Durgesnandini' and 'Setaram' on the stage. For the stoppage of communal misunderstanding the committee request the proper authority to stop these immediately.

The above resolution passed in the W.C. meeting of the ABMSL of 29th April, 1944 is forwarded to Mr. Abtaf Hossain, DPI for favour of information.

Nasruddin Ahamed
Acting General secretary."[৩৯]

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯৪৪ সালের ১৫ই মে ছাত্র লিগকে লেখা এক চিঠিতে জানতে চাওয়া হয় যে, ওই নাটক দুটির কোন্ কোন্ অংশ তাঁরা আপত্তিকর মনে করেন। সেটি এই

"To the General Secy,
ABMS League
5, Wellesly 1st Lane,
Calcutta.

Sir,

With reference to the resolution passed on the meeting of the ABMSL on the 29th April, 1944 in connection with staging of play 'Durges Nandini' and 'Sitaram'. I am directed to request that the portions which are considered objectionable by the ABMSL may be specified for consideration by govt."[৪০]

তবে শেষ পর্যন্ত ওই নাটক দুটি আপত্তিকর বলে মনে করা হয়নি। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী ফাইলে যে নোট চালাচালি হয়েছে, তার কিছু উদ্ধৃত করা হল। 'স্বরাষ্ট্র (প্রেস)'র ওই ফাইলের একটি নোট : "এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যেই এস পি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এ পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু এতে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যে একে ইসলাম বিরোধী বা মুসলিম বিরোধী বলা চলে। সেইজন্যেই এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে ২১-১২-৪৩ তারিখের এস পি এ'র নোট এবং ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরের ফাইল নং পি ৫৭১/৪৩ বি তে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির নোট দেখা যেতে পারে। এখন বিবেচনা করে দেখতে হবে, সারা বাংলা মুসলিম ছাত্র লিগকে বলা হবে কি না যে, এই নাটকের কোন্ কোন্ অংশ তাঁরা আপত্তিকর মনে করেন, তা সুনির্দিষ্ট করে সরকারকে জানাতে, যাতে এ বিষয় বিবেচনা করা যায়।"[৪১]

'সীতারাম' সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারী ফাইলের ১৭-৫-১৯৪৪ তারিখের নোটে আছে:

From the examination of the mss. of Sitaram supplied by the C.P.S. office it does not appear that there is anything objectionable excepting the portions marked in pencil on pages 57, 61 & 62.[৪২]

দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামের নাট্যরূপের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উপরিউক্ত ফাইলের ১৮-৭-১৯৪৪ তারিখের নোটে তা সুস্পষ্ট। এদের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয়নি এবং কোনো ব্যবস্থা নেবার সুপারিশ করা হয়নি। দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারামের অভিনয় বন্ধের আবদার মানা হয়নি।

তবে চন্দ্রশেখরের নাট্যরূপের মতো গেজেট ঘোষণার মাধ্যমে নিষিদ্ধ না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক কাহিনীর নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি আপত্তিকর তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুলিশের সদর দফতরে [লালবাজারে] আপত্তিকর পাণ্ডুলিপির যে তালিকা আছে, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রেরও একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ রয়েছে। মহেন্দ্র গুপ্ত ও অতুল মিত্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ এবং বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র ও অমরনাথ ঘোষের 'সীতারাম' পুলিশের বাজেয়াপ্ত পাণ্ডুলিপির তালিকায় আছে। এ ছাড়া 'মৃণালিনী' ও দেবী চৌধুরাণীর নাট্যরূপের একটি করে পাণ্ডুলিপিও আপত্তিকর নাটকের তালিকায় আছে। তবে কোনরূপ সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে এইসব নাট্যরূপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। (৪৩)

নির্দেশিকা

১। বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৩৮

২। R.C. Majumdar, History and culture of the Indian People. Vol. X Bharatiya Vidya Bhawan. P-478.

৩। Ibid-P-478.

৪। Dr. Bhupendra Nath Dutta. Swami Vivekananda-Patriot-Prophet (1954). P-334.

৫। Ibid. P-201-202.

৬। নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৬৩

৭। কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, সোমেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত, পৃ. ২৯

৮। আনন্দমঠ, বঙ্গদর্শন সংস্করণ, অমিত্রসুন্দর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, আদি পর্ব, পৃ. ৬৪

৯। কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ৩৩

১০। ঐ, পৃ. ১৫

১১। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃ. ৩১

১২। B.Majumder. 'Militant Nationalism in India,' P-129.

১৩। Earl of Ronaldsay. 'The Hearts of Aryavarta. P-106.

১৪। B. Majumdar, 'Militant Nationalism', P- 192.

১৫। সাক্ষাৎকার কালীচরণ ঘোষের সঙ্গে, জানুয়ারি, ১২, ১৯৮২।

১৬। কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৫

১৭। File No. 122, 1912. Home (Pol.) Bengl. Govt.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃ. ১২১
১৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৭
২০। History of culture of the Indian people Vol. X Chapter-Birth of Nationalism.
২১। Amalesh Tripathy, The Extremist challenge, P. 15
২২। K.C. Ghose. The Roll of Honour.
২৩। প্রিয়নাথ ঘোষ, যজ্ঞভঙ্গ
২৪। India under Morley and Minto, Politics Behind Revolution, Repression and Reform (London 1964), M. N.Das P-38-39.
২৫ Fl. No. 122 (Sl. No. 6-7), 1912, Home (Pol.)Conf. Beng. Govt.
২৬। Ibid.
২৭। Fl. No. 74 (Sl. 1-5), 1913, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
২৮। Ibid.
২৯। Fl. No. 122 (Sl. 8-9), 1912, Home (Pol) Conf. Beng. Govt.
৩০। Fl. No. P-28 of 1912. Home (Pol.) Conf. Beng. Govt. 1913.
৩১। Fl. No. 74 (Sl. 1-5), Home (Pol.) Conf. Beng. Govt. 1913.
৩২। Fl. No. 122 (Sl. 17-18), 1912, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
৩৩। Fl. No. 122 (Sl. 10-13), 1912, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
৩৪। Fl No. 122 (Sl. 1-3), 1912, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
৩৫। Fl. No. 122 (Sl. 4-5), 1912.
৩৬। Ibid.
৩৭। Ibid.
৩৮। Ibid.
৩৯। Fl. No. 296/44. Proceedings No. 2-4, Home (Press) 1944, Beng. Govt.
৪০। Ibid.
৪১। Ibid.
৪২। Ibid.
৪৩। লালবাজারের আটক নাটকের পাণ্ডুলিপির তালিকা ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ছিল তীব্র আকুলতা। পরাধীনতার জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনায় বারবার মুখর হয়েছেন। ১৮৯৯ সালে ৩০ অক্টোবরের এক পত্রে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব স্পষ্ট। ওই চিঠিতে (মেরী হেলকে লেখা) তিনি লিখেছিলেন

..."আর আমরা আরম্ভ করেছি নতুন ভারত—ভিতর থেকে নিজের শক্তিতে উত্থিত ভারত—আমরা অপেক্ষা করে আছি কী ঘটে তাই দেখতে। কোনো নতুন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাস করি, যখন জাতি তাকে চায় এবং জাতির পক্ষে তা সত্য বস্তু হয়। ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির কাছে সত্যের পরীক্ষা হল—'প্রভুরা তার অনুমোদন করেন কি না' আর আমাদের কাছে—ভারতীয় বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তা অনুমোদিত কিনা—এর দ্বারা। লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে—ব্রাহ্মসমাজও আমাদের মধ্যে নয়, কারণ ইতিমধ্যেই ওরা শেষ হয়ে গেছে—এ লড়াই কঠিনতর, গভীরতর, আর অতি ভয়ানক।'[১]

ইংরেজ শাসন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব জনৈক লেখকের ভাষায়

"কলিকাতা বক্তৃতায় স্বামীজী যখন বলেছিলেন, আগে আমার থেকে ইংরেজকে কেউ বেশী ঘৃণা করত না—তখন আক্ষরিক সত্য ছাড়া তিনি কিছু বলেননি। সত্যিই পরিব্রাজক জীবনে, তারপরেও, ইংলণ্ডে যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সময়ে তিনি কার্যতঃ ইংরেজ মাত্রকেই নরদেহী শয়তান মনে করতেন। তাঁর ধারণায় প্রতিটি ইংরেজই ভারতের রক্তশোষণে নিযুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও সাধারণ ইংরেজের মধ্যে কোনো পার্থক্য তখন তাঁর কাছে ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত মনীষাকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন রেখেছিলেন।"[২]

ভারতকে মুক্ত করার জন্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের উদ্দেশ্য স্বামীজী একবার দেশীয় রাজাদের সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন—এমন তথ্য পাই স্বামীজীর ভাই বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ পেট্রিয়ট প্রফেট' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন

"স্বামীজীর জীবনের কিছু অংশ ভারতীয়দের কাছে পরিজ্ঞাত নয়। খুব কম লোকই জানেন, গোড়ার দিকে তাঁর রাজনৈতিক বৈপ্লবিক ভাব ছিল। তিনি বিদেশীর জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সে চেষ্টায় তিনি কিন্তু ব্যর্থ হন। ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করে তিনি প্রতিকারের ভিন্ন পথের কথা ভাবেন, সেই পথেই নিজের মনোযোগ চালিত করেন।...

"তাঁর মৃত্যুর পূর্ব বৎসর যখন তাঁর দুই বিদেশী অনুরাগী (একজন তাঁর শিষ্যা) কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সহায়তায় একটি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সংগঠন করেন, পরবর্তীকালে যা বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়—স্বামীজী তখন তাঁর শিষ্যাকে (অর্থাৎ নিবেদিতাকে এতে যোগ দিতে বারণ করেন। সিস্টার ক্রিস্টিন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি অপরজনকে কেন ভারতীয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে আনতে চান, স্বামীজী বলেছিলেন, 'নিবেদিতা ভারতীয় অবস্থা ও ভারতীয় রাজনীতির বিষয়ে কি জানে ? আমি আমার জীবনে তার চেয়ে অনেক বেশী রাজনীতি করেছি। বিদেশী শাসন উৎখাত করবার জন্য ভারতীয় দেশীয় রাজাদের নিয়ে সংগঠন তৈরী করার আইডিয়া আমার মাথায় ছিল। এই কারণেই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সারা দেশ পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। এই কারণেই আমি কামান নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাকসিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের ভিতর থেকে কোনো সাড়াই পাইনি। এইসঙ্গে এইকালে অন্য একদিকে আর এক প্রয়াসের বিবরণও স্বামীজী দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের এখন পচা-ধ্বসা অবস্থা। এখন আমি চাই নিঃস্বার্থ তরুণের একটি দল, যারা জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উন্নীত করবে।"[৩]

ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বামীজীর এই প্রচেষ্টার বিষয়ে অন্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'...লিজেল রেমঁ আমাকে বলেছেন, স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার মতলব করেছিলেন—একথা ম্যাকলাউড স্বয়ং তাঁকে বলেছেন। ম্যাকলাউড নিবেদিতার প্রচুর চিঠি লিজেল রেমঁকে দিয়েছিলেন কিন্তু অনেক চিঠি বা চিঠির অংশ রেমঁর সামনে বসেই তিনি ছিড়েছিলেন 'Too Political' বা 'Too Personal' বলে।...'[৪]

ইংরেজ শাসনে ভারতের দুরবস্থার বিষয়ে স্বামীজী আমেরিকায় তাঁর ভাষণে বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর রিপোর্ট লুইবার্গ, মিসেস রাইট প্রমুখের লেখায় আছে।

একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'...মানুষ যদি ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করে, ইতিহাসের প্রতিশোধকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ইংরেজের উপরে সেই প্রতিশোধ নামবে। তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুঠে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা—আর আমাদের জনগণ সারা দেশ জুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে।'[৫]

আমেরিকায় স্বামীজীর এইসব মন্তব্যের জন্য তাঁকে ছদ্মবেশী কংগ্রেসওয়ালা বলেও প্রচারের চেষ্টা হয়। দেশে ফেরার পর স্বামীজীর উপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়। ১৮৯৮ সালের ২২ মে নিবেদিতার লেখা চিঠিতে এ তথ্য আছে। তিনি মিসেস হ্যামন্ডকে লেখেন

"আজ সকালে সন্ন্যাসীদের একজন সতর্কবাণী শুনেছেন, পুলিশ গোয়েন্দা মারফৎ স্বামীজীর উপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা সাধারণভাবে অবশ্য আমরা জানতাম, কিন্তু আজকের সংবাদটি একেবারে গায়ে আঁচ লাগার মতো।

"স্বামীজী যদিও হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তবু এর সম্বন্ধে গুরুত্ব না দিয়ে পারছি না। সরকার নিশ্চয় ক্ষেপে গেছে, অন্তত স্বামীজীকে যদি সে কোনোভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করে তাহলে তাই প্রমাণিত হবে। সরকারের ঐ কাজ মশালে আগুন ধরিয়ে দেবে, যা সারা দেশে আগুন ছড়াবে।...ইংলণ্ড থেকে তুমি বুঝতেই পারবে না—জাতিবিদ্বেষ কাকে বলে। ...তিনজন শ্বেতাঙ্গিনীর (মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা) সঙ্গে স্বামীজী ও অন্য 'নেটিভ'রা যখন ভ্রমণ করেন, তখন তাঁদের জঘন্য ধরনের অপমান সহ্য করতে হয়।

স্বামীজীর চিঠিপত্র গোয়েন্দারা খুলে দেখতো। সে সংবাদ আছে স্বামীজীর একটি পত্রে। ১৯০১ সালে ম্যাকলাউডকে লেখা ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন

"মিসেস লেগেটের শেষ যে চিঠিখানি এসেছে, তার খামটাকে নির্লজ্জভাবে ছিঁড়েছে। ভারতের ডাকবিভাগ আমার চিঠিগুলি একটু ভদ্রভাবে খুলবার চেষ্টাও করে না।'[৭]

ব্রিটিশ সরকারের অনুচিত ব্যবহারে স্বামীজীর তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার কিছু কিছু বর্ণনা এইসব চিঠিতে মেলে। ইংরাজ সরকার স্বামীজীর বিষয়ে এতই সন্দিগ্ধ ছিল যে কাশ্মীরের মহারাজা মঠ তৈরী করার জন্য স্বামীজীকে জমি দিতে চাইলে সে প্রচেষ্টা ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বানচাল করে দেন। তাতে স্বামীজী প্রচণ্ড আঘাত পান।

সমকালে স্বামীজী সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের আচরণের এইসব তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, এই বীর সন্ন্যাসীকে রাজশক্তি কী চোখে দেখতেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পরও তাঁর সম্পর্কে, তাঁর লেখা সম্পর্কে তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি, বরং দেশ যতই মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ততই তা বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিলেন, এ দেশে মুক্তি আন্দোলনে কোন্ বিপন্ন প্রেরণা জোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবন ও বাণী। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিস্ফোরণ—তার বারুদ স্বামীজীই। একজন পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ একথা লিখেছেন। তিনি আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কে এইসব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। আর্ল অব রোনাল্ডস তাঁর 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' গ্রন্থে লিখেছেন

"From my early life", wrote a young Bengali whose imagination had been captured by it, "I was of a religious turn of mind and was in the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

habit of nursing the sick and helping the poor... I began to feel a peculiar despondency and was pondering over my life's mission, which I thought should be towards the amelioration of the condition of the poor and the needy, when I met A, with whom I had some conversation on the subject. After A few days I met him again and he gave expression congenial to my religious tendencies and encouraged me in my life of thought. After a few days more he gave a book called 'Desher Kotha' to read, which I did. On reading the book I got an excitement of mind, thinking of our past glories and the present deplorable condition of the people of the country. Suspecting nothing, I began to have closer intimacy with him and to have religious discourses with him at times. Gradually he began to insert ideas of anarchism into my religiously disposed mind, saying that religion and politics are inseparable and that our paramount duty should to do good to the people of the country." The writer then tells how he was given another book to read entitled 'Patravali', by Vivekananda, and how he learnt from it what self-sacrifice the author had made for the good of the country. Later he was asked if he had read the book of Bankimbabu, and it was suggested to him that he should read 'Ananda Math.'[৮]

এ থেকে পাওয়া যায়, কীভাবে দেশের তরুণদের বিপ্লব আন্দোলনে আকৃষ্ট করা হত। স্বামীজীর লেখা কেমন করে প্রভাবিত করতো তরুণদের উদ্বুদ্ধ হতে। স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা সিডিশন কমিটির প্রতিবেদনেও আছে

"Vivekananda died in 1902 ; but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ram Krishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is aparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects."[৯]

স্বামীজীর লেখার এবং স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী কালে আরও বাড়তে থাকে। শাসক সমাজ স্বামীজীর লেখা সম্পর্কে এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে যে, তাঁর লেখার প্রচার যাতে না হয়, সেদিকে ছিল তাদের সতর্ক দৃষ্টি। তল্লাসির সময় অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর বইপত্র পেলে পুলিস আটক করত। শেষ পর্যন্ত একবার তাঁর বই নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও ওঠে।

ইংরেজ আমলে গোয়েন্দাদের এক রিপোর্টে সে তথ্য আছে। দেখা যায় যে, স্বামীজীর পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবও উঠেছিল। মূল্যবান সেই গোপন নথি এই

"In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patrabali' Part 1, 4th Edition of Swami Vivekananda for contravening Sec. 4(c) of Press Act, 1910. Accordingly a copy of English translation of the alleged objectionable passages of the book was sent to Sri S. R. Das, standing councel for legal opinion. Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion in which he said :

I am strongly of opinion after going through the whole book that it does not contravene Sec., 4 (C. O. of the Act I of 1910).'

On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter."[১০]

পত্রাবলী সম্পর্কে সরকারী মনোভাব উদ্ধৃত অংশে স্পষ্ট। এস আর দাসের ভিন্ন মত না থাকলে বইটি বাজেয়াপ্ত হতই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোপন সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর নিবন্ধও রাজরোষে পড়ে।

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Headquarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhon'. In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December 1907, Swamiji wrote, 'You have all been hypnotised, your ruler tell you that you are low, subjucated and weak and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that, so those people who used to look down upon us, by God's will, respecting me like God. Peping cannot lead man into salvation. What is wanted is a Keenaged sowrd and a war to death."[১১]

সরকারী ফাইলে উদ্বোধন থেকে স্বামীজীর নানা উদ্ধৃতির অনুবাদ আছে। যথা, "It is necessary now to worship Ram with the Bow, Mahabir and Mother Kali. The worship of the Mother requries blood—human sacrifice."[১২]

শিকাগো ধর্ম মহা সম্মেলনে বিশ্বজয়ের পর স্বামীজী দেশে ফিরলে কলকাতায় তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ খৃঃ) জানানো হয়, তাঁর উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন সেটি গোয়েন্দাদের ফাইলে বন্দী আছে। স্বামীজীর ওই ভাষণ ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ভাল চোখে দেখেননি। সরকারী কোপে পড়া স্বামীজীর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের বয়ান

"মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় প্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয়স্বজন স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে অতিদূরে পলাইয়া যায় ; চেষ্টা করে দেশের সকল সম্বন্ধ পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি সে নিজে যে সার্ধ ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু সুরে বলিতে থাকে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। হে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরল প্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে ? আমি বলিলাম, পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট পবিত্রতা মাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ। ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার মনে আসিল না।

"হে কলিকাতাবাসী আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতার কাজই করিয়াছ—অহো ! হিন্দু ভ্রাতারই কাজ। কারণ এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠো-জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ'—নির্ভীক হইতে হইবে তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠো জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলী প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'অশিষ্ট, বলিষ্ঠ, মেধাবী' যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতার এরূপ শতসহস্র যুবক রহিয়াছেন। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও একসময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি তবে তোমরা আমার অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পারো। উঠ—জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে,—ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে।

"অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ। হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।

"ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন। কে কোথায় দেখিয়াছ—টাকায় মানুষ করিয়াছে ? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদগুলির মধ্যে মনোরম কঠোপনিষদ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের অবশ্যই স্মরণ আছে : এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত কতগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বলিব না, অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবা মাত্রই কি ফল হইল। দেখ শ্রদ্ধা জাগিবা মাত্রই নচিকেতার মনে হইল—আমি অনেকের মধ্যে মধ্যম, অধম আমি কখনই নহি। আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে সমস্যার চিন্তায় তাহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন। যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং তিনি যম সদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিনদিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা জানো, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেইজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে—ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্ত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে, তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও—যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্ট দ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সমগ্র শক্তি রহিয়াছে। কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে, অতএব আমি চাই এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলের আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস, আর এই বিশ্বাস অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আসিবেই আসিবে।

"আমি তো এখনই কিছুই করিতে পারি নাই। তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য লোপ পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার হইবে যে, আমি তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি। বিশেষত আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতিগুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি। তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকদলের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে, আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা ব্যক্তিত্বহীন ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হইলে মুহূর্তের মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদের পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে কেবল বলিতে পারি—আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের, সর্বোপরি আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় লাগিতে পারি।"[১০]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ লিখেছেন যে, স্বামীজীর 'ভাববার কথা' নিবন্ধটিও রাজরোষে পড়ে। গোয়েন্দা ও পুলিশ যেখানেই পেয়েছে, ওই বইটি নিয়ে গেছে। লিখেছেন

'এই 'নিষিদ্ধ' পুস্তকপুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার, প্রকাশক, প্রেসের মালিকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে তা নয়, কেবলমাত্র সরকারী গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে, তারপর পুলিশ দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত করেছে, মালিককে ধরে টানাটানি করেছে, আর যাদের উপর রাজনৈতিক কারণে সরকার সন্দেহ পোষণ করতো বা কোনও ঘটনা সম্পর্কে খানাতল্লাসী করতে যেত, সেখানে এ সকল সাহিত্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির 'চরিত্র' সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাঢ়তর করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। কোনও একটা ছেলে পাড়ায় 'স্বদেশী করে' সুতরাং হয়তো গুপ্তচরের পরামর্শে পুলিস তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো। 'খাতায় নামও উঠে গেল। তারপর পুলিশ তার বাড়ী তল্লাসী করলো, অন্য কিছু অর্থাৎ বোমা, বন্দুক, রিভলভার, তরোয়াল, রামদাও, ছোরা, গুপ্তি, সড়কী—এমন কি একগাছি লাঠি না পেলেও, যদি গীতা, আনন্দমঠ, স্বামীজীর 'ভাববার কথা', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', প্রভৃতি কিছু পেয়ে থাকে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে, হয়তো দু'চারটা গোঁত্তা রদ্দা, ঘুঁষি, চড় দিয়ে এবং কুটুম্ব সম্পর্কিত মিষ্টবচন আউড়ে থানায় গারদে আটক করে রেখেছে, 'সদর' থেকে 'টিকটিকি' পুলিশ এসে পুঙ্খানুপুঙ্খ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বানুসন্ধান এবং প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তারপর হয়তো বা ছেড়ে দিয়েছে, আর নয়তো বিনাবিচারে বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে।'[১৩]

তবে সরকারী নথিপত্রে এমন কোন তথ্য পাইনি যাতে 'ভাববার কথা' সরকারী কোপে পড়ার তথ্য আছে।

জাতীয় চেতনার উদ্বোধন করতে স্বামীজী প্রকাশ করেন এই 'উদ্বোধন' পত্রিকা। উদ্বোধনের একাধিক নিবন্ধ নিয়ে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগে বহু ফাইল চালাচালি হয়, গোয়েন্দাদের, আমলাদের বিরূপ মন্তব্যও আছে। তবে এসব ঘটনা ঘটে তাঁর মৃত্যুর পরে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনও সরকারের কোপে পড়েছিল। গোয়েন্দাদের শ্যেন দৃষ্টি ছিল এই সংস্থাটির উপর। তাই তো বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ফাইলে গোয়েন্দা রিপোর্টে এই সংস্থার কার্যকলাপ ও এর সন্ন্যাসীদের গতিবিধির সুবিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মিশন সম্পর্কে সেই সময়ের জাঁদরেল পুলিস অফিসার টেগার্টের একটি দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও এখন পশ্চিম বাংলা সরকারের আর্কাইভসে রক্ষিত আছে। মিশন সম্পর্কে বড়লাট কারমাইকেলও দিল্লীর দরবারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। তবে পরে তাঁর ভুল ভাঙে।

বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রে ও গোপন ফাইলে উল্লেখ আছে বহু বিপ্লবীর সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ ছিল। সিডিশন কমিটির রিপোর্টেও বিপ্লবীদের উপর মিশনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে কথা আগেই বলেছি।

সরকারী ফাইলে 'বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর' **'An account of Revolutionary movement in Bengal'**—বই থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে। সেটি এখানে উল্লেখ্য **"When we found that recruitment is at a stand still, we had recourse to disseminating political nostrums in the guise of religion with the assistance of the Ramkrishna Mission."**[১৪]

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে একটি মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ **'Sri Aurobinda was said to have got the patriotic ideas from Vivekananda through sister Nivedita while at Baroda.'**[১৬]

গোপন, গোয়েন্দা প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে : **"Ramkrishna Mission itself had been used in the past as a revolutionary agency under the guise of religion and philanthropy and the greatest danger in the present time lies in the unaffiliated Ashram which had grown up like mushroom in affected areas in East Bengal."**

Vivekananda commended to go out and preach the gospel of Ramkrishna and found branch Ashrams throughout India. This command had been taken up by the revolutionaries of Bengal to such a good effect, that in spite of best intentions, the Belur Math were unable to control them.

Vivekananda advised to his followers to tour the villages and attract the attention of the masses by the means of Magic lantern lectures.

Indra Nandi made an extensive tour in Bengal on behalf of the Maniktola Party. In course of which he used a magic lantern to attract the attention of the hearer, on the line laid down by Swamiji, since that time several other similar instances have been reported.

বিপ্লবীদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের কথা সরকারি নথিপত্রে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। গোপন সরকারি ফাইলের এক জায়গায় আছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"In the Anusilan Samity-system Vivekananda's works were considered as text books to be used to gather recruits. Libraries in the name of Vivekananda were also found in the house of revolutionaries. Ramkrishna Kathamrita and Vivekananda's Karmojoga were favourite books."[১৮]

স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা তো প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাই। মিশনের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা গোয়েন্দা রিপোর্টে আছে :

"...he is believed to have taken shelter for a time in Belur Math the head-quarter of Ramkrishna Mission in India, before he left for America in 1908."[১৯]

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে দুই ভায়ের ভূমিকা সম্পর্কেও সরকারি ফাইলে মন্তব্য আছে

"Both brothers wanted a united India freed from foreign domination. Bhupendra Nath sought to accomplish it by means of a revolution against the government. While Vivekananda endeavoured to unite his countrymen and awaken in them a sense of their power as examplified in their ancient history through Vedantism which taught equality of all men and nowhere laid down the caste restriction which subsequently grew up and framed the rock which disunited and split up the Indians in such a way as to enable a small number of his countrymen."[২০]

বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ থাকার কথাও সরকারি ফাইলে আছে :

"There are indications that the Mission and its followers were connected with the revolutionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in Punjab and Native states."[২১]

স্বামীজীর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর বিষয়ে এই বিবরণ

"After the death of Swamiji in 1902 Swami Brahamananda became the president and head of the Ramkrishna Mission all over India and outside.
These Missionaries are suspected of preaching Swaraj and Brahmananda alias Rakhal Ghose has been described as leader of these men."[২২]

আরও গুরুতর অভিযোগ

"The association of the Belur Math with Revolutionary Party in Calcutta is certain and Brahmananda Swami had done thing to do with the despatching 'Jugantar' leaflets to Madras because Swami was believed to be at Treplicome at or about that time."[২৩]

এই অভিযোগ কলকাতার গোয়েন্দারা মাদ্রাজ পুলিশের কাছে করেছে। তবে মাদ্রাজ পুলিশ তা সমর্থন করেনি। একথাও ফাইলে আছে : "But Madras Police did not support, they said that it was S. Somasudaram Bharati, extremist Vakil of Tuticorine was responsible."[২৪]

বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের সম্পর্কের আরও অভিযোগ আছে "One Nalini Kanta Dey of Chorebagan who went to Puri with Brahmananda as his attendant was alleged to have supplied arm to Nani Gopal Sengupta's group."[২৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯১২ সালের ২৯শে জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের যে ৫০তম জন্মোৎসব হয়, তাতে বিপ্লবীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, সে সম্বন্ধে সংবাদ

"On the occasion of Swamiji's 50th anniversary held at Belur on 29.2.12, several members of now defunct Anusilani Samity done the work of feeding the visitors present. After the function was over a secret political meeting was reported to have been held but not confirmed."

অভিযোগ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল এই বেলুড় মঠ

"Of all Centres of Ramkrishna Mission in India Belur Math alone seems to have been used as rendezvous of the revolutionaries. Person holding revolutionary views visited the Math from time to time and it is believed that political Sannyasis received training and instruction there ."

"Makhanlal Sen, a Dacca suspect was seen supervising the feeding of the visitors and Manik Guha Mustafi and Hemchandra Basu acquited person of Dacca conspiracy case, Kiron Mukherjee of Jessore and Suresh Samajpati were also present."

বিভিন্ন সময়ে যেসব বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ ছিল সরকারি ফাইলে তাঁদের নামও আছে। যেমন, আলিপুর বোমার মামলার দেবব্রত বসু। ইনি পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হন। আলিপুর বোমার মামলার শচীন সেন ও কুঞ্জলাল সাহা। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভবভূষণ মিত্র।

এছাড়া আছেন যোগেন ঠাকুর (সারথি গোষ্ঠী), তারাপদ বসু (নাঙলা ষড়যন্ত্র মামলা), পুলিন মুখার্জি, সতীশ বসু (কলিকাতা অনুশীলন সমিতি), নগেন্দ্রনাথ বসু (ঢাকা,) বীরেন সুর (আর্য সমাজ), ফণীভূষণ ঘোষ (চন্দননগর), যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (হাওড়া), উমাশঙ্কর সরকার (পূর্ণদাস সমিতি ঢাকা), রসিকচন্দ্র সরকার (গোপালপুর ডাকাতি)।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্য আশ্রমেও বিপ্লবীদের আসা যাওয়া ছিল বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে

"During 1913-14 important political suspects had been unearthen in Ramkrishna Mission—Baldeo Roy at Kankhal Ashram and Benaras Ashram, Satish Das Gupta at Benaras Ashram. Basanta Biswas is said to have raided at Benaras Ashram."

তবে কোন কোন রিপোর্টে স্বামীজীকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে স্বামীজী নিজে নন, তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগ ছিল

"Swamiji did not concern himself much with practical politics as such, but many of his followers were afterwards found connected with the revolutionary movements in Bengal."

স্বামীজী সম্পর্কে গোয়েন্দাদের আর একটি বিচিত্র মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক না হলেও উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না

'Because of his non-observance of caste distinction and other prejudices he came to be disliked by the Brahmans, the theosophists and the Brahmins'.

গোয়েন্দা রিপোর্টে বারবার অভিযোগে স্বয়ং বড়লাট কারমাইকেলও প্রভাবিত হন। দিল্লি দরবারে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্যও করেন। ১৯১৭ সালের ২২শে জানুয়ারি মিশনের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে প্রতিবাদ করে তাঁকে স্মারকলিপি দেওয়া হলে তিনি এ জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখকরা যাদের অনেকেই এই সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী—এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাবের কথা বলেছেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় "বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে পাঁচ-স্তর প্রস্তরের উপর স্থাপন করেছিলেন। যথা, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অতীব গৌরবের ও ভারতের মহত্ত্বের জন্য গর্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে ভারতের ঐক্য, গণজাগরণ এবং শারীরিক শক্তি ও শৌর্যের বিকাশ। একদল যুবককে, যারা তাঁর কাছে পথনির্দেশ ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, তিনি বলেন, আমার জীবনের মিশন হচ্ছে মানুষ তৈরি। আমার মিশন তোমরা কাজে ও বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করো। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড় এবং তাঁর দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের আদর্শ জীবনে আচরণ করার চেষ্টা করো। মাতৃভূমির সেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য। প্রথম চাই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি।

অন্যত্র তিনি বলেছেন,"আগামী পঞ্চাশ বছর মাতৃভূমিই তোমাদের আরাধ্য দেবতা হউক। অন্য সব অকেজো দেবতা এই কয়েক বছর ভুলিলে ক্ষতি নাই।" [অনূদিত) [৩০]

আর একজন ঐতিহাসিক আরও স্পষ্ট ভাষায় স্বামীজীর প্রভাবের কথা বলেছেন : 'বাংলার বিপ্লবী দলগুলির প্রত্যেক জিমনাসিয়ামে অর্থাৎ শরীরচর্চা কেন্দ্রে তাঁর 'ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' নামে বইটি পড়া হত। যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মপরিষদের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে, স্বামীজীর অনুপ্রেরণাপূর্ণ শিক্ষা ছাড়া বিপ্লব আন্দোলন যে-রূপ নিয়েছে, তা নিতে পারত কিনা সন্দেহের ব্যাপার।' [অনূদিত][৩১]

ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও হরিকুমার চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি ছাড়াও রোমা রোলাঁর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

'Romain Rolland rightly holds that Vivekananda's neo-vedantatism 'spread like burning alcohol in the veins of the intoxicated nation.' 32

১। শঙ্করী প্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩
২। ঐ, পৃঃ ১৫
৩। ঐ, পৃঃ ১৭
৪। ঐ, পৃঃ ১৭
৫। ঐ, পৃঃ ২৫
৬। ঐ, পৃঃ ৩৮
৭। ঐ, পৃঃ ৩৮
৮। Earl of Ronaldshay. The Hearts of Aryavarta P-85.
৯। Sedition Committee's Report, 1918, page-23.

১০। Home (Pol.) (Conf.) Fl. Sl. 100-FN-1068/12, 1912, Beng. Govt.
১১। Home (Pol.) Conf. Fl. Sl.-100-FN.-1068/12, 1912, Bengal Govt.
১২। Ibid.
১৩। Home (Pol.) (Conf.) Fl. Sl.-182-FN-6/16, 1915/ Beng. Govt.

১৪। কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪
১৫। Home (Pol.) (Conf.) Fl. Sl. 177-FN-632/13, 1913, B. Govt.
১৬। Ibid.
১৭। Home (Pol.) (Conf.) Fl. Sl.-182-FN-6/15. 1915. Bengal Govt.
১৮। Freedom Fighters papers No. 45. State Archives, Writers Buildings Calcutta.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯। Home (Pol.) (Conf.) File. Sl. 100-FN-1068/12, 1912, B. Govt.
২০। Home (Pol.) (Conf.) File. Sl. 182-6/16, 1915, B. Govt.
২১। Ibid.
২২। Home (Pol.) (Conf.) File. 82.-Bengal. S. D. 9.1.09. ext. Beng. Augt. 1909. SB. FN VII of 1909.
২৩। Ibid.
২৪। Ibid.
২৫। Ibid.
২৬। Ibid.
২৭। Ibid.
২৮। Home (Pol) (Conf.) Sl 182/FN.6/15, 1915. B. Govt.
২৯। Home (Pol.) (conf.) Sl. 100-FN-1068/12, 1912, B. Govt.
৩০। History and Culture of Indian People. Vol. X by R. C. Majumdar, P-493.
৩১। Bimanbehari Majumdar; Militant Nationalism in India. Page-62
৩২। Ibid.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সঙ্গীত, কবিতা ও নিবন্ধ আছে, যা মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলিতে সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে। 'একলা চলো রে' গানটি কেবল অহিংসার ঋষি মহাত্মা গান্ধীরই প্রিয় নয়, যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন তাঁদেরও একইভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর রবীন্দ্রনাথই বিশ্বের একমাত্র কবি যাঁর সঙ্গীত দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। তবু একটা বিষয় লক্ষণীয় : রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা নিষিদ্ধ হয়নি। অথচ দেশাত্মবোধক রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী, সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেকের বই ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেন। কেন ? ইংরেজ সরকার কি রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বিপজ্জনক মনে করতেন না ? মোটেই তা নয়। ব্রিটিশ আমলের নথিপত্রে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরাজ সরকার সন্দিগ্ধ ছিলেনই, গোয়েন্দাদের সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি। কিন্তু তাঁরা সম্ভবতঃ ভেবেছেন, বিশ্বখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা নিষিদ্ধ করা হলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সেই আশঙ্কাতেই হয়তো সরকার তাঁর কোনো লেখা বজেয়াপ্ত ঘোষণা করেননি। সরকারের গোপন নথিপত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনাকে গোয়েন্দারা আপত্তিকর বলে নোট দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ্য 'রাশিয়ার চিঠি'।

রবীন্দ্রনাথের বই নিষিদ্ধ না হলেও তাঁর সম্পর্কে লেখা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-এর 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' বইটি ১৯৩২ সালে নিষিদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির উপর 'সর্বহারার দৃষ্টিতে রাশিয়ার চিঠি' বইটিও বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের মতো বহুনন্দিত ব্যক্তিকে সুযোগ সুবিধামতো হেনস্তা করেছে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ও রাজপুরুষরা। একবার তুচ্ছ কারণে সমন জারি করে তাঁকে আদালতে টেনে আনা হয়। একটি নিষিদ্ধ বই কবিকে উৎসর্গ করা হয়েছিল, সেই তাঁর অপরাধ। বইটির নাম হুঙ্কার।

লেখক হীরালাল সেন। তিনি বিপ্লবী। বইটি নিষিদ্ধ হয় ১৯১১ সালে। সেই মামলায় সাক্ষী দিতে রবীন্দ্রনাথকে খুলনা কোর্টে যেতে হয়। কবি কিন্তু আগে জানতেন না যে বইটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই ঝঞ্ঝাটের পরেও রবীন্দ্রনাথ ওই লেখককে (হীরালাল সেন) শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ দেন। কিন্তু তাতে শান্তিনিকেতনের উপর পুলিশের উৎপাত এমন বেড়ে যায় যে, রেহাই পাবার জন্য কবি পরে হীরালালবাবুকে তার জমিদারি দেখাশোনার কাজ দেন।[১]

এর কিছুকাল পর মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার উল্লেখ করেন। স্বামীজীর ভাই বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বামীজীর ভক্ত ভারতপ্রেমিকা মিস ম্যাকলাউড রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিদ্যালয়ে চাকুরি দেবার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর মতো বিপ্লবীকে চাকুরি দেওয়ার ব্যাপারে অসমর্থতা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে এই চিঠিটি লেখেন ১৯১২ সালের ১৭ ডিসেম্বর।[২]

508 W. High Street
Urbana, Illinois
17 Dec. 1912.

'My dear Miss Macleod,

It is very difficult for me to make any suggestion as to what opening there could be for Mr. Bhupen Dutt. I have a boarding school in Bengal where I employed as a teacher a man prosecuted for seditious writings and who was on the verge of starvation with his whole family. It nearly wrecked my institution. I had to remove him, making some other provision for his livelihood. I really do not see any possible position for Mr. Bhupen Dutt in India, and the best thing he could do would be to accept some professorship in this country, (i.e., in America) and wait till

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

the present mood of the Indian Government undergoes a complete change.

With kind regards

Yours sincerely,
Rabindranath Tagore.

হীরালাল সেন ছাড়া সরকারের চোখে চিহ্নিত কালীমোহন ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ আইচ এই সময় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের উপর এই সময় ইংরেজ সরকারের বিষদৃষ্টি পড়েছিল। সরকারী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করা নিষিদ্ধ হয়, ওই নিষেধাজ্ঞা জারির সরকারী আদেশটি সরকারী নথিপত্র সন্ধান করে পাওয়া গিয়েছে। ১৯১১ সালের ২৪ অক্টোবরে এ সম্পর্কে সার্কুলারটি বের হয়। এই চিঠি থেকে তা জানা যায় :—

Dear Sir,

I am desired to refer to Eastern Bengal and Assam Government's demi official letter No. 1636-52N, dated the 24th October, 1911 regarding Santiniketan and Brahmacharya Ashram institution at Bolpur in the district of Birbhum. It was stated in the letter that the L. Governor of Eastern Bengal and Assam considered the institution altogether unsuitable as a place for the education of the sons of Government servant and desired that any well-disposed government servants who might be known or believed to have sons at the institution, or to be about to send sons to it might be warned to withdraw them, or not to send them as the case may be, unless they were prepared to find their sons, debarred from Government employment.

বাংলা সরকারের সেক্রেটারি জে এইচ কার ১৯১২ সালের ২২শে জুলাই বিভিন্ন বিভাগে যে আধা সরকারী সার্কুলার পাঠান তাতে এই তথ্য আছে।

উদ্ধৃত পত্র থেকে জানা গেল ১৯১১ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে জারি করা সার্কুলারের দ্বারা সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শান্তিনিকেতনে পড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছিল। এটি আধা-সরকারী সার্কুলার হলেও সরকারী কর্মীদের কাছে এটি সরকারের অবশ্য পালনীয় আদেশ। যাই হোক সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ওই আধা-সরকারী সার্কুলারটি প্রত্যাহৃত হয়। বাংলা সরকারের তৎকালীন সেক্রেটারি জে এইচ কার-এর পত্রে সে তথ্য আছে।

"I am now to say that changes have since been made in the staff of the school which render it no longer necessary to maintain the order in force. No further action need therefore be taken on the letter of the Government of Eastern Bengal and Assam. I am also to request that you will be so good as to inform any of your subordinates to whom you may have given warning about the school that Government no longer consider it necessary to take steps to prevent boys being sent to it."

জে এইচ কার ১৯১২ সালের ২২শে জুলাই ঢাকা থেকে (ডি· ও· সার্কুলার নং ১২৬ টি জি) উপরের পত্রটি লেখেন। এতে জানানো হয়েছে শান্তিনিকেতনের স্টাফ বদলের পর সরকার সিদ্ধান্ত বদলেছেন, অর্থাৎ ইতিমধ্যে হীরালাল সেন ও কালীমোহন ঘোষ অন্যত্র গেছেন। আপত্তি ছিল এঁদের জন্যই। মাত্র ৯ মাস সরকারী আদেশ বলবৎ ছিল। স্বদেশী যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনে কবির বিশেষ ভূমিকা ছিল। হিন্দুমেলার যুগ থেকেই বালক রবীন্দ্রনাথ দাদাদের সঙ্গে জাতীয় ভাবমূলক নানা সভাসমিতি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। তাঁর লেখা সে যুগে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে, ১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি পাঠ করেন, সেটি স্বদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেমে পূর্ণ। হিন্দুমেলার 'উপহার' শীর্ষক ওই কবিতাটিতে ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এতে বালক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পরাধীনতার বেদনা

'ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,/ "কেনরে ভারত কেন তুই, হ'য়/ আবার হাসিস। হাসিবার দিন/ আছে কি এখনো এ মোর দুঃখে"।/ ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,/ পাইবে হায়রে নূতন জীবন ;/ ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া/ আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।'[৫]

১৮৭৫ যে কবিতা পড়েন তাতে যথেষ্ট স্বদেশপ্রেম দেখা যায়। দু'বছর পরে ১৮৭৭ একাদশ অধিবেশনে পঠিত কবিতায় তিনি আরও অগ্রসর হয়েছেন। সে কবিতা সরাসরি বৃটিশ বিদ্বেষে এবং দেশপ্রেমে পূর্ণ।

এই কবিতাটি ১৮৭৭ সালে হিন্দু মেলার একাদশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন। সে সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 'সাধারণী'তে ৪ মার্চ, ১৮৭৭ সালে বের হয়

"আমরা নিরাশ মনে নবগোপালবাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন্ সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লির দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ায় দুর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা ও গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ তখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতের বৎসরের অধিক নয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আদ্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি ভারতের জন্য রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আমাতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান।' একজন পরিচিত কবিও(নবীনচন্দ্র সেন) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"[৬]

ষোল বছরের কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের 'দিল্লির দরবারে' কবিতাটি বিদেশী শাসকের প্রতি বিদ্বেষে, সেই সঙ্গে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গৌরবে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী দেশভাবনার সঙ্গে তুলনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে বিবেচনা করে সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করছি :

দিল্লির দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ রবে।
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী কূলে, আর্যকবি গায় মনপ্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত আসন লয়েছে কাড়িয়া করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি, ভারতে আজিকে সুখের দিন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের তরে গো উঠায় তান ?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠিছে বাজি ?
যতদিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা শ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খল করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠিছে আজি ?
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয় ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন শৃঙ্খল করিতে পূজা।
ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূতগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির
ওই আসিতেছে জয়পুর রাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ,
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর।
হারে হতভাগ্য ভারত ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠিছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে,
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক, আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।'

এই রবীন্দ্রনাথ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু ২০ বছর পরে ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বদেশী ভাণ্ডার' স্থাপন করেন, তখন সম্ভবত সরকারের অস্বস্তির কারণ হয়েছিলেন। বিদেশী পণ্য দেশের বাজার যাতে গ্রাস না করে, সেজন্য দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। দেশী পণ্য বিক্রিতে ও ব্যবহারে দেশের মানুষকে উৎসাহিত করতে তিনি উদ্যোগী হন। তিনি 'স্বদেশী ভাণ্ডার' গড়ে তোলেন। এ জিনিস বিদেশী শাসকের পক্ষে ভাল চোখে দেখা সম্ভব ছিল না। তখন গোয়েন্দা বিভাগে তার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হয়েছিল কিনা জানি না। তবে 'ফ্রিডম মুভমেন্ট পেপারস'-এ এই ঘটনার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে গোয়েন্দা নথিতে লেখা হয়েছিল

"On 1897, Rabindranath Tagore started "Swadeshi Bhandar" at 82, Harison Road, to encourage sale of country made goods and to start schools for instruction indigenous Arts ; but the effort met with little success.'

একই সূত্রে নিম্নের রি[illegible] পাই [illegible] জমি[illegible] রবীন্দ্রন[illegible] দেশা[illegible]সাধক কার্যাবলীর উল্লেখ আছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

Swadeshi in Rabi Tagore's Zamindary :
Rabindranath Tagore reorganised his zamindary administration with the sub-division of Kusthia and appointed 4 circle Inspectors and directed them to get supplies of country-made clothes and threads and sell them at the lower price to the tenants than the foreign made goods.[২]

শাস্তিপ্রাপ্ত দেশপ্রেমিককে সোনার পদক দানে প্রতিশ্রুত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মন্তব্য সরকারী নথিতে (যদিও কোন সময়ে এটি লিখিত তা আমরা জানি না) আছে

"It was announced that silver medals to be presented to those convicted in connection with swadeshi movement on recognition with to their services. Rabindranath Tagore had promised a golden star to be presented to the foremost of Barisal Salt-riot men. The meeting was held at Grand theatre on Harrison Road.

Three thousand people attended, twenty three persons received medals, greatest reception was awarded to a young student who was sentenced to fifteen strikes by the Calcutta Chief-Presidency Magistrate for crying 'Bande Mataram' in the street.[১০]

১৯০৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ওই সভা হয়।

বঙ্গভঙ্গের পরে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হলে কিছু সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার ফলে ধরে নেওয়া যায় তিনি সরকারের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন। ১৯০৯, ২৭ জুলাইয়ের এক সার্কুলারে রবীন্দ্রনাথকে অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা আছে দেখতে পাই, যাঁদের গতিবিধির উপর সারাক্ষণ নজর রাখতে হবে। এই সার্কুলারটি অনুবাদ করে দিচ্ছি :

"সার্কুলার নং ৬। এম বি, তাং কলকাতা ২৭শে জুলাই, ১৯০৯ প্রেরক : এফ সি ডালি ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, কলকাতা, সমীপে : সমস্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে। এই প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা দেওয়া হল। এইসব নাম গোয়েন্দা বিভাগের সাপ্তাহিক অ্যাবস্ট্রাক্টয়ে ছাপা হবে না।

২। তবে এঁদের গতিবিধি ও কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাঁদের কেউ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গেলে যে অফিসারের এক্তিয়ারের বাইরে তিনি যাবেন, সেই অফিসারকে তখনই এই বিষয়টি তার মারফৎ সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানাতে হবে। যাঁর এলাকায় উনি যাচ্ছেন আর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চকে তো জানাতে হবেই।

৩। রেলে করে তাঁদের যাতায়াতের বিষয় রেল-পুলিশকে জানাতে জেলা-পুলিশকে নির্দেশ দিতে হবে। এই সব ব্যক্তির প্রতি নজর রাখতে পরস্পরের সহযোগিতার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। এই সব লোকের কেউ অন্য প্রদেশের কোন্ জেলায় গেলে সেই জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে একটি সাংকেতিক তারবার্তা পাঠাতে হবে। ওই তারবার্তায় ওই ব্যক্তির নাম থাকবে এবং তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্যাদি জানানোর অনুরোধও থাকবে।

নাম	পেশা	বাসস্থান
ক) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	সম্পাদক, বেঙ্গলী	ব্যারাকপুর
খ) মতিলাল ঘোষ		সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা
গ) এ সি ব্যানার্জি	ব্যারিস্টার	কলিকাতা
ঘ) শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	ব্যারিস্টার	ভাগলপুর এবং কলিকাতা
ঙ) প্রাণকেষ্ট পাইন	বেনতভোগী আন্দোলনকারী	কলিকাতা
চ) সুকুমার সেন	"	"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছ)	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	অ্যাটর্নী	কলিকাতা
জ)	দেদার বকস	বেতনভোগী আন্দোলনকারী	
ঝ)	পরমেশ্বর লাল	ব্যারিস্টার	
ঞ)	আবদুল হোসেন	জমিদার	
ট)	এ রসুল	ব্যারিস্টার	
ঠ)	এস· এন· হালদার	ব্যারিস্টার	
ড)	রজত নাথ রায়	”	
ঢ)	জে· এন· রায়		
ণ)	কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ		
ত)	পি· কে· রায়চৌধুরী		
থ)	ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	জমিদার	
দ)	গজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জমিদার	৫১, রতন সরকার গার্ডেন, কলিকাতা।
ধ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	জমিদার	৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
ন)	হরিদাস হালদার	সম্পাদক	কলিকাতা
প)	এ· এইচ· গজনানী	জমিদার (ময়মনসিং)	”
ফ)	এ· কে· ঘোষ	ব্যারিস্টার	

আমরা লক্ষ্য করি নোবেল পুরস্কার পাবার পরও কবির নাম 'সন্দেহভাজন'দের তালিকায় ছিল। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তার পরেও কয়েক বছর আই বি 'র সিক্রেট অ্যাকস্ট্রাক্টে' বা উইকলি রিপোর্টে তিনি 'সাসপেক্ট', 'লেট সাসপেক্ট' বা 'একস-সাসপেক্ট'। ১৯১৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারির রিপোর্টে পর্যন্ত কবির নামের সঙ্গে ঐ মনোরম বিশেষণটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯১৫ সালের ১৩ই মের একটি সভা সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার এই মর্মে রিপোর্ট দিচ্ছেন

"আমি জানতে পেরেছি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের জন্য 'বেঙ্গল সোস্যাল লিগ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। মেয়ো হাসপাতালের ডাক্তার ডি· এ· মৈত্র ওর সম্পাদক হচ্ছেন। এজন্য ১৩ তারিখে রাত সাড়ে ৮টায় সাধারণী ব্রাহ্ম সমাজ হলে এক সভা হয়। 'টিকিট' দেখিয়ে সভায় ঢুকতে হয়। প্রায় ১২০০ ব্যক্তি এতে যোগ দেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভাষণ দেন

১) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সাসপেক্ট)
২) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সাসপেক্ট)
৩) ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (এক্স-সাসপেক্ট)
৪) ডঃ ব্রজেন্দ্র কুমার শীল (একস সাসপেক্ট) (অনূদিত)[১২]

এর কিছুদিন আগে বাংলা সরকারের কাউন্সিল সদস্য পি· সি· লায়ন সি· এম· আই, আই· সি· এস· চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে সাসপেক্ট' ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি জানতে চান কোন কোন কারণে সাসপেক্ট টাইটেল দেওয়া হয়ে থাকে ? তালিকাভুক্ত অনেকেই অতিশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আপাতত বৃটিশ রাজের বিরোধী নন, সেখানে তাঁদের সন্দেহভাজনের তালিকাভুক্ত করে রাখার যৌক্তিকতা কী তাই লায়ন জানতে চেয়েছিলেন—বিশেষত যে তালিকায় যখন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত (যিনি কিছুদিনের মধ্যেই নাইট উপাধি পেতে যাচ্ছেন) রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন।

Darjeeling
the 9th May, 1915.

"My dear Hughes Buller,

I have been looking through the Bengal list of Political suspects and should be much obliged if you let me know what has been done during

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

the past $2^1/_2$ years to keep it up-to-date, and especially in the matter of including the name of men do not now deserve special recognition under this title. The list seems to me to be a very long one but I do not of course, feel in a position to criticise it until I know more about it in detail. I have hopes, however, that it may prove possible to eliminate a certain number of names as the result of careful scrutiny.

In connection with this subject I would be much obliged if you would let me know whether the movements of all these people are recorded in police gazette, or whether those persons who are mentioned in the gazette belong to a more limited category.

It would be obviously of great advantage if we could reduce the number of those whom we are watching by a still further investigation into their title to our attention.

Yours sincerely,
sd/-P.C. Lyon."[১৩]

জবাবে চীফ সেক্রেটারি জানান যে সব ব্যক্তি রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরই 'সাসপেক্ট' বলা হয়।

Writers Buildings
The 13th Man, 1915

'Dear My Lyon,

The last edition of compilaton dealing with persons connected with the anarchical and revolutionary movement, was published on January the 6th last, after careful consultation with the local Superintendent and Magistrate. Names are eliminated and added from time to time as new editions appear

The movements of persons connected with anarchical and revolutionary movments, are not, to my knowledge, published in police gazette at all.

Probably, you refer to the secret abstracts, the practice is to enter the important movements of men whose names are in the list, should it be considered necessary for other S. P. or other special Branches to know. It is undersirable to inflate the secret abstract unduly.

Yours sincerely
R. Hughes-Buller.'

এ প্রসঙ্গ নিয়ে লায়নের সঙ্গে ফুলারের দীর্ঘদিন নোট ও ফাইল চালাচালি হয়। ১৯১৫ সালের ২৭ মার্চের নোটে লায়ন জানতে চান যে, কী কারণে রবীন্দ্রনাথের নাম ওই তালিকাভুক্ত হয়েছে?

"Please let me see the list. I doubt if we had any good cause for including Mr. Rabindranath Tagore in such a list."

এর উত্তরে ১৯১২ সালের জুলাই ভাইসরয় খুলনা কংগ্রেস ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে যে নোট দিয়েছিলেন তার প্রতি লায়নের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিশেষ করে খুলনা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য করার কথা উল্লেখ করা হয়। এর পর লায়ন এই মর্মে নোট দেন

"Thank you. I know the Bolpur case of course, but had forgotten his presidentship of the khulna Congress. He obviously became associated during the critical time after the partition. But he is well-known for other things and it is unnecessary to write 'ex-suspect' after his name."

অর্থাৎ লায়ন সাহেব রবীন্দ্রনাথকে নিষ্কলঙ্ক পুরুষ বিবেচনা করলেন না, বিশেষত যখন খুলনা কংগ্রেসে পৌরোহিত্য করার মতো অপকার্য করেছিলেন। বিশ্বভারতীতে বিপ্লবীকে চাকরী দেওয়ার অপরাধও ছিল। তবে ওসব পুরনো হয়ে গেছে। আর মানুষটি নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

গেছেন। সুতরাং 'প্রাক্তন' সন্দেহভাজন বিশেষণ এবার তুলে দেওয়াই ভালো।

এরপর তিনি চীফ সেক্রেটারিকে এই মর্মে নোট দেন, 'ইয়েলো বুকের সিক্রেট অ্যাবস্ট্রাক্টে অনেক অপ্রয়োজনীয় নাম আছে, এই তালিকা অনাবশ্যক বড়।'[১৪]

তারপর এই সিক্রেট অ্যাবস্ট্রাক্ট তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ যায়। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাংলা সরকারের রোষ কত যে তীব্র ছিল, তার একটা বড় প্রমাণ নোবেল পুরস্কার পাবার পর যখন কবিকে ভারত সরকার সম্মানিত করতে আগ্রহী হন, তখন বাংলা সরকার আপত্তি তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে একবার বিদেশ যাওয়া অনুমতি দেওয়াও হয়নি নাইট উপাধি পাবার পরেও। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে তিনি বিদেশ যাবার মনস্থ করেন। সুহৃদ অ্যান্ড্রুজ কবিকে অস্ট্রেলিয়া যাবার অনুরোধ করেন। পাসপোর্ট তাঁর ছিলই। সরকার কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ কাউকেই বিদেশ যেতে দিতে ইচ্ছুক নন। সিমলার ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স দফতরের সি আর ক্লিভল্যান্ড ১৯২৮ সালের ২৭শে জুন বাংলার পদস্থ আমলা হেনরি হুইলারের কাছে এক অত্যন্ত গোপনীয় বার্তা পাঠালেন

"প্রিয় হুইলার,

আমেরিকাবাসী সিমুরের (Saymour) কাছে লেখা অ্যান্ড্রুজের একটি চিঠি হস্তগত হওয়ায় জানা গিয়েছে যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা যাওয়ার জন্য স্যার আর টেগোর এবং অ্যান্ড্রুজ মনস্থ করেছেন। আপনাকে চিঠিখানি আমি এই কারণে লিখছি যে, এঁরা দুজন যেন শেষ মুহূর্তে পাসপোর্টের জন্য আপনার কাছে আবেদন না করে বসেন। ব্যক্তিগত ভাবে এই পাসপোর্ট তাঁদের না দেওয়াই আমার ইচ্ছা। অ্যান্ড্রুজের বিচারবুদ্ধি নৈরাশ্যজনকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং ভবিষ্যতে তিনি যে বোকার মত কী পর্যন্ত ক্ষতিসাধন কাজ করে বসবেন, তা কেউই অনুমান করতে পারে না।

আপনার বিশ্বস্ত

সি আর ক্লিভল্যাণ্ড[১৫]

এর আগে জাপান ও আমেরিকা গিয়েছিলেন কবি। তিনি নাকি জাপানে বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থনে ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন। নিউইয়র্ক টাইমস-এর কোনো এক সংখ্যায় বেরিয়েছিল, 'এ ব্রিটিশ নাইট কন্স্পায়ার্স এগেনস্ট ব্রিটেন।' ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশনে স্যার ইউলিয়ম ভিনসেন্টও কবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে। 'মাদ্রাজ মেলের' সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয় যে, কবি যদি এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না থাকেন, তাহলে সরকার ও জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনে যা কিছু বলার আছে তা তাঁর প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

কবির বিরুদ্ধে এইসব প্রচারের উৎস গোয়েন্দা দফতরের হাতে আসা একটি পত্র। চিঠিখানির বয়ান "স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি জানান যে তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন জাপ প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা এবং প্রধানমন্ত্রী তেরাউচির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তেরাউচি নাকি খুব সহানুভূতিশীল। স্যার রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য মাঝারি স্তরের জাপ অফিসারদের সঙ্গেও পরামর্শ করেন।

চিঠিখানিতে প্রেরকের নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তি অনুমান করা হয় যে, গদর দলের অন্যতম প্রভাবশালী কর্মী ডাক্তার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত হয়েছিল এবং আমস্টার্ডামি নিবাসী জেড এন ডি অলিফিয়ার্স-এর কাছে প্রেরিত চিঠির বয়ান অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ কি সত্যই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রবলভাবে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেন। আমেরিকায় এই মামলা চলার সময় সরকার পক্ষের উকিল প্রসঙ্গত কবির নাম উল্লেখ করেন। এই সংবাদ জেনে রবীন্দ্রনাথ তার যোগে প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠান "সানফ্রানসিসকোতে ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কিত খবর সংবাদপত্রের মারফৎ পাওয়ার পর জানতে পেরেছি যে উপরোক্ত মামলাতে বিবাদী পক্ষের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে। আমি আপনার এবং আপনার দেশবাসীর কাছে থেকে এই রকমের মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাকে রক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। বস্তুত আপনাকে এবং আপনার দেশবাসীকে এটা জানিয়ে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করি যে, আপনাদের আতিথেয়তা এমন কারো ওপরে বর্ষিত হয়নি যে ব্যক্তি তার সুযোগ নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য পাতাল পথের নর্দমায় গড়াগড়ি দিতে প্রস্তুত।" গদর দলের সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মত বিরোধ হয়, সে কথা সর্বজনবিদিত। ১৯১৮ সালে জুনে মডার্ন রিভিউয়ে বিস্তৃত লেখাও হয়েছে। এমনকি শোনা যায় উল্টোপক্ষে আমেরিকার বিপ্লববাদী ভারতীয়দের দিক থেকে কবিকে আক্রমণের আশঙ্কাও করা হয়েছিল। (১৬)

দীর্ঘদিন জীবিত এবং জাতীয় আন্দোলনের নানা পর্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে গোয়েন্দা দফতরের মন্তব্যের পরিমাণ বিপুল—তার পুরো বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই। আমি কেবল সরকারী মনোভাব বোঝাবার জন্য প্রথম পর্বের গোয়েন্দা বিবরণীর কিছু নমুনা হাজির করেছি। পরে যখন রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ছেড়েছেন, তারও পরে নানাভাবে সরকারী উৎপীড়নের প্রতিবাদ করেছেন, তখন সরকারী নথির পরিমাণ ক্রমেই বেড়েছে। এখানে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন—রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের রূপ দেওয়া কেননা আমাদের আলোচ্য—নিষিদ্ধ রচনা।

তার আগে দেখে নিতে পারি, 'কণ্ঠরোধ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ সিডিশন আইনের প্রতিবাদে টাউন হলে জনসভায় 'কণ্ঠরোধ' নিবন্ধ পড়েছিলেন

"অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙ্গালীর ভাষা, দুর্বলের ভাষা, তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না, এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি। কারণ যাহাই হউক না কেন, যে ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না এবং যে ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা, আমার কোন্ ভাব হইতে কী কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি সুদুঃসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত না দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদগীরিত, তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

"আমি বিদ্রোহী নই, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই। কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা স্পষ্টরূপে জানি না এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থলে দুর্বল জীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমন স্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়াই থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদবুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই একটা লক্ষণ তখন হইতে দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী, যাঁহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন, তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাগরোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন—দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন। সে সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাক বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে, 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ' তথাপি যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছি তখন ভীত বন্ধুদিগের কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।"[১৭]

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ অজস্র দেশাত্মবোধক, গান কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখলেও তাঁর কোনো লেখা নিষিদ্ধ হয়নি। তার সম্ভাব্য কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় সরাসরি উস্কানি ছিল না বা স্বদেশী আন্দোলন সমাপ্ত হবার অল্পদিনের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন (যাঁকে ঘাটালে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিক্রিয়া ঘটবে) এসব কথাও বলেছি। তবে দেখা যায়, তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইংরাজী অনুবাদের বিরুদ্ধে সরকারী নির্দেশ ছিল, সরাসরি ভাবে নয়—পরোক্ষ ভাবে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে জানানো ভালো—রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক রচনা সম্বন্ধে দেশপ্রেমিকদের ছিল মিশ্র মনোভাব। একদিকে যেমন তাঁর গান বা কবিতা থেকে দেশপ্রেমিকরা প্রেরণা পেয়েছেন, অপর দিকে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত বিপ্লবী চরিত্র অথবা প্রবন্ধে ব্যক্তি মতামত সম্বন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা (অন্তত তাঁদের একাংশ) তীব্র বিরাগ বোধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ঘরে বাইরে, চার অধ্যায় বা জাপানে প্রদত্ত ন্যাশনালিজম সংক্রান্ত বক্তৃতা ইত্যাদি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিও করেছিল। এসব ব্যাপারে সরকার অবহিত ছিলেন বলেই ধরে নেওয়া যায়। তাঁর রচনার বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে সরাসরি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অন্যতম কারণও এখানে থাকতে পারে।

রাশিয়ার চিঠি

'রাশিয়ার চিঠি' ১৯৩১ সালে গ্রন্থাকারে বের হয়। তার আগে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। 'রাশিয়ার চিঠি'তে কবি ভারতে ইংরেজ শাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ১৯৩০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ মস্কো থেকে লিখেছিলেন

"ভেবে দেখ না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড় কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে ? তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।" (রাশিয়ার চিঠি)

একদিকে ভারতে ইংরেজ শাসনের নিন্দা অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার প্রশংসা। রাশিয়ার চিঠির উপসংহারে এক জায়গায় কবি লিখেছেন

"রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণের মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি।"

রশিয়ার চিঠিতে কবি বার বার ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত ও রাশিয়ার তুলনা করেছেন—

"আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয়, এ জন্যে আমাদের মন্দভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলাম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলাম সে শিক্ষা বুঝি একটুখানি পড়া, লেখা ও অঙ্ক কষা—কেবলমাত্র মাথা গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্ত করে এম এ পাস করবার মতন নয়।"

এটি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ এ লেখা। অন্যত্র লিখেছেন :

"রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এত বড় সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারিনি। কেননা, শিশুকাল থেকে আমরা যে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' এর আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি। (১ অক্টোবর, ১৯৩০)

আর এক জায়গায় কবি লিখেছেন

'প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল—এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। নিজেদের দেশের অতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশী করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় দড়ি ছিড়েছে, চাকা ভেঙ্গেছে। দেশের হতভাগ্যদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি, কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছি ; তাঁরা বাহবাও দিয়েছেন : যেটুকু ভিক্ষে দিয়েছেন,তাতে জাত যায়, পেট ভরে না।'

ভারতের ইংরেজ শাসনের কঠিন সমালোচনা অব্যাহতভাবে চলেছে :

"কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালা ডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশগামী মুনাফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনাফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল,—এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য রাজকোষে টাকা নেই। কেন নেই ? তার প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায়, এপারের জলাশয়ে, আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে ওপারের দেশে—যে দেশে হাসপাতালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত, অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।"

'রাশিয়ার চিঠি' থেকে এমন উদ্ধৃতি আরও অনেক দেওয়া যায়। নানা দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের পর রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। সতের দিন মস্কো থাকাকালে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার নানাদিক দেখেন। লেখক, বিজ্ঞানী, জননেতা, শিল্পী, অভিনেতা, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক—সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আত্মীয় ও স্বজনদের কাছে লেখা এইসব চিঠি প্রথম বের হয় প্রবাসী পত্রিকায়। পরে ১৯৩১ সালে গ্রন্থাকারে বেরোয় 'রাশিয়ার চিঠি' নামে।

যে 'রাশিয়ার চিঠি'তে ভারতে ইংরেজ শাসনের এরকম কঠোর সমালোচনাআছে, তা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের রোষে পড়াই স্বাভাবিক। মূল বাংলা 'রাশিয়ার চিঠি'র বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা না নিলেও এর ইংরাজী অনুবাদকে ছাড় দেয়নি, 'মডার্ন রিভিউয়ে'র যে সংখ্যায় রাশিয়ার চিঠির অনুবাদ বের হয়েছিল, সরকার সে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে এবং পরবর্তী প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে বলে জানা গিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের সঙ্গে যখন রাশিয়ার মৈত্রী (মিত্র পক্ষ) হয়, তখন বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরাজী Letters From Russia থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের গোপন ফাইলে সে তথ্য আছে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের সমর্থনে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৪১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 'যৎকিঞ্চিৎ' কলমে লেখা হয়

"ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশবাসী ও গভর্নমেন্টকে একটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর পূর্বে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই বইয়ের ইংরাজী অনুবাদও Letters From Russia নামে প্রকাশিত হয়। গভর্নমেন্ট এই ইংরাজী অনুবাদ বইখানি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, যদিও মূল বাংলা বই সরকারী মতে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থে রাশিয়া সম্পর্কে বহু প্রশংসার কথা ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই ইহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়া থাকিবে। কিন্তু কেবল ইংরাজী অনুবাদ সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হইল কেন ? রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার প্রশংসা করিয়াছেন। এই কথাটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যাহাতে জানিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐরূপ আদেশ জারি হইয়াছিল ? সে যাহা হউক রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি অপমানসূচক এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। সোভিয়েট গভর্নমেন্টের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এখন মৈত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ আদেশকে জীয়াইয়া রাখিলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সভ্য জগতের নিকট নিন্দার্হ হইবেন।"[১৮]

একটি প্রশ্ন–Letters From Russia কি আদৌ পৃথক বই হিসাবে বের হয়েছিল ? এবং ওই নামে কোন গ্রন্থ কি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ? কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নোটে কিন্তু Letters From Russia নিষিদ্ধ হবার কথা স্বীকার করা হয়নি। আনন্দবাজার পত্রিকার ওই সম্পাদকীয়ের অল্পদিন পরে (১৮ই অক্টোবর, ১৯৪১) পুলিশ কমিশনার এই মর্মে নোট দেন 'There are no records either in SB or DD to show that English translation of Rabindranath Tagore's Letters From Russia was proscribed."[১৯]

সরকারী ফাইল থেকে এ সম্পর্কে আর একটি নোট পাওয়া গিয়েছে। তাতেও 'লেটারস ফ্রম রাশিয়া' নিষিদ্ধ করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। সেটি হল ১৯৪১ সালের ৬ই নভেম্বরের। তার বয়ান 'It may be noted in this connection that a book in Bengali entitled,

'সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি' was proscribed under this Department notification No. 24934 dated 11.8.36. Presumably this Editorial article of Ananda Bazar Patrika has been written under mis-apprehension. No further action is perhaps called for in this file which may be closed."[২০]

এখানে রবীন্দ্রনাথের Letters From Russia নিষিদ্ধ করার কথা স্বীকার করা হয়নি।

আরও প্রশ্ন 'রাশিয়ার চিঠি'র সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ পৃথক পুস্তকাকারে ইংরেজ আমলে কি এদেশে ছাপা হয়েছিল ? 'লেটার্স ফ্রম রাশিয়া' সম্বলিত মডার্ন রিভিউর উল্লিখিত সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হবার পর স্বাধীনতার আগে আর কোথাও 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরাজী অনুবাদ বের হয়েছি কি ? সাহিত্য আকাদামি (১৯৬১ সালে) প্রকাশিতRabindra Nath Tagore-A centenary volume

অনুযায়ী— তা হয়নি-ঐ গ্রন্থে আছে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে Letters From Russia (রাশিয়ার চিঠির ইংরাজী অনুবাদ) প্রথম প্রকাশিত হয়। কলকাতায় বিশ্বভারতী এটির প্রকাশক। অনুবাদ করেন শশধর সিংহ।[২১]

সে যাই হোক, রাশিয়া ভ্রমণ কবিকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল যে 'রাশিয়ার চিঠি'র দশ বছর পরও কবি যখন 'সভ্যতার সংকট' লেখেন, তখন বারবার বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের দুরবস্থার তুলনা করেছেন ; 'বহু সংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে।'

কবির যখন বয়স সত্তরের কাছাকাছি তখনকার লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'। আর এই 'সভ্যতার সংকট' কবি লিখলেন তাঁর ৮০তম জন্মদিনে, ১৯৪১ সালের মে মাসে, মৃত্যুর কয়েক মাস মাত্র আগে। এটিই তাঁর জীবনের শেষ নিবন্ধ। এ থেকে দেখা গেল রাশিয়া কি বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে। জীবনের এই শেষ নিবন্ধে তাই তিনি একাধিকবার রাশিয়ার কথা বলেছেন এবং 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে' যারা 'কাজ করে' তাদের কথা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার অধ্যায়

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তার জের এখনো মেটেনি। বাংলার রাজনৈতিক মহলের একাংশ বিশেষতঃ বিপ্লবীরা এই উপন্যাস পড়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই প্রতিক্রিয়ার কিছু সংবাদ আমরা উপস্থিত করেছি।

এখানে বিস্ময়কর সংবাদ এই, রবীন্দ্রনাথকে বোঝানো হয়েছিল—,সরকার তাঁর এই গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন

"মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া কবি তাঁহার উপন্যাস 'চার অধ্যায়' প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। খৃষ্টমাস-সপ্তাহে উহা বাহির হইল ; পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে দক্ষিণ ভারতে 'চার অধ্যায়' লেখেন কয় ফরমা ছাপাও হয় ; কিন্তু পছন্দ হয় না বলিয়া বাদ যায়। তারপর লিখিয়া কাটিয়া বই ছাপাইলেন গল্পের বিষয়বস্তু বাংলার বিপ্লব সংক্রান্ত : লোকে বলিল, বই গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন। ছাপা বই পড়িয়া থাকিল কয়েক মাস। তারপর বন্ধু-বান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কবি বই প্রকাশ করিলেন।"[২২]

বস্তুতঃ গ্রন্থটি সরকারের কাছে বিরূপতা নয় পক্ষপাতের কারণ হতে পারে। তেমন সম্ভাবনার কথা জনচিত্তেও উঠেছিল, একথা প্রভাতকুমার তার পরেই লিখেছেন : "বই বাহির হওয়া মাত্র দেশের মধ্যে ভীষণ একটা আন্দোলন সৃষ্টি হইল। এই বই সম্বন্ধে যে পরিমাণ সমালোচনা হইয়াছে তাহা 'ঘরে বাইরে'র পর কবির অন্য কোন বই সম্বন্ধে হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে সকল কপি বিক্রীত হইয়া যায়। লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গভর্নমেন্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লব দমনের জন্য এই বই উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে। ইহা নিষিদ্ধ পুস্তক হইতে পারে আশঙ্কায় প্রকাশ বন্ধ রাখা হইয়াছিল ; পরে প্রকাশিত হইলে শোনা গেল যে, ইহা সরকারের বিপ্লব দমনের প্রচার পুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আসলে রচনাটি একটি গল্পমাত্র, গল্প ও সাহিত্য হিসাবেই ইহা বিবেচ্য।"[২২] *

শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি গত ১৪-১২-৮১ তারিখে তাঁর বাসভবনে দেখা করি এবং চার অধ্যায় সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি জানান "রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছিলেন, চার অধ্যায় সরকার নিষিদ্ধ করতে পারে।"

শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একাধিক পত্রে কবি 'চার অধ্যায়' নিষিদ্ধ হবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৪ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন, 'চার অধ্যায়' গল্পের গোড়ায় একটা সূচনা লেখা হয়েছে—সেটা তোমাকে পাঠাব। ইতিমধ্যে স্থির করেছি বইটা এখানে প্রকাশ করে দেব। দেখাই যাক না কী পরিণাম হয়। কিন্তু তাই বলে তোমার তর্জমায় ঢিল দিয়ো না। যদিই এখানে ওরা এটা বন্ধ করে দেয় সেখানে ওটা প্রকাশ চলবে। একথা ওদের বোঝা উচিত সমস্ত গল্পটাই বৈভীষিক রাষ্ট্র উদ্যমের বিরুদ্ধে।"[২৩]

এর পক্ষকাল পরেই কবি আবার ওই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৫ সালের ৬ই জানুয়ারী অমিয় চক্রবর্তীকে শান্তিনিকেতন থেকে যে চিঠি লেখেন তাতেও ওই আশঙ্কা আছে :

"কল্যাণীয়েষু, 'চার অধ্যায়' প্রকাশ করে দিয়েছি। বিশ্বাস করিনে কর্তারা ওটা বন্ধ করে দেবে—বন্ধ করবার ন্যায্য কারণ কিছু মাত্র নেই, তৎসত্ত্বেও যদি উপদ্রব করে সেটা বোকামি হবে। বোকামির বিরুদ্ধে সতর্ক হবার দরকার বোধ করিনে। যাই হোক, বইখানা যখন প্রকাশিত হোলোই তখন ওটা তর্জ্জমা করবার কোনো হেতু রইল না।"[২৪]

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই স্বীকার করেছেন—

১) চার অধ্যায় নিষিদ্ধ করার সঙ্গত হেতু নেই, কারণ বইটি বৈভীষিক রাষ্ট্র উদ্যমের বিরুদ্ধে।

২) এমন বই নিষিদ্ধ করা বোকামি।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর উল্টোপ্রান্তে আছেন। শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা উপরিউক্ত চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বার বার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, আপত্তি উঠবে দেশের লোকের পক্ষ থেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১২ এপ্রিল, ১৯৩৫, রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। অমিয় চক্রবর্তীকৃত চার অধ্যায়ের প্রাপ্তি স্বীকারের পরে তিনি লেখেন, "আমি কবি, এইটেই হল আমার প্রথম ও শেষ কথা। আর যেসব আমার কাঁধে ভর করেছে সেগুলো সব বাহ্য। বটগাছে বাঁদর লাফায়, পাখী বাসা বাঁধে, কিন্তু বটগাছটা তাদের বাদ দিয়েই। আমি গল্প লিখে থাকি—তার সদ্য প্রমাণ চার অধ্যায়। কিন্তু আমি যখন কবিতা নিয়ে পড়ি তখন মনে হয়, ওগুলো পরগাছা, শিকড় নেই অন্তরে। চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠকদের ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক খাঁটি গদ্যের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা—নভেলের নির্জ্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরী হবে।...তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই তর্জ্জমাটা দেখেছেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁরা কী বিচার করেন জানতে ইচ্ছা করি। সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে তাঁদের ঔৎসুক্যের কারণ আছে সে হচ্ছে আধুনিক বাংলার বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের একটুকরো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অন্তত কবির তরফে এটাতে আমার নিজের কোন দরদ নেই—আমার দরদ হচ্ছে এলা অন্তুর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী।...

প্রথম যখন ইংরেজীতে তর্জমার কথা উঠেছিল তখন সংশয় ছিল সরকার বাংলায় ওটা চলতে দেবে কিনা। সে সম্বন্ধে আশঙ্কা নেই। বস্তুত আপত্তি উঠবে দেশের লোকের পক্ষ থেকেই।"[২৫]

গোপন সরকারী ফাইল ও নথিপত্রে পদস্থ আমলাদের নোট ও মন্তব্য থেকে 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে সরকারের পরস্পর বিরোধী মনোভাব জানা যায়। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের গোপন ফাইল থেকে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ সরকার 'চার অধ্যায়ের' প্রচার বন্ধ তো চানই নি, বরং বহুল ও ব্যাপক প্রচার চেয়েছিলেন। বাংলায় বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য মেজর সি জি ব্রেনান ১৯৩৫ সালের ৮ এপ্রিল যেসব সুপারিশ করেন, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে 'চার অধ্যায়'কে নাট্যরূপ দিয়ে শহরে ও গ্রামে তার ব্যাপক প্রচার ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হোক।' অথচ এর কিছুকাল আগেই বিপ্লবীদের বিষয় নিয়ে লেখা বলে এই 'চার অধ্যায়'ই বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেন তৎকালীন বাংলা সরকারের পাবলিক প্রসিকিউটর। মনে হয় তিনি চার অধ্যায় বিপ্লব বিরোধী মনোভাব তৈরী করার ব্যাপারে কতখানি সহায়ক হতে পারে তা অনুধাবন করে উঠতে পারেননি। কিন্তু অনুধাবন করার মতো লোক সরকারে ছিলই। আমরা দেখি কয়েক মাস পরেই বাংলা সরকারের এক পদস্থ আমলা 'চার-অধ্যায়'-এ বিপ্লব আন্দোলনের দুর্বলতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে সশস্ত্র আন্দোলনের মোকাবিলায় এর ব্যাপক প্রচার চেয়েছিলেন। কলকাতা ও জেলায় জেলায় চার অধ্যায়ের অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব তিনি করেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ জানতেন সরকারের তরফে বইটিকে বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গত কারণ নেই—তবে যদি নির্বোধ আমলারা গ্রন্থটির তাৎপর্য না বুঝে বাজেয়াপ্ত করে ফেলে, সে ভিন্ন কথা।

নিষিদ্ধ হবার আশঙ্কায় ছাপার পরও চার অধ্যায় অবিলম্বে প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ হয়। 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর সঙ্গে 'চার অধ্যায়ে'র ইন্দ্রনাথের অনেক মিল। রবীন্দ্র-জীবনীকারের ভাষায় "বাংলা দেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবকাহিনীর পটভূমিতে কাহিনী পত্তন। ইন্দ্রনাথ ইহার কেন্দ্র, কবি ইন্দ্রনাথকে করিয়েছেন খানিকটা সবজান্তা, সব বিষয়ে পণ্ডিত সর্বকর্মা,—যেমন 'পথের দাবী'র সব্যসাচী। ইন্দ্রনাথ দিগগজ বিজ্ঞানী, সমস্ত যুরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ব দুই-ই জানেন। ফরাসী জারমান ভাষায় সুপণ্ডিত। আবার ডাক্তারী পাশ, জুজুৎসু বীর, গীতাও আওড়ান...ইন্দ্রনাথ বিপ্লবের নেতা ; স্বভাব দুর্দমনীয়। নির্মম হইতে তাহাকে বাধে না ; বিপ্লব সৃষ্টির জন্য উৎসুক কিশোর ও যুবকের দল তাহার পাশে জমা হয় ; আটকা পড়ে তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। তাহাদের দিয়া 'রাজনৈতিক' ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি চালনা করেন ; এ সবের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ—দলের কাজের জন্য। ইন্দ্রনাথ বলেন,—তাঁহার সমস্ত কাজ ইমপার্সোনাল অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত নাই। তিনি বলেন, হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার ডাক শুনে কত মানুষের মত মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল। ...গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মত মরতে পারাও যে একটা সুযোগ। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধ মনে স্বীকার করে নিতে পারি।... ডুবো জাহাজে ঝড়ের মুখে যে চারজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমার জিত।' তারপরে গীতার কথা বলেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অর্থাৎ কাহার শাক ভুট্টার ক্ষেত জলে ডুবিল, সে চিন্তা 'বিভূতির (মুক্তধারা) নয়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাল-মন্দের বিচার, লৌকিক ধর্মাধর্মের খুঁৎখুতানি এই শ্রেণীর নেতার মতে দুর্বলতার চিহ্ন অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায়, অতএব রাজনীতির নামে unscrupulous হওয়ায় অধর্ম হয় না।'

এই ইন্দ্রনাথ চরিত্রের জন্যই হয়তো আশঙ্কা করা হয়েছিল 'চার অধ্যায়' নিষিদ্ধ হতে পারে। এটি প্রকাশিত হবার এক বছরের মধ্যেই বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৩৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ দিল্লীতে এই গোপন রিপোর্ট 'A Note on Rabindranath's political Opinion' পাঠান।"

"Dr. Rabindra Nath Tagore who does not make use of his title of knight, enjoys an international reputation as a poet, philosopher and authority on Indian culture. On the one hand, he came prominently to notice as anti-partition agitator (of 1905) and since then has been hostile to Government. He has given Bengal many of his national songs.

A very recent source report from Calcutta alleges that he is now more....anti-Government than he was in the past, and states that this is apparent in a novel which he has recently published. It is alleged that the novel 'has entolled the revolutionary cult of Bengal'. The Calcutta special branch review of the novel is below, together with the opinion of the Public Prosecutor ,Calcutta. He has recommended the forfeiture of the book under the Press Emergency Powers Act, 1931. The view he has taken when considered with the reaction of an agent to the book, leaves one with no doubt that its effect in Bengal must be harmful. This is what one would expect with to any Bengali novel in which the hero and heroine are terrorists.

From the police point of view, it is undesirable that a man with political views such as these held by Dr. Tagore, should be asked to give the convocation address at an Indian University. I suggest that it would be unwise to tender an invitation to an author whose work may be forfeited. I note, however, that a similar invitation has already been extended to him by the Aligarh university.[২২৬]

বলাই বাহুল্য, এরপর রবীন্দ্রনাথকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। উদ্ধৃত নোট সত্ত্বেও বলতে হবে, সরকার পক্ষ সাধারণভাবে চার অধ্যায়কে ক্ষতিকর নয়, উপকারীই ভেবেছিল, তা দেখা যায় মেজর সি জি ব্রেনানের সুপারিশগুলি থেকে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনের জন্য ঐ ব্যক্তি ১৯৩৫ সালের ৮ এপ্রিল কয়েকটি সুপারিশ করেন। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের তৎকালীন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এস এন রায় আই সি এসকে লেখা এক পত্রে তিনি সেগুলি জানান। বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রেস) বিভাগের গোপন ফাইলে সে তথ্য আছে। জবরদস্ত জঙ্গী ব্রিটিশ আমলাটি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন—তিনি সন্ত্রাসবাদের সাংস্কৃতিক মোকাবিলার সুপারিশ করেছিলেন। যে কয়েক দফা ব্যাপক কর্মসূচীর প্রস্তাব তিনি করেন, তার একস্থানে বলা হয়েছে, চার অধ্যায়কে নাট্যরূপ দিয়ে শহর গ্রামে তার ব্যাপক প্রচার ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হোক। মেজর ব্রেনানের সুপারিশের প্রাসঙ্গিক অংশ এই:

"Arrangements have already been made for the staging of play to

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

oppose the cult of terrorism and civil disobedience.

Dr. Rabindranath Tagore has also recently been persuaded through the Assistant Director of Public Instruction, Bengal to dramatise one of his books 'Char Adhyaya' which delivers a powerful attack on the cult of terrorism. When ready copies will be distributed to District Officer in the same manner as Patha-Bhrasta, and it is also proposed to make an attempt to make it staged in the first class theatre in Calcutta like Rangmahal and Natya Nikatan.[২৭]

মেজর ব্রেনানের সুপারিশ অনুযায়ী সত্যই রবীন্দ্রনাথকে চার অধ্যায়ে নাট্যরূপ দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। উপরিউক্ত ফাইল থেকে পদস্থ সরকারী আমলার নোট থেকে এইটুকু তথ্য শুধু পাওয়া যায়

'I have asked Mr. Chanda to request Dr. Tagore to dramatise the novel. Mr. Chanda has agreed to do so.' Sd. S. Basu. 11.5.1935.[২৮]

বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন

'পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আত্মবিকাশের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিকতার আত্মঘাতী, অচেতন যন্ত্রশক্তির ন্যায় মূঢ় প্রচেষ্টার প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না। কাজেই তিনি ইহার দুর্বলতা, আত্মপ্রতারণা, সুকুমার অনুভূতি ও উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সহিত অসামঞ্জস্যের উপর তীক্ষ্ণ শ্লেষ করিয়াছেন।'[২৯]

চার অধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে কিছু দ্বিধা আছে মনে হয়। বইটিতে যে সুস্পষ্টভাবে বৈপ্লবিক নীতির বিরোধিতা করা হয়েছে, একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তার থেকে দেখা যায় বইটির রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। উল্টোদিকে আবার তিনি নিছক প্রেমকাহিনী হিসাবে বইটির মূল্যায়ন দাবি করেছেন। সে বিষয়ে লিখেছেন

"চার অধ্যায় রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেশেব বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লব বর্ণনা অংশ গৌণ মাত্র : এই বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।"[৩০]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার অধ্যায় নিয়ে বিতর্ক

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের তরফ থেকে যে প্রতিবাদ আশঙ্কা করেছিলেন, তা সত্যই এসেছিল। এদেশের জনসাধারণের একাংশ তীব্রভাবে মনে করেছিল রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অনুচিতভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে আক্রমণ করেছেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে ভূমিকায় তাঁর মন্তব্য গর্হিত (পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাটি প্রত্যাহারও করেন।) এ বিষয়ে পত্র পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় উঠে। গ্রন্থটি সম্পর্কে বিপ্লব আন্দোলন সমর্থকদের বিরূপতা অপর পক্ষে সরকার পক্ষের উল্লাসের কারণ হয়েছিল। সেই কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কিছু তথ্য আমরা উপস্থিত করছি। যদিও প্রতিবাদের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

সমকালে এই 'চার অধ্যায়' নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিতর্ক উঠেছিল ব্রহ্মবান্ধবের জন্য। রবীন্দ্রনাথই এর সূত্রপাত করেন প্রথম সংস্করণের 'আভাসে' ব্রহ্মবান্ধবের প্রসঙ্গ তুলে। তিনি লেখেন "একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত এখন সেইপত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। আধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠাও আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

"শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রাম পথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

"এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালী জাতকে রুশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল।বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলেন। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশ আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতোবড় প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

"এই সময় দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাত হয়নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

"নানাদিকে নানা উৎপাতের উৎসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্তার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে একলা বসেছিলাম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্ব্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে," এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

"এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা, উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।"

চার অধ্যায়, বিশেষতঃ এর আভাস বা ভূমিকা সাময়িক পত্রে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। প্রবাসীর মাঘ, ১৩৪১য়ের সংখ্যায় 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে রাজশেখর বসু লেখেন 'এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ মৌচাকে কাঠি দিয়েছেন ; তার ঝঙ্কার শোনবার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।' প্রবাসী সম্পাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে বিবিধ প্রসঙ্গে লেখেন।[৩২]

'প্রবাসী'তে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এইসব অভিযোগের জবাব দিলেন। তিনি ১৩৪২ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন নীচে তা দেওয়া হল

"আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্য বিচারের বাইরে পড়ে গেছে।এটা স্বাভাবিক , কারণ, এই গল্পে যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্র চেষ্টা আলোড়িত বর্তমান বাংলা দেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এই জন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে যুক্তভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয় মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন সাহিত্য রূপ স্পষ্ট হতে পারে।

"এই রচনা সম্বন্ধে লেখকের তরফ থেকে আমার যা বক্তব্য সেটা বলে রাখি। বইটা লেখবার সময় আমি কী লিখতে বসেছিলুম সেটা আমার জানা। সুতরাং এই ব্যক্তিগত খবরটা আমিই দিতে পারি ; সেটা কী হয়ে উঠেছে সে কথা পাঠক ও সমালোচক আপনবুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বিচার করবেন। সেই বুদ্ধির মাত্রাভেদ ও রুচির বৈচিত্র স্বাভাবিক, সুতরাং আলোচনা হতে থাকবে নানা ছাঁচের ও নানা মূল্যের। কালের উপর নির্ভর করে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই লেখকের কর্তব্য।

"যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালবাসা। নরনারীর ভালবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয়, চারিদিকের অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষরূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবোধ। এই দুইয়ে মিলে সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সংগেই দেখাতে হয়েছে যে অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ। "বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্র প্রচেষ্টার নানা সংঘটনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা ও তার কিছু কিছু আভাস নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তাহলে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক, গল্পের ভূমিকা রূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। খ্রীষ্টানও যদি **কুমারসম্ভব** পড়তে চায় তাহলে কালিদাসের বর্ণিত হরপার্বতীর আখ্যানকেই তার সত্য বলে জানা চাই, তা নিয়ে ধর্মতত্ত্ব ঘটিত তর্ক চলবে না। এই পৌরাণিক আখ্যানে সাংখ্যাতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হয়েছে কি না সে প্রশ্ন উত্তর দেবার যোগ্যই নয়, আসল কথাটা এই যে, এই আখ্যানের ভূমিকায় হরপার্বতীর প্রেম ও মিলনটাই মুখ্যভাবে গোচর। এমনকি কুমারের জন্ম বিবরণকেও কালিদাস উপেক্ষা করেছেন। যদি কোনো পাঠক বলেন আমার গল্পের ভূমিকা কোনো কোনো অংশে বা অনেক অংশে আমার স্বকপোলকল্পিত তাহলে গল্প লিখিয়ে হিসাবে সে অভিযোগ মেনে নিলেও ক্ষতি হবে না। ইন্দ্রনাথ দ্বারা চালিত প্রচেষ্টার কী পরিণাম হল, কী হল বটুর বা কানাইয়ের সে সংবাদটাকে কোনো স্থান দেওয়া হয়নি, উপসংহারে একমাত্র ব্যঞ্জনা অস্তু – এলার প্রেমের, এই উপসংহারের দ্বারা ওই প্রেমের রূপটিকেই সম্পূর্ণতা দেওয়া হল।

"গল্পের উপক্রমণিকার উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল-এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এবং সে এলাকে পেল না আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রাণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

হতে পারে এই আশা করেছিলুম। তা থেকে গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভাল।

"একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরের প্রকৃতি। একথাটি প্রণিধান-যোগ্য সন্দেহ নেই।

"আর একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লব চেষ্টা সংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাকত তাহলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলেছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্যে এই সব হত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এসকল মতের কোনো কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব "এহ বাহ্য"। একথাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই। কোনো মত প্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তা হলেই সেটা হবে অপরাধ।

"যদি কোন অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও নিজের ব্যক্তিত্বের কোনো ইঙ্গিত প্রকাশ পায়নি এমনতরো অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

"অবশেষে সংক্ষেপে আমার মন্তব্যটি জানাই : চার অধ্যায়ের কোনো মত বা উপদেশ আছে কি না সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা অংশ গৌণ মাত্র ; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটিতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়তের পরও চার অধ্যায় নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি। ১৯৩৫ সালের ১১ মে'র সংখ্যায় 'দেশে' রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করেন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে 'কবি সাহিত্যের কমলবনে পদ্ম তুলিতে গিয়া অযথা কাদা ঘাঁটিয়াছেন।' তিনি লেখেন

"বৈশাখের 'প্রবাসী'তে কবি লিখিয়াছেন, "চার অধ্যায়ের রচনায় কোন বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক।" অতঃপর প্রবন্ধের শেষ লাইনে সাময়িক পত্রগুলির প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিয়া লিখিয়াছেন "তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ" চার অধ্যায়ে কেবল যদি রসের কথা থাকিত তবে উহা লইয়া সংবাদপত্রে বিশেষ কোন কথা উঠিত না। কিন্তু রসের রঙীন মেঘজাল সৃষ্টি করিয়া কবি যে ইন্দ্রজিতের মত সেই মেঘ অন্তরাল হইতে তাঁহার বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে নির্মল শরজাল নিক্ষেপ করিয়াছেন—ইহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন ? অন্তু এলার প্রেমের কাহিনী সৃষ্টি করিয়া কবি আমাদের সম্মুখে যে অপূর্ব রসলোক সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই রসলোকের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইতে পারি না তাহার কারণ যে মানুষটি অমৃতের ভাণ্ড লইয়া রস বিতরণ করিয়াছেন তিনি নিছক রসসৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। যে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক, কবি, রসের স্রষ্টা—সেই রবীন্দ্রনাথের পিছনে দেখি আর এক রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। এই রবীন্দ্রনাথ মিশনারী সাহেবদের মত আপনার মত প্রচারের উম্মাদনায় প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে গালাগালি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবি—সেই জন্যই মিশনারীর ভূমিকা লইয়াও তিনি চার অধ্যায়ে গালাগালিকে কোথাও অভদ্রতার কোঠায় ঠেলিয়া দেন নাই। কবি যতই বলুন, আধুনিক বাঙালী নায়ক নায়িকার প্রেমের ইতিহাস তাঁর উপন্যাসের মূল আখ্যানবস্তু—তবু কিন্তু চার অধ্যায় পড়িতে পড়িতে তাঁহার প্রচারকের ছবিটাই মনের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। যেটুকু বীণা তিনি বাজাইয়াছেন সেটুকু কেবল 'স্যালভেশন আর্মির' সিপাহীদের মত আপন প্রচার কার্যকে সাফল্য দান করিবার জন্য। এই প্রচার করিবার নেশা কবিকে এমনই তীব্রভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, মোকদ্দমায় জিতিবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় তিনি সাক্ষ্য সংগ্রহের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাধারণ মামলাবাজ লোকেরা সাক্ষ্যের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কবি উৎসাহের উৎকট আতিশয্যে মৃত ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। নিজের স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইলে জীবনে যে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি উপস্থিত হয়—সেই ট্র্যাজেডির ভীষণতা অপরকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য শ্মশানের পবিত্র চিতাভস্ম ঠেলিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বাঙালী পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে না টানিয়া আনিলে উপন্যাসের রসসৃষ্টির পক্ষে এমন কি ব্যাঘাত ঘটিত ? কোন ব্যাঘাতই ঘটিত না। কবি 'প্রবাসী' প্রবন্ধেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, সে এলাকে পেল না, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাব বিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হইতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিনি॥ ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুম তাহোক, তবে গল্পের দিক থেকে এর কোন মূল্য নেই সে কথা জানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভাল।"

"রসসৃষ্টির দিক হইতে উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেতাত্মাকে মৃত্যুর যবনিকার আড়াল হইতে সাক্ষ্যরূপে টানিয়া আনিবার কোন মূল্যই থাকিতে পারে না—একথা স্বীকার করিয়া সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়াছেন। টুর্গেনিভ তাঁহার virgin soil-এর মধ্যে সমসাময়িক রাশিয়ার উগ্রপন্থী তরুণ সম্প্রদায়কে বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করিতে কসুর করেন নাই। কবি যেমন করিয়া চার অধ্যায়ের মধ্যে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে আঘাত দিয়েছেন, virgin soil-এর মধ্যে টুর্গেনিভও তেমনি করিয়াই তরুণ রাশিয়াকে চাবুক মারিয়াছেন।......

"....চার অধ্যায় শিল্পীর এই পঙ্গুত্বের দ্বারা অভিশপ্ত। কবি আপনার মধ্যে নিঃশেষে ডুবিয়া গিয়া চার অধ্যায় রচনা করেন নাই। তিনি চারদিকের লোকজনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উক্ত উপন্যাসখানি সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যকে আমার কথা শুনাইব—উন্মার্গগামী আমার কথা বুঝাইব, তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে আমার বাঁশী জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিব—এমনি একটি মনোভাব চার অধ্যায়ের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। শিলাইদহের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পদ্মার কুলে বসিয়া কবি যখন পুষ্পের মত আপনার সঙ্গীতগুলি ফুটাইয়াছেন তখন তো তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে এই ইস্কুল মাস্টারের মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। সে ছিল শিল্পীর যথার্থ গৌরবের দিন। সেই অজ্ঞাত বাসের দিনে প্রচার করিবার, সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার চেতনার ক্ষেত্র হইতে সুদূরে অবস্থান করিতেছিল। তখন তিনি গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন নিছক সৃষ্টির প্রেরণায়—তাহার পর কখন সেই অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরাইয়া গেল। মালা আসিল চন্দন আসিল, বিপুল শঙ্খধ্বনির মধ্যে বিশ্বের দরবারে কবির আরতি হইল, নানা দেশ হইতে ভক্তবৃন্দ কবির আসন তলে জুটিতে লাগিল। বৃন্দাবনের রাখাল কৃষক কখন মথুরাপুরীতে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কবি মানুষটি ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিতে লাগিল। বাহির হইয়া আসিল মোহান্ত মানুষটি। বাণীর কমল বনে বীণার ঝঙ্কার থামিল, শুরু হইল সমাজগৃহে প্রচারের বক্তৃতা।

"চার অধ্যায়ে কবি রবীন্দ্রনাথ মোহান্ত রবীন্দ্রনাথের বেশে দেখা দিয়াছেন, আমলকীর বনে সন্তর্পণের ছায়ায় যে আত্মভোলা কবি মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেছেন, চার অধ্যায়ে তিনি বাঁশী ফেলিয়া 'মেগাফোন' লইয়া মনুমেন্টের পাশে আসিয়া যেন বক্তৃতা দিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় প্রগতিমূলক জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুতীব্র ভাষায় গালাগালি। সাহিত্যের গড়ের মাঠে কবির এই প্রোপাগ্যাণ্ডিস্টের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া বঙ্গভারতী নিশ্চয়ই নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিয়াছেন। প্রোপাগ্যাণ্ডার দারুণ উন্মাদনায় কবি আত্মমর্যাদা পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। যে অবিচলিত আত্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কর্মকে ও চিন্তাধারাকে অপরূপ মহিমা দান করিয়াছে, চার অধ্যায়ে সেই আত্মবিশ্বাসও কবিকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার ভয় হইয়াছে—লোকে বুঝি তাঁহার বাণীকে Poetic fiction বলিয়া উড়াইয়া দিবে, চার অধ্যায়কে কবিমনের ভিত্তিহীন কল্পনার রঙীন মেলা বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। "ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে এই সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত যা মেজাজ দিয়ে গড়া।" এই ভয় কবিকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, তাই পুরাতন বন্ধু, সহকর্মীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

জীবনের ওপার হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য এপারে টানিয়া আনিতে তাঁহার কবিমন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করিল না। উপাধ্যায় মহাশয় আপন অন্তরের···সুগভীর বেদনা হইতে যদি কোন কথা নিভৃতে বন্ধু ও সহকর্মীকে বলিয়াই থাকেন—সে কথা হাটের মাঝে প্রচার না করিলে কি চলিত না ? রসসৃষ্টিতে তাহা হইলে ব্যাঘাত জন্মাইত ? উপাধ্যায় মহাশয়কে সাক্ষ্যরূপে খাড়া না করিলে কেহ যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করিত—তাহাতে কি. এমন আসিয়া যাইত ? 'মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলার'—আত্মবিশ্বাসী নির্ভীক কবিকণ্ঠ হইতেই কি একদিন এই অমর সঙ্গীত উৎসারিত হয় নাই।

"আসল কথা—কবি হইয়া আর্টিস্ট হইয়া তিনি এমন একটা অশোভন কাজ করিয়া বসিলেন যাহার গল্পের দিক দিয়াও কোন মূল্য নাই তাহার কারণ চার অধ্যায় লিখিবার সময়ে তাঁহার ভিতর হইতে শিল্পী মানুষটি অন্তর্হিত হইয়াছিল—শিল্পী আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল সেই মানুষটি যে সমাজে বেশ করিয়া উপদেশ দেয়—ইস্কুল মাস্টার হইয়া ছাত্র পড়ায়।···

"তর্ক ও উপদেশ দেওয়ার অপরাধে কেবলমাত্র সাময়িকপত্রের প্রবন্ধগুলিকে অপরাধী করিলে ন্যায় বিচার হইবে না। চার অধ্যায় এই অপরাধ হইতে মুক্ত নহে। তবে কবি এই উপন্যাসে আপনার মতটাকে অতি কৌশলের সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কি কথা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নহে। বস্তুতঃ প্রত্যেক আর্টিস্টই আপন সৃষ্টির মধ্যে নিজের কথা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।"

"Every artist writes his own biography" রবীন্দ্রনাথ যত বড় আর্টিস্টই হউন কথার অন্তরালে আপনাকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। গান্ধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধনুর্বাণধারী যোদ্ধারূপে তিনি নিঃসন্দেহে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ প্রচারক রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে শিখণ্ডীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি যদি তর্ক ও উপদেশকে তাঁহার সৃষ্ট লোকের বহির্বাটীতে রাখিয়া আসিতেন, তবে চার অধ্যায়ের বিরুদ্ধে আজ এত কথা উঠিত না—সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার সুনামে মলিনতা স্পর্শ করিত না। সাহিত্যের কমল বনে পদ্ম তুলিতে গিয়া অযথা কাদা ঘাঁটিয়াছেন। এক্ষণে সেই পাঁকের গন্ধকে পদ্ম-গন্ধ দিয়া ঢাকিবার মতই হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য আবার যুক্তি তর্কের অবতারণা কেন ? ভুল করাই তো মানুষের স্বভাব। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্য—তিনি ভুল করিয়াছেন—হয়তো ইচ্ছা করিয়া করেন নাই—অজ্ঞাতসারেই করিয়াছেন।"[৩৪]

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের কঠোর সমালোচনার পর শ্রীমেঘনাদ গুপ্তের ছদ্মনামে 'দেশে' (২ মার্চ, ১৯৩৫) আর একটি নিবন্ধ বের হয়। সেটিরও কিছু এখানে উল্লেখ করছি

"রবীন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস "চার অধ্যায়" দেশের মনের মধ্যে একটা ফেনিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে। অনেকদিন আগে কবির "ঘরে বাইরে" উপন্যাসখানিকে কেন্দ্র করে দেশময় এমনি একটা আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। দেশকে যে বাণী দান করবার জন্য 'ঘরে বাইরে'র সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই 'চার অধ্যায়ে'। তিনি তাঁর দেশকে সাবধান করতে চেয়েছেন বিভীষিকা পন্থার বিপদ থেকে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই 'চার অধ্যায়' লেখা হয়েছে। গ্রন্থের আভাসেই দেখতে পাই ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়ের ছবিঃ কবির সঙ্গে সেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর শেষ দেখা ও শেষ কথার কাহিনীটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে উপন্যাসের আরম্ভে।

"···গ্রন্থে উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা কতদূর সমীচীন হয়েছে—তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকের মনে অনেক কথা উঠেছে। থাক—সে সব কথা। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কবি দেশকে কারও চেয়ে কম ভালবাসেন না। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তিনি গানের পর গান লিখেছিলেন আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলবার জন্য—সেই গান আজও পুরাতন হয়নি। ভিক্ষার পথ ছেড়ে পৌরুষের পথে চলবার প্রেরণা কার কবিতা, গান ও রচনার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম ? রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা দলিত করে স্বাধীনতার আদর্শের পানে একলা চলার উৎসাহ দান করেছিলেন কে ? অর্থহীন আচারের 'অচলায়তন'কে ভেঙে ফেলে মুক্ত আকাশতলে বেরিয়ে আসবার দুর্জয় আহ্বান শুনেছি কার কম্বুকণ্ঠ থেকে ? অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের পর ভারতবর্ষের আহত আত্মার সুতীব্র বেদনা কার লেখনীকে আশ্রয় করে প্রথম অগ্নিগর্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে প্রথম উপাধি ত্যাগ করেছিলেন কোন মহাজন ? 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম, 'স্বাধিকার প্রমত্ত' ইর্ত্যাদি অমূল্য রচনা প্রসব করেছিল কার তেজপূর্ণ কণ্ঠহীন লেখনী ? না—তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের মতের যতই অনৈক্য ঘটুক—কবির সুতীব্র দেশাত্মবোধে আমরা যেন কোনদিনই সন্দেহ না করি, জানি, তাঁর চার অধ্যায়ের অনেক কথার সঙ্গে অন্তর সায় দেবে না—তবু একথা স্বীকার করতেই হবে—ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি আর সকলের মতই উদগ্রীব। ভুল তাঁর হয়েছে—কিন্তু সে ভুল দৃষ্টির ভুল। অবিচার তিনি যথেষ্ট করেছেন—কিন্তু সেই অবিচার মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' লিখে অবিচার করার মত ঘৃণ্য নয়। ভালবাসা যেখানে প্রচুর, সেখানেও কখনো কখনো আমরা অবিচার করি—না জেনে ভুলে বুঝে।

"আগেই বলেছি, 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানিকে বিভীষিকা- পন্থার বিরুদ্ধে একটি সুতীব্র প্রতিবাদ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বলবার ভঙ্গিমা চমৎকার : কথা দিয়ে, উপমা দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছেন—যা শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। পেট্রিয়জিমের নামে জাতিপ্রেমের যে ব্যভিচার হতে পারে সেই ব্যভিচার সম্পর্কে আমাদের মনকে তিনি সচেতন করতে চেয়েছেন। পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশকে মুক্ত করবার কাজে যারা ব্রতী হয়েছে, কবি তাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধারের চেষ্টা ফলবতী হবে না। মানবধর্মকে উপেক্ষা করে পেট্রিয়টিজমের সাধনা হবে—নিবুদ্ধিতার আত্মঘাত।

"...উপন্যাসের নায়ক অতীনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মুখ দিয়ে নিজের কথাগুলি বলবার জন্য। মনে হয় উপাধ্যায় মশাইকে সামনে রেখে অতীনকে তিনি তৈরী করেছেন। উপাধ্যায় মহাশয় জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে কবিকে নিজের জীবনের ব্যর্থতার সম্পর্কে যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন তার কথা এ পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেউ জানতো না। সেই কথা সকলকে তিনি জানাবার প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাই অতীনকে তাঁর তেতলার ছাদের উপর দাঁড় করিয়ে তাঁকে দিয়ে দিকে দিকে ঘোষণা করেছেন সেই কথা যাকে তিনি ব্রহ্মবান্ধবের কথা বলে গ্রন্থের আভাসে ব্যক্ত করেছেন। উপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন বৈদান্তিক।

"...'চার অধ্যায়ে' কবির আঘাত হয়েছে দু'মুখো সাপের মত। তার একটা মুখ কামড়িয়েছে বিভীষিকা পন্থার গোপন আন্দোলনকে—আর একটা মুখ বিষ উদ্গীর্ণ করেছে গান্ধী আন্দোলনের উপর। গান্ধী আন্দোলনের উপর কটাক্ষ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অতীনের নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে। এলার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে অতীন বলেছে—'হাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্ত্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে, ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হলো চিরজন্মের মত পঙ্গু এমন সময় লাগল মন্ত্র, উল্টোরথ যাত্রায় ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙ্গেছে তাদের জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হোলো। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন এক নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। কবি গান্ধী আন্দোলনের মধ্যে কেবল লক্ষ লক্ষ নরনারীর পুতুল নাচই দেখেছেন। যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্য তিনি একদিন সরকারের দেওয়া উপাধি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্যই এই বঙ্গদেশের সহস্র সহস্র যুবক একদিন সরকারী বিদ্যালয় ছেড়ে এসেছিল, দেশবন্ধু ও মতিলালের মত প্রতিভাবান ব্যবহারজীবীরা আদালত ছেড়ে দিয়েছিল, অনেক উপাধিধারী উপাধির মোহ ত্যাগ করেছিলো, যে কাজ করাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন, সেই কাজ যখন দেশের হাজার হাজার লোক করলো তখন তার মধ্যে তিনি দেখলেন শুধু পুতুল নাচ। তাদের কাজকে স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথ বলতে কোথাও বাধলো না।

"...আদর্শ ছোট হলে তাকে সফল করা কঠিন হোতো না। আদর্শ বিপুল বলেই তাকে সফল করে তোলা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ, গান্ধীজীর আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছে তাদের পুতুল মনে করবার কারণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়তো এই যে, তারা গান্ধীজীর অনুসরণ করেছে। তাঁদের উচিত ছিলো না গান্ধীজীর জন্য অপেক্ষা করা। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় এক একটা জাতির সহস্র সহস্র মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা মানুষের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। গান্ধীজী ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি। রোমা রোঁলার ভাষায় He incarnates the spirit of his people.

"লোকে যদি তাঁর অনুসরণ করে থাকে এর মধ্যে নিন্দা করবার কিছু নেই। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সফল করবার চেষ্টা করেছেন বলেই হাজার হাজার মানুষ তাঁর পিছনে ছুটেছেন। অনুসরণ করা আর পুতুল নাচা সব সময় এক কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বীণা ছেড়ে দিয়ে জাতিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করবার জন্য যদি আজ কর্মক্ষেত্রে সেনাপতি হয়ে দাঁড়ান—দেশ তাঁকেও একজন সর্দার বলে মাথায় তুলে নাচবে।

"...কবি আমাদের সাহিত্যের আকাশে সূর্যের মত সগৌরবে বিরাজ করতে থাকুন। আঘাত দেবার যেখানে প্রয়োজন সেখানে তাঁর মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষী কিরণধারা তিনি নির্দয় হয়ে বর্ষণ করুন। অযথা আঘাত দিলে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার অপব্যবহার করা হবে। কবি যদি অনুদার হয় তবে উদারতার আশা করবো কোথায়? স্বাধীনতার বিজয় সঙ্গীত গাইবার জন্যই তো কবির জন্ম। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যেখানে কবির অবিচার দেখি—সেখানে সেই অবিচার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত দেয়। মনে হয় 'রক্তকরবী' 'মুক্তধারা', 'রাশিয়ার চিঠি' যিনি লিখলেন তিনি কেন এমন করে বিশ্রীভাবে গণ-আন্দোলনকে নিষ্ঠুর আঘাত দিলেন? প্রতিভার কি ট্র্যাজেডি!"[৩৫]

নির্দেশিকা

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবন কথা'—আনন্দ সংস্করণ, পৃ ৮২

এখানে প্রভাতকুমার লিখেছেন: জন্মোৎসবের প্রায় দু-মাস পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন (ফেব্রুয়ারি,১০—১২)। বিদ্যালয়ের পক্ষে দুর্দিন যাচ্ছে; সরকার থেকে গোপন ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় গবর্মেণ্ট কর্মচারির ছেলেদের শিক্ষার উপযোগী স্থান নয়। বহু অভিভাবক গবর্মেণ্টের এই গোপন অন্তর টিপুনিতে ভীত হয়ে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে গেছেন। হীরালাল সেন নামে খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের এক জেল-খাটা শিক্ষককে কয়েক বছরের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন বলে পুলিশের ঘোর আপত্তি। তাকে বিদায় করে দেবার জন্য কবির উপর অনেকবার চাপ এসেছিল, তিনি কর্ণপাত করেননি। এবার বুঝলেন, স্কুল রাখতে গেলে হীরালালকে বিদায় করতেই হবে। কবি তাঁকে বিদায় করলেন বটে, কিন্তু পথে বসালেন না, তাঁকে নিজের জমিদারিতে কাজ দিলেন। কালীমোহন ঘোষ ছিলেন আরেকজন সরকারের 'চিহ্নিত' লোক, তিনি বিলাত চলে গেলেন বলে রেহাই পেলেন।

২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন, দেশ, নভেম্বর, ১৯৮২

৩। FL. No. 88, SL. No. 1-2, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt. 1912.

৪। Ibid.

৫। যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃ ১১৮

৬। Ibid.

৭। ব্রিটিশের বদলে মোগল বসিয়ে কবিতাটির কয়েক লাইন (ব্রিটিশ বিজয়...আর এক তান) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে সন্নিবেশিত করেন। —রবীন্দ্রজীবন কথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৪, আনন্দ সংস্করণ

৮। Paper No. 47, State Committee for compilation of History of Freedom Movement in India, Bengal Region.

৯। Ibid.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০। Ibid.
১১। Confidential circular for 1908-1909, Shillong. Eastern Bengal and Assam (Political Branch).
১২। I.B. Weekly Report. dt. 24-2-1915.
১৩। FL. No. 207
———— Home (Pol.) 1915.
Sumds. (1-2)
১৪। Ibid.
১৫। লাডলী মোহন রায়চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের যাত্রাভঙ্গ' যুগান্তর, ১৫-১১-১৯৮২
১৬। Ibid.
১৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৯৫৭-৯৫৮
১৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১-৯-১৯৪১
১৯। Fl. No.55/18 41, 1141, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
২০। Rabindranath Tagore—A centenary volume Sahitya Academy.
২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৭৫
২২ ক) ঐ
২৩। চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ, একাদশ খণ্ড, পৃ ১৫৪-১৫৫
২৪। ঐ পৃ ১৩১-১৩২
২৫। ঐ, পৃ ১৫৪-১৫৫
২৬। Fl. No. 55/1/1935. Home (Pol.) conf. India. Govt. Ref. চিন্মোহন সেহানবীশ, 'রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পরিচয়, শারদীয়া,
২৭। FL. No. 461, Sl. No. 1-33. Home (Press) confidential, 1935, Bengal. Govt.
২৮। Ibid.
২৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ১৭৫
৩০। রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ৫৪৫
৩১। ঐ
৩২। দেশ, ১৩-১১-১৯৮২ পুর্নমুদ্রিত তথ্য মূল লেখাটি 'প্রবাসী'র মাঘ, ১৩৪১ সংখ্যায় বের হয়।
৩৩। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪২ সংখ্যা
৩৪। দেশ, ১১ মে ১৯৩৫-য়ের সংখ্যা
৩৫। 'দেশ', ২ মার্চ, ১৯৩৫—পুনর্মুদ্রিত 'দেশ' ১৩-১১-১৯৮২তে
৩৬। চার অধ্যায় সম্পর্কে আর একটি উল্লেখ্য, তা হচ্ছে : চার অধ্যায়ের যে অনুবাদ নিয়ে এত চিঠি লেখালেখি, অমিয় চক্রবর্তীর করা সেই অনুবাদটি এখনও ছাপা হয়নি। অনুসন্ধান করে জেনেছি, সেটি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর আরকাইভসে বন্দী আছে। চার অধ্যায়ের যে ইংরাজি অনুবাদটি ছাপা হয়েছে, সেটি সুরেন ঠাকুরের করা, অমিয় চক্রবর্তীর নয়। শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'রবীন্দ্র রচনার ইংরাজি অনুবাদ-সূচী' গ্রন্থে আছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'ফোর চ্যাপটার্স'-এর অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ

ইংরেজ আমলে নিষিদ্ধ বাংলা বইপত্রের তালিকায় দেখা যাবে যে, প্রায় সব বই নিষিদ্ধ হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। পালশীর যুদ্ধ কথা থেকে আরম্ভ করা যায়। পলাশীর যুদ্ধ কেন্দ্রিক বহু বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধ এমন কিছু বড় যুদ্ধ নয় (১৭৫৭, ২২-২৩ জুন)। কিন্তু এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। এই যুদ্ধ জয় থেকে ভারতে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত। এই সুপরিচিত যুদ্ধ বিবরণ পাই, একদিকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর, বা বণিক জগৎ শেঠ ইত্যাদির বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন মোহনলালের অকুতোভয় আত্মোৎসর্গ। সেই সঙ্গে ইংরাজের অজস্র নীতি গর্হিত আচরণ।

বেইমানী, অবিশ্বাস, লোভ, উৎকোচ, হানাহানি, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরা এই দিনগুলিকে ভিত্তি করে বহু নাটক, উপন্যাস, নিবন্ধ প্রভৃতি লেখা হয়েছে। এর অধিকাংশই সরকারের কোপে পড়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ওইসব লেখায় দেশকে আবার স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা আছে। আর আছে ইংরেজদের হীনতার বিবরণ। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজ নন্দকুমার, গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'জালিয়াৎ ক্লাইভ', ক্ষীরোদ প্রসাদের নন্দকুমার, ও পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা, 'ফিরিঙ্গি বণিক', মীরকাশিম, 'জগৎশেঠ প্রভৃতি এ যুগের পটভূমিতে লেখা। স্বভাবতই ওইসব বই রাজরোষে পড়ে।

ইংরেজ আমলে ভারতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা 'সিপাহী বিদ্রোহ' এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘবদ্ধ সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সামরিক বিদ্রোহের সঙ্গে গণবিদ্রোহ যুক্ত হয়ে এ এক প্রচণ্ডরূপ নেয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়—এই চারটি কারণে এই বিদ্রোহ ঘটে। রাজনৈতিক কারণগুলি হচ্ছে, লর্ড ডালহৌসির ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি, মুঘল সম্রাটের বংশধরদের প্রতি অসম্মান, পেশয়ার দত্তকপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তির বিলোপ। আর অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে আছে : বহু ভূস্বামীর বিলোপ, ···সাতারা, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের বিলোপের ফলে বহু ব্যক্তির কর্মচ্যুতি, দাক্ষিণাত্যে বহু জমিদারি বাজেয়াপ্ত, অযোধ্যা অধিকারে অসন্তোষ। সামাজিক ও ধর্মীয় কারণগুলি হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, মিশনারীদের তৎপরতা, বিধবা-বিবাহ আইন প্রভৃতি তাছাড়া ভারতীয় সিপাহীদের চর্বিযুক্ত কার্তুজের এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্ত্তনে ধর্মভীরু হিন্দু মুসলমান সিপাহীরা ফেটে পড়েন। এই সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা একাধিক বই রাজরোষে পড়েছিল। যেমন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস, রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস (পাঁচখণ্ডের বই), চণ্ডীচরণ সেনের ঝান্সী রাণী, অযোধ্যার বেগম। (এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে আছে।) এর পর বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দেশে তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ দেখা দেয়—১৯০৫য়ে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ওঠে লর্ড কার্জনের আমলে—১৯০৩ সালে। ভারত সরকারের সচিব রিস্‌লে স্বাক্ষরিত এক পত্রে বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মন সিংহ জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হোক। ১৯০৫ সালের জুলাইয়ের ভারত সচিব বঙ্গচ্ছেদের অনুমতি দেন। ৭ জুলাই এই খবর জানার সঙ্গে সারা বাংলা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরের দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গভঙ্গের তীব্র আপত্তি জানালেন। সঞ্জীবনী বয়কটের ডাক দিল। ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর হল ওই প্রতিবাদ বিক্ষোভ সত্ত্বেও। এর পর আন্দোলন এত তীব্র ও সার্বজনীন রূপ নিল যে বাংলার জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়, পূর্ববঙ্গ, আসাম, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছায়। দেশজুড়ে বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল। জাতীয় শিক্ষার প্রবণতা দেখা দিল। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার দমননীতি শুরু করলো। এই প্রচণ্ড আন্দোলনের চাপে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারের বঙ্গভঙ্গ রহিত ঘোষণা করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা অনেক বই, পত্র পত্রিকা রাজরোষে পড়েছে। যেমন, বঙ্গাঙ্গচ্ছেদ সন্তাপ (চন্ডীচরণ কাব্যতীর্থ প্রণীত ৪৬ টি শোক), 'বঙ্গের পুনর্জন্ম' (কেদারনাথ দেবশর্মা), 'ছাত্র দমন কাব্য'(প্রথম খণ্ড) ললিতমোহন সরকার রচিত, 'ভারতবাসীর কর্তব্য কি ? (ডঃ ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), 'স্বদেশগাথা' (কামিনী কুমার ভট্টাচার্য), 'স্বরাজ সঙ্গীত' (অনন্তকুমার সেনগুপ্ত), 'আমরা কোথায় ? (ভুবন মোহন দাশগুপ্ত), বই এবং'যুগান্তর', 'সঞ্জীবনী', 'বন্দেমাতরম' (ইং) প্রভৃতি সরকারের বিষ নজরে পড়ে।

এই বঙ্গভঙ্গের যুগে দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি 'স্বরাজ' দাবি করেছিলেন। কংগ্রেসে চরমপন্থীদের প্রভাব বেড়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চলেছিল। বৈপ্লবিক আক্রমণ ও হত্যাও হয়েছিল। তবে স্মর্তব্য বঙ্গভঙ্গের আগে থেকেই বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন অরবিন্দ। ১৯০২ সালে তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বাংলায় পাঠালেন বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এই বছর কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন প্রমথ নাথ মিত্র। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিছু আগে নিবেদিতা ভাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈপ্লবিক কাজের সূচনা করেছিলেন। অরবিন্দের দলের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সংযোগ হয়। ১৯০৮ সালে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির পত্তন হয় পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে। বারীন ঘোষ মুরারিপুকুরে গুপ্ত বোমার কারখানা স্থাপন করেন। এই দলে ছিলেন হেমচন্দ্র দত্ত কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। নেতা অরবিন্দ। এঁরা ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকী ব্যর্থ হল। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বারীন, উপেন, হেমচন্দ্র ও উল্লাসকরের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। অভিযুক্ত অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তি পান। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতি নিষিদ্ধ হয়। এর পর ক্রমান্বয়ে নানা বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলে। বিদেশে আমেরিকায় গদর পার্টি, কাবুলে 'আজাদ সরকার', জার্মানিতে 'ইন্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি প্রভৃতি বিপ্লব সংস্থা গড়ে ওঠে। বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে দেশে সশস্ত্র সংঘর্ষের চেষ্টা বারবার হয়। ব্যর্থও হয়। বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথের দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় (১৯১৫, ৯ সেপ্টেম্বর)। শাঁখারিটোলা ডাকঘরে ডাকাতি—১৯২৩, কাকোরি রেলস্টেশনে ডাকাতি—১৯২৫, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ—১৯৩০, ১৮ এপ্রিল, ঢাকায় লোম্যান হত্যা ১৯৩০, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সিম্পসন হত্যা—১৯৩০, মেদিনীপুরে জেলা শাসকদের হত্যা—১৯৩১, কুমিল্লার জেলাশাসক হত্যা—১৯৩১ প্রভৃতির ঘটনা ইংরেজ শাসককে সন্ত্রস্ত করে তোলে। সমস্ত মুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম ১৯৪২'র আগষ্ট আন্দোলন ও নেতাজীর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম। এই অগ্নিযুগের পটভূমিতে লেখা অনেক বইপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যেমন, 'বর্তমান রাজনীতি', 'মুক্তি কোন পথে !', দীনেশের শেষ, ফাঁসি, দেশভক্তি, রক্তপতাকা, শোকসিন্ধু, পথের দাবী, বিপ্লবী অবনী মুখার্জি, অগ্নিমন্ত্রে রাণী, ভাণ্ডার পূজারী, রাজদ্রোহীর জবানবন্দী, কানাইলাল, ফাঁসির সত্যেন, বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন, ক্ষুদিরাম, বাংলার বিপ্লববাদ, বিপ্লবের সন্ধানে, চলার পথে, বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী, কালের ভেরী, রাখীকঙ্কন, ভৈরবচক্র, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন, বিপ্লবী বাংলা, দেশবাসীর প্রতি নিবেদন, বিপ্লবের সন্ধান, বিপ্লবতীর্থ, মায়ের ডাক, ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন।

(এই সব বই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পরে দ্রষ্টব্য)

জাতীয় কংগ্রেস ভারতে নিরবছিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৮৮৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে জন্ম নেয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রথম পর্বে কংগ্রেস আবেদন নিবেদন নীতি গ্রহণ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে চরমপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় মডারেটদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়, যার পরিণতিতে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গ, যার পরিণতিতে চরমপন্থীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিছু বছরের জন্য কংগ্রেসের বাইরে থাকেন। ১৯২৩-১৯৪৮ কে বলা হয় কংগ্রেসের গান্ধীযুগ। তাঁর নেতৃত্বে ১৯২০-২১ বিরাট অসহযোগ আন্দোলন হয়। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ঐতিহাসিক প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে হয় লবণ সত্যাগ্রহ ও ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার যে শাসন সংস্কারের নীতি নেয়, কংগ্রেস তা মেনে নেয় এবং দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনে অংশ নেয়। তখন ভারতের ১১টি রাজ্যের মধ্যে ৬টির শাসনভার কংগ্রেস নেয়। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ঘটে। কংগ্রেস থেকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির সহায়তা করার প্রশ্নে নেহরু', আজাদের সঙ্গেও গান্ধীজীর মতবিরোধ হয়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ১৯৪২ সালে আগষ্ট প্রস্তাব নেয়, যা ইংরাজ সাম্রাজ্য শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান। গান্ধীজী বোম্বাই সমুদ্র সৈকত থেকে ঐতিহাসিক ধ্বনি দেন : 'কুইট ইণ্ডিয়া,করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (৮ আগষ্ট,১৯৪২) সারা দেশের কংগ্রেস কর্মী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা আগষ্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, গ্রেফতার হলেন, হাজারে। আন্দোলন আর অহিংস রইল না। ব্রিটিশ সরকারও তীব্র দমননীতি নিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে শতাব্দীকালব্যাপী এই যে স্বাধীনতা আন্দোলন তার পটভূমিতে অসংখ্য বইপত্র লেখা হয়েছে। এর অধিকাংশই রাজরোষে পড়েছে। যথা : গল্প ও চিত্রে ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস, পূর্ণ স্বাধীনতা চাই কেন ?, যুগাবতার গান্ধীজী,মহাত্মা গান্ধীর কবিতা, বর দোলি সত্যাগ্রহ প্রভৃতি।

রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পর ইউরোপ প্রবাসী অনেক বিপ্লবী—মানবেন্দ্র রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। এম এন রায় ১৯২০ সালে তৃতীয় ইন্টারন্যাশানালের কর্মসমিতির সভ্য হন। ১৯২৫ সালে কানপুরে এক প্রকাশ্য সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এই বৈঠক হয় গোপনে। ১৯২৭ সালে কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস., পার্টি গড়েন। এদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট সংগঠন দিন দিন জোরদার হতে থাকে। বহু কমিউনিস্ট নেতা গ্রেফতারও হন। ভারত সরকার যুদ্ধকালে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে দুই পর্বে দুই নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধের মুখে, ভারত সরকার বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেন। কমিউনিস্টদের বহু প্রচারপত্র ও পুস্তিকা নিষিদ্ধ হয়। এর পর ভারত সরকারের মনোভাব বদলায়, কারণ জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হলে (২২ জুন, ১৯৪১) ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাঁদের নীতি বদলেছিলেন। তাঁরা এই যুদ্ধে ইংরাজ সরকারকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত করেন। ভারত সরকার তখন উক্ত পার্টি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থনে লেখা (১৯৩৫-১৯৪২ পর্বে অসংখ্য বইপত্র, ইস্তাহার রাজরোষে পড়ে। তার কিছু কিছু নাম দিলাম : 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন', 'সরকারের যুদ্ধে চাঁদা দিও না', রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য এগিয়ে চল, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের নরনারীর প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন, 'সাম্যবাদ', 'সান ইয়াৎ সেনের জীবনী' 'বিদ্রোহী রাশিয়া'।

এ ছাড়া আরও অনেক বই রাজনৈতিক কারণে রাজরোষে পড়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুকুন্দদাসের মাতৃপূজা, পথ, 'কর্মক্ষেত্র', কর্মক্ষেত্রে গান, পথের গান, নজরুল ইসলামের ভাঙার গান, যুগবাণী, চন্দ্রবিন্দু, বিষের বাঁশি, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের রক্তরেখা, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের মন্দিরের চাবি, মতিলাল রায়ের শতবর্ষের বাংলা প্রভৃতি। টলস্টয়ের উপন্যাসের অনুবাদ 'বিপ্লবের আহুতি', সখারামের দেশের কথা, তিলকের জীবনী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী' প্রভৃতি গ্রন্থ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়
সামাজিক কারণে নিষিদ্ধ

ক)সাম্প্রদায়িক কারণ : ধর্মবিদ্বেষ প্রচার ও সাম্প্রদায়িক কারণেও ইংরেজ আমলে কিছু কিছু বাংলা বইপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে ওই কালে ভারতে সাম্প্রদায়িক কারণে নিষিদ্ধ বইপত্রের সংখ্যা খুবই কম।

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মবিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য খোন্দকর—আইবুল ইসলামের 'গরু ও হিন্দু মুসলমান' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলমানদের মধ্যে এবং প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে গরু কাটার প্রচলন থাকা এর বিষয়বস্তু। ১৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ১৯১১ সালে এরকান আলি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে এটি আছে।

বর্ণবিদ্বেষ প্রচারের জন্য স্বামী সত্যানন্দজী সরস্বতীর শক্তিশালী সমাজ বইটি রাজরোষে পড়ে। শ্রী হরিচরণ চক্রবর্তী এর প্রকাশক, কলকাতার শক্তিবাদ প্রেসে ১৩৫৮ সালে এটি ছাপা। ১০০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে অনেকগুলি ছোট ছোট নিবন্ধ আছে। দিল্লিতে জাতীয় মহাফেজখানায় এই বইটি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। বইটিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে।

বইয়ের প্রচ্ছদে আছে :

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী—নং ৭
শক্তিশালী সমাজ
তৃতীয় ভাগ
স্বামী সত্যানন্দজী সরস্বতী
মূল্য ১
প্রকাশক শ্রী হরিচরণ চক্রবর্তী
১১৭ নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
শক্তিবাদ প্রেস থেকে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

রাজশক্তির বিরুদ্ধে এই বইয়ে কোন বিদ্বেষ নেই। আছে মুসলিম বিদ্বেষ। সাম্প্রদায়িক কারণেই বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১০০ পৃষ্ঠার ওই পুস্তকটিতে নানা বিষয়ে নিবন্ধ আছে। যেমন, কুরানবাদ, মহম্মদ ও লেনিন, বেদ ও কুরান, আর্যশাস্ত্র ও যবন, আর্য ধর্মরক্ষা ও কুমারী পূজা, ভারত ভাগ ও যবনবাদ, নমাজ, আল্লাহ ও ঈশ্বর। কুরানে ইমানদার লক্ষণ.....আল্লাই মিঞার কাফের বিদ্বেষ....বহিস্তে সুখ দুঃখ, কাকের নিকট আল্লাহর পরাজয়—আল্লহর ও কাকের শত্রুতা, কিবলা ও শিবের মন্দির, কাবার মন্দিরের ইতিহাস, বিবেকানন্দ ও কুরানবাদ, রুটিবাদ ও কম্যুনিজম ও খৃষ্টানবাদ....প্রভৃতি।

অশ্লীলতার কারণে নিষিদ্ধ গ্রন্থ

খ)ইংরেজ আমলে একাধিক বইয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছে।ঐ অভিযোগে ইংরেজ সরকার প্রথম যে বাংলা বইটির বিরুদ্ধে "মামলা করেন", তার নাম 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। এটি নাটক, লেখক : উপেন্দ্রনাথ দাস। এখানে উল্লেখ্য 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'ই প্রথম বাংলা বই, যা রাজরোষে পড়ে। ১৮৭৬ সালের ৪ মার্চ গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য অভিনয়ের সময় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সেখানে গিয়ে থিয়েটারের ডিরেকটর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু প্রমুখ আটজনকে গ্রেফতার করেন। অভিযোগ, আগে অভিনীত সুরেন্দ্র বিনোদিনী অশ্লীল নাটক।[১]

অশ্লীলতার অভিযোগ এখানে ওজর মাত্র। আসল কারণ কিন্তু রাজনৈতিক।'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে ব্রিটিশ সরকারের অনাচারকে উদঘাটিত করা হয়েছিল। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটরের বিরুদ্ধে আগে থেকেই পুলিশের ক্রোধ ছিল। ক্রোধের আসল কারণ কী, তা কাছাকাছি সময়ের নাট্য-ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

লেখক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্তাকর্ষক রচনা থেকে সুস্পষ্ট:

"মহারাণী ভিকটোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভূতপূর্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সে সময়ে যুবরাজ ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষ দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় অপূর্ব সমারোহ হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজকে তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাসভবনে আহ্বান করেন। যুবরাজ বহির্বাটিতে প্রবেশ করিবার পর মুখোপাধ্যায় গৃহিণী ও অন্যান্য কুল-মহিলারা শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, বরণ প্রভৃতি দেশীয় হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে যুবরাজকে সম্বর্ধনা করেন। জগদানন্দবাবুর উক্ত কার্যের জন্য দেশে ও সমাজে তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল—সংবাদপত্র সমূহে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা বাহির হইতে লাগিল। 'বেঁচে থাকো মুখুজ্যের পো, খেললে ভাল চোটে' বলিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের বাজীমাৎ কবিতা বাহির হইল। 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার'ও এই সুযোগে গজদানন্দ নামে এক প্রহসনের অভিনয় করিল। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ প্রহসনখানি রচনা করেন এবং অনুরুদ্ধ হইয়া নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাহাতে কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার তারিখে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে 'সরোজিনী' নাটক ও গজদানন্দ প্রহসন অভিনীত হয়। বলাবাহুল্য, রঙ্গালয়ে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রথিতযশা সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীব্র কটাক্ষ—দর্শকগণ পরম আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারি বুধবারে নাট্যচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের benefit night উপলক্ষে 'গ্রেট ন্যাশানালে' পুনরায় গজদানন্দ ও 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় হয়।

একজন নিরপরাধ, সম্ভ্রান্ত এবং রাজভক্ত প্রজাকে থিয়েটারে এইরূপে ঘৃণিতভাবে চিত্রিত হইতে দেখিয়া পুলিশ হইতে 'গজদানন্দ' অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'গ্রেট ন্যাশানালে' 'কর্ণাট কুমার' নামক একখানি নতুন নাটক ও 'গজদানন্দ' প্রহসনের নাম পরিবর্তন করিয়া 'হনুমান চরিত্র' প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয় রাত্রে ডাইরেক্টর উপেন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে একটি তীব্র বক্তৃতাও করেন।

"পুনরায় পুলিশ হইতে 'হনুমান চরিত্র' এবং 'কর্ণাট কুমারের' অভিনয় বন্ধ করিবার আদেশ আইসে। পরে ১লা মার্চ উপেন্দ্রবাবুর befefit night উপলক্ষে সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক এবং The police of pig and sheep নামক নতুন প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয় রাত্রে উপেন্দ্রবাবু পুনরায় একটি উত্তেজনাপূর্ণ ইংরাজী বক্তৃতা করেন।

"ইহার পরিণাম বড়ই ভীষণ দাঁড়াইল গভর্নমেন্ট থিয়েটার সম্প্রদায়কে কঠোর শিক্ষাদানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বড়লাটের নিকট হইতে 'গজদানন্দ', 'হনুমান চরিত্র', 'কর্ণাট কুমার' এবং The police of pig and sheep এর অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় ঘটনা।

"যে প্রহসন অভিনয় করিয়া 'গ্রেট ন্যাশানাল' সম্প্রদায় গভর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদের উপর দোষারোপ না করিয়া অন্য এক অপ্রত্যাশিত কারণে গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্বে যে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত, তাহা অশ্লীল এবং সেই অশ্লীল নাটক অভিনয় ও অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেন্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও অভিনেতাগণকে গ্রেফতার করিবার আদেশ দিলেন।

"৪ মার্চ শনিবার গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য অভিনীত হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ডেপুটি পুলিশ কমিশনার লাম্বার্ট সাহেব সদলবলে আসিয়া গ্রেট ন্যাশানালের ডাইরেকটর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেণু), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল রায়, সঙ্গীতাচার্য রামতরণ স্যানাল প্রভৃতিকে ওয়ারেন্টে ধরিয়া লইয়া যান। শুনা যায় স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুর স্টেজের উপর সিলিং-এ উঠিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লুকিয়া ছিলেন, মতিলাল সুর দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তিনি ঝাঁকামুটে সাজিয়া পলায়ন করিবার সময় ধরা পড়েন। মহেন্দ্রলাল বসু তৎপর দিবসে প্রাতে পাল্কীর দোর বন্ধ করিয়া যাইতেছিলেন, পলিশের চক্ষু এড়াইতে না পারিয়া ধৃত হন। সহসা পুলিশ আসিয়া ধরপাকড় শুরু করায় থিয়েটারে একটা ভীষণ হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। দর্শকগণ আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। অভিনেতারা ব্যাকুল হইয়া ওঠেন এবং অভিনেত্রীগণ ক্রন্দন করিতে শুরু করেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর নির্ভীকতায় ও প্রবোধ বাক্যে তাঁহারা আশ্বস্ত হন।

"লালবাজার পুলিশ কোর্টে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার হয়। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী কোর্টে গিয়া surrender করেন। ডাইরেকটর উপেন্দ্রনাথ দাস থিয়েটার সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ সর্ব্ববিষয়ের দায়িত্ব, তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বীকার করায় ভুবনমোহন বাবু অব্যাহতি পান।"[২]

অশ্লীলতার অভিযোগে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র অভিনেতা ও ডিরেক্টরের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা কলকাতায় আলোড়ন ওঠে। প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ডব্লু সি ব্যানার্জি এই মামলায় আসামীর জামিনের আবেদন পেশ করেন। মামলায় আসামীদের পক্ষে যাঁরা সাক্ষী দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর্য দর্শনের সম্পাদক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু শ্যামাচরণ সরকার। তাছাড়া বইটির পক্ষে মত প্রকাশ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিশ্র, মিঃ ওয়েন (চিফ ইন্টারপ্রেটার কলিকাতা হাইকোর্ট) রেভারেণ্ড ডঃ কে এম ব্যানার্জি প্রমুখও।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র যে দৃশ্যটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়, তাতে দেখানো হয়েছে বিরাজমোহিনী নামে এক মহিলাকে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ক্রিমবলের ধর্ষণের চেষ্টা।

'But the subject of the present prosecution was not that the text had been departed from, but that the drama was obscene. There was another scene in the drama in which the same European Magistrate Mr. Crimble made an attempt of criminal assult on the maid Birajmohini a grown up girl who jumped down from the balcony to aviod outrage. Mr Basu as Magistrate used to come downstair , and in the next scene, carried the girl in his arms and concluded by saying, 'By Joe! the sweet lady! She had actually jumped down from the balcony'. Her figure at the time with her clothes stained with blood, gave the police a handle for prosecution.'[৩]

নদী পুলিশের রবার্টসন সাদা পোশাকে থিয়েটারে ছিলেন। তিনি নাটকটিকে রাজদ্রোহকর ও অশ্লীল বলে অভিযোগ করেন এবং রিপোর্ট দেন।

(Mr. Robertson of the River Police had been to the theatre in plain clothes and reported strongly on the drama being libellous and obscene tending to show that the blood was the result of outrage of the girl by the European Magistrate, when it tended to show as monoster. Besides, the idea was that the girl was not married, no Hindu would ever marry her but a fallen one..)[৪]

আশ্চর্যের কথা, সেকালে কনভেন্ট গার্ডেন এবং ড্রুরিলেন থিয়েটারের ইংরাজি রঙ্গমঞ্চে এ ধরনের বহু নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। রোমিয়ো ও জুলিয়েটে এবং মেরী ওয়াইভস অব উইনডসরেও আপত্তিকর সংলাপ অভিনেতাদের মুখে দেওয়া হয়েছে। আর ফরাসী নাটকগুলো তো আরও আপত্তিকর। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না।

এই নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি মোটামুটি এই:

1. **Both Babus Upendra Nath Das and Amritlal Bose. Director and Manager on March 1876, at Great National Theatre wilfully**

দুনিয়ার পাঠক এক হও

exhibited to public view an obscene representation of a woman having her saree stained with blood in front carried in the arms of a man having his shirt stained with blood in front, intending thereby to represent the immediate results of such woman having been defloured by such man.

2. Babu Amritlal Bose as District Magistrate recited and uttered the following obscene words to the annoyance of others:
   I) Have you got a handsome sister? Send her to my bed one day. I consent to give you some money.
   II) Beauty (Sundari), I can't wait any longer. I am still addressing you in soft words. consent to bestow your love; if you don't consent. I will take against your will.
   III) Sundari, come to my embrace. I am not a tiger or a bear or a hog. I want to taste your love. [৬]

মামলার শুনানীর সময় সুরেন্দ্র বিনোদিনী অশ্লীল নয় বলে যাঁরা সাক্ষ্য দেন, তাঁদের মধ্যে একজন ইংরেজও ছিলেন। জন চার্লস ওয়েন, তিনি বলেন

"I am senior interpreter, High Court. I see Surendra Venodini, I have read the book. I find it resembles a novel called twenty straves, published in 'Bow Bells'. It is a play. It is not in my opinion as obscene play for the Bengali stage. I am acquainted with Bengali play not deeply read in them. There are other more imedients. The object of the scene is to incite virtuous indignition towards the magistrate, who is depicted as villain." [৬]

ওয়েনের বক্তব্য এই নাটকে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। এখানে একজন বদমাইস ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণই দর্শকদের ঘৃণার উদ্রেক করেছে।

পদস্থ সরকারি কর্মচারী শ্যামাচরণ সরকার বলেন

'আমি বাংলা ভাষায় পারদর্শী এবং আমি একজন বাংলা লেখক। আমি এই নাটকটি পড়েছি (৪৪ পৃষ্ঠা থেকে তিনি একটি অনুচ্ছেদ পড়েন), এর শব্দগুলিতে অশ্লীল বলে কিছু দেখি না। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা অত্যন্ত নীতি বিগর্হিত। এর চেয়েও তা খারাপ (তিনি অন্য একটি পাতা থেকে একটি অনুচ্ছেদ পড়েন)। এই পাতায় একটি অনুচ্ছেদ আছে, যা নীতি বিগর্হিত কিন্তু বাঙালী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অশালীন নয়। এর থেকে আরও অনেকগুলি খারাপ নাটক আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণ নিন্দাজনক। নাটকোচিতভাবে বলতে গেলে এর শব্দগুলি অশ্লীল নয়।'[৭]

শ্যামাচরণের মতে এর চেয়ে অনেক বেশী অশ্লীল লেখা বাংলায় আছে।

আসামীদের কৌঁসুলি মিঃ অ্যালান বলেন

"এই নাটকটি আগে অভিনীত হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা হয়নি। ইংলিস রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অনেক অপেরার চেয়ে সামগ্রিকভাবে এই নাটকটি বেশী অশোভন নয়। আদালত অবগত আছেন যে, কনভেন্ট গার্ডেন ও ডুরি লেনে অনেক নাটকের অভিনয় হয়। যা প্রকৃতপক্ষে অশ্লীল নয়, তবে কোনভাবেই নৈতিক মান বাড়ায় না। এই প্রমাণের সপক্ষে তিনি কেবলমাত্র সোন্নাম্বুলা ত্রাভানটোর এবং ডন জুয়ানের দৃশ্যগুলির কথা উল্লেখ করতে চান এবং সভ্যতার উচ্চতম মঞ্চে অধিষ্ঠিত মহান নগরীতে যদি এই ধরনের নাটকের অভিনয় হতে পারে, তাহলে কলকাতায় অভিনীত নাটকগুলি এত কড়াকড়িভাবে স্ক্রুটিনী করার বস্তুত কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন লোকের কাছে 'অশ্লীল' শব্দের বিভিন্ন মানে। যে বইটি জনগণের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে কামনার লালসা বা ধারণাতীত নীতিবিগর্হিততার উস্কানি দেবার প্রবণতা আছে কিনা, সেটাই হচ্ছে একমাত্র প্রশ্ন।"[৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আসামী পক্ষের আর এক কৌঁসুলি মিঃউডের এই বক্তব্য 'এই নাটকের অভিনয়ে অভিনেতাদের একজন 'হগ অ্যান্ড লাম্ব' শব্দগুলি নাটকে চালু করেছেন, সেইজন্যই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে মনে হয়। তাদের 'পুলিস অ্যান্ড পিগ অ্যান্ড শিপ' নাটকটি অভিনয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং অভিনেতাদের একজন ওই দুটি শব্দ নাটকের অন্তর্ভুক্ত করায় পুলিস এই মামলা দায়ের করেছে। খাঁটি যে তার কাছে সব কিছুই খাঁটি কিন্তু যেখানে ভেজাল, সেখানে অন্যরকম।

শেকসপীয়ারের নাটকগুলিও বাস্তবিক এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক দিক থেকে অশ্লীল। উইন্ডসরের অনেক বই নীতিবিগর্হিততার উপর ভিত্তি করে। অন্য অনেক নাটকে অশালীন অনুচ্ছেদ আছে যেমন : রোমিয়ো এবং জুলিয়েট, অধিকাংশ ফরাসী নাটক এবং শেকসপীয়রের অনেক নাটকের চেয়ে এই নাটকটি খারাপ নয়।...ম্যাজিস্ট্রেট মহিলাটিকে বলাৎকার করার পর এই নাটকের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, যেমন জেলে যে বিদ্রোহ ঘটে, তবু তার অভিমত হচ্ছে যে, এই নাটকে কোন অশ্লীলতা নেই। এবং এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, আসামীদের কোন রকম অপরাধ করার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁরা পুলিসের সামনেই অভিনয় করেছেন।'[৯]

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ),উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসু ও যোগেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁদের সাক্ষ্যে বইটিকে নির্দোষ বলে মন্তব্য করেন (ইংলিশম্যান, ১৩ মার্চ, ১৮৭৬)।

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। মিঃ পি ডি ডিকেন্স অশ্লীলতার দায়ে আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করলেন।

'The evidence of the defence, it appears to me, proves too much, according to it nothing would be obscene, unless it is couched in obscene words. According to my opinion the passage in evidence is grossly obscene. It appears, a good taste is afforded by the daily newspapers, which have rejected the passages as unfit for publication'.[১০]

১৮৭৬ সালের ৮ মার্চে প্রদত্ত রায়ে পি ডি ডিকেন্স ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২, ২৯৪ ধারা মতে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুকে দোষী সাব্যস্ত করে। তাঁদের একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মামলার শুনানির সময় আদালতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। পুলিসকে বারবার লোকের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ৯ই মার্চ হাইকোর্টের উকিল লাইব্রেরিতে এক সভায় এঁদের মুক্তির জন্য লেঃ গভর্নরকে একটি স্মারকলিপি দেবার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র,ব্যারিস্টার রবার্ট অ্যালেন ও উড প্রমুখ ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপীলে উদ্যোগী হন এবং হাইকোর্টের ক্রিমিন্যাল বেঞ্চ আসামীদের জামিনে মুক্তি দেন। ওই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি ফিয়ার ও বিচারপতি মার্করি।

এই আপীলের ব্যয় বহনের জন্য ১১ই মার্চ, ১৮৭৬ 'বিনিফিট'[*] অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। তাতে এই মর্মে আবেদন জানানো হয়। **" patrons and countrymen, now or never is the opportunity to help us"**[১১]

এই আবেদনে কলকাতার মানুষ বিপুলভাবে সাড়া দেয়। জেলের আসামীদের প্রতি খুব ভদ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়।[১২]

আপীলের শুনানীর সময় ব্রানসন, টি পালিত ও মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবীরা সুরেন্দ্র বিনোদিনীর পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁরা টেনিসন ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে এটি অশ্লীল নয়। ২০শে মার্চ বিচারপতি ফিয়ার ও মার্করি আসামীদের খালাস দেন।

এই রায়ের পর বিচারপতি ফিয়ার ৩০শে মার্চ, ১৮৭৬ ভারত ত্যাগ করেন। গুজব তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে সেদিন কলকাতার মানুষের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন। হিন্দু মহিলা স্কুলের পক্ষ থেকে লেডি ফিয়ারকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, যখন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' মামলার জন্য মর্মাহত, যাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তখন কিছু ব্রাহ্ম এতে বিশেষ আনন্দিত ছিলেন। এ সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়ট ব্রাহ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজের এক মুখপত্র ইন্ডিয়ান মিররের নিম্নের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছিল।

"We thank viceroy and we thank the police and Mr. Dicken for their noble effort to stem the tide of public immorality".[১৩]

হিন্দু পেট্রিয়ট এর তীব্র নিন্দা করেন

"It is indeed very funny to conclude from a resolution of a society the existence of which is unknown to the public that the recent arbitrary acts of government have given universal satisfaction. It would help nobody to discuss whether the above representation was deliberately made or not but our contemporary ought to have known that the native community feels surely the late arbitary proceedings to the government, the Magistrate and police and the people are really very much alarmed"[১৪]

যেদিন (২০শে মার্চ, ১৮৭৬) এই মামলার রায় সরকারের বিরুদ্ধে গেল, সেদিনই মিঃ হবহাউস লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে Dramatic performance Bill তোলেন। সেদিন থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে সরকারি লাগাম পড়ল।

বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ইনডিয়ান স্টেজ প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন

"অশ্লীলতা সম্পর্কে সবসময়ই মত ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটা কখনই ন্যায়সঙ্গত নয় যে একজিকিউটিভ কর্তৃপক্ষের উপর কোনটি অশ্লীল বা অশ্লীল নয় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাচ্ছে, ন্যাশানাল থিয়েটারের মামলায় একজিকিউটিভ কর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটককে অশ্লীল বলেছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই নাটকটি অশ্লীলতা মুক্ত।"[১৫]

অশ্লীলতার কারণে নিষিদ্ধ দীনবন্ধুর সধবার একাদশী

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের বিরুদ্ধেও অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তারও কারণ অশ্লীলতা নয়, পদস্থ রাজকর্মচারীকে হেয় করার চেষ্টা। সরকার এই নাটকের ও তার অভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

আমরা দেখি 'সধবার একাদশী' রচিত হবার (১৮৬৫) অনেক পরে এটি নিষিদ্ধ হয়েছে—দীনবন্ধুর মৃত্যুর (১৮৭৩ খৃঃ) ৪০ বছর পরে—অভিযোগ **অশ্লীলতা**। ইতিমধ্যে নাটকটি বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। 'সধবার একাদশী' দিয়েই বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্ম—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র সে কথা বলেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর **'শাস্তি কি শান্তি'** নাটকটি দীনবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে উৎসর্গ পত্রে লেখেন

"যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত ; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশানাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"[১৬]

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর শিল্পসার্থক নাটক। কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে দীনবন্ধু এই ধরনের একটি নাটক লিখতে পেরেছিলেন সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন

"দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্যন্ত পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে যাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হইত। লোকের সঙ্গে মিলিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাফদের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য শোনিত পায়িনী নগর বাসিনী রাক্ষুসী, নদের চাঁদ, হেম চাঁদের মত 'উন পাঁজুরে বরা খুরে' হাপ পাড়াগাঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীনতাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা, কাওরানীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙালী লেখক তাহা পারে নাই।…

"দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।"[১৩]

অভিজ্ঞতা শেষ কথা নয়, সহানুভূতির রসায়ন চাই। বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে বলেছেন

"তাহার সহানুভূতি অতিশয় তীব্র। বিস্ময় ও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু এমন তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব দুঃখীর সঙ্গে নহে ; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পাপ চরিত্র ছিলেন না। কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন।—দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক তিনি সর্বস্থানে যাইতেন। শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। তিনি অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার প্রায় পাপাগ্নিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন।"[১৮]

সধবার একাদশীর প্রথম অভিনয় ১৮৬১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে, শারদীয়া পূজার রাত্রিতে, বাগবাজার মুখুজ্যে পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। "গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে, নানাবিধ ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করার অভ্যাস থাকা আবশ্যক এই নিমিত্ত উক্ত ভূমিকায় অভিনয় সাধারণ অভিনেতাদের দ্বারা অসম্ভব। এইরূপ সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের মুখে উক্ত উদ্ধৃত ইংরেজি কাব্যের আবৃত্তি দর্শকবৃন্দ যেরূপ আনন্দসাৎ করিয়াছিলেন, তদবধি বিস্মিত হইয়াছিলেন।"

"প্রায় সপ্তাহ পরে কোজাগরি লক্ষ্মীপূজায় শ্যামপুকুরস্থ নবীনচন্দ্র দেবের বাটিতে (গিরিশচন্দ্রের শ্বশুরালয়) 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয়াভিনয় হয়। তৃতীয় অভিনয় গড়পারে জগন্নাথ দত্তের ভবনে এবং চতুর্থাভিনয় দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের শ্যামবাজার বাটিতে হয়।…এই অভিনয়ে স্বয়ং গ্রন্থকর্তা দীনবন্ধু ও তাঁহার বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন।"[১৯]

সধবার একাদশীর অভিনয় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরে হয়ে গেছে। বাংলার বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় মানুষেরা সেই অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তারপর হঠাৎ কেন সেই নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, ব্যাপারটা রহস্যজনক। 'সধবার একাদশী'র বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক রোষ কি তার কারণ ? সধবার একাদশী সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টে অন্তত সে ইঙ্গিত আছে।

'The character of Kenaram, a deputy Magistrate, who is termed by the author 'Ghatiram Deputy' appears to be an attack on the selection by the Government men for the executive service which is chiefly filled up by men of high qualifications, strong character and good social status. It is pity that a Deputy Magistrate holding a position of responsibility should be painted such a licentious character and so grosly illiterate as to be utterly incapable of understanding simple thing'.[২০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পদস্থ আমলাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করাকে সরকার সুনজরে দেখেননি, উপরের নোটে তা স্পষ্ট। তবে আপাতত অশ্লীলতার অভিযোগেই সধবার একাদশী নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এফ. এল. হ্যালিডে এক বিজ্ঞপ্তিতে সধবার একাদশীর অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বইটি আর না প্রকাশের জন্য বসুমতী প্রেসকে নির্দেশ দেওয়া হয়

"In accordance with the provision of sec. 62-A(3) of Act IV of 1866 and 39-A clause (3) of the act II of 1866, as modified upto the first June 1910, the Commissioner of Police, Calcutta hereby prohibits you Purna Chandra Mukherjee of Basumati Press, 166 Bowbazar Street, from preparing, exhibiting or dissemination a book of publication entitled 'Sadhabar Ekadashi' by the late Rai Bahadur Dinabandu Mitra which is of a nature of outrage morality and decency.

Sd. F.L. Halliday
Commissioner of Police
Calcutta."[২১]

Calcutta the 19th
February, 1914

এই সময় স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগে এ নিয়ে ফাইল চালাচালি হয়। নাটকটির কি ধরনের সারসংক্ষেপ করা হয়েছিল তা নিম্নের সরকারি নোট থেকে বোঝা যায়।

'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের লেখা এটা একটা সামাজিক বিদ্রূপ নাটক। বড়লোকের একমাত্র বকে যাওয়া ছেলে অটল কয়েকজন লম্পটের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। বিশেষ করে পাঁড় মাতাল অসৎচরিত্র নিমচাঁদের প্রভাব তার উপর খুব বেশি। এভাবে সে নিজের সর্বনাশ করেছে। সে তার শোভনতার বোধ হারিয়ে ফেলে, এবং তার পারিবারিক বাসভবনে একজন বাজারের মেয়েকে রক্ষিতা হিসাবে রাখতে এবং তার বাবা-মার সামনেই তাকে আনতে ইতস্তত করেনি। একমাত্র পুত্রের প্রতি অন্ধ ভালবাসায় তার বাবা মা এমনকি মেয়েমানুষ ও মদের জন্য তাকে টাকাকড়িও দিতেন। কারণ তাঁরা পুত্রের আত্মহত্যার হুমকিতে ভীত ছিলেন। সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটলো একদিন যখন একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে অটলের কয়েকজন আত্মীয় আমন্ত্রিত হন যখন সে অসৎ উদ্দেশ্যে তার খুড়শাশুড়ীকে অপহরণের জন্য একজন নপুংসককে কাজে লাগালো। তবে এই নপুংসকটি তাকে চিনতে না পেরে ভুল করে জোর করে অটলের কাছে নিয়ে এল অটলেরই বউকে। অটল তখন মুঘলের ছদ্মবেশে তার সদর ঘরে অপেক্ষা করছিল। অটলের কাকা সেখানে আসেন এবং অটলকে কয়েকটা জোর থাপ্পড় দেন। অটলের বন্ধু নিমচাঁদকে খোঁজা হয় এবং তাকে একটি ঘরে পাওয়া যায়। অটলের কাকা তাকেও উত্তম মধ্যম দেন। তার পর তারা ঠিক করে বাগানে বেড়িয়ে এবং মদে ডুবে এই ব্যথা ও দুঃখের উপশম করবে।'[২২] (অনূদিত)

বইটির অশ্লীলতা প্রসঙ্গে মন্তব্য কালে নোট লেখক শিল্পে নীতি-দুর্নীতি প্রসঙ্গ এনেছিলেন, এবং দীনবন্ধুর রচনার ক্ষেত্রবিশেষে শ্লীলতার অভাব সম্বন্ধে সাহিত্যরথীদের মন্তব্যও তুলেছেন :

"যে সব অনুচ্ছেদের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হল, তা থেকে দেখা যাবে যে নাটকটি অশ্লীলতায় ভরা যা শোভনতার পক্ষে অন্তরায়। এতে কয়েকটি স্থূল শব্দও আছে। যেমন, পুঙ্গিরপুত (২৪ পাতায় বাঙাল (২৫ পাতায়), ৩৩ পাতায় 'ফিরিঙ্গী' শব্দটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত হয়েছে। কারণ এখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঘৃণার নিদর্শন হিসাবে ভারতীয়রা ব্যাপকভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করে।

'সম্ভবত এই জন্যই বাংলা সাহিত্যের সম্রাট স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্র বাহাদুর যিনি লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁর দীনবন্ধু জীবনীতে বলেছেন, 'সধবার একাদশী'র যেমন অত্যন্ত প্রশংসোর দিক আছে, তেমনি অসাধারণ খারাপ দিকও আছে। সেইজন্য আমি দীনবন্ধুকে অনুরোধ করেছিলাম যে, অনেক সংশোধন না করে এটি না প্রকাশ করতে।

"সমকালীন বিশিষ্ট সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর বাংলা সাহিত্য ও ভাষা সংক্রান্ত বইয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 'সধবার একাদশী' অশোভন ও জঘন্য। দুঃখের কথা যে, দীনবন্ধুর মত একজন শিক্ষিত লেখকের কলম থেকে এই ধরনের বাজে লেখা বের হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হাল্কাভাবে বলা যেতে পারে যে, এই বইটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজিক। নৈতিক পথ থেকে অটলের ইচ্ছাকৃত ও অস্বাভাবিক পতন চরিত্রহীন লোকদের উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করা উচিত। খুড়শাশুড়িকে অপহরণের চেষ্টার জন্য কাকার হাতে উত্তম মধ্যম খাওয়ার পর এই অন্যায় ও জঘন্য কাজের জন্য লজ্জিত না হয়ে সে বাগানে গিয়ে একজন লম্পট বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপান করতে চেয়েছিল। নাটকের শেষে অটল নিজে যেসব বলেছে, তা থেকেই এর প্রমাণ মেলে। তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অটলের চরম ঔদাসীন্য অমানবিক, শহরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আনন্দের যে উজ্জ্বল চিত্র আঁকার চেষ্টা এখানে হয়েছে, বিবাহিত তরুণদের পক্ষে তা খারাপ দৃষ্টান্ত।

"ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারামের চরিত্র, যাকে লেখক ঘটিরাম ডেপুটি বলে উল্লেখ করেছেন, এমনভাবে চিত্রিত যে মনে হয় একজিকিউটিভ সার্ভিসে সরকারের লোক মনোনয়নের প্রতি আক্রমণ করা হয়েছে। অথচ এই পদে প্রধানত উচ্চশিক্ষার, দৃঢ় চরিত্রের ও ভাল সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন লোকেদেরই মনোনীত করা হয়। এটা দুঃখের কথা যে, দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের একজন দুশ্চরিত্র লোক হিসাবে চিত্রিত হবে এবং তিনি এতই অশিক্ষিত যে অতিসাধারণ জিনিসও বুঝতে এমন অক্ষম।

"নাটকের অন্যতম চরিত্র ও পূর্ববঙ্গের লোক রামমাণিক্যকেও ভালভাবে চিত্রিত করা হয়নি। লেখক যেভাবে তাঁর চরিত্র এঁকেছেন, তাতে পূর্ববঙ্গের লোকেদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি নির্দয়ভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। রামমাণিক্যের বউকে প্রকাশ্যে আনা এবং তার চরিত্রের প্রতি বিরূপ মন্তব্য শোভনতা ও নৈতিক রুচির পরিপন্থী। লেখক রামমাণিক্যের মাধ্যমে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাবে ওইসব মন্তব্য করেছেন। কলকাতার লোকদের সম্পর্কে রামমাণিক্যের অশোভন মন্তব্য সাধারণভাবে কলকাতার লোকেদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে।

"সৌদামনী (অটলের বোন) এবং কুমুদিনীর (অটলের বউ) মধ্যে কথোপকথন যা পুরো একটা অঙ্ক জুড়ে আছে, তা অশ্লীলতার ঠিক সীমানায় রয়েছে।

"আর্ট শোভনতার বন্ধনে বাঁধা নয়—সাধারণভাবে এই চিন্তাই করা হয়। এক্ষেত্রে এই ধারণা মনে হয় ভুল। আর্টের দোহাই দিয়ে অশ্লীলতা ও কুরুচিকে কখনই ক্ষমা করা উচিত নয়। আর্ট স্বাভাবিক হলেও যখন তা শোভনতা ও সুরুচির গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় তখন তাকে সুন্দর বলা যায় না। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে জীবনচন্দ্রের মুখ দিয়ে একটি অনুচ্ছেদে লেখক যা বলেছেন, তাতে নিশ্চয়ই তিনি সুরুচি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মনের পরিচয় দেননি। সেখানে আছে :

'জীব। তোমার মা উপপতি করে এনে দেন—যা গুওটা আজ হতে তোকে আমি ত্যজ্যপুত্র কল্যম। (৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)'[২৩]

পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের নোট আমি মূলেই উপস্থিত করছি, যার মধ্যে তিনি বিশেষ আপত্তিকর অংশগুলি চিহ্নিত করেন :—

নকুলেশ্বরকে নিমচাঁদ :—

'ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্ছে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্রান্‌টিন্ দেখয়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্তৃক পতিবিনাশিত হয়েছে—' (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

নিমচাঁদ তার বন্ধু অটলকে (যেমন দুজনেই মাতাল) 'কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ ?'

অটল বেটি তিন-শ টাকা মাসোয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাকলে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখতেম। (১ম অঙ্ক, ১ম ভাগ)

কাঞ্চন ও অটলের কথোপকথন:

কাঞ্চনকে অটল—'কেন জানি আমি তোমায় যেদিন থেকে রেখেচি, সেইদিন থেকে নিমচাঁদ তোমায় ত মাসী বলে ডাকে জানি।

কাঞ্চ। মাতাল হলে নিজের মাসী বড় জ্ঞান থাকে, তা আবার পাতানে মাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অট । না, জানি সে আমার বুজম্ ফ্রেন্ড, জানি সে আমায় বলেচে, ফ্রেন্ডের মেয়েমানুষ মাসীর মত দেখতে হয় ।

কাঞ্চ । আমার কপালে বনপো উপপতিই ঘটে—প্রিয়শঙ্কর যখন আমায় রাখলে, তখন রমানাথ আমায় মাসী বলতো, তারপর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী বললেন ; পাছে রমানাথ কিছু ভাবে, তুমি আমায় মা বলতে, তা মনে আছে ? এখন আমি তোমার জানী হইচি । (২য় অঙ্ক, ২ গর্ভাঙ্ক)

নিমচাঁদ ভোলাকে বলছে :

'জামাইবাবু, ত্বরায় শ্বশুর বাড়ি যাও, তুমি যে, বাহার দিয়ে এয়োচো, তোমার বিরহে আমাদের মেয়ে এতক্ষণ কত কাঁদচে—' (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

ভোলা । বেলিমেন্ট সার, প্রেগনান্ট সার্—ইয়েস সার ।

অটলকে রামকান্ত

'পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর‍্যা মস্তক গুরাই দিচে—বাঙ্গাল কউস ক্যান—এতো অকাদ্য কাইচি তবু কলকত্বার মত হবার পারচি না? কলকত্বার মত না করচি কি! মাগীবারী গেচি, মাগুরি চিকন দু'তি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বক্কোন করচি, বান্ডিল খাইচি,—এতো কর‍্যাও কলকত্বার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেহত্তে আর কাজ কি,......' (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

রামমাণিক্য একজন পূর্ববঙ্গের লোক । একজন বোকা লোক হিসাবে তাকে দেখানো হয়েছে । নিমচাঁদ তাকে মদের গ্লাস এগিয়ে দেয়—গ্লাসের উপরে সে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে এবং বলে যে, সে এটা শোধন করছে । তখন নিমচাঁদ বলে "ব্যাটা খাবেন ব্র্যান্ডি, মন্ত্রের ধূম দেখ, ভাদ্র বোয়ের কাছে শোবেন, মাঝে একটা বালিস দিয়ে—দে ব্যাটা গেলাস দে"— (ঐ)

রামমাণিক্যকে নিমচাঁদ—

'আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

......স্টীমারে যাবো, তোর ভাগ্যধরীকে আনবো'

রাম । হালা বাই হালা, ই কি তোর কলকাত্বাই মাগ, উমি লোকের লগে খারাপ কাম্ করাব—বাগ্যদরী বাই বাতার করাব, স্যাও বালো, পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না ।

নিমচাঁদ অটলকে—তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে, সুন্দরও—

অট । পেটও হবে—

ভোলা । বেলিমেন্ট সার ? প্রেগনান্ট সার, হুজ সার্ ? (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ কেনারাম ও তার আর্দালির প্রবেশ

অট । হাল্‌লো, হাল্‌লো, কেনারামবাবু যে ।

কেনা । তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাত কত্তে এলেম ।

নিম । তিনি হন কে ?

আর । (হাত জোড় করিয়া) ডেপুটি মেজেস্টার রায় বাহাদুর—হাকিম,

নিম । চিকিৎসা কত্তে জানে ?

canst thou not minister
    To a mind diseas'd
Pluck from the memory
    a rooted sorrow;
rase out the written
    troubles of the brain;
And, with some,
কে বলে দেওনা ।

কেনা । আমি ডাক্তার নই ।

নিম । হাকিম বল্যে যে—তুমি ডক্‌টর । জন্‌সনে চিকিৎসা কর নাই ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কেনা। না

নিম। সেই জন্যে—তা হলে বলতে

'There is the patient.
Must minister to himself'......

ভোলা। (কেনারামের প্রতি) অনার্ড সার্, ঘটিরাম ডেপুটি সার—

অটল। ঘটিরাম কি রে?

কেনা। ...ওঁর নাম ঘটিরাম ডেপুটি।

এরপর কেনারাম কি করে ঘটিরাম হল, তা ব্যাখ্যা করেন। কেনারামের মুখে—

'ভাই বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া বড় কঠিন—আমি একদিন মুচিরাম ফরিয়াদের নাম পড়তে ঘটিরাম বলেছিলুম···

···আমার সাক্ষাতে কেউ বলতে পারে না—পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে ঘটিরাম ডেপুটি, আমার কাচারি আস্তে হলে বলে, ঘটিরামের কাছারি যাচ্ছি।'

নিমচাঁদ কেনারাম ডেপুটিকে (যিনি ব্রাহ্ম হয়েছেন) এই প্রশ্ন করেন ···তুমি কি হিন্দুর সব দেবতা ত্যাগ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ?

কেনা। The question is very painted.

নিম। ····ফিরিঙ্গি যে ক্রিশ্চান, তবু তারা কালীকে ভয় করে পূজা দেয়, তাহাতে তাঁর নাম ফিরিঙ্গী।

কালী। বলো বাবা, ভেবে বলো।...'[২৪]

সধবার একাদশীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্যে আবেদন নিবেদন চলে। শেষ পর্যন্ত সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। বছর পাঁচেক পর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

কলকাতার সরস্বতী ইন্সটিট্যুটের অবৈতনিক সম্পাদক হরেন্দ্রকুমার সর্বাধিকারী এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারিকে এক দীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ পত্র লেখেন। ১৯১৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা ওই পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন, নীতি নাশ নয়, নীতি প্রতিষ্ঠাই দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য। বিশ্বের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের তথাকথিত অশ্লীল রচনাংশের উল্লেখ তিনি করেছিলেন নিজ বক্তব্যের পক্ষে।

বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারিকে লেখা তাঁর পত্রের অনুবাদ এই :

"কলকাতার পাবলিক্ লাইব্রেরী এবং ফ্রি রিডিং রুম্ সরস্বতী ইন্সটিট্যুটের কমিটি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে মাননীয় সপারিষদ রাজ্যপালের বিবেচনার জন্য সরকারি নির্দেশের প্রতিবাদে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি পেশ করিতে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের বাংলা নাটক 'সধবার একাদশী'র বিরুদ্ধে (ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে) কলকাতার পুলিশ আইনের ৬২এ (৩) ধারা অনুসারে ঐ নাটকটি নিষিদ্ধ এবং এর অভিনয় নিষিদ্ধ করে যে আদেশ জারি করা হয়েছে তার প্রতিবাদে এই বক্তব্য জানাচ্ছি।

"১৮৬৫ সালে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অসংখ্যবার মাননীয় এবং প্রশংসামুখর দর্শকের সামনে অভিনীত হয়েছে প্রকাশ্যে এবং প্রাইভেট রঙ্গমঞ্চে। মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ভারতের সেক্রেটারি অব্ স্টেটের কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার সম্মানে অতি সম্প্রতি কলকাতার ইনকোর্পোরেটেড ল সোসাইটি'র সদস্যরা—এটি মঞ্চস্থ করেন।

"এই নাটকের নায়ক অটলবিহারী একজন ধনী ব্যক্তির ছেলে। সে একজন কুখ্যাত বারাঙ্গনার পিছনে তার প্রায় সমস্ত সম্পদ খরচ করে ফেলেছে। এই কাহিনীর আকর্ষণ নিমচাঁদকে নিয়ে। নিমচাঁদ এই নাটকের সহ নায়ক। সে একজন শিক্ষিত যুবক, তার পাণ্ডিত্য খুব বেশী। কিন্তু সে মদে আসক্ত, অসৎ আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকার পর দুজনেই অনুশোচনা করে। এই নিমচাঁদের মাধ্যমে লেখক নৈতিক দিকটি তুলে ধরেছেন। মদ ও মেয়ে মানুষের পিছনে ছোটার কুফল দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এবং নিমচাঁদকে এর একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ধরনের লম্পটের জীবন যাপনের দিকটি এই কাহিনীতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়নি এবং নাটকের চরিত্রগুলিও এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতিরঞ্জিত করা হয়নি যে তা শোভনতার বোধকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে শিল্পসৌষ্ঠব এত চমৎকার যে, জীবনে যা সত্য সেই ভাবেই পরিস্থিতির সৃষ্টি।

"মলিয়ারের 'ল্য মিসাঁথ্রোপ' এবং 'তারতুফ', বালজাকের 'কমেদি উম্যান', এমিল জোলার 'লাসোমোয়া' এবং 'তেরেস রাকোয়া,' কাউন্টলিয় টলস্টয়ের 'রেজারেকসন' এবং 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' এই ধরনের লেখা এবং বিশ্বের শিক্ষিত সমাজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এইসব লেখাকে দেখে। কারণ এইসব বইয়ে সমসাময়িক জীবন ও আচার আচরণের জীবন্ত চিত্র আছে। এইসব নাটকে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের নৈতিক মান বাড়ানো। স্টিনবার্গ বা গলবের্গে দ অ্যানানজিও জীবন্ত শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রশংসিত হন। যদিও তাঁরা মানব প্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর আবেগের অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন তাঁদের লেখায়।

"এলিজাবেথের যুগের নাট্যকারদের শেক্সপীয়ার ও বেন জনসন বা মারস্টোন এবং ম্যাসিংগার বা ওয়েলস্টর এবং ডেকরের নাটকগুলিতে যদিও ষোড়শ শতকের ইংলন্ডের ব্যঙ্গকৌতুকের অস্বাস্থ্যকর সুরের প্রকাশ, নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ নাট্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি তাঁদের লেখনী থেকেই বের হয়েছে। কনগ্রিভ ও স্যার জন ভাব্রুগের নাটকগুলির সর্বত্র দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের বিষাক্ত স্বাদ পাওয়া যায়। এই সব নাটকের স্থূলতা ও নৈতিকতা বিরোধী চরিত্র তাঁদের যুগেরই প্রকৃত প্রতিনিধি। হ্যামিলটন থমসন যিনি রেসটোরেশন যুগের নাট্যকার ও কবিদের সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁর মন্তব্য হচ্ছে:

'রেসটোরেশন যুগের কমেডি নৈতিকতা—যদি এই ধরনের কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকার কথা আমরা বলতে পারি তা শোচনীয়ভাবে খারাপ।' উইলিয়ম উইচারলির নাটকগুলির প্রতিটি নায়কই ম্যাকাউলের ভাষায়, 'ভয়ঙ্কর কামুক, যে নিজেকে একটা বড় রাস্কেল হিসাবে ভাবে, এবং সে প্রত্যেককে তার মতই ভাবে।' স্যার জর্জ ইথারেগের নাটকগুলি সম্পর্কে স্যার রিচার্ড স্টিলের অভিমত, 'আমি একে স্বাভাবিক অনুভূতি বলে মানতে রাজি, তবে এটা চরম দুর্নীতি ও অধঃপতনের অনুভূতি।'

"আমার কমিটির অভিমত এই যে, 'সধবার একাদশী' নাটকে এমন কিছু নেই যা নৈতিকতার পরিপন্থী। এবং আমার কমিটির অভিমত এই যে, সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্বের ছবি আঁকার জন্য বাস্তব চিত্র দরকার। যার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সমাজের নৈতিক দিকের উন্নতি সাধন। প্রকাশিত হবার পর থেকেই এই নাটকটি ক্লাসিক বলে গণ্য। এটি উচ্চগুণসম্পন্ন স্যাটায়ার। সমসাময়িক জীবন ও রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করার জন্যই এটি রচিত। এর তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ আক্রমণের জ্বালা অত্যধিক মদ্যপান—আসক্তির ব্যাধি ও আনুষঙ্গিক দোষগুলিকে লক্ষ্য করেই। জনগণের নৈতিক বোধের উন্নয়নই এর উদ্দেশ্য।

"আমার কমিটি দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করে যে, এই নাটকটিতে শোভনতাবোধের হানিকর কিছু থাকতে পারে না, অপর পক্ষে নৈতিকতাবর্জিত জীবনের প্রলোভনের বিরুদ্ধে এটা একটা সতর্ক বাণী। এই পরিস্থিতিতে আমার কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে পুলিশ কমিশনারের সেই আদেশের বিরুদ্ধে যা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে জারি করা হয়েছে। এবং আবেদন জানাচ্ছে এই আদেশ বাতিলের।"

সরস্বতী ইনস্টিট্যুট
৫২-৩, শাঁখারিটোলা লেন,
কলিকাতা
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবক
হরেন্দ্রকুমার সর্বাধিকারী
"অনারারি সেক্রেটারি"[২৫]

সরস্বতী ইনস্টিট্যুটের ওই পত্রের ভিত্তিতেই 'সধবার একাদশী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই নাটকটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ১৯১৯ সালের ৫ই অকটোবর সার্কুলার বের হয়। তার বয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

To
The Commissioner of Police,
Calcutta.

Sir,
With reference to the correspondence once resting with your letter No. DDP 5659 dated the 11th September; 1919, I am directed to request that you will be so good as to withdraw the order, issued on the 19th February, 1914 by Sir F. L. Halliday, Late Commissioner of Police, Calcutta prohobiting the preparation, exhibition etc. of the book entitled 'Sadhabar Ekadashi' by Late Rai Dinabandhu Mitra Bahadur.

5.10.1919 I have etc.
Writers Buildings, Sd/-
Calautta. Deputy Secretary[২৬]

ওই একই তারিখের পত্রে ডেপুটি সেক্রেটারি সরস্বতী ইনসটিট্যুটের অনারারি সেক্রেটারি হরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীকেও 'সধবার একাদশী' থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। তার বয়ান

To
The Hony. Secretary,
Saraswati Institute,
Calcutta.

Sir,
With reference to your letter dated the 19th September, 1919 I am directed to say that the Commissioner of Police, Calcutta has been instructed to withdraw the order issued under Police Act of Halliday in 1914."[২৭]

অরাজনৈতিক (?) কারণে যেসব বই সরকারী রোষে পড়েছে 'সধবার একাদশী' সেই তালিকার দ্বিতীয় গ্রন্থ। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কারণও নাটকটির নিষিদ্ধ হওয়ার পিছনে থাকতে পারে, যা সুরেন্দ্র বিনোদিনীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তবে দীনবন্ধু এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, কারণ তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে এটি নিষিদ্ধ হয়। জীবনকালে এটির উপর সরকারী নজর পড়লে দীনবন্ধুকে খুবই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত। নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ নিয়ে রেভারেন্ড লঙের বিরুদ্ধে বিচারের সময় তো অভিযোগকারীদের প্রধান কৌসুলি একাধিকবার বলেছেন যে, এই নাটকে সিভিল সার্ভিসের মানহানি ঘটেছে। সধবার একাদশীতেও অনুরূপ ব্যাপার রয়েছে, ঘটিরাম হাকিমের চরিত্র চিত্রণে।

আমরা দেখলাম, অশ্লীলতার অভিযোগে এই দুটি নাটক নিষিদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ অভিযোগ প্রত্যাহৃতও হয়েছে। আসলে আমরা যতদূর দেখেছি অশ্লীলতার অভিযোগে একটি মাত্র বই নিষিদ্ধ হয়েছে, যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সংবাদ আমাদের কাছে নেই। বইটির নাম 'সখের জলপান।' এই নাটকটি ১৯১১ সালের এপ্রিলে নিষিদ্ধ হয়। লেখক, বাবু শৈলেন্দ্রকুমার সরকার এম এ। এ সম্পর্কে পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে বাংলা সরকারের আন্ডার সেক্রেটারিকে এই মর্মে চিঠি লেখা হয়

D.O. 2285/P.10 Office of the Commissioner
of Police, Calcutta
10.4.1911.

Mv dear Cullis,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

I send herewith an extract from the Commissioner Registrar of Dramas together with a printed copy, of a farce entitled "Sakher Jalpan -Thikey-Thik' submitted by Kohinoor Theatre on the 27th Jany. 1911.

In page 1 of the printed copy book sent by this office the marked portion of the dialouge of Somru has been expunged as obscene, this deletion has been initiated by the Manager of the Kohinoor Theatre who agreed to omit it from the play.

As usual the Manager of the Theatre has been informed that the Commissioner of Police notes that the play is initiated to be shortly staged in his Theatre.

An extract from the Register of the Dramas regarding the above mentioned play together with office file No. P. 10 on the subject has been forwarded to the special Dept. for information and publication in the abstracts.

Yours sincerely,
Sd/-

এই নাটকের যেসব অংশ বাদ দেওয়া হয়, তার একটি

"Pl. somru ; Not that I am disinclined to love......I have three Nice Bibis—Besides them there are five with whom I enjoy."

'পতিতার আত্মচরিত' নামে একটি বইয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে ১৯২৯ সালে। বইটিতে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হননের চেষ্টা হয়েছিল। 'মানবী দেবী' ছদ্মনামে বইটি লেখা। বইটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে এবং এ নিয়ে সরকারী ফাইলে নোট চালাচালিও হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি বাজেয়াপ্ত হয়নি। এ সম্পর্কে সরকারী ফাইলের নোটে আছে

'Informing Babu Hemanta Kumar Das and Ashutosh Dasgupta that Government after consulting their legal adviser have decided not to take any legal action in connection with the publication of the book in Bengal entitled 'Patitar Atma charit.'[২৮]

'নারীর পূজা' নামেও একটি নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। এবং এর অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফরম্যান্স আইনের ৩ ধারা অনুসারে। এর লেখক হলেন : বাঁশরীমোহন মুখার্জি। সরকারী আদেশে (নং ৮৯৯৩, তাং ১৪ই মার্চ, ১৯৩২) বলা হয় এই নাটকটি 'is likely to deprave and corrupt persons'.

পুলিশ কমিশনার এল এইচ কলসন এই নাটকটি সম্পর্কে বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে লেখেন

'As the drama is full of (obscene matter) it is likely to deprave and corrupt persons present at its performance.

অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু রাজরোষে পড়েছিল এবং সাহিত্য জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এমন একাধিক গ্রন্থ ও তাদের লেখক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আছে পরিশিষ্টে।

নির্দেশিকা

১। এ সম্পর্কে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য 'ফাড়কের মামলার পূর্বে, বঙ্গভূমিতে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক রচনার জন্য নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের বিচার হয়। ওই নাটকে এক বাঙালী যুবক একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করেছিল, এবং কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীরা কারাগার ভেঙে পালিয়েছিল।'—'বহুরূপী', মার্চ, ১৯৭৪ পুরাতন থিয়েটার সংখ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিরিশচন্দ্র', দেব বুক সং, পৃঃ ১২৫
৩। The Indian Stage, H. N. Dasgupta, P. 270.
৪। Ibid, p. 271
৫। Ibid, p. 276
৬। Ibid, p. 277
৭। Ibid, p. 277
৮। Ibid, p. 277-278
৯। Ibid, p. 278
১০। ibid, p. 279
১১। Ibid, p. 275
১২। Ibid, p. 280
১৩। Ibid, p. 281 & Indian Mirror, March 12, 1876.
১৪। The India stage, Dasgupta, p. 281-283. & Hindu Patriot, 27/3/1876.
১৫। Dasgupta, The Indian Stage, p. 286.
১৬। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিরিশচন্দ্র', পৃঃ ৫১
১৭। বঙ্কিম রচনাবলী—সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৮৩২
১৮। Ibid.
১৯। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিরিশচন্দ্র', পৃঃ ৫১
২০। Fl, No. 2B/30 (1-6), 1919, Home (Pol.), Beng. Govt.
৩২। Fl. No. 2B/36 (1-6), 1919, Home (Pol.), Beng, Govt.
২২। Ibid.
২৩। Ibid.
২৪। Ibid.
সরকারী ফাইলে 'সধবার একাদশী'র সংলাপের ইংরাজি অনুবাদ আছে। তার বদলে মূল বাংলা সংলাপ নেওয়া হয়েছে, 'দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ, স্বাক্ষরতা প্রকাশন' থেকে, পৃঃ ১৫৩—১৯৬
২৫। Fl. Govt. of Beng. Political Dept. B. Oct, 1919, Nos. 44-49.
২৬। Fl. No. 2B/36 (1-6), 1919, Home (Pol.) Beng. Govt.
২৭। ibid.
২৮। Fl. No. 666/1929. Home (confidential) Govt of Bengal.
২৯। Fl. No. 7p/7, 1932, Beng. Govt. Home (Pol.) confidential.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়
নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

ইংরেজ আমলে নিষিদ্ধ বাংলা বইগুলির অধিকাংশই নিছক প্রচারধর্মী—তাদের সাহিত্যমূল্য নগণ্য। ওই সব গ্রন্থের ঐতিহাসিক পটভূমিই আমাদের প্রধান আলোচ্য। কিছু বই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়েছে। তাই সংক্ষেপে এদের সাহিত্যমূল্যের উল্লেখ করছি। বাজেয়াপ্ত ও সরকারী রোষে পড়া বইপত্রের সংখ্যা অনেক হলেও এর মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ছাপ কয়েকটি মাত্র লেখাতেই আছে। যেমন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস বা নজরুলের 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি। নিষিদ্ধ বইগুলির মধ্যে সাহিত্য মূল্যের দিক দিয়ে শরৎচন্দ্র ও নজরুলের লেখাই সবার উপরে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিও সাহিত্য গুণসম্পন্ন। চরিত্র চিত্রণের যে অভিনবত্ব নিয়ে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার ছাপ আছে 'পথের দাবী'তেও। নূতনের কেতন উড়িয়ে নজরুল বাংলা কাব্যে যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা এনেছিলেন, তা তাঁর বাজেয়াপ্ত গ্রন্থগুলিতেও সুস্পষ্ট। বাজেয়াপ্ত যে সব নাটক প্রচারধর্মিতার ঊর্ধ্বে উঠেছে, তার মধ্যে গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিলে উল্লেখ্য মুকুন্দদাস ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলি। এ ছাড়া বাজেয়াপ্ত কিছু কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে অল্প স্বল্প সাহিত্যরস আছে। বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা 'চলার পথে'র একাধিক গল্প সার্থক ছোটগল্প। প্রবন্ধের বইগুলির অধিকাংশই নিছক প্রচারধর্মী লেখা। তবে কিছু বলিষ্ঠ লেখা আছে। নগেন দাসের পাঁচ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হলেও সেগুলিই সবই প্রচারধর্মী লেখা—রসোত্তীর্ণ কাব্যগ্রন্থ নয়। যেমন বাজেয়াপ্ত অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা ও লিফলেট।

বাংলা সাহিত্যের অন্য শাখার মত স্বদেশ চেতনা জাগাতে প্রবন্ধেরও ভূমিকা কম নয়। যেসব প্রবন্ধ সরাসরি স্বাদেশিকতা প্রচার করে রাজরোষে পড়ে, তার অধিকাংশই রাজনৈতিক আলোচনা জাতীয়। যা দেশবাসীকে নানা তথ্য ও কর্মসূচী দিয়েছে। উত্তেজনামূলক দেশাত্মবোধক প্রবন্ধও আছে। তবে এই সকল রচনার সাহিত্যমূল্য সাধারণভাবে বেশি নয়।

পরাধীন আমলে বহু বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এগিয়ে এসেছিলেন জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য। তাঁদের অনেকের লেখা সরকারী কোপে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়। কেউ কেউ শাস্তিও পান। যেমন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরে নিবন্ধ লেখার জন্য এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যুদ্ধবিরোধী কেন ?' পুস্তিকা লেখার জন্য দণ্ডিত হন। পরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বাংলায় প্রবন্ধের বই লিখে যাঁরা ব্রিটিশের রোষে পড়েন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য সখারাম গণেশ দেউস্কর। তিনি বাঙালী না হলেও তাঁর কর্মকেন্দ্র বাংলা-কলকাতা, লেখার ভাষাও বাংলা।

দেশের কথা সখারামের 'দেশের কথা' এবং 'তিলকের মোকদ্দমা'—এই দু'টি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। 'দেশের কথা' বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ১৯১০, ২২শে সেপ্টেম্বরের গেজেটে। (২৮৪০ পি ডি, তাং ২২-৯-১৯১০)। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ওই বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহৃত হয়—১৯৪৭ সালের ১৭ই মার্চ (নং ৩৩৮ পি আর)।

সখারাম গণেশ দেউস্করের অপর বই 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন কথা' নিষিদ্ধ হয় ১৯১০ সালের ১লা অকটোবর গেজেটে ঘোষণায় (৩০৫৬ পি ডি)।

'দেশের কথা' বইটিতে ব্রিটিশ আমলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে। এটি রমেশচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য লেখকের ইংরাজিতে লেখা অর্থনৈতিক ইতিহাসমূলক রচনার উপর নির্ভরশীল। 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা' বইটিতে বাল গঙ্গাধর তিলকের জীবনী ও তাঁর বিরুদ্ধে মামলার কথা আছে। এটি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাল গঙ্গাধর তিলককে (১৮৭৫-১৯২০) মহারাষ্ট্রের মুকুটহীন রাজা বলা হয়। শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব প্রবর্তন করে তিনি মহারাষ্ট্রের মানুষের মনে নতুন চেতনার সঞ্চার করেন। তাঁর প্রেরণা শুধু মহারাষ্ট্র নয়, সমগ্র ভারতে ছড়িয়েছিল। সুপণ্ডিত, যুক্তিবাদী তিলক রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁকে বারবার রাজরোষে পড়তে হয়েছে। কারাগারে দীর্ঘকাল আটক থাকতে হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের এই প্রথম সারির চরমপন্থী নেতা কংগ্রেসের আবেদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিবেদন নীতির তীব্র বিরোধী। তাঁর ঘোষণা—স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। ইংরেজের নিকট আবেদন নিবেদন না করে নিজেদের শক্তিতেই আমরা স্বরাজ লাভ করবো। গান্ধীজী রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পাবার আগের যুগে তিলকই সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট তিলকের মৃত্যু হয়।

মারাঠী নেতা তিলকের জীবনীকার সখারাম গণেশ দেউস্করও (১৮৬৯-১৯১২) মারাঠী। তিনি স্বদেশী যুগের নাম করা প্রবন্ধকার। তাঁর আদি নিবাস বোম্বাই-এর রত্নগিরি জেলার দেউস গ্রামে। জন্ম বিহারের বৈদ্যনাথধামের কাছে একটি গ্রামে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাটিয়ে সখারাম ১৮৯০ সালে কলকাতায় এসে 'হিতবাদী' পত্রিকার অফিসে কাজ নেন। ওই পত্রিকার প্রুফরিডার পদ থেকে ক্রমে তিনি সম্পাদকের পদে উন্নীত হন ও পরিচালনার কাজে অসাধারণ দক্ষতা দেখান। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। কর্মীদের সঙ্গে তিনি পাঠচক্র করতেন এবং তাঁদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ১৯০২ সালে মার্চে প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সেখানে ইতিহাস, ধর্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে সখারাম গণেশ দেউস্কর শিক্ষকতা করতেন। স্বেচ্ছাবাহিনী সমিতিও তিনি গঠন করেন আর্তদের সেবায়। শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সখারামের উল্লেখযোগ্য বই : 'দেশের কথা' 'শিবাজী দীক্ষা', 'শিবাজী', 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?'। 'দেশের কথা' অত্যন্ত জনপ্রিয় বই ছিল। অল্পদিনের মধ্যে এর পাঁচটি সংস্করণ বের হয়।

'দেশের কথা' সম্পর্কে 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' বইয়ে লেখা হয়েছে : "অন্যান্য যে-সকল বই 'নিষিদ্ধ' হয়েছিল, তার মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ১৯০৪ জুন ১৮ই তারিখে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। খুনখারাপি, হাঁকডাক, উন্মাদ উত্তেজনার বাণী ছিল না বইখানিতে। কিভাবে ইংরেজ তার শাসন শোষণ নীতির সাহায্যে ভারতকে নিঃস্ব করেছে, দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়েছে—অর্থ ও সহায় সম্বলহীন হয়ে লোক মরণের পথে চলেছে—এই ছিল পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদেশীয় কূটবুদ্ধিতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবনতি হেতু ইংরেজের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়ে, দেশ যাতে নিজশক্তির উপর নির্ভর করতে পারে তারই কথা ছিল প্রচুর।"

Sri Aurobindo on himself পুস্তকের মতে 'a book compiling all the details of India's economic servitude which has an enormous influence on the young men of Bengal and helped them to turn into revolutionaries in Bengal and assisted more than anything else in the preparation of the Swadeshi movement.'

'দেশের কথা' পর পর তিনটি সংস্করণ পার হয়ে, চতুর্থ সংস্করণ হঠাৎ ১৯১৩, ২২ সেপ্টেম্বরের সরকারী 'নিষিদ্ধ' পুস্তক তালিকায় উঠে পড়ে। তার পরেই অক্টোবর ১ দেউস্কর লিখিত 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' একই গোত্রে চড়ানো হয়। তাঁর 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' বইও সরকারী মতে এই শ্রেণীভুক্ত হয়।

তাঁর 'শিবাজী চরিত' গ্রন্থ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা চলে এই পুস্তকে সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (Sri Aurobindo on himself P. 307) পরে দাদাভাই নওরোজী ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে ভাষণদানকালে 'স্বরাজ' শব্দের প্রয়োগ করেন এবং তখন থেকে জাতীয়তাবাদী মাত্রেই একে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্থে ব্যবহার করে এসেছে।'

সখারাম গণেশ দেউস্কর বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি সরকারের বিষনজরে পড়ার পর তাঁকে ওই কাজ ছাড়তে হয়। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন অধ্যাপক ইস্তফা দেন। তাঁরা হলেন : বাবু বাবুরাম বিষ্ণু পরাধর ও বাজপাই। বাবুরাম ছিলেন সখারামের ভাইপো। 'দেশের কথা' বাজেয়াপ্ত করার বৈধতা তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। এসব তথ্য গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেছে। তার থেকে আরও জানা যায় যে, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হয়েও তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ন্যাশনাল কলেজের সভায় সখারামকে সমর্থন করেন। এ সম্পর্কে সরকারী নথিপত্র থেকে যেসব রিপোর্ট উদ্ধার করা গেছে, তার কিছু কিছু এখানে তুলে দিলাম

"In connection with recent Government orders proscribing two books of S. G. Deoskar entitled 'Desher Katha' and 'Tilakar Mokardama' The Commissioner of Police reports that he has received information that a meeting of the National Council of Education was held to consider the question of Pandit Sakharam's connection with the Bengal National College of which he is a professor. Babu Hirendra Nath Dutta, Brojendra K. Roy Chowdhury, Sir Gurudas Banerjee and T. Palit were among those present. T. Palit, a retired Barrister, suggested that, in the circumstance it was inadvisable that Sakharam should continue to work in the college and proposed that he be granted leave for 6 months on half pay. To this Sakharam did not agree. He said he would resign if the committee so desired. Hirendra Babu approved his resignation, and said that if this course was accepted on he would withdraw his donation from the College Funds. Brojendra Kishore supported Hirendra Babu. When the question was put to vote, Sir Gurudas Banerjee voted with Hirendra Babu and T. Palit's proposal was defeated."[২]

গোয়েন্দা দফতর থেকে ১৯১০ সালের ২৫শে নভেম্বর চীফ সেক্রেটারি স্টিভেনসন মুরকে যা লেখা হয়, তা নিম্নে দেওয়া হল

To Dear Mr. Stevenson-Moore,

With reference to para 5 of Mr. Levinge's No. 140 P. D. of the 15th ultimo, conveying His Honour's remark on the weekly Report of the 10th item, in the matter of S. G. Deoskar and the National Council of Education, I send you, herewith, an extract from letter dated the 14th instant, from the Commissioner of Police, Calcutta, which gives some further information on the subject.

পুলিস কমিশনারের সংশ্লিষ্ট পত্রটি নিচে দেওয়া হল

Extracts from letter dt. 14.11.1910
From Commissioner of Police.

"With ref. to your D. O. No. 9828/820 of the 17th Oct. intimating that His Honour wished for a further report regarding S. G. Deoskar and the National College, I have received information from an informer who spoke to Deoskar on the subject that T. Palit is still very anxious to get rid of Deoskar from the National College but Sir Gurudas Banerjee, Subodh Ch. Mullick and Hirendra Nath Dutta are in his favour...Meanwhile the National College has responed and Deoskar has resumed his duty as professor."[৩]

এর ১৯১০ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের গোয়েন্দা রিপোর্টে সখারামের দেশত্যাগের কথা আছে। পুলিস কমিশনার ওই গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে সখারামের পদত্যাগের কথা জানান

"Commissioner of Police reports that he has information that S. G. Deoskar has resigned his appointment in the National College since his name was mentioned by the approver, Lalit Chakbraberty, in Howrah gang case. He was given a month's salary in lieu of notice. It is also reported that his nephew, Babu Baburam Bishnu Paradhar (who challenged legality of the Govt. order proscribing 'Deshar Katha' as already reported) and a Mr. Bajpay also teaches in the National College, have resigned."[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সখারাম গণেশ দেউস্কর সম্পর্কে ন্যাশনাল কলেজ কি সিদ্ধান্ত নেন, সে ব্যাপারে পদস্থ আমলারা খুবই উৎসুক ছিলেন। এমন কি তৎকালীন লেঃ গভর্নরও এব্যাপারে জানতে চান ও রিপোর্ট চেয়ে পাঠান।

ওই বছরই বাবুরাম বিষ্ণু পরাধরের 'দেশ-কী-বাত' নামে একটি বই নিষিদ্ধ হয়। বাবুরাম বিষ্ণু পরাধর ছিলেন সখারামের ভাইপো। 'দেশের কথা' বাজেয়াপ্ত করে যে সরকারী আদেশ জারি হয়, তার বিরুদ্ধে তিনি আদালতে চ্যালেঞ্জ জানান। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজের তিনি একজন অধ্যাপক ছিলেন। 'দেশের কথা' বাজেয়াপ্ত হবার কিছুদিন পর তিনিও সখারামের সঙ্গে ওই কলেজ থেকে ইস্তফা দেন।

'মারো ফিরিঙ্গী কো' নামে একটি বই নিষিদ্ধ হয় ১৯১০ সালে। বইটির লেখক কে জানা যায়নি।

বর্তমান রণনীতি :- 'বর্তমান রণনীতি' বইটি নিষিদ্ধ হয় ১৯১০ সালের ৩০শে এপ্রিল (বিজ্ঞপ্তি নং ৪০৮ পি·ডি) মূল বাংলা বইটি দেখার সুযোগ হয়নি। রাজ্য সরকারের আরকাইভস-এ এর ইংরাজী অনুবাদটি দেখেছি। তাতে লেখকের নাম নেই। বাজেয়াপ্ত করার সময় যে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি বের হয়, তাতেও লেখকের নাম নেই। বইটির লেখক কেউ বলেছেন অবিনাশ ভট্টাচার্য, কেউ বলেছেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। কালীচরণ ঘোষ এটিকে বারীন্দ্র কুমারের বলে স্বীকার করে লিখেছেন

"বর্তমান রণনীতি" লেখেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত J. S. Block লিখিত 'Modern weapons and Modern war fare' অবলম্বনে এটি রচিত এবং ১৯০৭ অক্টোবর ৭ই প্রকাশিত। আধুনিক ছোটবড় মরণাস্ত্র, সেনা বিভাগের নানা অংশের এবং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম, সৈন্যসজ্জার বিধি ব্যবস্থা, কায়দাকানুন, আক্রমণ ও প্রতিরোধ বিভাগের কার্যপদ্ধতি, গরিলা যুদ্ধের রীতিনীতি প্রভৃতি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ বইখানি নানা ছবির সাহায্যে সমৃদ্ধ ছিল।(*)১৯০৭ অক্টোবর ১৩ই 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা করে। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি

"এই বই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ, জাতীয় চিত্তের নব ভাবনার দ্যোতক। অতীতের সংকীর্ণ জীবন ও আবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পর্বে আমরা রোমান্টিক কবিতা ও উপন্যাসে পরিতৃপ্ত ছিলাম, মাঝে মাঝে হয়ত পাঠ্যসূচীসম্মত দর্শন বা সমালোচনা মিলত এখন কিন্তু জাতিচিত্ত উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত—ইতিহাস, দেশাত্মবোধক নাটক, জাতীয়তার গান, এবং আমাদের প্রাচীন ও সজীব ধর্মের নিত্য উৎসবের বারিধারা ছাড়া কোনো কিছু কেউ নিতে চায় না। "বর্তমান রণনীতিতে" যে রণনীতি প্রকাশিত, সেটা আশু গ্রাহ্য বললে ব্যাপারটা বিপজ্জনক দাঁড়াবে সেটা বোঝবার মতো বাস্তববোধ বন্দেমাতরম্ কাগজের ছিল ; সুতরাং সে ত্বরিতে বলল, 'বর্তমান রণনীতি' ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমানের রণনীতি নয়। সমান ব্যস্ততার সঙ্গে জানাল "আমাদের কাজ হল, দেশবাসীকে জাতীয় জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান ও কর্মের জন্য প্রস্তুত রাখা।" (অনূদিত)

পঞ্জাবী পত্রিকায়ও এই বইটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এখানে প্রশ্ন করা হয় বাংলার যে নিহিলিস্ট আন্দোলন পুলিশ সদ্য আবিষ্কার করেছে, তার সঙ্গে কি বইটির কোনো সম্পর্ক আছে ?(*)

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আরকাইভসয়ে যে বইটি আছে, সেটি মূল বাংলা বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ। তা থেকে লেখকের নাম পাওয়া না গেলেও প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম পাওয়া যায়। এর প্রকাশক হলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (আরভালিয়া ২৪ পরগণা) এবং মুদ্রক হলেন : বিভূতি ভূষণ রায়। কলকাতার ৫, রামধন মিত্র লেনের 'সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত। প্রকাশনার তারিখ ২০শে আশ্বিন, ১৩১৪। মূল্য বার আনা প্রচ্ছদে প্রথমে ছোট অক্ষরে 'বন্দেমাতরম্' লেখা আছে। তারপর বড় অক্ষরে বইয়ের নাম 'বর্তমান রণনীতি'।

এই ইংরাজী 'বর্তমান রণনীতি' বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে ছাপা। সম্ভবত বিবেচনার জন্য 'পুট' করার উদ্দেশ্যেই মূল বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ সরকারের পক্ষে ছাপানো হয়। এই বইয়ের সবশেষে লেখা আছে ২২-১২-১৯১০

প্রচ্ছদের পরের পাতায় প্রকাশকের বক্তব্য। সরকারী ফাইল থেকে তার ইংরাজী অনুবাদটি তুলে দিলাম :Apology

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

On account of haste various errors have remained in the edition and certain important subjects the science of warfare would not be inserted. We trust that subscribers to Rana-Nite will excause all those wants and short comings through their kindness. If we receive encouragement, we shall try to remove these.

Abinash Ch. Bhattacharjee
Publisher

Arbhalia. 24 Pargana
20th Aswin. 1314 B. S.

'বর্তমান রণনীতি' বইটি দুই খণ্ডের। প্রথম খণ্ডে ছিল ৫টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ৮টি অধ্যায়।

প্রথম খণ্ডের অধ্যায়গুলি :—

Chapter I - War is the Rule of creation.
II An account of the weapons of this age.
III - Nomenclature and the Armory
IV Body and Limbs of the Army
V Strategy.

দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায়গুলি :—

Chapter I - Last half of strategy.
II Tactices of the offensive side.
III - The real form of modern warfare.
IV- Attack.
V Tactics of the cavalry.
VI Captains (officers) are the leaders.
VII - Guerilla mode of fighting at last turns into regular mode of warfare.
VIII- Whether fair or unfair.[৮]

মুক্তি কোন পথে ? 'মুক্তি কোন পথে' ? বইটি ১৯১০ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। এর লেখক হলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বের হলেও এটি লেখকের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধের সমষ্টি। ১৯০৭ সালের জানুয়ারিতে এটি প্রকাশিত হয় (১৩১৩ ১লা মাঘ) বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি হয় ১৯১০ সালের ৮ই আগস্ট। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ২৯৬৫ পি, তাং ৮-৮-১৯১০।

'মুক্তি কোন পথে ?' নিবন্ধের বইটি চার খণ্ডের ছিল বলে সরকারী গেজেট থেকে জানা যায়। এই বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। লণ্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও বইটি নেই।

'বর্তমান রণনীতি' ও 'মুক্তি কোন পথে ?' বই দুটি সম্পর্কে সমালোচক ইতিহাসকার লিখেছেন 'যুগান্তরের চোখা চোখা লেখাগুলি সংকলন করে বই বেরুলো 'মুক্তি কোন পথে ?' এবং 'বর্তমান রণনীতি'। প্রথম বইয়ে জনমত গঠন এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ঘোষিত। অস্ত্র সংগ্রহের অর্থ জোগাড় করতে দরকার হলে ডাকাতি করতে হবে। সানন্দে জানানো হয়, ট্রিগার টেনে কোনো ইউরোপীয়কে নিকেশ করতে তো বেশি গায়ের জোরে দরকার হয় না, বোমা তৈরি করতেই বা অসুবিধা কি ? শাসকগণ চমৎকৃত হয়ে শুনেছিলেন, মুক্তি কোন পথের সন্ধানীরা সৈন্যবাহিনীর কাছেও হাজির হতে ইচ্ছুক। ওক্ষেত্রে শুভফল অবধারিত, কেননা দেশীয় সৈন্যরা পেটের দায়ে সৈন্যদলে ঢুকলেও এদেশের মানুষ, তাদেরও রক্ত মাংসের শরীর, তাদের যদি স্বদেশের দুঃখদুর্দশার কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তারা যথাকালে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে (যেগুলি শাসকরা সরবরাহ করেছে) স্বাধীনতা যুদ্ধে লেগে পড়তে পারবে।"[৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' :

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বইটি ১৯১০ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। (গেজেট নং ৬৯৬ সি ডি, তাং ১৭-৫-১৯১০)। ১৯০১ সাল কলকাতা 'হিতবাদী' প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়। প্রকাশক নীরদবরণ দাস। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ যে নিছক বিদ্রোহ নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধনীতা সংগ্রাম—এই বইয়ে তা বলা হয়েছে। নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, সিপাহী বিদ্রোহই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই বইটি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ফাইলে যে রিভিউ আছে, তা নিম্নে দেওয়া হল

''Sipahi Juddhar Ithias' is a history of Sepoy Mutiny of 1857 and for the material of which the author professed to have consulted all available English sources of information as well as a large number of Hindi Pamphlets which went by the name of "Santaun Ka Gadar" (Mutiny of '57) Published and circulated in upper India in 1857 and **subsequent years.**

According to author the Mutiny was neither a war for religion nor a war for independence of a people but more convulsion brought about by a policy of indiscretion, deceipt and duplicity towards the Indian soldiery. the native states and the native landed gentry pursued by the East Indian Company from time of the Marquies Wellesly to that of the Lord Dalhousie.

The book was said to have been full of very hostile cirticism of the measures of Lord Dalhausie'",

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই জন্যই তাঁর বইটি রাজরোষে পড়ে। এই বইটির একটি করে কপি লণ্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। পাঁচকড়িবাবু (১৮৬৬-১৯২৬) বহু ভাষাবিদ, সাংবাদিক, সুলেখক ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। ব্যঙ্গ ও সিরিয়াস—দুরকম লেখাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনুবাদও করেছেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসও আছে। যেমন 'সাধের বউ', দড়িয়া'। তাঁর অন্যান্য বই 'বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়, 'ভিকটোরিয়া চরিত, ঔরঙ্গজেব, 'আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী, 'রূপলহরী বা রূপের কথা', 'শ্রী শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত। হিতবাদী, বঙ্গবাসী, প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখেন। তিনি সুবক্তাও ছিলেন।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে যে প্রথম সংঘবদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধ হয়, তাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়। সামরিক বিদ্রোহের সঙ্গে গণসংগ্রাম যুক্ত হয়ে এ এক প্রচণ্ড রূপ নেয়। আর একটু শক্তিশালী হলে এই যুদ্ধ ইংরেজ শাসনের সমাধি ঘটিয়ে দিত। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়—এই চারটি কারণে এই যুদ্ধ ঘটে। রাজনৈতিক কারণগুলি হচ্ছে লর্ড ডালহৌসির ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি, মুঘল সম্রাটের বংশধরদের প্রতি অসম্মান, পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তির বিলোপ সাধন ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কারণগুলি হল—বহু ভূস্বামীর উচ্ছেদ, সাতারা নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের বিলোপের ফলে বহু ব্যক্তির কর্মচ্যুতি, দাক্ষিণাত্যের বহু জমিদারী বাজেয়াপ্ত, এবং অযোধ্যা অধিকারের ফলে ব্যাপক বেকার সমস্যার সৃষ্টি। সামাজিক ও ধর্মীয় কারণগুলি হচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা, বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন। এছাড়া, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় সিপাইদের চর্বিযুক্ত এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তনে ধর্মভীরু হিন্দু ও মুসলমান সিপাইরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৮৭৫ সালের মার্চে ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম বিপ্লবের ইঙ্গিত দেন। তা পূর্ণরূপ নেয় মীরাটের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে (১০ মে, ১৮৫৭)। বিদ্রোহ সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ শক্তি জয়ী হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে নভেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে রাণী সরাসরি ভারতের শাসনভার নিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরবর্তীকালে লেখা আরও বই রাজরোষে পড়ে। যেমন, রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'। এই বইটি পাঁচ খণ্ডের। ১৮৭৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে খণ্ডগুলি বের হয়। তাঁর বইটি বাজেয়াপ্ত হয়নি। তবে রজনীকান্ত গুপ্তের বই রাজরোষে পড়েছে। একথা কেউ কেউ বলেছেন।[১১] কিন্তু আমি গেজেট সন্ধান করে এ সম্পর্কে সমর্থক কোনো উল্লেখ এখনো পাইনি।

অন্যান্য নিষিদ্ধ গ্রন্থ

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধরীর 'প্রসূন' ও 'প্রণব' নামে দুটি নিবন্ধের বই নিষিদ্ধ হয়। 'প্রসূন' নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯১১ সালে—৭ই মার্চ, ১৯১১ তারিখের গেজেটে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'প্রণব' নিষিদ্ধ হয় ১৯১৫ সালে (গেজেট বিজ্ঞপ্তির নং ১১৮৩, পি ডি, তাং ২-৬-১৯১৫) 'প্রসূনের' কোন কপির হদিশ পাইনি। তবে 'প্রণবের' একটি কপি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। ১৯১৪ সালে 'প্রণব' কলকাতা থেকে বের হয়। লেখকই প্রকাশক।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রখ্যাত 'নব্যভারত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুসারে তাঁকে জামিন দিতে বলা হলে তিনি নব্যভারত বন্ধ করে দেন। পরে আবার বের হয়। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আরও অনেক নিবন্ধের বই আছে 'সোপান', 'বিবেকবাণী', 'বিবাহ-সংস্কারক', 'দ্যুতি' 'দীপ্তি', 'যোগজীবন', 'সান্ত্বনা' প্রভৃতি। তিনি কয়েকটি উপন্যাসও লেখেন—'শরৎচন্দ্র' 'বিরাজমোহন', 'ভিখারী', 'সন্ন্যাসী', 'পুণ্যপ্রভা', 'মুরলা' প্রভৃতি।

এই সময় পরপর কয়েকটি নিবন্ধের বই বাজেয়াপ্ত হয়। যেমন, 'দেবসমিতি বা সুরলোকে স্বদেশ কথা'। এর লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত। কলকাতা থেকে বইটি প্রকাশিত। ১৯১১ সালে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

ভূবনমোহন দাশগুপ্তের 'আমরা কোথায়' নামে বই ১৯১১ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'স্বদেশ' প্রসঙ্গ বইটিও ১৯১১ সালে নিষিদ্ধ হয়।

১৯২১ সালে অনেকগুলি প্রবন্ধের বই নিষিদ্ধ হয়। বইগুলি হলো

'চরকা মাহাত্ম্য', 'যুগবতার গান্ধী', 'স্বদেশী চাবুক', 'স্বদেশী চশমা' ও 'স্বরাজ স্বর্গের সিঁড়ি'।

'চরকা মাহাত্ম্য' বইটির লেখক মৌলবী আহমেদ আলী। বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

'যুগবতার গান্ধী' বইটি ময়মনসিংহ থেকে মনোজমোহন বসু বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বদেশী চাবুকের (সপ্তম থেকে নবম খণ্ড) কয়েকটি খণ্ড নিষিদ্ধ হয়। 'স্বদেশী চশমা' নামেও একটি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়। বই দুটি বিহার, ওড়িশা ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সেও বাজেয়াপ্ত হয়।

এই বছর 'স্বরাজ স্বর্গের সিঁড়ি' নামেও একটি বই নিষিদ্ধ হয়। বইটি কলকাতা থেকে এন এন দাস ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২২ সালে খিলাফত আন্দোলন সংক্রান্ত একাধিক নিবন্ধ ও কবিতার বই নিষিদ্ধ হয়। 'খিলাফত ও মুসলমান এবং কর্তব্য' এবং 'স্বরাজ ও খিলাফত' এই দুটি নিবন্ধের বই ওই বছর বাজেয়াপ্ত হয়। প্রথমোক্ত বইটি বরিশাল থেকে প্রকাশিত এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৯৯এ ধারামতে নিষিদ্ধ হয়। 'স্বরাজ ও খিলাফত' বইটি বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯২৪ ও ১৯২৫ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে 'শেষ স্মৃতি' নামে একটি বই বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের লেখা এবং কলকাতার সরস্বতী প্রেস থেকে মুদ্রিত। এবং রংপুরের জ্যোর্তিময় দাশগুপ্ত হলেন এর প্রকাশক। বইটি সেন্ট্রাল প্রভিন্স থেকেও বাজেয়াপ্ত হয়।

মতিলাল রায়ের 'শতবর্ষের বাংলা' এবছর বাজেয়াপ্ত হয়। বইটি চন্দননগরের 'সাধনা প্রেস' থেকে মুদ্রিত এবং প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত। ১৯২৫ সালের ২৯শে জুলাইয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয় (নং বেঙ্গল নং ৭৩৩৫ পি)। বইটি প্রখ্যাত বাঙ্গালীদের জীবনী। মতিলাল রায়ের (১৮৮২-১৯৫৯) পিতা বিহারীলাল সিংহ চৌহানবংশীয় ছেত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজপুত ছিলেন। মতিলাল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ, বাঘাযতীন প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ করেন। পরে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব নেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। যেমন 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী', 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি' 'হিন্দু জাগরণ', 'যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ', 'অরবিন্দ মন্দির' প্রভৃতি। তাঁর আর একটি বই 'কানাইলাল' ১৯২৯ সালে নিষিদ্ধ হয়। তাঁর প্রবর্তক সঙ্ঘ থেকে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকাও বের হত। 'শতবর্ষের বাংলা' বইটি লণ্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা 'সান ইয়াত সেন' বইটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯২৫ সালের ১৭ই আগষ্ট। বিজ্ঞপ্তি নং ৮১২৬ পি। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও এ বইটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কলকাতার মেটকাফে প্রেসে এস ভূষণ পান কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং ব্রজবিহারী বর্মন কর্তৃক বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে এটি প্রকাশিত।

চীনের মহান বিপ্লবী নেতা সান ইয়াত সেনের জীবনী এটি। সান ইয়াত সেন (১৮৬৭-১৯২৫) চীন প্রজাতন্ত্রের জনক। দক্ষিণ চীনের সুইহেংয়ে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন দরিদ্র খ্রীষ্টান কৃষিজীবী। তিনি হনুলুলু ও হংকং এ মিশন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় হংকং-এ শিক্ষালাভ করেন এবং সেখানকার প্রথম মেডিকেল স্নাতক হন ১৮৯১ সালে। মাকাও ও ক্যানটনে তিনি ডাক্তারী ও চীনা প্রজাতন্ত্রী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশে গিয়ে প্রবাসী চীনাদের সাহায্যে জাতীয় দল 'হুয়ো মিন টং' গঠন করেন। ১৯১২ সালের বিপ্লবে তিনি নামকিং প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন। দ্বিতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হলে তাঁর নির্বাসন হয়। ১৯১৭ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯২১ সাল নানকিং-এ চীনা প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন। তিনি রুশপ্রভাবে প্রভাবিত হন এবং সাম্যবাদের ভিত্তিতে চীনের জাতীয় কর্মসূচী রচনা করেন। চীনের জনগণ তাঁকে এখনও গভীর শ্রদ্ধা করে। নানকিং এ তাঁর সমাধিস্থানটি জাতীয় পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। চীনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে চীন তাঁর শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে নিয়েছে।

'সান ইয়াত সেন' বইটির লেখক বিপ্লবী ও সাম্যবাদী নেতা মানবেন্দ্র রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিপ্লবী দলে ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে চিংড়িপোতা গ্রুপ নামে একট বিপ্লবী গোষ্ঠী গঠন করেন। প্রথম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ও শিবনারায়ণ স্বামীর দ্বারা প্রভাবিত। ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি গ্রেফতার হন এবং গার্ডেনরীচ ডাকাতি দলেও ছিলেন—১৯১৫ সালে। এই বছরই বিদেশ থেকে বিশেষ করে জারমানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যাপারে তিনি টি মার্টিন নামে দু'বার বাটাভিয়ায় যান। পরের বছর আমেরিকায় যান এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম নেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে অমেরিকায় গ্রেফতার হন এবং মেক্সিকোতে পালান। তিনি মেক্সিকো কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সালে তিনি মস্কোর কমিনটার্ন কার্যকরী কমিটির ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য হন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনি একজন পথিকৃত। চীন বিপ্লবের ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ১৯২৭ সালে চীনে যান। পরের বছর মত বিরোধের জন্য কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর ভারতে চলে আসেন। ছ'বছর কারাগারে কাটাতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৩৭ সালে তিনি লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন বলে কংগ্রেসের মধ্যে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন এবং র‍্যাডিক্যাল ডেমক্রেটিক পার্টি গঠন করেন। শেষ জীবনে নিজেকে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট বলে ঘোষণা করেন এবং 'নিও হিউম্যানিস'-এর তত্ত্ব প্রচার করেন। বিপ্লব ও মানবতা সম্পর্কে তিনি ইংরাজিতে অনেকগুলি বই লেখেন।

'সান ইয়াত সেন' বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয় স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে। এ সম্পর্কে গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ (১৯১ পি আর তাং ৫-৪-৪৮)। এ সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে। কেউ কেউ লিখেছেন, এর লেখক নরেন্দ্রনাথ রায়। মনে হয়, মানবেন্দ্রনাথের ছদ্মনামের সঙ্গে ভুল করেই এই ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা সরকারের গেজেটে পরিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলা হয়েছে, এর লেখক এম এন রায়। ১৯২৮ সালে 'তরুণ বাঙালী' নামে একটি নিবন্ধের বই নিষিদ্ধ হয়। ব্রজবিহারী বর্মন কর্তৃক সম্পাদিত ওই বইটি মেটকাফ প্রেস (১৫, নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা)থেকে মুদ্রিত । ১৯৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতার বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে বইটি প্রকাশিত। ১৯২৮, ২৫শে ফেব্রুয়ারি বইটি নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

১৯২৯ সালের অনেকগুলি নিবন্ধের বই নিষিদ্ধ হয়। (১) বিপ্লব পথে ভারত (২) বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন (৩) বিপ্লবী বাংলা (৪) বিপ্লবী অবনী মুখার্জী (৫) দেশ পরিচয় (৬) ফাঁসির আশীর্বাদ, (৭) গল্পে ও চিত্রে ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস (৮) খেয়ালী (৯) বিদ্রোহী আয়ারল্যাণ্ড।

'বিপ্লব পথে ভারত' বইয়ের লেখক পুলকেশচন্দ্র দে সরকার। সরস্বতী প্রেসে (১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা) বইটি মুদ্রিত এবং ২০এ, গোপী বসু লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ভারতীয় ফৌজদারি বিধির ১২৪এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯২৯ সালের ১৫ই আগস্ট। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ৯৩৪১ পি। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও: এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফৎ বইটি নিষিদ্ধ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের ৮ই মার্চ বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

এই বছরই পুলকেশ দে সরকারের আর একটি বই বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায় তাঁর 'ফাঁসির আশীর্বাদ' বইটি ১৯২৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। বই ১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মহামায়া প্রেস থেকে ছাপা। ১৯৪৮ সালের ৮ই মার্চ বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়। চারুবিকাশ দত্তের 'বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন' বইটি ১৯২৯ সালের ১৫ই আগস্ট নিষিদ্ধ হয়। গেজেট ঘোষণায় জানা যায় যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারায় বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার মহামায়া প্রেস (১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট) থেকে বইটি মুদ্রিত ও কলকাতার বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত।

বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন ও লেখক চারুবিকাশ দত্ত উভয়েই চট্টগ্রামের অধিবাসী। প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসি হয়। ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় প্রমোদরঞ্জন ধৃত হন। ওই মামলার আসামীরা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। আই বি ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জিকে ওই মামলার আসামীরা জেলের মধ্যেই হত্যা করেন। ফলে বিপ্লবী অনন্তহরি ও বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়। অন্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। প্রমোদরঞ্জন বি পি এস এ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। লেখক চারুবিকাশ দত্তও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর 'রাজদ্রোহীর জবানবন্দী' বইটিও বাজেয়াপ্ত হয়। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন' বইটিও তাঁর লেখা।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'বিপ্লবী বাংলা' বইটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯২৯ সালের ৮ই অক্টোবর ভারতীয় ফৌজদারি বিধির ১২৪এ ধারা মতে। বইটি ১৫, মেটকাফ প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ৩-১, রসা রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর আরও কয়েকটি বই নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩০ সালে তাঁর 'দেশের ডাক' প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি গেজেট ঘোষণায় 'দেশের ডাক' নিষিদ্ধ হয় (গেজেট নং বেঙ্গল নং ১৩৭১/৮৩ ও বি) 'দেশের ডাক'-এর প্রথম সংস্করণটি কলকাতার প্রকাশ প্রেসে (৬৬, মানিকতলা স্ট্রীট) কৃষ্ণধন চ্যাটার্জি কর্তৃক মুদ্রিত। এবং লেখক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কর্তৃক ৫, সমবায় ম্যানসন থেকে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণটিও একই ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হলেও এর প্রকাশক হচ্ছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত এবং ঠিকানা আছে ১১৬-১-১, হ্যারিসন রোড, কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণটি ৯২, বউবাজার স্ট্রীটের ইউনিক প্রেস থেকে ছাপা। চতুর্থ সংস্করণটি ফরওয়ার্ড প্রেস থেকে বিহারী ধর কর্তৃক মুদ্রিত এবং এর দেশবন্ধুপল্লী সংস্কার সমিতি থেকে জিতেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত—ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮-এ।

দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় 'দেশের ডাক' বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। এটি ৪র্থ সংস্করণের। বইটির মূল্য চারি আনা। ৬৫ পৃষ্ঠার এই নিবন্ধের বইটিতে অনেকের প্রতিকৃতি আছে : সুভাষ, গান্ধী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চিত্তরঞ্জন, ভারতমাতা। বহু মনীষীর কথার উদ্ধৃতিও আছে।

বইয়ের প্রথম নিবন্ধটি হচ্ছে 'আমাদের দেশ'। তাতে আছে

'আজ যখন দেশের দিকে তাকাই দেখতে পাই যে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে!' (পৃ-১)

সরকারী ফাইলে বইটির আপত্তিকর অংশগুলিতে লালকালির দাগ আছে। যেমন

"...যেদিন থেকে বিদেশী বণিকের দল, শকুনির ঝাড়ের মতো এসেছে, সেইদিন থেকে ভারতের সোনা সাগরের ওপারে গিয়ে জমতে আরম্ভ করেছে।" (পৃ-৩)

"যখন ৮৮৫৮ তাঁতিরা তাদের বুড়া আঙ্গুলগুলি কুরকুর করে কেটে ফেল্লে। বিদেশীর অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে মায়ের মেয়ের সতীত্ব রক্ষা করতে, ভাই, সতীত্ব রক্ষা করতে আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলে, বাংলার বাণিজ্য, বাংলার লক্ষ্মী, বিদেশীর হাতে সঁপে দিলে—সেইদিন থেকে বাংলা ফকীর হলো—লক্ষ্মীছাড়া হলো।" (পৃ-২৪)''

'দেশের ডাকে'র শেষ এইরূপ—

"...গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে লোকের বুকে বুকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া রোগ, দুঃখ, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত স্বাধীনতার দাবী নিয়ে দাঁড়াইবার সাহস ও শক্তি সঞ্চার করে পল্লীসংস্কারের প্রকৃত কাজ করে, সকলে মিলে আনতে হবে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব ; মা এসে জাতির মনকে ওলট পালট করে পূরাতন, প্রাণহীন, মারাত্মক সংস্কারগুলোকে চুরমার করে একটা নতুন সংস্কার ও শক্তি বুকে বুকে জ্বেলে দেবে—এক যুগান্তর আসবে—তখনই ভারতমাতার দুঃখের দিন শেষ হবে। জগতের সেই উচ্চতম গিরিকন্দর গৌরীশৃঙ্গ হতে আবার শান্তির সংবাদ, প্রেমের সংবাদ, জীবনের সংবাদ ভারত হতে ছড়িয়ে পড়বে ;

কিন্তু—

সে কবে—সে কবে—সে কবে
যে দিন

আমরা—যুবকের দল দেশের ডাকে কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতমাতার সেবায় 'বন্দে মাতরম' বলে মরণ পণ করে লেগে যাব'। (পৃঃ ৬৫)

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'বিপ্লবী বাংলা' বইটিও জাতীয় মহাফেজখানায় লাইব্রেরীতে আছে। এরও দাম চার আনা। মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার বই এটি। একে একটা পুস্তিকা বলাই ভাল। এটি জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতার সারাংশ। প্রচ্ছদে আছে :

বিপ্লবী বাংলা। শ্রী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী
প্রাপ্তিস্থান শ্রী সুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ
আর্য্য পাবলিশিং কোং
মূল্য চারি আনা, ৩/১, রসা রোড, কলিকাতা।

"শ্রী দীনেন্দ্র কুমার গুহ কর্ত্তৃক ৩/১, রসা রোড হইতে প্রকাশিত ও ১৫ নং নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, মেটকাফ প্রেস হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত"—পরের পাতায় আছে।

'বিপ্লবী বাংলার' শেষে (২৮ পৃঃ) আছে :"...বাংলার বুকে আলো দেখে হটে যাওয়া পতঙ্গের মত হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে যুবক বেপরোয়া হয়ে নিশ্চিন্ত মনে যেমন কারাগার বরণ করে নিল তেমন আর ভারতের কোথাও হয়নি। বাঙালী চিরকালের বিপ্লবী। যুগে যুগে যেই সুযোগ পেয়েছে অমনি প্রাণহীন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে পরাধীনতার সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছে যুঝেছে তাই এ যুগেও আস্ফালন করে হুঙ্কার করে ইংরেজের স্বার্থপরতার দুর্গ মড় মড় করে ভেঙে স্বাধীনতা লাভে আকুল। বাংলার বিদ্রোহী প্রাণ বিপ্লবের চুম্বক আহ্বানে রোমাঞ্চিত হইয়া স্বাধীনতার যজ্ঞকে সফল করিতে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া আজও আগুয়ান।"

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন ?" নামে একটি পুস্তিকাও নিষিদ্ধ হয়। এটি কলকাতা থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে ১৯৩১

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সালের ২২শে জুলাই বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। (বেঙ্গল নং ১২০৪৯ পি) ২০এ, গোপী বোস লেন, কলকাতার সারভিস প্রিন্টিং কোম্পানিতে প্রকাশক ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

সুবক্তা, কংগ্রেস নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বাজেয়াপ্ত এই বই তিনটি—'দেশের ডাক', 'বিপ্লবী বাংলা' ও 'বিলাতি বস্ত্র বর্জন করিব কেন ?' লণ্ডনের ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও আছে। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাব যুক্ত ছিলেন। এজন্য তাঁকে বারবার কারাগারে যেতে হয়েছে। তাঁর পোস্টার ও ছবিসহ 'লণ্ঠন লেকচার' এক সময় সারা দেশকে মাতিয়ে তোলে। স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের কাজেও তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনিই প্রথম কলকাতায় শিল্প ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী করে আমাদের আশু প্রয়োজন ও উন্নয়নের প্রতি জনগণকে সজাগ করেন। তিনি অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অসংখ্য দেশাত্মবোধক নিবন্ধ ও পুস্তক পুস্তিকার তিনি লেখক।

'বিপ্লবী অবনী মুখার্জী' বইটি ১৯২৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের গেজেট ঘোষণায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয় (গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-১৫৫৫১ পি)। ঢাকার বাংলা বাজারের কাশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে রাখালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গেজেটে লেখকের নাম নেই। তবে লণ্ডনের ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরীতে এর যে কপিটি আছে, তা থেকে জানা যায় রাখালচন্দ্র ঘোষই এর লেখক। ১৯২৯ সালে ঢাকা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়।

বিপ্লবী অবনী মুখার্জির কর্মস্থল ছিল ইউরোপ। সেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও প্রচার চালান। প্রথমে যান জার্মানীতে। বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এদেশের বিপ্লবীদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি একবার ভারতে এসেছিলেন। বিদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিপ্লবী অবনী মুখার্জি সম্পর্কে মস্কোর ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে একটি ফাইল আছে। একজন বিশিষ্ট বাঙালী সম্প্রতি সেটি দেখে এসেছেন। অবনী মুখার্জির স্ত্রী রোজা কিটিং হব এখনও জীবিত। তাদের এক ছেলে ও মেয়ে। নাম যথাক্রমে গোরা ও মায়া। তাঁরা লেনিনগ্রাড সহরে বসবাস করেন।[১০]

বিপ্লবী অবনী মুখার্জির জীবনীকার রাখাল ঘোষও একজন বিপ্লবী ছিলেন। তিনি অনুশীলন দলভুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁর কারাগারে কাটে। বহরমপুর ডিটেনসন ক্যাম্পেও তিনি অনেকদিন আটক থাকেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ। অধ্যাপনা করতেন। তাঁর লেখার হাতও ভাল ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণচন্দ্র গুহের 'দেশ পরিচয়' বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে ১৯২৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। বইটি শ্রী সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের ৫ই এপ্রিলের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে 'দেশ পরিচয়' রাহুমুক্ত হয়।

বীরেন রায়ের 'খেয়ালী'-বইটি ১৯২৯ সালের ৭ই অক্টোবর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে বাজেয়াপ্ত হয়। এ বইটিও কলকাতার সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপা। এবং এর প্রকাশকও সরস্বতী লাইব্রেরী।

'কাকোরী ষড়যন্ত্র' বইটি ১৯২৯ সালের ১৯শে জুলাই বাজেয়াপ্ত হয়। বইটির লেখক মণীন্দ্রনারায়ণ রায়। ২০, কলেজ রোডের দেবস্থান অ্যান্ড কোং থেকে এটি মুদ্রিত। এবং ৯৩-১ এফ, বৈঠকখানা রোডের বাণী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত।

বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় আছে—

কাকোরী ষড়যন্ত্র

'ঐ অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সময় হয়েছে নিকট এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"
—রবীন্দ্রনাথ
শ্রী মণীন্দ্রনারায়ণ রায়
পাঁচসিকা

২য় পৃষ্ঠা—
শ্রী মণীন্দ্রনারায়ণ রায় জুলাই, ১৯২৯
বেণু কার্যালয়
৯৩/১ এফ, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা

প্রিন্টার
শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়
ডেভেনহ্যাম এণ্ড কোং
২০, কলেজ রো, কলিকাতা

তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'উৎসর্গ পত্র'

দেশসেবাকেই যাহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন দেশের সেই সশস্ত্র তরুণ তরুণীদের উদ্দেশে এই বীর চতুষ্টয়ের জীবনকাহিনী উৎসর্গ করিলাম। —মণীন্দ্র রায়

চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'ভূমিকা'

'ভুল করিয়া হউক বা পাগলামী করিয়া হউক জীবনকে যাহারা ধূলিমুষ্টির মতই অগ্রাহ্য করিতে পারে তাহারা বীর, তাহারা মহাপুরুষ। বাংলার তরুণ তরুণীগণ যাহাতে এই সমস্ত মহাপুরুষদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইল।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যাহাদের ফাঁসী হইয়াছে তাহাদের জীবনকাহিনীগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইল। এসব জীবনে কাহিনী বড় একটা নাই তবে ভাব আছে। রামপ্রসাদ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছিলেন তাই তাহার জীবনকাহিনী লিখবার কতকগুলি উপকরণ আমরা পাইয়াছি। অন্যান্য জীবনকাহিনী সম্বন্ধে তেমন কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই বলিয়াই তাঁহাদের জীবনী অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে আদর্শকে অবলম্বন করিয়া এই জীবনগুলি বিকশিত হইয়া উঠিবার চেষ্টা পাইতেছিল সেই আদর্শটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইলাম তাহা বলিবার অধিকার একমাত্র পাঠকগণেরই আছে।

আমার যে সমস্ত বিহারী বন্ধু হিন্দী সাহিত্য হইতে আমার এই পুস্তক লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি এই সুযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দি সার্চলাইট ইতি
পাটনা শ্রী মণীন্দ্রনারায়ণ রায়'
১৪ই চৈত্র, ১৩৩৫

কাকোরী ষড়যন্ত্র ১৩৬ পৃষ্ঠার বই। এই বইটি সম্পর্কে লেখকের উক্তি—

'আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই মহানাটকের কয়েকজন অভিনেতার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। সরকারী নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফলে অকালে ইহাদের জীবন নাটকের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া মুক্ত স্বাধীনভাবে দেশসেবার সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে যে কোন লেখক ইহাদের জীবনচরিত লিখিয়া ধন্য হইতে পারিত। কিন্তু ইহারা কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই ইহাদের জীবনে কাহিনী নাই, কিন্তু দেশসেবাকেই যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী জীবনের ব্রত করিতে চান তাঁহারা ইহাদের জীবন আলোচনা করিয়াও যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারিবেন। মানুষ কর্মের দ্বারা বড় হয় বটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ভাব না থাকিলে কর্ম করিবার প্রেরণা আসে না। এই বীর চতুষ্টয় কর্ম করিবার সুযোগ পায় নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ভাবসম্পদে দরিদ্র ছিলেন না। তাঁহারা যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতীয় কিশোর কিশোরীরই অনুকরণযোগ্য (পৃঃ ২২)।

এই বইয়েরই প্রথম নিবন্ধটি 'কাকোরী ষড়যন্ত্র'। ১৯২৫, ৯ আগষ্ট লক্ষ্ণৌ শাহরানপুর লাইনের কাকোরী স্টেশনে দুর্যোগময় রাত্রে একদল যুবক সরকারী টাকা ট্রেন থেকে লুঠ করেন, তারই বিবরণ এই প্রবন্ধে।

দ্বিতীয় নিবন্ধ — শ্রীরামপ্রসাদ বিস্মিল,
তৃতীয় নিবন্ধ — আসফাকউল্লা খাঁ,
চতুর্থ নিবন্ধ — ঠাকুর রোশনলাল সিং,
পঞ্চম নিবন্ধ — শ্রী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,
ষষ্ঠ নিবন্ধ — উপসংহার।

রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা, রোশনলাল ও রাজেন্দ্রনাথের কাকোরী মামলায় ফাঁসি হয়। যোগেশ চ্যাটার্জি ও শচীন্দ্র সান্যালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

কাকোরী রেল স্টেশনের ওই দুঃসাহসিক ডাকাতি হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা করেন। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে ওই সংস্থা গঠিত হয়। উত্তর প্রদেশে এঁরা সক্রিয় ছিলেন। উত্তরপ্রদেশে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের মধ্যে এই দুঃসাহিক সশস্ত্র অভিযান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

লেখক মণীন্দ্র রায়ও কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। কাকোরী রায় নামে তিনি খ্যাত হন। আদর্শনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী মণীন্দ্র রায় বিশিষ্ট সাংবাদিকও ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কামাখ্যা পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি ধৃত হন। সাংবাদিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বিদ্রোহী আয়ারল্যান্ড' বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে ১৯২৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে এটি প্রকাশিত।

'গল্পে ও চিত্রে ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস' বইটি ১৯২৯ সালের ১ জুন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে নিষিদ্ধ করা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ সিংহের এই বইটি সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (৩৪-১ বি, বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে মুদ্রিত এবং ১১০, কলেজ স্ট্রীট থেকে নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত কংগ্রেস সংক্রান্ত একাধিক বই নিষিদ্ধ হয়। অন্যত্র এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩০ সালে অনেকগুলি নিবন্ধের বই বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। যেমন, 'বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচি', 'বাংলার কথা', 'ফাঁসির সত্যেন,' 'রাজদ্রোহ', 'বিদ্রোহী রাশিয়া'।

'বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচি' বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে ১৯৩০ সালের ৯ই মে'র গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। বইটির লেখক জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। ৩৩এ, মদন মিত্র লেনের বাণী প্রেস থেকে শান্তিকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক মুদ্রিত এবং মণীন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। এই বইটি ১৯৩০ সালে রাজশাহীর মিত্র ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত। লেখক জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রাবন্ধিক ও মুক্তি সংগ্রামী। তাঁর আরও বই আছে 'পথের পরিচয়', 'বিপ্লবের তপস্যা'। ১৯১৭ সালে মজঃফরপুরে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া পুলিশের সঙ্গে যে সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তাতে বিপ্লবী দলে ছিলেন জিতেশ লাহিড়ী।

বিপ্লবী নলিনীর জন্ম ১৮৯৬ সালে। অধুনা বাংলাদেশ ও আগেকার পূর্ববঙ্গে তাঁর জন্ম (অন্যমত, নদীয়ার শিকারপুরের কাঞ্চনতলায় তাঁর জন্ম)। শৈশবে বাবার মৃত্যু ঘটে। মেধাবী ছাত্র নলিনী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়বার সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। সেখানে তাঁর উপর পুলিশের নজর পড়ে। তারপর তিনি ভাগলপুর কলেজে পড়তে যান এবং সেখান থেকে আই এ পাশ করেন। সেখানেও পুলিশের নজর পড়ে। তারপর তিনি পাটনা কলেজে যোগ দেন ও দানাপুর সৈন্যনিবাসে বিপ্লব প্রচার করতে থাকেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারের চেষ্টা করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তাঁদের গৌহাটির গোপন আড্ডায় পুলিশ হানা দেয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের বিপ্লবীরা কামাখ্যা পাহাড়ে আশ্রয় নেন। পুলিশ সে পাহাড়ও ঘিরে ফেলে। তারপর নেতার আদেশে নলিনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে রুগ্ন শরীরে কলকাতায় আসতে সক্ষম হন। এই সংঘর্ষে বিপ্লবীদের আংশিক জয় হয়। কিছুদিন কলকাতায় থেকে আরোগ্য হওয়ার পর নলিনী ঢাকায় গিয়ে ফলতাবাজারে এক বাড়িতে আবার দলের কেন্দ্র গড়েন। সঙ্গে ছিলেন তারিণী মজুমদার। কিছুদিনের মধ্যে একদিন এক সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ সে বাড়িতে হানা দিল। দুই বন্ধু মিলে পুলিশের উপর গুলি চালাতে শুরু করলেন। তারিণীর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল পুলিশের গুলিতে। নলিনী মারাত্মক আহত হয়ে ধরা পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই কোন জবানবন্দী না দিয়েই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ১৯২৮ সালের ১৬ই জুন ঢাকার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রমণীরঞ্জন গুহ রায়ের 'বাংলার কথা' পুস্তিকাটি ১৯৩০ সালের ২৯শে নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। বইটির প্রকাশক হলেন ২/২, বাগবাজার স্ট্রীটের বলাই মুখার্জি। বীণাপাণি আর্ট প্রেস (৩০/১, দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে এটি ছাপা।

'ফাঁসির সত্যেন' নামে বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে ১৯৩০ সালের ২০শে জানুয়ারির গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। যুগপৎ সেন্ট্রাল প্রভিনস সরকারও এটি বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে নভেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়। ১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ব্রজবিহারী বর্মণ কর্তৃক বইটি সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী নরেনকে হত্যার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৮৮-১৯০৮) ফাঁসি হয়। কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু ও নরেন গোস্বামী—এই তিনজনে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে গ্রেফতার হন। ১৯০৮ সালের ২রা মে কানাইলাল গ্রেফতার হন কলকাতা থেকে। আর তিনদিন পর অর্থাৎ ৫ই মে নরেনকে গ্রেফতার করা হয় শ্রীরামপুর থেকে। সত্যেনকে ১৯০৮ সালের ২১শে জুলাই আদালতে হাজির করা হয়। মেদিনীপুর অস্ত্র আইন মামলায় দণ্ডিত হয়ে তিনি আটক ছিলেন।

নরেন রাজসাক্ষী হয়ে যান। ১৯০৮ সালে ২৩শে জুন তাঁকে অপরাধ থেকে ক্ষমা করা হয়। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে জানান, অরবিন্দ বিপ্লব আন্দোলনে জড়িত। নরেনের এই সাক্ষ্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে থাকতেন। অসুখের ছলনায় সত্যেন ও কানাইলাল ক'দিন বাদ দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। জেলেই (৩১ আগস্ট, ১৯০৮) বাইরে থেকে আমদানি-করা পিস্তলের গুলিতে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কানাই ও সত্যেন ধরা পড়েন। বিচারে উভয়ের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অবিচলিত কানাই বীরের মত ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। জেল গেট থেকে শ্মশান পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ যেন ভেঙে পড়েছিল। কলকাতা তেমন দৃশ্য আগে দেখেনি। কানাইলালের প্রতি দেশবাসীর এই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা দেখে বিদেশী শাসক এত বিচলিত হয়েছিল যে, স্থির হয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আর কারো মরদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্য দেওয়া হবে না। জেল বিধি সংশোধন করে ১৯০৮ সালের ১৭ই নভেম্বর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি বের হল

"The body shall not be delivered to the friends of the criminal, if in the opinion of the Superintendent there is likelihood of its being made the occassion of the public demonstration, or otherwise improperly treated."

সত্যেনের ফাঁসি হয় ১৯০৮ সালের ২১ নভেম্বর এবং অন্ত্যেষ্টি হয় জেল এলাকার মধ্যেই। সত্যেনের কুশপুত্তলিকা নিয়ে একটি মিছিল বেরুলে ১৪৪ ধারা জারি করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, মজঃফরপুরের হত্যার ব্যাপারেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে আলিপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোমার মামলায় বিচারের সময় তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। সত্যেন অনেকদিন ধরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম তাঁরই ছাত্র। সেখানকার আরও অনেক তরুণকে তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বিপ্লবী দলে আনেন। সত্যেন রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

এঁদের আত্মোৎসর্গ সম্পর্কে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকারের মন্তব্য 'নিবেদিতা-কালে যেসব বাঙালী বিপ্লবী আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁদের মধ্যে কানাইলাল তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পেয়েছেন।...যেভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তা একমাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। কানাইলাল অজস্র জাতিচিত্তকে ভাবাকুল করে তুলেছিলেন। অজস্র বন্দনা তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। নিবেদিতা শ্রদ্ধানত মস্তকে সেই স্তোত্রগানে অংশ নিয়েছিলেন।

কানাইলালের প্রতি এই সর্বজনীন অত্যুশ্চ শ্রদ্ধা কেবল চমকপ্রদ বৈপ্লবিক কৌশলে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য নয়—ততোধিক, ফাঁসির আদেশের পর তাঁর দেহ-মনের অবর্ণনীয় রূপান্তর সংবাদ।'[১৪]

কানাইলালের মৃত্যুবরণ সম্পর্কে নিবেদিতার মন্তব্য

"কি অপূর্বভাবে ছেলেটি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করল। ঠিক হোক, ভুল হোক—বীরত্ব, যা সত্যই বিশাল বীরত্ব-তা ইতিহাস সৃষ্টি করে।"[১৫]

ফাঁসির সত্যেন্দ্রনাথকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দেবার জন্য বৃদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রীকে ডাকা হয়েছিল কিন্তু কানাইলালকে তাঁকে দেখতে দেওয়া হয়নি। মৃত্যুদণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গেও কী নির্মম আচরণ।

'রাজদ্রোহ' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা ১২৪এ ধারামতে (ভারতীয় দণ্ডবিধির) ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই বাজেয়াপ্ত হয়। সরস্বতী প্রেস (১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে রত্নেশ্বর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। লেখকের নাম হিসাবে আছে: 'জনৈক বিপ্লবী।'

অমূল্যচন্দ্র অধিকারীর 'বিদ্রোহী রাশিয়া' বইটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে ১৯৩০ সালের ৪ঠা আগস্ট নিষিদ্ধ হয়। বইটি লেখক কর্তৃক মহামায়া প্রেস (১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট) থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি ওই বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়।

রুশ বিপ্লবের উপর লেখা ওই বইটির লেখক অমূল্যচন্দ্র অধিকারী স্বয়ং বিপ্লবী, অনুশীলন দলভুক্ত। তিনি ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। দীর্ঘদিন কারাগারেও কাটান, বকসার ক্যাম্পেও আটক ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি কলকাতায় এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান।

১৯৩১ সালেও কয়েকটি প্রবন্ধের বই বাজেয়াপ্ত হয়। 'আমার দেশ', 'বীরেন্দ্রনাথ', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'কালের ভেরী', 'মিচেল ও বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ড', 'সাম্যবাদ', 'শ্রী ভাঁওতা', 'তরুণ শহীদ' প্রভৃতি এই বছর নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় 'বিদ্রোহী রাশিয়া' বইটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। লেখক সম্ভবত কারাগারে থাকার সময় বইটি লেখেন। লেখকের নামের আগে আছে রাজবন্দী শ্রী অমূল্যচন্দ্র অধিকারী। দাম—দুই টাকা। বর্মণ পাবলিশিং হাউস। ১৯৪/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। (গেজেটে এই তথ্যটি নেই।)

প্রচ্ছদের পর আছে—

উৎসর্গ

'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে'

তরুণ যাত্রিগণের উদ্দেশ্যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা উৎসর্গ করিলাম

গ্রন্থকার

বইয়ের গোড়ায় আছে:

"গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত" মহামায়া প্রেস। ১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—'বিদ্রোহী রাশিয়া' বইটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ১৮/৪ অক্রুর দত্তের গলি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলিকাতা। ভূমিকাটি ১০ পৃষ্ঠার।

ভূমিকার পর লেখকের 'নিবেদন' ৩ পৃষ্ঠার। নিবেদনে লেখক লিখেছেন

"বিদ্রোহী রাশিয়া প্রথম যখন লিখিতে আরম্ভ করি তখন ভাবি নাই যে, উহা কোনদিন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইবে। আমাদের দেশের বহুলোক রুশবিদ্রোহের ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু বাংলা ভাষায় এক সঙ্গে বিদ্রোহী রাশিয়ার সমগ্র ইতিহাস বিরল। তাই, যে বিদ্রোহ সারা দুনিয়ার ভাব-ধারায় একটা বিপ্লব আনিয়া দিয়াছে এবং যে ভাব-ধারার একটা স্রোত ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাধারণভাবে আলোচনা করিবার নিমিত্ত 'স্বাধীনতা'র পৃষ্ঠায় লেখনী চালনা করি।..."

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র অধিকারী

১৫ই চৈত্র, ১৩৩৬।

'বীরেন্দ্রনাথ' নামে একটি বাংলা নিবন্ধের বই ১৯৩১ সালের ১৪ই মে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। বইটির লেখক ফনীভূষণ রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ রায়। বইটি ফরিদপুর থেকে ছাপা ও প্রকাশিত। ফরিদপুরের পালেঙ-এর শিশু প্রিনটিং ওয়ার্কসে মুনীন্দ্রমোহন মুখার্জি কর্তৃক মুদ্রিত এবং ফরিদপুরের পালেঙের হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী এই বইয়ে বর্ণিত হয়েছে।

'মিচেল ও বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ড' বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে বাজেয়াপ্ত হয়। ওই বছর ৩০শে সেপ্টেম্বরও বইটি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এর লেখক মনোরঞ্জন গুপ্ত। ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের সরস্বতী প্রেসে ১৯২৯ সালে অরুণচন্দ্র গুহ কর্তৃক বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আইরিশ বিপ্লব সম্পর্কে বইটি রচিত। আইরিশ বিপ্লবী জন মিচেলের জীবনী সম্পর্কেও ওই বইয়ে আলোচনা হয়েছে। লেখক মনোরঞ্জন গুপ্ত বরিশালের গ্রামে জন্মেছিলেন। তিনি যুগান্তর দলে ছিলেন। দীর্ঘদিন কারাগারে অতিবাহিত করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। বুড়িয়া গুপ্ত নামে খ্যাত ছিলেন। পাকিস্তান সংসদের তিনি প্রাক্তন সদস্য। শেষ জীবন কলকাতায় কাটান।

সোমনাথ লাহিড়ীর 'সাম্যবাদ' বইটি ১৯৩১ সালের ১৭ই এপ্রিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারামতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ১২, হরিতুকি বাগান লেনের গোপাল প্রিনটিং ওয়ার্কসে বিশ্বরঞ্জন চ্যাটার্জি কর্তৃক বইটি মুদ্রিত। ওই ঠিকানা থেকেই ১৯৩১ সালে মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত। পরে ওই বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

লেখক সোমনাথ লাহিড়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী, সি পি আইয়ের প্রথম সারির নেতা ও সাংবাদিক এবং প্রাবন্ধিক। সোমনাথবাবু আগে কংগ্রেসে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। কারাদণ্ডও হয়। সুবক্তা ও সুলেখক সোমনাথবাবু অনেক সুচিন্তিত রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখেছেন। সাম্যবাদী নেতা হিসাবে তিনি বিদেশে কয়েকবার বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গিয়েছেন। তাঁর বেশ কটি বই আছে। এককালে তিনি গল্পও লিখেছেন।

দিল্লীতে ন্যাশনাল আরকাইভসে সোমনাথ লাহিড়ীর 'সাম্যবাদ' বইটি আছে। বইয়ের প্রথম পাতায় পাই

সাম্যবাদ

(Marxian Socialism)

All the past we leave behind, we debouch upon a newer, mightier world, varied world, fresh and strong. The world we seize, world of labour and the march,

Pioneers! Pioneers!

Walf whitman

সো[redacted]লাহিড়ী

২য় পৃষ্ঠায় আছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
গোপাল পাবলিশিং হাউস
১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা
জুলাই, ১৯৩১
দাম বারো আনা

৩য় পৃষ্ঠা—
বাংলার বিপ্লবী যৌবনকে উপহার দিলাম

সাম্যবাদ বইটি মোট ৯৬ পৃষ্ঠার। বইয়ের প্রথমে লেখকের ঋণ স্বীকার। তারপর 'গোড়ার কথা'—তারপর ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদ : (১) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, (২) শ্রেণীর লড়াই, (৩) সাম্যবাদের অর্থনীতি, (৪) বাড়তি মূল্য (৫) পণ্যের চলন, (৬) মূলধনের গঠন (৭) জমির খাজনা, (৮) রাষ্ট্র ও সমাজ এই নিবন্ধের সব শেষে লেখা—'দুনিয়ার মজদুর এক হও'।

এই বইটি কী ধরনের তা বোঝার জন্য একটু উদ্ধৃতি দিই

'... সাম্যবাদের নামেই আমাদের দেশের অনেকে শিউরে ওঠেন। অনেকেরই আবার সাম্যবাদ সম্বন্ধে একদম ভুল ও আজগুবি ধারণা আছে। সাম্যবাদ বল্লেই বোলশেভিজম্, অ্যানার্কিজম, লাল রাশিয়া, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, রক্ত, খুনখারাপি প্রভৃতি অনেক কথাই তাঁদের মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে ওঠে এবং তাঁরা কোনরকম খোঁজ বা বিচার না করেই আঁৎকে ওঠেন। এর দুটো কারণ আছে—প্রথম কারণ অজ্ঞতা, এবং দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ অপর পক্ষের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারকার্য। অধিকাংশ দেশেই আজকাল ধনবাদ (Capitalism) ও সাম্রাজ্যবাদের অগাধ প্রভুত্ব এবং সাম্যবাদ এই ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকেই ধ্বংস করতে চায়। কাজেই প্রভুর দল যে সাম্যবাদের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন না এবং নানারকম কদর্য ও বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করে তার বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন তার আর বিচিত্র কি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর জীবনের উপর যে সাম্যবাদ গড়ে উঠেছে বর্তমান ও অতীত সমাজকে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যৎ সমাজের যে উজ্জ্বল ধারণা সে দিয়েছে—তাতে কোন প্রতিবন্ধকই সাম্যবাদকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। তাই হার্বার্ট স্পেনসারের মত সাম্রাজ্যবাদী লেখককেও স্বীকার করতে হয়েছে—"সমস্ত বাধা সত্ত্বেও সাম্যবাদের যুগ আসবেই" (Socialism will come inevitably in spite of all opposition)।

আমাদের দেশেও তা-ই মানুষের জীবনের ক্রমবিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ। সাম্যবাদকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছে না এই প্রবন্ধ সাম্যবাদের সেই অগ্রগতিরই একটা প্রমাণ' (পৃঃ ২-৩)।

সাম্যবাদ বইটির শেষে দাবি করা হয়েছে যে, বাংলাভাষায় Marxism এর উপর এইটাই প্রথম বই। যতদূর দেখেছি বৎসর হিসাবে ১৯৩২ সালেই সবচেয়ে বেশি বই নিষিদ্ধ হয়েছে। ওই বছর বাজেয়াপ্ত প্রবন্ধের বইয়ের সংখ্যা অনেক। সেগুলি হ'ল : 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ', 'বন্দী নারী', 'বরদোলি সত্যাগ্রহ', 'গান্ধী বন্দী কেন', 'ইংরেজের সুশাসনে বাংলাদেশ', 'রমেশের আত্মকথা', 'রিক্ত ভারত', 'শিখের আত্মাহুতি, 'অগ্নিমন্ত্রে নারী', 'ভাঙার পূজারী'। 'বন্দীর ব্যথা'।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' বইটি ১৯৩২, ১৫ এপ্রিল বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয় ১৯৩১ সালের ইনডিয়ান প্রেস এমার্জেন্সি পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট অনুযায়ী। ১৯৪৭ সালে বইটির উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়। ৩৩-এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতার বাণী প্রেসে শান্তকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক বইটি মুদ্রিত। এবং ২৭-৩ হরি ঘোষ স্ট্রীটের নব্যসাহিত্য ভবন থেকে রমণীমোহন গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি বই 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' ১৯৩৫ সালের ১২ই জুনের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

এই বইটি সম্পর্কে চীফ সেক্রেটারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুলিশ কমিশনার এডি গার্ডন ১৯৩৫ সালের ১০ই মে চিঠি লেখেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Sir, I have the honour to forward herewith a copy of a book in Bengali entitled'সাম্যবাদের গোড়ার কথা'by Bijoylal Chatterjee, together with a copy of its review. The book was printed at classic press, 21 Patuatala lane by Abinash Ch.Sirkar, and published from the Atmasakti Library, 15, College St. Calcutta by Manmatha Nath Biswas.
Eighty two copies of this book have recently been seized on a search of the Atmasakti library. From the opinion of the public prosecutor, Calcutta (copy attached) it will be seen that the Publication comes within the mischief of sec. 4(1) of the Press Emergency Power Act, and should be foreited under section 19 of the said Act.

I therfore reqest that Government be pleased to press early orders of its forfeiture as advised by the public prosecutor.

তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটর বি সি সেনের (অফিসিয়েটিং) 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' বইটি সম্পর্কে মন্তব্য সরকারী ফাইল থেকে তুলে দিলাম

"১৯৩৫ সালের ৮ই মে তিনি কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারকে লেখেন—প্রিয় মহাশয় আমি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' বইটি সযত্নে পড়েছি, ১৫, কলেজ স্ট্রীটের আত্মশক্তি লাইব্রেরির মন্মথনাথ বিশ্বাস কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং ২১, পটুয়াটোলা লেন কলকাতাস্থ ক্লাসিক প্রেসে মুদ্রিত।

বইয়ের ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় এবং ৬২ পৃষ্ঠায় রঙিন কালিতে যেসব অনুচ্ছেদ চিহ্নিত তার জন্য বইটি ইন্ডিয়ান এমার্জেন্সি পাওয়ারস অ্যাক্টের ৪(১) (৬) ধারায় আওতায় পড়ে। এ সম্পর্কে ১৩, ১৫, ৯৯ এবং ১১২ অনুচ্ছেদে'র উল্লেখ করা যেতে পারে।

যদিও ওটা খুব জোরালো কেস নয়, তবে সংশ্লিষ্ট বইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই বিশেষ ঘটনার জন্য উল্লিখিত আইনের ১৯ ধারামতে বাজেয়াপ্ত আদেশের জন্য আবেদন জানাতে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব।" (অনূদিত)

পাবলিক প্রসিকিউটরের মন্তব্য ও পুলিশ কমিশনারের সুপারিশের পর 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হল ১৯৩৫ সালের ১২ই জুনের গেজেট ঘোষণায়। তাতে জানানো হয় যে, ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমার্জেন্সি পাওয়ার্স) অ্যাক্টের ১৯ ধারা অনুসারে প্রদত্ত সব ক্ষমতাবলে সপারিষদ রাজ্যপাল বিজয়লাল চ্যাটার্জির 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা' বইটির সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করছেন। কারণ সপারিষদ রাজ্যপালের মনে হয় যে, ওই বইটি পূর্বোক্ত আইনের ৪ ধারার উপধারা (১) য়ের অংশ (ডি)য়ে পড়ে।

বিজয়লাল ছিলেন গান্ধীবাদী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত, এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রবল সমর্থক। স্মরণ থাকতে পারে, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথের লেখকই 'চার অধ্যায়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৯১৮—১৮-২-১৯৭৪)। জন্ম কৃষ্ণনগর নদীয়া। মুক্তি সংগ্রামী চারণ কবি ও সাংবাদিক। কৃষ্ণনগর সি এম এস স্কুল ম্যাট্রিক। বি এ পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। জীবনে প্রথম দিকে সুভাষ, হেমন্ত ও নজরুলের অনুসারী হলেও রাজনৈতিক আদর্শে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধীবাদী। তাঁর কর্মজীবনের পেশা ছিল সাংবাদিকতা। বহু পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার আবির্ভাবের মূলে ছিল তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। তিনি চারণ কবি হিসাবে খ্যাত হন। এক সময় বাংলার গ্রামেগঞ্জে ঘুরে জনসাধারণের ঘুম ভাঙাবার, তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার ভার নিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ, সর্বহারার গান, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য বই 'চারণ-গীতি', 'চারণ কবি হুইটম্যাস'। তিনি এককালে দেশের যুব সমাজকে নতুন নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। The champion of the Proletariate তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভায় তিনি দু'বার জন-প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।[১৮]

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সান্ত্বনা গুহের একাধিক বই রাজরোষে পড়েছে। ১৯১০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ডিব্রুগড়ের বরদুলি টি এস্টেটে এঁর জন্ম। অল্প বয়সেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক নিবন্ধও লেখেন। সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সরকার তাঁর তেজী কলমকে ভয় পেতেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিলে তিনি কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। বিনা বিচারে দীর্ঘকাল আটক থাকেন। জেলের আইন ভঙ্গ করার জন্য বারবার শাস্তি পান। ১৯৩২ সালে হিজলি জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ২১ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। জেলে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। ১৯৩৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি জেল হাজতে মারা যান।

'সান্ত্বনা গুহের "বন্দী নারী" বইটি ১৯৩২, ১৫ই এপ্রিল ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইন, ১৯৩১ অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। ঘোষ প্রেসে (৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন) মনোরঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক এটি মুদ্রিত এবং ৫৮/৩, হ্যারিসন রোড, কলকাতার 'বন্দেমাতরম সাহিত্য ভবন' থেকে একই ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত।

সান্ত্বনা গুহের আরও দু'টি বই বাজেয়াপ্ত হয় 'অগ্নিমন্ত্রে নারী' ও 'ভাঙার পূজারী'। 'অগ্নিমন্ত্রে নারী' ১৯৩২, ৩১শে মার্চ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। শূলপাণি চক্রবর্তী কর্তৃক কলকাতার ৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেনের ঘোষ প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ১৪, কালিদাস বসু স্ট্রীটের যুগবাণী সাহিত্য চক্র থেকে শূলপাণি চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

সান্ত্বনা গুহের 'ভাঙার পূজারী' বইটি ১৯৩২, ২৫শে জানুয়ারির গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ৫৮/৩, হ্যারিসন রোডের বন্দেমাতরম সাহিত্য ভবন থেকে অনিলকুমার মুখার্জি কর্তৃক বইটি মুদ্রিত।

'অগ্নিমন্ত্রে নারী' বইটি যখন বাজেয়াপ্ত হয়, তখন সান্ত্বনা গুহ কারাগারে ছিলেন। সেজন্য গেজেট ঘোষণায় বলা হয়েছে লেখক 'detenee'।

সান্ত্বনা গুহের 'বন্দী নারী' বইটি মুক্তি সংগ্রামে কারাবরণকারী নারীদের সম্পর্কে লেখা। তাঁর 'ভাঙার পূজারী' বইটি দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের জীবনী।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অনূদিত 'বরদোলি সত্যাগ্রহ' বইটি ১৯৩২, ২৮শে এপ্রিল ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইন, ১৯৩১ অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। বইটির লেখক ২৪ পরগনার সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেসে চারুভূষণ চৌধুরী কর্তৃক এটি মুদ্রিত এবং ১৫, কলেজ স্কোয়ারের খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে হেমপ্রভা দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 'বরদোলি সত্যাগ্রহ' বইটির মূল লেখক মহাদেব দেশাই।

১৯২৮ সালে বরদোলি সত্যাগ্রহ হয়। গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। সরকার তাদের এই অহিংসা আন্দোলনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন। মহাদেব দেশাই দীর্ঘদিন গান্ধীজীর সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৯২ সালের জানুয়ারিতে সুরাটে এঁর জন্ম। বৃত্তিতে ছিলেন আইনজীবী। গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সর্বক্ষণের সঙ্গী ও একান্ত সচিব হন। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। বারবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট গ্রেপ্তার হবার পর জেলে আটক থাকার সময় জেলেই মারা যান—১৫ই আগস্ট, ১৯৪২।

সতীশ দাশগুপ্ত বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা ও সোদপুরের খাদি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামীণ উন্নয়নে ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকেও দীর্ঘদিন কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

হেমপ্রভা দাশগুপ্তাও প্রখ্যাত মুক্তিসংগ্রামী। তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন একাধিকবার।

শ্রীদীপঙ্কর শর্মা লিখিত 'গান্ধী বন্দী কেন ?' নামে একটি পুস্তিকা ১৯৩২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯৩১, ১৯ ধারামতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

'ইংরেজ সুশাসনে বাংলাদেশ' নামে একটি বই ১৯৩২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বাজেয়াপ্ত ঘোষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়। ভারতীয় প্রেস (বিশেষ ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারা অনুসারে ওই বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। লেখকের নাম জানা যায়নি।

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ লিখিত 'রমেশদার আত্মকথা' বইটি ১৯৩২ সালের ২৮শে এপ্রিল বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ৯১, আপার সার্কুলার রোডের মহম্মদী প্রেস থেকে মহম্মদ খৈরুল আলাম খান কর্তৃক বইটি মুদ্রিত ও কলকাতারই ২৪, আমবুশ রো থেকে কে সি আচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'রিক্ত ভারত' বইটি ১৯৩২, ৯ই নভেম্বর ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেসে চারুভূষণ চৌধুরী কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং ১৫, কলেজ স্কোয়ারের হেমপ্রভা দাশগুপ্তা কর্তৃক প্রকাশিত। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের ৫ই এপ্রিল বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়।

সুলেখক হেমেন্দ্রলালের অনেকগুলি বই আছে। তিনি প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা সবই লিখেছেন। তবে মূলত তিনি কবি। তাঁর কবিতার বই 'ফুলের ব্যথা'। তাঁর 'ঝড়ের দোলা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের প্রভাব আছে। তাঁর আর একটি উপন্যাস 'মায়ামৃগ'। হেমেন্দ্রলালের বাজেয়াপ্ত 'রিক্ত ভারত' বইয়ের একটি কপি লনডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

'শিখের আত্মাহুতি' বইটি ১৯৩২, ৮ই এপ্রিল ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়। বইটির লেখক : দীনেশচন্দ্র বর্মণ। কলকাতার মহম্মদী প্রেসের খৈরুল আলাম খান কর্তৃক মুদ্রিত এবং ২৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানী থেকে সুরেশচন্দ্র বর্মণ কর্তৃক প্রকাশিত। মোগল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শিখদের প্রতিবাদ ও তাদের অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বিবরণ এতে আছে।

মুরারিমোহন ঘোষের 'বন্দীর ব্যথা' বইটি ১৯৩২ সালের ৪ঠা জুলাই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। ঢাকার ইন্ডিয়া প্রেস থেকে লেখক কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে তরণীভূষণ সোম কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৩৩ সালে 'বাংলার পতন', 'বিপ্লবী তরুণ' ও 'জাগো ভারতবাসী' এই তিনটি নিবন্ধের বই বাজেয়াপ্ত হয়।

'বাংলার পতন' বইটি ১৯৩৩, ১৩ই মে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়—১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমার্জেন্সি ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে। ওই বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৭ সালের ৩০শে এপ্রিল। বইটি শেখ মুজঃফর আমেদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং চট্টগ্রাম কোহিনুর প্রেসে রেবতীরমণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।

মুজঃফর আমেদ ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ দীর্ঘদিন কারাগারে কাটিয়েছেন।

'বিপ্লবী তরুণ' বইটি ১৯৩১, ১৯শে সেপ্টেম্বরের গেজেটে, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী বিধির ৯৯এ ধারায় বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। 'বিপ্লবী তরুণ' বইটি গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং জামালপুরের শান্তি প্রেসে যোগেশচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

'জাগো ভারতবাসী' বইটি ১৯৩৩ সালের ১লা নভেম্বরের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারায় বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। 'জাগো ভারতবাসী' ২—৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর কেশরী প্রেস থেকে মুদ্রিত।

১৯৩৪ সালে 'যুগের বাংলা', 'ভারতে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা', 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' (১ম ও ২য় খণ্ড) বাজেয়াপ্ত হয় শেষোক্ত বই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা। 'যুগের বাংলা' বইটি ১৯৩৪, ২৮শে জুন ভারতীয় প্রেস (এমার্জেন্সি পাওয়ার্স) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারায় বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ৬১, বউবাজার স্ট্রীটের প্রকাশ প্রেস থেকে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত এবং প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত।

প্রিয়নাথ চ্যাটার্জির 'ভারতে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা' বইটি ১৯৩৪ সালের ১৩ই জুলাইয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইন, ১৯৩১ অনুসারে বইটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ৪০, মির্জাপুর স্ট্রীটের অবিনাশ প্রেসে সুরেশচন্দ্র দাস কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং ২৪-৩বি, মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

'চীনের ছাত্র আন্দোলন' নামে একটি বই ১৯৪০ সালের ১৫ই নভেম্বর নিষিদ্ধ হয়। ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১) (বি) এবং (সি) ধারা মতে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বইটির লেখক নৃপেন ঘোষ। ৭২, হ্যারিসন রোড, কলকাতার বর্মণ পাবলিশিং হাউসের ব্রজবিহারী বর্মণ কর্তৃক প্রকাশিত।

'চীনের ছাত্র আন্দোলন' বইটির মূল্য তিন আনা। মাত্র ২৫ পৃষ্ঠার বইয়ের প্রথমে আছে কমরেড প্রমোদ সেনের ভূমিকা। সরকারী ফাইলে বইটি আছে, আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, বইয়ের কোথাও কোন তারিখ নেই। ভূমিকাটি তুলে দিলাম।

'যে পুস্তিকার ভূমিকা লিখছি তার নাম হচ্ছে 'চীনের ছাত্র আন্দোলন'। বোকা ছাত্র যারা, তারা হয় চোখ বড় করে, নয়তো নাক সিট্‌কে জিজ্ঞেস করবে :

'ভারতের ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে না লিখে হঠাৎ চীনে দৌড় দেবার কারণ ?

'জবাব হচ্ছে এই যে, বর্তমান অবস্থায় চীনা ছাত্রদের থেকে শিক্ষালাভ না করে ভারতবর্ষে ছাত্র-সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্তমান সময়োপযোগী আন্দোলন গড়ে তোলা এক প্রকার অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

লেবার পার্টি, ছাত্র বিভাগ, ২৭বি, গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা।

প্রমোদ সেন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।'

পরিশেষে বইয়ের লেখক নৃপেন ঘোষ লিখেছেন

"তাছাড়া নিখিল চীন ছাত্র সংঘ বিশেষ করিয়া ভারতীয় ছাত্রদের সহযোগিতা চাহিয়া সেচুয়ান 'স্টুডেন্টস ভয়েসে' এক আবেদন বাহির করিয়াছে। এই আবেদনের প্রত্যুত্তর দিতে হইলে ভারতীয় ছাত্র-সমাজকে চীনা ছাত্র আন্দোলন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

'চীনের ছাত্র আন্দোলন' বইটি সম্পর্কে প্রথমে স্বরাষ্ট্র দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার। ১৯৪০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে তিনি লেখেন

"Sir, I have the honour to forward herewith, for the consideration and orders of Government, a Bengali book entitled 'Chiner Chhatra Andolan' by Nripen Ghose. It was published by Broja Behary Burman from Burman Publishing House, No. 72, Harrison Road, and printed by Bibhuti Bhusan Pan at Shyamsundar Printing works at 4, Pran Nath Sen Lane, Calcutta, of which the said Bibhuti Bhusan Pan is the keeper, vide declaration No. 154, dt. the 15th September, 1937).

"The public prosecutor. Calcutta was consulted in the matter and a copy of his opinion, together with the English translation of the objectionable passages of the book is enclosed.

"As the book appears to certain prejudicial reports within the meaning of Rule 34 (6)(e) of the Defence of India Rules, I would solicit the favour of early orders of Government being issued for forfeiture of all copies of the book under Rule (1)(b)(c) of the Defence of India Rules."

পুলিশ কমিশনারকে পাঠানো স্বাক্ষর-পি জি মুখার্জি, কলিকাতা তাং ১৪-৯-১৯৪০ পাবলিক প্রসিকিউটরের নোটে বলা হয় : ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে খারাপ : প্রথম পাতাটি ভারতরক্ষা বিধির রুল (৬) (ই)-য়ের আওতায় পড়তে পারে।

এর পর ১৯৪০ সালের ১৫ই নভেম্বর বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে এই আদেশ জারি হয়। বাংলা সরকারের অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারি পোর্টার এক বিজ্ঞপ্তিতে (নং ৬৭৪৯ পি) জানান, সরকার ভারতরক্ষা বিধির ৪০ রুলের সাবরুল (১) অনুসারে উক্ত বই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করছেন।

১৯৪১ সালে বাজেয়াপ্ত হয় 'ভারত শ্রমিক আন্দোলন' ও 'জাতীয় মুক্তি ও গণসংগ্রাম,' ১৯৪৬ সালে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা', 'বিপ্লব', 'জনতা নয় গণবাহিনী গঠন করো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
১৯৪৭ সালে বাজেয়াপ্ত হয় 'আগষ্ট বিপ্লব ১৯৪২।'

১৯৪১ সালের ২রা জানুয়ারির গেজেট ঘোষণায় 'জাতীয় মুক্তি ও গণসংগ্রাম' বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়েছিল। কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সী থেকে ১৯৪০ সালের মে মাসে বইটি প্রকাশিত। বইটার দাম : চার আনা। বইয়ের লেখকের আসল নাম জানা যায়নি। পাণিনি ছদ্মনামে বইটি লেখা। কমিউনিস্ট দলের পক্ষে প্রকাশিত এই গ্রন্থে দেখা যায়—তখনো ঐ দল ইংরাজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থক। মোট ৫৬ পৃষ্ঠার এই বইটিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিবন্ধ আছে :

১) সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ

২) স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্রমবিকাশ

৩) ক্ষমতা দখলের লড়াই

৪) পঞ্চায়েত রাষ্ট্র ও গণমুক্তি

বইয়ের ভূমিকায় আছে—

"আমাদের পঞ্চদশ বৎসরের জাতীয় সংগ্রাম আজ চরম সাফল্যের সম্মুখীন। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও গণভোটে নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আজ আর সুদূরের সমস্যা নয়, আশু সম্ভাবনা। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসী আজ এই দাবীর জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প।"

তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটর বইটির কয়েকটি অংশ আপত্তিকর বলে মন্তব্য করেন এবং বইটি ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেন। ১৯৪০ সালের ১৬ই জুলাই পাবলিক প্রসিকিউটর পি জি মুখার্জি এই রিপোর্ট দেন

"A well written book tracing the Government of India from the village communities under Panchayet, through the feudal Zemindary system the Pathan and the Moghal rules, the administration of East India Company, down the present British Rule. Also traces the development of various revolutionary movements (the terrorist movement, no-tax campaign etc.), the gradual awakening of the masses and their struggle for liberation. There is throughout an impatience of foreign domination and an accusation of heartless exploitation against the British Capitalist and Imperialistic Government to whose activities the ruin of cottage industries and the decadence of the peasantry are attributed.

At page 32 there is reference to defection amongest troops.

At page 44 etc. there is a plea for non-participation of India in any war outside India.

At page 49 there is an appeal to remember the experiences of the last great war and the extents following it, specially the atrocities perpetuated at jallianwallabag.

In my opinion the book offends against the provisions of Rule 34/7 read with Rule 34(6) Sub clauses (e)(8) and (k) infrigement of Rule 34 (6)(b) is not very marked.

The book is likely to make powerful appeal to the imagination of readers and should be suppressed by the application of Rule 40; Defence of India Rules.

তৎকালীন সরকারী কৌঁসুলি পি জি মুখার্জির এই মন্তব্যের পর পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদারও বইটি আপত্তিকর বলে উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি স্বরাষ্ট্রবিভাগে লেখেন

"I have the honour to forward herewith, for the consideration and orders of Government, a Bengali book entitled 'Jateo Mukti-O-Gana

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Sangram' by Panini.

It was published by Suren Dutta from the National Book Agency at 72, Harrison Road and printed by Jamini Mohan Ghosh at popular printing works at 47, Madhu Roy Lane, Calcutta of which Bejoy Chandra Dhar is keeper (vide declaration No. 59 dated the 28th March, 1938).

The public prosecutor, Calcutta was consulted in the matter and a copy of his opinion, together with authenticated translation of the objectionable passages in the book is enclosed. The book appears to contain prejudicial reports. Within the meaning of Rules 34 (7) read with Rule (6) Sub clause (e) (i) and (k) of the Defence of India Rule.

I may mention the two English books entitled 'India Marches on Vol. III' and 'Indian working class Vol.II' by the same author Panini and published and printed by the same publisher and printer were forfeited by Government under notification nos. 5828 p and 5829 p dated the 19th Sept. 1940 respectively.

I would, therefore, solicit the favour of early orders of government being issued for forfeiture of all copies, of the book 'Jatio-Mukti-O-Gana-Sangram' by Panini under rule 40(1)(b)(e) of the Defence of India Rules 1939,"

প্রমথনাথ ঘোষের 'ভারতে শ্রমিক আন্দোলন' বইটি ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারানুসারে বিহার সরকারের ১৯৪৭ সালের ৮ই জুলাইয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত হয়।

কল্পনা দত্তের 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা' বইটি ১৯৪৬ সালের ২৬শে মার্চ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়। কলকাতার ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের নববিধান প্রেসে বীরেন সিং রায় কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং ১২১, লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির কানাই রায় কর্তৃক মুদ্রিত। ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

বইয়ের লেখিকা কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লব' নামে একটি বাংলা পুস্তিকাও ১৯৪৮ সালের ৫ই নভেম্বর ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ হয়।

চন্দ্রবরণ গুপ্ত ভায়ার "জনতা নয় গণবাহিনী গঠন করো" বইটি ১৯৪৬ সালের ২৫শে নভেম্বরের গেজেট ঘোষণায় ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে আছে, তারিণীশংকর চক্রবর্তীর 'আগস্ট বিপ্লব ১৯৪২' বইটি স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের ১৭ই নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩১ সালের প্রেস আইনের (জরুরী ক্ষমতা) ১৯ ধারানুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। যতদূর মনে হয়, বইটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যবস্থা স্বাধীনতার পূর্বেই করা হয়েছিল—তবে লাল ফিতা খুলতে খুলতে স্বাধীনতা এসে যায়।

লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলা বাজেয়াপ্ত বইয়ের তালিকা থেকে জানা যায় যে, 'ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন' নামে একটি বইও বাজেয়াপ্ত হয়। মূল ইংরাজি বইয়ের লেখক হলেন : উইলিয়ম জেনিংস ব্রেন। এই বাংলা অনুবাদটি কার, তা জানা যায়নি। বইটি সানফ্রান্সিসকো থেকে হিন্দুস্থান গদর পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩২৪ সালে হিন্দুস্থান গদরের অফিস ভ্যালেনসিয়া স্ট্রীট থেকে বইটি প্রকাশিত।

উইলিয়ম জেনিংস ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি। প্রেসিডেন্ট পদে তিনি প্রার্থীও হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গদর আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়দের বৈপ্লবিক দল। স্বাধীনতা-লিপ্ত আমেরিকা-প্রবাসী কয়েকটি ভারতীয় দলের মিলনে ১৯১৩ সালে গদর পার্টির পত্তন হয়। বিশিষ্ট বিপ্লবী হরদয়াল দলের নেতৃত্ব নেন। 'গদর' মানে বিপ্লব। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে যে কোন উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল ওই দলের মূল লক্ষ্য। 'সানফ্রান্সিসকো'র যুগান্তর আশ্রম থেকে প্রথম দলের কাজ শুরু হয়। বিদেশ থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারেও ওই দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য গদর পার্টি নিয়মিত একটি পত্রিকা বের করতেন। তাছাড়া বহু পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে তাঁর বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের আসল অবস্থা তুলে ধরেন।

১৯০৭ সালে আমেরিকায় যে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন হয়, এইসব ভারতীয় শ্রমজীবী তাতে যোগ না দেওয়ায় তাদের সম্পর্কে সেখানে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রবাসী ভারতীয়রা এই সময় পরাধীনতার গ্লানি উপলব্ধি করেন এবং ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য ছোট ছোট দল বেঁধে ওই দেশে প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁদের নিয়েই তৈরি হয় গদর পার্টি। ওই দলের পত্রিকার নামও ছিল 'গদর'। উর্দু, মারাঠী ও গুরুমুখী ভাষার ওই পত্রিকা বের হত। সানফ্রান্সিসকো ছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া, অরেগন, ওয়াশিংটন ও ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানেও গদর দলের ঘাঁটি গড়ে ওঠে।

তারপর হরদয়াল গ্রেফতার হন। জামিনে মুক্ত থাকার সময় তিনি জেনিভায় যান। হরদয়ালের অনুগামী রামচন্দ্র তখন দলের কার্যভার নেন এবং বরকতুল্লা, ভগবান সিং প্রভৃতির সাহায্যে কাজ চালাতে থাকেন। এরপর ঠিক হয়, এশিয়ার কয়েকটি দেশের ভিতর দিয়ে কিছু বিপ্লবী ভারতে পাঠিয়ে তারপর অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ দিয়ে বিদ্রোহ ঘটানো হবে। জয়রালা সিং এর নেতৃত্বে এমনি একটি দল কলকাতায় আসা মাত্র ধরা পড়ে গেল।"

লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইটিও আছে। বিশিষ্ট বিপ্লবী ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক নলিনীকিশোর গুহের লেখা এই বইটি ১৯৩০ সালে কলকাতা থেকে বারিদকান্তি বসু কর্তৃক প্রকাশিত। নলিনীকিশোর গুহ ঢাকার অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন। রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যা সম্পর্কে ১৯১০ সালে ধৃত হন। তিনি ঢাকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায়ও তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেন। তিনি সুলেখক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইয়ে আমাদের দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। তিনি অনেক অজানা দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় আর একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'স্বাধীনতার দাবি' বইটি আছে। ১৯৩১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ওই বই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাংবাদিকতার একজন পথিকৃৎ। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ফলে তাঁকে কারাগারেও অতিবাহিত করতে হয়েছে অনেকদিন। শেষ জীবনে তিনি সাম্যবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও সমর্থন অটুট ছিল। 'নন্দীভৃঙ্গী' ছদ্মনামে তিনি অনেক নিবন্ধে লেখেন। ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক লেখায় তিনি একদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি নিবন্ধের বই আছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য নিবন্ধ ছড়িয়ে আছে। তিনি দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার একাধিক দিনের কাগজ বাজেয়াপ্ত হয়, যথা ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯।

দয়ানন্দ চৌধুরীর 'পরাধীনের অভিশাপ' নামে একটা বই ওখানকার লাইব্রেরীতে আছে। ১৯৩১ সালে কলকাতা থেকে লেখক কর্তৃক বইটি প্রকাশিত। বিদেশীশাসনে ভারতের দুর্ভাগ্যের কথা তাতে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীহট্টের অধিবাসী দয়ানন্দ চৌধুরী মুক্তি সংগ্রামী। শ্রীহট্টে তাঁর আখড়াটি ছিল স্বদেশীদের ঘাঁটি। তাঁর আশ্রমের নাম ছিল.. জগৎশ্রী আশ্রম, শ্রীহট্ট। পুলিশের হামলায় তিনি অরুণাচলে আশ্রম করেন। এখান থেকে যান দেওঘরে। দেওঘরেও পুলিশ তাঁর আশ্রম আক্রমণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে। গুলিতে কোন কোন আশ্রমবাসী মারা যান।

হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর 'মুক্তির সাধন' বইটিও নিষিদ্ধ তালিকায় আছে। এতেও বর্ণিত হয়েছে বিদেশী শাসনে ভারতের দুর্দশার চিত্র। শ্রীহট্ট থেকে দ্বারকানাথ গোস্বামী এটি প্রকাশ করেন।

শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত আরও বই নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন, দ্বিজেন্দ্রমোহন দশগুপ্তের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ শ্রীহট্ট'। এতে শ্রীহট্টের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবরণ আছে। বইটির প্রকাশক শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত। লেখক দ্বিজেনবাবু ও প্রকাশক শ্রীশচন্দ্র দুজনেই স্বাধীনতা সংগ্রামী। দ্বিজেনবাবু শ্রীহট্টের প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা ছিলেন। প্রিয়কুমার গোস্বামীর নিবন্ধের বই 'স্বাধীনতার স্বরূপ' রাজরোষে পড়ে। ঢাকার সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে শ্রীহিমাংশুকুমার রায় কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের হেনা প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র দে। সাল ১৩৩০। মূল্য বারো আনা।

একশ' পৃষ্ঠার এই বইটি প্রথমে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় বের হয়। বইটি বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থনে লেখা, এই বইয়ে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র শোষণমুক্তির পথ। লেখক প্রিয়কুমার গোস্বামী শ্রমিক নেতা। তিনি শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই বইটি সম্পর্কে স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ তৎকালীন চীফ সেক্রেটারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯২৩ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি এই মর্মে নোট পাঠান

'I invited your attention to the enclosed book entitled 'Swadhinatar Swarup' (The true form of freedom) by Priya Kumar Goswami, formerly a leader of the Narayanganj Labour Association.

The book has been reviewed by one of my officers, a copy of whose report is enclosed. It will be seen that the publication diseminates Bolshevik ideas of a pernicious type and is an unequivocal attempt to excite the peasant and working classes.

The question of proscribing the book has been considered but this class of literature does not appear to fall within the perview of ordinary law, as it is not seditious.

If it is inteneded to carry out spirit of the Government of India's instructions regarding Bolshevism (Ref. Government of India Home Dept. letter No. F-9n dated 29-8-22) it appears that special legislation is necessary.

পুলিশ বিভাগের ওই অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে চীফ সেক্রেটারি ভারত সরকারের কাছে চিঠি লেখেন এবং এ ধরনের বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। ১৯২৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি চীফ সেক্রেটারি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবকে এই মর্মে পত্র লেখেন

Sir, I am directed to forward for the information of the Government of India a copy of a book entitled 'Swadhinatar Swarup' (The true form of freedom) together with a review and a translation of some of the most objectionable passages in the book.

The book diseminates Bolshevik ideas of a pernicious type and makes an attempt to excite the peasant and working classes. I am to point out that there are at present no adequate means of dealing with literature of this kind.

Even if the author were prosecuted under section 153A, I.P.C. there is no provision in the law to enable all copies of the book to be seized. Section 99A of the code of criminal procedures refer only to 124 A, I.P.C.[১৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত আইনগত কারণে শেষ পর্যন্ত 'স্বাধীনতার স্বরূপ' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়নি।

বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। এর প্রথমে আছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কবিতা— 'দরিদ্রের জাগরণ।'

তারপর 'প্রকাশক' হিমাংশুকুমার রায়ের নিবেদন—

তারপর—'লেখকের কৈফিয়ত'।

তারপর—উপক্রমণিকা: স্বরাজ কত দূরে ?

তারপর—স্বাধীনতার স্বরূপ।

তারপর—শেষ কথা

তারিখ ১৩৩০, ১২ই আশ্বিন।

'স্বাধীনতার স্বরূপ' বইটি সম্পর্কে গোয়েন্দা অফিসার ১৯২৩ সালের ৬ই নভেম্বর যে রিপোর্ট দেন, সেটি হুবহু সরকারি ফাইল থেকে তুলে দিলাম :As ordered I reviewed the book 'Swadhinatar Swarup' by Priya Kumar Goswami published from the Saraswati Library, Dacca. The book contains a short poem in preface by Hemendra Kumar Roy named 'Awakening of the poor'. The writer exhorted the poor men to throw away their loin cloths and to wake up, and not to pass their days like dumb, driven cattle. He further asked them not to serve the rich men who are invariably idlers.

This book is on the whole a Bolshevik literature. The objectionable portions have been marked and side lined. The writer says that he has no faith in the 'Swaraj' preached by the followers of Messrs. Gandhi and Das. Even if 'Swaraj' be attained the writer said, we would change from one frying pan to another. Some rich mill-owners, zaminders, and upper intelligent., upper middle class would capture the Government and they would tyranise and oppress the poor people in the same way as was done by the English.The main thing to be achieved, the writer says in the emancipation of the poor people in India, who form more than 95% of the population from the clutches of money-lenders, zaminders , mill-owners and other people who systematically exploit the people and keep them in rags only to become rich themselves.

The land should be taken away from the zaminders and distributed free to the poor peasants who really cultivate them. The land-owners, the writer says, pass their days in idleness, and have no right to monopolise the major portions of the profits accrued from the land. Similarly the mill hands, who really run the mills, should have share in the profit.

The writer says the Salvation of India does not lie in the 'Charka' movement of Mr. Gandhi or in the Council entry question, but in educating the millions of the poor people of India to understand their own interest, to tell them how powerful they are, to make them really fit to remove their sufferings. Let the people have more freedom in their daily life and all sorts of bondage social or otherwise be removed and when the poor people would raise their heads and free themselves from the tyrany of the rich, India would be automatically free."

চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লবের বলি' নামে একটি বই ১৯২৩ সালে ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

'বিপ্লবের বলি'র প্রথম ভাগের প্রচ্ছদে আছে—বিপ্লবীরা সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছেন—এই ছবি। তার তলায় লেখা

'যতীন্দ্রনাথ'।

চন্দননগরের (গোলন্দপাড়া) বিপ্র ভাণ্ডার হইতে শ্রী[illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক এটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত।

তারপর 'নিবেদনে' আছে :…"বাঙালীর জীবনে ভীরুতা, স্বদেশদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা ও কর্তব্যে অবহেলা প্রায় মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। মীরজাফর - রাজবল্লভের দেশ ও তাহাদের পরে স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য কেহ নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয় নাই। যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবী দলই প্রথমে বাঙালীকে সেই পথে দীক্ষিত করে।"

তারপর 'সূচী'—

যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় (রায়চৌধুরী), নীরেন (নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত), মনোরঞ্জন (সেনগুপ্ত)।

বইয়ের কোথাও তারিখ ছাপা নেই।

বইটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম।

যতীন্দ্রের অধিনায়কত্ব—

…"রবীন্দ্র প্রভৃতি ধরা পড়িবার পর, ঢাকার পুলিনবাবু নির্বাসিত হইবার পর, রাজরোষ-রক্তিম তাম্রবর্ণ ভারতাকাশ তলে দাঁড়াইয়া, যতীন্দ্রনাথই বিপ্লব আন্দোলনের রশ্মি হস্তে তুলিয়া লইলেন। যতীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে বিপ্লববাদীরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দেশময় বিদ্রোহের কেন্দ্র স্থাপন ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে লাগিল।" ঐ পৃ-৫১

'বিপ্লবের বলি' বইটির বিরুদ্ধে সি কাস্টমস অ্যাক্টে ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব করে পুলিস কমিশনার টেগার্ট ১৯২৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর চীফ সেক্রেটারি মবারলিকে চিঠি লেখেন

Sir, I have the honour to forward herewith a copy of Bengali .book entitled 'Biplaber Bali' 1st Part, Jatindranath'—Printed at the Bipra Press and published in Chandernagore by Basanta KumarChatterjiThe cover is objectionable and the contents are very much on the lines of the articles in the 'Ananda Bazar Patrika,' the Editor, and the Printer and the Publisher of which were recently prosecuted before the chief Presidency Magistrate. The acquittal in the 'Ananda Bazar Patrika' case makes the position more difficult as regards proscription, but I hold that the book is no less objectionable than 'Kanailal', which was prohibited under the sea customs Act, vide your Memo: No. 1379 P.D. dated the 6th Act, 1923. Also the sales of the book is reported to be large, e.g. the Saraswati Library of Calcutta have sent 800 copies to Dacca, Barisal and Pabna. I would, therefore, suggest for your consideration to make the Govt. of India to prohibit this book under Sec. 19 of the sea customs Act, as this would prevent the book being openly exhibited for sale. I would also suggest that if possible the book 'Biplaber Bali' generally may be prohibited entry, as such an order may cover any other parts which may subsequently be published in chandannagar I have not waited for a full review of the book to avoid delay.

এর পরে টেগার্ট চীফ সেক্রেটারিকে জানান যে, তিনি গোপনসূত্রে জেনেছেন যে, 'বিপ্লবের বলি'র প্রথম খণ্ডটি আসলে কলকাতার সরস্বতী প্রেসে ছাপা।

তিনি আরও জেনেছেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশিত হবার আগেই এর অনেক কপি বিক্রি করা হয়। ওই চিঠির তারিখ ১০/১১ ডিসেম্বর, ১৯২৩। এর কদিন পরই 'বিপ্লবের বলি'র ভারতে আনা নিষিদ্ধ হয়। ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ (শুল্ক) ১৯২৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ওই মর্মে নোটিশ জারি করেন। তাতে বলা হয় যে, সি কাস্টমস আইনের ১৮৭৮, ১৯ ধারা বলে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির 'বিপ্লবের বলি'র বইয়ের কোন কপি সমুদ্র বা স্থলপথে ব্রিটিশ ভারতে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন। বইটি বসন্তকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক চন্দননগরের বিপ্র প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায় যে, বন্দীজীবন, কার্পাস শিল্প, [illegible] ইতিহাস প্রভৃতির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'বন্দীজীবন' বইটি বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা। ওই বইয়ে লেখক লাহোর, বারাণসী, কলকাতা ও আন্দামানে তাঁর বন্দীজীবনের বর্ণনা দেন। বিপ্লবের প্রস্তুতির বিবরণও আছে। ১৯২৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি তারিখের এক নোটে গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেন। সরকারি ফাইলে তা আছে। ১৯২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি গোয়েন্দা পুলিশের (আই বি, সি আই ডি) ডি আই জি চীফ সেক্রেটারিকে জানান

"প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি নিম্নের বইগুলি পেশ করছি—

১. রুইন অব্ ইন্ডিয়ান ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ—লেখক বি ডি বসু
২. কটন—লেখক সতীশ দাশগুপ্ত
৩. কার্পাস শিল্প
৪. বন্দীজীবন, দ্বিতীয় খণ্ড, লেখক শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।"

বন্দীজীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'এর নিবন্ধগুলি ইতিপূর্বে 'বঙ্গবাণী'তে বের হয়। ১৯২৫ সালের ১৯ মে বইটির ইংরাজি ভাষ্য পাঠানো হয়েছে। এর লেখক শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এখন 'বিপ্লবী ইস্তাহারে'র জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছেন। এই বইয়ে বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে লাহোর, বেনারস, কলকাতা ও আন্দামানের বন্দীজীবনের বর্ণনা আছে। বইটির প্রথম খণ্ড আর ছাপা নেই বলে জানা গেছে। স্বভাবতই বইটির উদ্দেশ্য, দৃষ্টান্ত তুলে ধরা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা এতে আছে।

'এইসব কারণে উল্লিখিত চারটি বইই অত্যন্ত আপত্তিকর। এবং যদি এগুলি আইনের আওতায় আনা যায়, আমি এইসব বই বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করছি।"[১১]

'কার্পাস শিল্প' বইটির লেখক সতীশ দাশগুপ্ত। এই বইটি সম্পর্কেও তীব্র আপত্তি তোলা হয়। বলা হয়েছে, এই বইয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। এই বই সম্পর্কে মন্তব্য

..."a book reported to be notoriously unfriendly to British Indian administration. Some of the more objectionable passages in English version and corresponding portions in the vernacular edition are marked."

আপত্তি ওঠে সতীশ দাশগুপ্তের আর একটি বই সম্পর্কে-তুলা। ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ, সি আই ডি ১৩, ইলিসিয়াম রো, কলকাতা থেকে ২৫-১-১৯২৭ তারিখের চিঠিতেও ডেপুটি (ডি আই জি পুলিশ ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ) যে বে-সরকারি নোটটি চীফ সেক্রেটারিকে পাঠান, তাতে বলা হয়েছে—'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি নিম্নলিখিত বইগুলি পেশ করছি—(১) রুইন অব ইন্ডিয়ান ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি—বি ডি বসু (২) কটন—সতীশ দাশগুপ্ত, (৩) কার্পাস শিল্প, (৪) বন্দীজীবন, দ্বিতীয় খণ্ড,—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

বাংলা সরকারের পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ডিরেক্টর ওই বইগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমার মতে প্রথমটি ছাড়া অন্য বইগুলিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।

'মণিপুরের ইতিহাস' বইটি সম্পর্কেও আপত্তি উঠেছিল। বইটির লেখক হলেন মুকুন্দলাল চৌধুরী। এর তিনটি সংস্করণ ছাপা হয়। প্রথম সংস্করণটি ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। সরকারী ফাইলে এর আপত্তিকর অংশগুলির রিভিউ আছে ; তা তুলে দিলাম

মণিপুর সম্পর্কে ব্রিটিশের নীতি—

'It is a history of native state of Manipur from the earliest times to the present day. The disturbance which occur s in Manipur during the Vice-royalty of Marquis of Landsdowne was said to have been described in a spirit of extreme hostility to the Government. British officials were accused to cunning and duplicity in their dealing with Manipur affair.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থাঙ্গল জেনারেলের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব

Throughout (sic) arose in the mind of the Manipuries "Why this sudden miserable condition of Manipur, why this intolerable oppression of British when there was no fault on their part." To this Thangal general replied, "To secure their own interest the British can do anything and everything".

Thangal General again said, "Pooh sin! What sin in killing a vile and deceitful foe? (meaning the English). Is it sinful to kill a Tangli (a Manipuri word).

The English are becoming unrighteous and selfish with the growth in their power and extention of kingdom.

Thangal general again said, "How many Manipuris have lost their lives today through villiany of English ?"

There is said to have been a covert suggestion in the book that the British Government was tyrannical and unjust and its affairs contributed to bring the independent state of Manipur under British suzerainty.

The Maharaja of Manipur was an independent ruler in a more real sense than such chief as Gaikwar of Baroda and other native chiefs.

মণিপুরের ইতিহাস বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় 'শক্তিশালী সমাজ' নামে একটি বাংলা বইও আছে। এর লেখক স্বামী সত্যানন্দজী সরস্বতী (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আগেই আছে)।

'নিহিলিস্ট রহস্য' নামক বইটি রাজরোষে পড়েছিল, তবে বাজেয়াপ্ত হয় কিনা, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাইনি। বইটির লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়।

গোয়েন্দা দফতর থেকে (৯, ইলিসিয়াম রো, কলকাতা) ১৯১০ সালের ৩০শে নভেম্বর এইচ টি ফুলিসকে এই মর্মে চিঠি লেখেন

'প্রিয় ফুলিস, গত বছর ১৪ এপ্রিল দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'নিহিলিস্ট রহস্য' নামে একটি আপত্তিকর বইয়ের রিভিয়ুর কপি আমরা মিঃ ডিউকের কাছে পাঠিয়েছি।'

এর জবাবে ফুলিস আমাদের 'ওই বইটির কোন অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে আপত্তিকর হলে' তা জানাতে বলেন।

১৯০৯ সালের ২৯শে এপ্রিলের পত্রে (নং ২৯৫৪) আমরা তার জবাব দিয়েছি। এবং তারপর এ বিষয়ে আর কিছু শুনিনি।

চূড়ান্তভাবে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তুমি কি আমাদের জানাবে ?

এই বই সম্ভবত শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়নি। বিজ্ঞপ্তিতে 'নিহিলিস্ট রহস্য' নিষিদ্ধ হবার তথ্য পাইনি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রখ্যাত বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুটি খণ্ডই ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইন ১৯৩১ অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, এবং ১৯৩৪ সালের ২৯শে জুন বাজেয়াপ্ত হয়। প্রথম খণ্ডটি মেটকাফ প্রেস (১৫, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ডটি ছাপা হয় ২/১, রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের কলকাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের ডাঃ বি এন দত্ত কর্তৃক। এবং বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকেই প্রকাশিত। এই নিবন্ধটি আগে বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয়। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিবরণ, বাংলার বিপ্লবীদের আদর্শ এবং কর্মপন্থার নানা তথ্য এই বইয়ে আছে। লেখক নিজে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস চেতনার স্বাক্ষর এই বইয়ে আছে। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত, বার্লিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি ছোট ভাই।

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গোয়েন্দা দফতর যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, তা গোপন সরকারী ফাইল থেকে উদ্ধার করা গেছে। এই বিবরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এটা পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি

"Aprakasita Raj Naitik Itihas, Pratham Khanda (unpublished political history, Part 1) by Dr. Bhupendranath Dutta M.A.P.H D purports to give a history of the anarchist movement in Bengal and an account of the ideals and methods of Bengal revolutionaries. It also attempts to set forth the ideals of Indian Politicians and the relations of the political leaders with the masses.

The book is said to have been reprinted from the pages of the Bengali magazine, 'Bangavani'.

The author begins by saying that the revolutionary movement in Bengal was not the outcome of a fit of excitement of educated or half-educated youth. Its rise later back to the time of Ramgopal Ghosh. The foundation of the Bhamho Samaj and its influence on the thought of the Hindu society, revolutionary views of Rajnarayan Bose, starting of the National papers, staging of patriotic dramas in the National Theatre, the activities for the renaissance of Hinduism, the literary works of Bankim Chandra, Bhudev Mukherjee, Hemchandra Banerjee, Jogendranath Vidyabhusan and the consequent establishment of institution of lathi play, the political efforts of Surendra Nath Banerjee and Ananda Mohan Bose and the establishment of the students Association, the activities of the Indian Association and the congress, revolutionary projects of Sisir Kumar Ghose, the theory of 'Aggressive Hinduism' propounded by Swami Vivekananda and lastly the formation of revolutionary societies and their activities—these are the gradual stages of the evolution of the national life of Bengal.

Ram Mohan Roy who came into contact with western culture became an admirer of the French revolution and its precursors, the Encyclopaedists. But he applied the revolutionary principles to religious and social problems.A careful analysis of the political condition of modern India shows that in the provinces where the Bramho Samaj or the Arja Samaj has ushered in a new current of thought, that is, where radical views prevail, the national movement and the desire for independence have assumed a powerful aspect.

Bengali literature current about 40 to 50 years ago bears testimony to the fact that desire for independence in Bengal was the result in Western Education.

About 1901 there was a rumour that while the Marhatta has organised a secret revolutionary society which would make its existence felt, the Bengalis were doing nothing. This slur moved the Bengalis who took to Lathi playing, wrestling etc......, and studying chemistry.

Then came the 'partition of Bengal' intailing in its train the Swadheshi movement which made the work of revolutionaries easier.

In 1906 'Bombs' appeared. Their appearance in Bengal may be attributed to three causes:—

(1) Histories of other countries and the activities of the Russian revolutionaries.

(2) Bombs are the only means in the hands of an unarmed and coward people;

দুনিয়ার পাঠক এক হও

(3) The zeal of the Bengalis to outrival people of other provinces. The revolutionaries held that Congress policy of petition and representation had killed the manhood of the people, and so they resolved to stir up courage and desire for independence in the mind of the people by laying down their own lives and punishing the oppressors.

The 'Bomb' was the result of the work of groups—the result of the mental evolution of the Bengalis who had been advancing towards radicalism by stages since the time of Raja Rammohan Roy.

Revolutionism and Bombs are the fruit of the last 70 years of higher education and not the result of Swadeshi movement as is generally supposed. During the closing period of Swadeshi movement branches of the revolutionary society were established all over Bengal. Peoples of all classes (except peasants and labourer) from titled Zamindars to young boys became members of the society.

A Bengali is notorious for his cowardice, but at the time of real work the heroes could be found in him.

The programme of collecting fund for the revolutionary works by political dacoity was accepted by the secret society from the very beginning.

It has been already said that there was party spirit among the members of the revolutionary society. One party advocating lathi playing, boxing, wrestling , playing football etc. and the other parties, to one of which the author belonged laying stress on propaganda works.

The latter worked jointly under the leadership of Arabinda and published the newspaper 'Jugantar'.

In the history of the evolution of Indian politics one fact should be particularly noted, viz, that when the revolutionary works began in right earnest, it was only the youngmen that were sent to goal or to the gallows, but the barristers and the pleaders posing as leaders of the so-called extremist party only delivered speeches and did nothing else. Nor did they contribute a single furthing to the national fund at that time. This is what is called bourgeois mentality. When bombs appeared, bullets were showered and arrests were made the bourgeoisie retired to the back grounds.

The leaders of revolutionary party asked its members to drive out the English first. Accordingly the revolutionaries began to preach evolution and succeeded in recruiting a number of Zamindars, Lawyers, and merchants, but the masses which formed 95 percent of the population of Bengal did not respond to their call. Little did the young revolutionaries realise at that time that they were really roaring about at agents of the bourgeoisie forsafeguarding the vested interests while they thought they were serving their country.

The revolutionaries studied European policy, socialism, Indian economics, history of Russian revolutionaries and so forth under the guidance of SakharamGanesh Deuskar who held regular classes. As a result of these studies several English and Bengali pamphlets were anonymously printed and distributed among public. During the time of Swadheshi movement numerous issues of a manifesto entitled 'Sonner Bengla' were published in English and Bengali. The object of all these was to make the people in general dissatisfied with the English.

During this time educated men from various classes and of various sorts became members of the secret society or sympathised with it. But after the Alipur bomb case the activities of the society as also its constitution

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

underwent a change, when the revolutionary activities assumed a serious aspect, the Zamindars, pleaders, and barristers severed connection with secret society and at the beginning of the great war the society was composed solely of students. At that time the revolutionary activity was confined solely to the perpetration of dacoity and punishment of oppressive police officers. But during the war money and arms were sent to India from foreign countries, the Sultan of Turkey declared Jehad against the English and the Shikh-ut-Islam of Turkey granted Fatwa to the Hindus and Muslims to combine and fight against the English in India. But all these were of no avail.

The failure of the attempt of revolution in India was due to inherent defeat in the conception of Indian revolutionism which was that all classes of people from the raja down to the peasants would remain in their respective position without sacrificing a bit of their self-interests and would fight together for independence—a preposterous idea. The mind of the Indian revolutionary like that of the ordinary Indian is static.

There is no dynamic-force in the Indian society. The revolutionaries did not realise that those who had not revolutionised their mind and thought could not bring about revolution in the outer world. The Brahmin would look down upon the Sudra; the Hindu would hate the non-Hindu; The Zamindars would fleece the tenant while the persecution of women would continue; caste-distribution and class-distinction would remain as rigid as before; Brahmanical bigotry would remain at its height, still all would be united in the name of nationalism and drive out the English. This was the philosophy of the Indian revolutionary. Here in lay the fallacy. The fact was that revolutionism was reduced to a sort of Brahmanism. Mazzini had said; 'Mind of man should be freed first, then only he will understand the nature of Freedom in the outer world? Though all revolutionaries quoted Mazzini, none could understand the significance of his saying.

The mind of the revolutionaries being in such an unprepared state, they were exploited by the bourgeoisie and treated like hired goondas by the latter. Here the writer refers to certain incidents relating to an attempt to murder Sir Bamfylde Fuller, L. Governor East Bengal Assam. Prafulla Chaki was brought from Rangpur to murder the L. Governor. This attempt to murder was practically inspired by the late Surendranath Bannerjee. All news from the time of the preparation of bomb to his (L-Governor) leaving the shores of India was regularly communicated to him (Surendranath). Surendranath had promised to pay revolutionaries, 7 to 8 thousands rupees (to be collected from several friends) for meeting the expenses to be incurred in the attempt. The bomb was shown to him when it was under preparation. This was the first bomb prepared in India.

Profulla Chaki accepted revolution as an article of faith. He considered murder of Government officials and selfsacrifice in that cause as religious act. It was explained to him that self abnegation was necessary for the political sacrifice of India and he actually lay down his life. But if he were told that all sorts of subjugation political, religious, social, economic -were fundamentally the same and were asked to fight against priest craft, social tyrany and economic independence, (or for the matter of that other Bengali martyrs) he would not, perhaps, accept

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

the reasoning and lay down his life (or their lives). The reason is that the cult of freedom in India did not and does not embrace all the spheres of nation's life. But the idea of Russia is different and so she is now completely free and desires the freedom of the entire race. But in India all zeal is extinct.

Constitution and working of the Bengali revolutionary society.

At the time of establishment of the Bengal Revolution society there was a president, two vice-presidents and a treasurer all belonging to the legal profession on the wealthy class. There was another functionary whose duty was to work among the students. All news regarding the work of the society in different centres had to be regularly communicated to the president. Every member of the society was like a centre and worked among the students. No two centres knew the activities of each other. When a new recruit was admitted to the society, he was initiated with mantra (mystic formula) of the society and he had to promise that he would accept the capital punishment if he divulged the news of the person by whom he was initiated. Members of the society were subjected to strict discipline. No two members were permitted to converse in public or to express curiosity about each other. Every student had to obey his master and guide.

From 1902 to 1916 revolutionary work was carried on only by the members the 'Babu' class with the result that revolutionary attempt was abortive. None could realise that true meaning of the revolution was not merely driving out the English. All the revolutionaries belonged to the baurgeaisie class who naturally hated the poor and masses and did not have the time or desire to look beyond the interests of their own. (i.e. bourgeaisie) class. For this reason or may be for other reasons also revolutionism was not preached in India or in Bengal among the peasants, labourers, coolies, shop keepers, etc. who belonged to masses. Herein lies the difference between the revolutionaries of India and those of other countries of the world. Foreign revolutionary activities are confined mainly to masses and labourers. There revolution means reconstruction of the society with a view to removing the root cause of social abuses, that is, the establishment of social and economic equality and harmony in the society.

The movement that was set on fact in Bengal by the revolutionaries has declined owing to the absence of a competent leader. It was because no supermen like Sri Krishna Chaitnya Bharati or Acharjya Kesab Chandra Sen appeared in the field of politics to the revolutionary movement of Bengal that no national work of importance was ever effected by any amount of national zeal; national strength could not come fully into play. Bengal's real misfortune is that no superman appeared to bless the revolutionaries of Bengal or India.

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস বইটির যেসব অংশ আপত্তিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারী ফাইলে তার ইংরাজি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে ইংরাজির বদলে সংশ্লিষ্ট বই থেকে আমি মূল বাংলায় তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বোমা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যের উল্লেখ আছে ফাইলে

"...কিন্তু ১৯০৬ খৃঃ বোমার আবির্ভাব হয়। বঙ্গে বোমার আবির্ভাবের তিনটি প্রধান কারণ ছিল। (১) বাঙালী ভাবপ্রবণ (emotional), কাল্পনিক (imaginative) ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যগ্রস্ত (nervous) জাতি।...ম্যাটসিনির আত্মজীবনীর প্রথম ভাগ আমাদের ধর্মপুস্তক ছিল (মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন বাঙালী আনন্দমঠের জাতি কিনা, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?), তৎপরে রুষীয় বৈপ্লবিকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কার্যকলাপ আমরা পর্যবেক্ষণ করিতাম। (২) নিরস্ত্র স্বদেশপ্রেমিকতার পক্ষে জাতীয় অবমাননাকারী ও অত্যাচারিকে দণ্ড দিবার অন্য রাস্তা নাই এবং একটা কাপুরুষ জাতিকে জাগাইয়া দিবার অন্য উপায়ও তখন ছিল না। (৩) কাপুরুষ বাঙালীকে অন্যান্য প্রদেশকে টেক্কা দিয়া কাজ করিতে হইবে, ইহাও আমাদের একটা জিদ হইয়া উঠিয়াছিল। এই তিন কারণ একত্রিত হইয়া বোমার আবির্ভাব করিয়াছিল। এক কথায়, উদ্দেশ্য ছিল যে, কংগ্রেস আবেদন ও নিবেদনের পন্থা দ্বারা দেশের লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে ; এই বিনষ্ট মনুষ্যত্বকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য 'বিষস্য বিষমৌষধম' দরকার। সেইজন্য বৈপ্লবিকদলের লোক দৃঢ়সঙ্কল্প হইল যে, সাহস দেখাইয়া, আত্মজীবন ত্যাগ করিয়া ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিয়া দেশে স্বাধীনতার স্পৃহা ও সাহস আনাইয়া দিবে" (অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১১-১২)।

বাঙালী যুবকদের সাহসের কথা উল্লেখ করে লেখক বলেছেন '...এইসব শিক্ষিত যুবক যে প্রকার সাহস, চতুরতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। যদি প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে বা রণক্ষেত্রে তাহাদের জীবনের কার্য বিকশিত হইতে পারিত তাহা হইলে বাংলা দেশ জগতের সম্মুখে এক আদরণীয় স্থান অধিকার করিত। বাঙ্গালার স্বাধীনতা পন্থাবাদীদের চরিত্রের আদর্শ অতি উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল বলিয়াই এই ভীতু বাঙালী যুবকেরা প্রাণটি তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল। ইহাদের যদি রণবিদ্যায় বিশারদ করা যাইত, তাহা হইলে জগতের সম্মুখে একবার রণকুশল বাঙালী সৈনিকের কৃতিত্ব দেখান যাইত' (ঐ ২১-২২)। ৫০ পৃষ্ঠায় আছে... 'মুক্তির মন্ত্র পূর্ণভাবে দেওয়া নাই এবং এখনও দেওয়া হয় না বলিয়াই ভারতে এত জটিল সমস্যা। এই আদর্শের প্রভেদ বলিয়াই রুষ আজ মুক্ত এবং সমগ্র মানব জাতিকে এই মুক্তি-দান-প্রয়াসী। তাই আজ রুষের আদর্শে জগৎ টলটলায়মান হইয়াছে। আর ভারত ? সবই নিভিয়া গিয়াছে।...

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জেলে বিপ্লবীদের হাতে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর খুন সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য আপত্তিকর বলে চিহ্নিত হয়

'গোস্বামীর মৃত্যু-শাস্তিতে নাকি ইউরোপীয় বৈপ্লবিকেরা বাহবা করিয়াছিলেন। প্যারিসের সোসালিস্ট (উপস্থিত কম্যুনিস্ট) মুখপত্র Humanite নাকি লিখিয়াছিল, ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষীবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, এই প্রকার ঘটনা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে এই প্রথম' (পৃঃ ৭৩)।

এই বইয়ের অন্যান্য আপত্তিকর অংশ হচ্ছে, পৃঃ ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৫, ৯৮, ৯৯ ও ১০১।

(অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, বৈশাখ, ১৩৩৩, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে ওইসব উদ্ধৃতি।)

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কেও সরকারী ফাইলে বিরূপ মন্তব্য আছে। তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

Aprakasita Rajnaitik Itihas(Unpublished Political History), Part II by Dr. Bhupendra Nath Dutta, MA, PHD.The author gives framentary accounts of the activities of the Indian revolutionary party outside India, during the European war.

The revolutionary party had centres of activities in Japan, China, Philippine Islands, Sind, Java etc. It also appears that certain members of the party were successful in their attempts in the beginning but failed at the last moment.

Indian revolutionaries are said to have received help from the German Government.

Incidentally the writer also refer to the distribution of revolutionary pamphlets among the Indian sepoys to incite them against English, as a result of which some soldiers are said to have deserted the army.

An allegation is made on page 56 that during the siege Kuleb Amare when food was supplied to the besieged from aeroplanes, a distinction

দুনিয়ার পাঠক এক হও

was made between the black and white soldiers, the former receiving more food than the latter, though both were equally facing starvation on the one hand and the artillery of the enemy on the other. similar distinction is said to have made in other front also.

Referring to the murder of Pandit Ram Chandra by a sikh in open court is Sanfrancisco followed by the murderer being shot dead by an American Bailif, the author observes that the motive and the conspiracy behind the murder is still a mystery. One theory is that the British secret Police brought out the murder of Ram Chandra who was the backbone of Gadar movement in America.

The author believes that though these revolutionary movements were not successful,there is little doubt that the small political reforms that have been granted of late must be attributed to the self sacrifice to the revolutionaries.

এই গ্রন্থের যেসব আপত্তিকর অংশের ইংরাজি অনুবাদ সরকারী ফাইলে আছে, মূল গ্রন্থ (প্রথম সংস্করণ) থেকে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"সে এক সময় গিয়াছে ! তখন বৈপ্লবিকদের হৃদয়াকাশে আশার অরুণ কিরণ উদীয়মান হইয়াছিল। কত কল্পনা, কত জল্পনাই না তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল ! তখন তাহাদের হৃদয়ে কি উৎসাহ কি সাহসই না ছিল ! বাঙলার বিপ্লববাদের বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কোন লেখক বঙ্গীয় কবির শিখ বীর্যের চিত্রাঙ্কণ বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকদেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এ চরিত্রাঙ্গন এ সময়ের নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিকদের প্রতিই প্রযোজ্য হয়। তাই বলি, সে একদিন গিয়াছে। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারও ঋণ।" বৈপ্লবিকদের পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়া দেশে বিদেশে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন জিব্রাল্টারের পথ দিয়া ইউরোপে আসিয়াছেন। সে পথ বন্ধ হইলে ব্রিটেনের মাথা বেড়িয়া বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কুচপরোয়া নেই, ইহাই মনের ভাব। কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছেন। আর মৃত্যু ভয় ? সত্যই 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' তাহাদের ছিল। সুয়েজ খাল রাত্রে সন্তরণ করিয়া মিশরের ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ এক বাঙালী ও এক মাদ্রাজী দুই তরুণ যুবক জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল (বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ত্রিমূল আচারিয়া) মদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু বাঙালী তরুণ যাইতে প্রস্তুত হইল (বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)।সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত দেশসমূহে গিয়া অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে, অমনি বঙ্গভাষী ও পঞ্জাবীভাষী যুবকের দল লাগিয়া গেল ! ইরন ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি পার হইয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্য যুবকের দল দৌড়িয়া যাইল। কাজে আগে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তারপর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কি হয়। মরিব কি বাঁচিব তাহা পরে দেখা যাইবে, ইহাই ছিল এই সময়ের বৈপ্লবিক যুবকদের মনস্তত্ত্বের অবস্থা।"

মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সিপাইদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার কর্ত্তৃপক্ষ করতেন, তার যে বিবরণ লেখকের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এই খণ্ডে আছে, তাও আপত্তিকর বলে বলা হয়েছে (পৃঃ ১১৬১)।অন্যান্য আপত্তিকর পৃষ্ঠাগুলি ১১৭, ১২১, ১২৩, ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৪১, ১৪৪-১৪৫, ১৫০-১৫২। এই রিপোর্টটি বি জি প্রেসে (১৯৩৪-৩৬) ছাপা।[২০] এই রিপোর্টের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়গুলি ছিল

১) বিপ্লবীদের সঙ্গে গণ সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য বিপজ্জনক মনে হয়েছে।

২) বিপ্লব চেতনার যে ধারাবাহিক কাহিনী ভূপেন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন, তা দেখিয়ে দিয়েছে বিপ্লব আন্দোলন উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কয়েকজন যুবকের কীর্তি নয়। এর পিছনে পরাধীন জাতির দীর্ঘ ঘোষিত বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

৩) ডঃ দত্ত ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লব-চেতনার সম্পর্ক দেখিয়েছেন।
৪) সাহিত্যে বিপ্লব চেতনার রূপ দেখিয়েছেন।
৫) বোমার আবির্ভাবের পিছনে সরকারী নীতির অনৌচিত্যের রূপ দেখিয়েছেন।
৬) কংগ্রেসের নরম নীতির ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় বোমার আবির্ভাব—তাও দেখিয়েছেন।
৭) বাংলার প্রায় সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিকদের অনুপ্রবেশ দেখিয়েছেন।
৮) বিপ্লব আন্দোলনে যুবকদের প্রধান কর্মী ভূমিকা এবং কার্যকালে ধনী বুর্জোয়াদের পশ্চাৎ অপসরণ দেখিয়েছেন। বিপ্লব আন্দোলনের দুর্বলতার আলোচনায় বলেছেন—তা ধনী বুর্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল ছিল। শ্রমিক এবং কৃষকদের দলভুক্ত করেনি। সেই জন্যই তা ব্যাপক গণ সংগঠন হয়ে উঠতে পারেনি।
৯) ভারতীয় মনের স্থিতিশীলতার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে বিপ্লবের সাফল্য আনা যাবে না—এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে।
১০) ভারতে বিপ্লব আন্দোলনে গণ চরিত্র ছিল না কেন, তার কারণ প্রদর্শনের পর লেখক রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গুণগান করেছেন এবং সেই পদ্ধতিতে সর্বাত্মক বিপ্লব আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

লেখার জন্য কারাদণ্ড চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডি এইচ কিংসফোর্ড ১৯০৭ সালের ২৪ জুলাই সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে 'যুগান্তরে' বিদ্রোহাত্মক নিবন্ধ লেখার জন্য এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৯০৭ সালের ১৬ জুন তারিখের যুগান্তরে প্রকাশিত 'ভয়ভঙ্গ' ও 'লাট্ঠৌষধি' শীর্ষক দুটি দেশদ্রোহকর নিবন্ধের জন্য তাঁর ওই দণ্ড হয়। যে সাধনা প্রেস থেকে ওই পত্রিকা ছাপা হয়, সেটিও বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। আদালতে প্রদত্ত বিবৃতিতে ভূপেন্দ্রনাথ ওই দুটি নিবন্ধ লেখার সমস্ত দায়িত্ব নিজে নেন এবং বলেন যে, দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যই তিনি এ কাজ করেছেন। এর আগেও ওই পত্রিকায় আপত্তিকর নিবন্ধ লেখার জন্য (২-৬-১৯০৭ তারিখে) তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত যুগান্তরের বিরুদ্ধে 'ইংলিশম্যান'ও তখন কোমর বেঁধে লেগেছিল। ওই পত্রিকার ২৬-৭-১৯০৭ তারিখে অভিযোগ করা হয়: 'Take any issue of the paper, read any article, you will find nothing but rank sedition. Anti-British spirit of the worst type pervaded the articles'

আরও অভিযোগ ····the conductors of the 'Jugantar' not content with diseminating sedition took it into their heads to publish a book in Bengalee the object of which was to teach warfare, including use of cannon." (Bartaman Rananiti).

যুগান্তরের বিরুদ্ধে এই সিডিশন কেসটি (এর পরও ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার বারবার মামলা করেছিলেন) সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রতিদিন সমস্ত সংবাদপত্রে ওই মামলার পূর্ণ বিবরণ ছাপা হত। আদালত কক্ষ দর্শকে পূর্ণ থাকত। ভূপেন্দ্রনাথের প্রশংসা করে ২৬-৭-১৯০৭ তারিখে বেঙ্গলিতে লেখা হয়: 'The manly and straight forward attitude of the convicted journalist, coupled with the severity of the attitudes have elicited for him the sympathy and admiration of his countryman. Bhupendra Nath showed that Bengali is no longer afraid of stone walls and iron bars of the prison.'

যুগান্তরের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় 'অ্যাকসন টেকেন এগেনস্ট যুগান্তর' বলে নিবন্ধ বের হয়, তাও রাজরোষে পড়ে তার বিরুদ্ধেও মামলা হয়, দণ্ডও হয়েছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮০, মৃত্যু ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১, অবিবাহিত): স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯০২-৩ খৃঃ পি মিত্র, অরবিন্দ প্রভৃতির সম্পর্কে এসে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) পরিচালিত আখড়ায় যোগ দিয়ে ঘোড়ায় চড়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন। ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৬ খৃঃ যুগান্তরের সম্পাদক হন। ১৯০৮ খৃঃ জেল থেকে মুক্তির পর আত্মগোপন করেন এবং পরে গোপনে আমেরিকা চলে যান (১৯১০ খৃঃ) এবং সেখানে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন (১৯১২)। ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধলে (১৯১৪) ইউরোপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানির সাহায্যে ভারতে বিপ্লব সংগঠনের চেষ্টা করেন। আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বার্লিনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি গঠিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দু বছর এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন। লেনিন ভারতে কমিউনিজম প্রচারের জন্য বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীদের মস্কোয় আমন্ত্রণ জানালে ভূপেন্দ্রনাথ মস্কো যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল লেনিনের সাহায্যে ভারতে বিপ্লব আন্দোলন জোরদার করা। ১৯২০ খৃঃ ভূপেন্দ্রনাথ বার্লিন জাতিতত্ত্ব সোসাইটির সদস্য হন। ১৯২১ খৃঃ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২৩ খৃঃ হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডক্টরেট হন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি দেশে ফেরার অনুমতি পান। কংগ্রেসে যোগ দেন এবং শ্রমিক-কৃষক,যুবছাত্র আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এ আই সি সির সদস্যরূপে আইন অমান্য করে দু'বার কারাবরণ করেন। অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অল ইন্ডিয়া কিষান সভার সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে কয়েক বছর কাজ করেন।

ভূপেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ ও বহুমুখী। তিনি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লব আন্দোলন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, মার্ক্সীয় দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে তার সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক লেখা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষিদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকার সম্পর্কে উল্লেখ না করা হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর অনেকগুলি নিবন্ধের বই বাজেয়াপ্ত হয়। সৌমেন্দ্রনাথ শক্তিশালী প্রাবন্ধিক। তবে তাঁর নিষিদ্ধ নিবন্ধগুলির অধিকাংশই প্রচারধর্মী পুস্তিকা, কার্যত রাজনৈতিক প্রচারপত্র। তাঁর 'বিপ্লব বৈশাখী', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'লাল নিশান', 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী', 'বন্দী', 'চাষীর কথা'—বইগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়া অনেকগুলি ইংরাজি বইও বাজেয়াপ্ত হয়। তবে তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সৌমেন্দ্রনাথ বিতর্কিত নাম। বন্দিত ও নিন্দিত—দুইই তিনি। বন্দনার চেয়ে নিন্দাই বেশি জুটেছে তাঁর কপালে। ভারতে তিনি একমাত্র কমিউনিস্ট নেতা যিনি মুক্ত কণ্ঠে সেযুগে স্তালিনের সমালোচনা করেছেন। রাশিয়ার তত্ত্বজ্ঞ বুখারিনের কাছে তিনি পাঠ নেন।

জার্মানীতে থাকার সময়ে সৌমেন্দ্রনাথের কয়েকটি বাংলা বই প্রকাশিত হয় সেখানেই, পুস্তিকাগুলি ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। পরে ১৯৩৪ সালে ফিরে আসার পরও তাঁর কিছু বই বাজেয়াপ্ত হয় এবং আরও কিছু বই রাজরোষে পড়ে যদিও শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়নি। সৌমেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'সরকারী ফাইলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে লিখেছেন : "কোন এক সময়ে সরকারী মহলে এ প্রস্তাবও হয় যে সৌমেন্দ্রনাথের নামে যে কোনো বই প্রকাশিত হবে সবই বাজেয়াপ্ত করা হোক। কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের সংখ্যা সৌমেন্দ্রনাথেরই সবচেয়ে বেশি—ইংরাজ সরকার তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে ভয় পেয়েই একাজ করেছিল। সরকারী ফাইলেই তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। মুজফ্ফর আহমেদের ইতিহাসে এসব ঘটনার কোন উল্লেখ নেই কারণ তাহলে সৌমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি পাঠকদের দিতে চেয়েছেন তা মিথ্যা হয়ে যাবে।"[১১]

১৯৩৪ সালের আগেই সৌমেন্দ্রনাথের তিনটি বই বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি তখন ইউরোপে। ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিনটি বই নিষিদ্ধ হয়। বইগুলি হচ্ছে : বিপ্লব বৈশাখী, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, লাল নিশান। তিনি এই বইগুলি বিদেশে থাকার সময়ে লেখেন এবং জার্মানীতে বাংলা ভাষায় ছাপান। ১৯৩০ সালের ৬ ডিসেম্বর 'বিপ্লব বৈশাখী', ১৯৩১ সালের ২১শে মার্চ 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এবং ১৯৩২ সালের ৫ই মার্চ 'লাল নিশান' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদেশে প্রকাশিত সৌমেন্দ্রনাথের 'লাল নিশান' গ্রন্থটি যখন ভারতে এসে পৌঁছাল, তখন বাংলা গোয়েন্দা পুলিশ বাংলা সরকারকে অনুরোধ জানান, ওই গ্রন্থের ব্যাপারে ভারত সরকারের পরামর্শ নিতে। গোয়েন্দা বিভাগের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন—এর আগে সৌমেন্দ্রনাথের ২টি গ্রন্থের বিরুদ্ধে সি কাস্টমস অ্যাকট অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে (ক) বিপ্লবী বৈশাখী। (খ) ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

(ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, সেন্ট্রাল রেভিনিউ নোটিফিকেশন নং-৪২ কাস্টমস তারিখ ৬-১২-৩০)

সরকারী ফাইল ও নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ 'বিপ্লবী বৈশাখী' সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে চীফ সেক্রেটারির কাছে প্রস্তাব করেন ১৯৩০ সালের ১১ নভেম্বরের চিঠিতে

'Sir, I have the honour to send herewith a review of a book in Bengali entitled 'Biplab Baisakhi' (Storm of Revolution) by Saumendra Nath Tagore, a Communist. The book has been printed in Germany and was recently intercepted by the Tippera Police in the inward Foreign Mail.

As the book contains seditious and objectionable matter, I am of opinion that its entry into British India should be prohibited under the sea customs Act. and suggest that action be taken accordingly.'[১১]

এর পর 'বিপ্লব বৈশাখী বইটি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে ভারত সরকারকে পত্র লেখেন বাংলা সরকার—১৯৩০ সালের ১৯শ নভেম্বর :

Sir, I am directed to forward herewith for the information of the Govt. of India a review of a book in Bengali entitled 'Biplab Baisakhi' by Saumendra Nath Tagore, a communist. The book which was printed in Germany was recently intercepted in the Inward Foreign Mail by Tippera Police.

2. The Govt of Bengal are of opinion that the book which contains seditious and objectionable matter should not be allowed to be imported into British India. I am accordingly to request that the Govt. of India may be pleased to issue an order under section 19 of the sea customs Act, 1878 prohibiting the bringing or taking by sea or by land into British India of the book entitled 'Biplab Baisakhi' by Saumendra Nath Tagore.

এর পর ভারত সরকার 'বিপ্লব বৈশাখী' বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। সংশ্লিষ্ট গেজেট বিজ্ঞপ্তিগুলি ১৯৩০ সালের ৬ই ডিসেম্বর বের হয়। তার বয়ান

No. 42 In exercise of the power conferred by Sec. 19 of the Sea Customs Act, 1878 (VII of 1878), the Governor General in Council is pleased to prohibit the bringing into British India of any copy of the book in Bengali entitled 'Biplab Baisakhi' (Storm of Revolution) by Saumendra Nath Tagore, printed in Germeny.

বাংলা সরকারের ফাইল ও নথিপত্র থেকে 'বিপ্লব বৈশাখী' সম্পর্কে ওই তথ্য পাওয়া যায়। সোমেন্দ্রনাথ বসু ভারত সরকারের ফাইলপত্র থেকে সৌমেন্দ্রনাথের নিষিদ্ধ বইগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য তাঁর 'সরকারী ফাইলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর' বইয়ে দিয়েছেন। ভারত সরকারের ফাইলে (হোম ডিপার্টমেন্ট ফাইল, ২৯-২-৩২ সন) আছে যে, বাংলা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো লিখেছেন "আমরা জানি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া সম্বন্ধে আরও দুটি বই লিখেছেন। একটি হলো weed Burnere যার জন্য কোন প্রকাশক তিনি এখনও খুঁজে পাননি। অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান মজলিশের পত্রিকা 'ভারতে'-এর কয়েকটি অধ্যায় ছাপা হয়েছে। সে অধ্যায়গুলি খুবই আপত্তিকর এবং বইটি ছাপা হয়ে ভারতবর্ষে এলে প্রবেশ রোধ করা উচিত। দ্বিতীয় বইটি হলো 'বিপ্লবী রুশিয়া'—এটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায়। এতে আপত্তির বিশেষ কিছু নেই তবে রাশিয়া সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লোকের শ্রদ্ধা বাড়াবার চেষ্টা আছে।

'আমরা সম্প্রতি জেনেছি যে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুটি বিপ্লবী পুস্তিকা বার্লিনে লিথোগ্রাফে ছাপা হয়ে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে। ডি. আই. বি এই অভিমত পোষণ করেন যে এমন একটি আদেশ প্রচার করা হোক যাতে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা যেকোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থ ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। (৫৮১ নং, ৭ই জুলাই ১৯৩২ তারিখের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের আদেশবলে এম. এন রায় ও এভেলিন রায়ের সমস্ত গ্রন্থ ভারতে প্রবেশ না করার নির্দেশ বলবৎ আছে।) সুতরাং ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে সী কাস্টমস অ্যাক্টে একটি ব্যাপক আদেশ জারী করতে অনুরোধ করা হোক।'

পলিটিক্যাল সেকশন ঐ মন্তব্য সমর্থন করে ২৬-২-৩২ তারিখে লিখলেন, 'মি. টেগোরের অধিকাংশ গ্রন্থই আপত্তিজনক এবং মনে হয় ডি আই বি'র প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিৎ।'[২৩]

বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের ফাইল থেকে পাওয়া তথ্যগুলি সৌমেন্দ্রনাথের লেখার প্রতি সরকারের কীরকম বিষ নজর ছিল তার হদিশ দেয়।

সৌমেন্দ্রনাথের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বাংলা পুস্তিকাটি নিষিদ্ধ হয় ১৯৩১ সালের ২১ মার্চ। এটিও জার্মানিতে ছাপা।

এর কিছুদিন পর 'লাল নিশান' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩২ সালের ৫ই মার্চের ৯নং 'কাস্টমস নোটিফিকেশানে' লাল নিশান' গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

সৌমেন্দ্রনাথের 'লাল নিশান' বই সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়

'The DIB is of opinion that it would be advisable to consider the question of the issue of a notification prohibiting the entry of all publication issued by S.N. Tagore wherever and in what ever language they may be printed as any publication which contains substantial reproductions of the matter contained in such original publication'.[২৪]

স্বরাষ্ট্রবিভাগ গোয়েন্দার ওই মন্তব্যের উপর লিখলেন যে তাঁর সব রচনাই আপত্তিকর। অতএব ডি. আই. বি'র নির্দেশ অনুসারেই কাজ করা উচিত। As most of Mr. Tagore's publications have been objectionable., the proper course would seem to be to accept DIB proposal.

১৮ই মার্চের, ১৯৩২ বিজ্ঞপ্তিতে ভারত সরকার সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানালেন

'Notification was issued on 5th March under Sec. 19 of sea Customs Act prohibiting the bringing into British India of any copy of book entitled 'Lal Nishan' by Saumendra Nath Tagore, Berlin.'[২৫]

বইটি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে বাংলা সরকার পত্র দেন। বাংলা সরকারের অ্যাডিশনাল ডেপুটি সেক্রেটারি ১৯৩২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টকে ওই চিঠি দেন। তার বয়ান

মহাশয়,

১৮৭৮ সালের ১৯ নং ধারায় এস এন টেগোরের 'লাল নিশান' গ্রন্থ যাতে স্থল, জল বা আকাশ পথে বৃটিশ ভারতে প্রবেশ করতে না পারে সেই বিষয়ে আপনাকে লেখবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। লেখকের কার্যকলাপ ভারত সরকারের ভাল করেই জানা আছে। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের ৯ই জুন ১৯২৭ সালের ডি ২০৩২-২৭ সংখ্যক চিঠির সঙ্গে সঙ্গে যে পত্রালাপ শেষ হয় তার উল্লেখ করতে পারি।

৩। কাউন্সিলসহ গভর্নর এই অভিমত পোষণ করেন যে, এই গ্রন্থটির ভারতে প্রবেশ বন্ধ করা উচিত। আমি তাই অনুরোধ করি ভারত সরকার এই মর্মে একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করুন। যে বইগুলি সরকার ধরতে পেরেছেন সেগুলি সবই বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বি আর সেন আই সি এস, বাংলা সরকারের তৎকালীন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে তিনি ওই চিঠিটি লেখেন।

যে আদেশবলে 'লাল নিশান' বাজেয়াপ্ত হয়, তা হল—

নং-৯, ১৮৭৮ (অব্ ১৮৭৮) সালের সি কাস্টমস আইনের ১৯ ধারা অনুসারে ক্ষমতা বলে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বার্লিনে ছাপা 'লাল নিশান' বইটির কোন কপি ব্রিটিশ ভারতে আনা নিষিদ্ধ করেছেন।

দেশে ফেরার পর সৌমেন্দ্রনাথের 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী', 'বন্দী' এবং 'চাষীর কথা' বইগুলি বাজেয়াপ্ত হয়।

'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী' বইটির লেখাগুলি প্রথমে 'গণবাণী'তে বের হয়—১৯৩৫ সালের মার্চ এপ্রিল সংখ্যায়। অল্পকালের মধ্যেই পুস্তকাকারে বের হয় এবং ছাপানোর সঙ্গে রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩৫ সালের ২৭শে মের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

বিজ্ঞপ্তি নং ১০৪০৮ পাব, ২৯শে মে, ১৯৩৫ :

১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমার্জেন্সি পাওয়ার্স) আইনের (XXIII অব্ ১৯৩১) অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সপারিষদ রাজ্যপাল সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীই কংগ্রেস বিরোধী' নামে বাংলা ইস্তাহারটির সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করছে। ৩০, হরিতকি বাগান কলকাতার কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে প্রভাত সেন কর্তৃক এটি মুদ্রিত এবং ভবানীপুরের ২০, কেদার বসু লেনস্থ গণবাণী পাবলিশিং হাউস থেকে উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত। সপারিষদ রাজ্যপাল মনে করেন যে, ওই ইস্তাহারটি পূর্বোক্ত আইনের ৪ ধারার(I) উপধারার (II) অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে। এই বইয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি বিশেষ নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আগে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের তাড়াই, তারপর ভারতে সমাজতন্ত্রের লড়াই করবো—একথা যারা বলে তাদের সমালোচনা এ গ্রন্থের একটা অংশ। অন্য অংশে আছে ধনতন্ত্রের ব্যাখ্যা। দেশভেদে ধনতন্ত্রের চরিত্র বদলায় না—সবদেশেই তার শোষণে ঐক্য আছে। এই বইয়ে বলা হয়েছে, 'ভারতে কংগ্রেস হচ্ছে জমিদার ও মিল মালিকের দল। ইম্পিরিয়ালিস্ট শাসনের বিরোধী যে তাকে ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী হতেই হবে।'

সৌমেন্দ্রনাথের 'বন্দী' বইটি ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুলাইয়ের গেজেট ঘোষণায় নিষিদ্ধ হয়। বইটি প্রভাত সেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং শশধর চক্রবর্তী কর্তৃক ৪৫নং গ্রে স্ট্রীটের মিত্র প্রেসে মুদ্রিত।

তাঁর 'চাষীর কথা' বইটি ১৯৩৯ সালের ২২শে নভেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। এই বইটিরও প্রকাশক প্রভাত সেন। ভারতবর্ষের চাষী কেমন করে ইংরেজের হাতে এবং জমিদার ও ফড়েদের হাতে লুণ্ঠিত হচ্ছে তার তথ্যবহুল বিবরণ এখানে আছে। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' থেকে উদ্ধৃতি আছে। তাছাড়া কংগ্রেসই যে ক্রমে ক্রমে চাষীদের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে, মানবেন্দ্র রায়ের এই মন্তব্যে তীব্র আপত্তি করা হয়েছে এখানে। শেষ সিদ্ধান্তে 'কলওয়ালা আর জমিদারদের কংগ্রেসের কসাইখানায় আমরা চাষীদের যেতে দেবো না। তা যদি দিই তা হলে চাষীদের সর্বনাশ করা হবে, দেশের স্বাধীনতার সর্বনাশ করা হবে। কৃষক সমিতি গঠন করে চাষীদের সংগঠিত করতে হবে জমিদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্যে। তারপর সেই সংঘবদ্ধ কৃষাণ শক্তিকে মজুরদের বিপ্লবীদল টেনে নেবে স্বাধীনতার লড়াইতে।'

'চাষীর কথা' বাজেয়াপ্ত হয় ভারতরক্ষা বিধিতে। গেজেট বিজ্ঞপ্তির বয়ান 'নং ৬৩৪৭ পি—২২শে নভেম্বর, ১৯৩৯

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'চাষীর কথা' নামে বাংলা বইটি ভারতরক্ষা বিধির, যা ওই বিধির (৬) অনুচ্ছেদের (ই) উপ-অনুচ্ছেদের সঙ্গে পঠিত, ৩৪ বিধির (৭) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের আওতায় পড়ে বলে রাজ্যপাল মনে করেন।

তাই ওই আইনের ৪০ বিধির (১) উপবিধির সি অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল পূর্বোক্ত পুস্তকের 'সমস্ত কপি, এবং এর পুনর্মুদ্রণ, অনুবাদ প্রভৃতি সংক্রান্ত সবকিছুই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করছেন।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

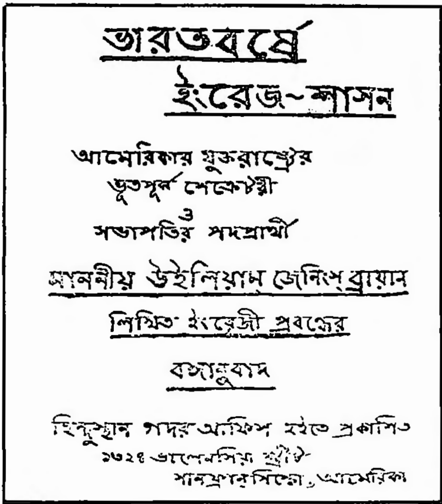

কয়েকটি নিষিদ্ধ বাংলা গ্রন্থ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বারডোলী সত্যাগ্রহ

শ্রীমহাদেব দেশাই প্রণীত

অনুবাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য—বাঁধাই ১৲

কাকোরী-ষড়যন্ত্র

"ঐ অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে
সময় হয়েছে নিকট এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ

Shri Manindra Nalayan Roy

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

পাঁচসিকা

অপ্রকাশিত

রাজনৈতিক-ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
এম, এ, পি এইচ, ডি,

এক টাকা]

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১২৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
—কলিকাতা—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সৌমেন্দ্রনাথের আরও লেখা সরকারের বিষনজরে পড়েছিল। যেমন, 'হিটলারিজম অব দি এরিয়ান রুল ইন জার্মানি', 'আন্দামানস্ দি পিনাল সেটেলমেন্ট অব্ ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম, পেজেন্ট রিভোল্ট ইন মালাবার, 'রিপ্রেসন ইন চিটাগঞ্জ, হরর্স ইন ঢাকা জেল, ব্রিটিশ টেরর ইন ইন্ডিয়া' 'মাটায়ারস অব দি ইন্ডিয়ান ফাইট ফর ফ্রিডম', 'রেড হিন্দুস্থান' 'ওয়েলস ইন বেঙ্গল', মুজঃফর আহমেদ।' এগুলির মধ্যে মুজঃফর আহমেদ ছাড়া সবগুলিই ইংরাজিতে লেখা। তাই সবগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলাম না। তবে জানা যায়, হিটলার ও আন্দামান সংক্রান্ত পুস্তিকা দুটি ছাড়া অন্যগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এগুলির মধ্যে 'মুজঃফর আহমেদ' বইটিই কেবল বাংলায়। সোমেন্দ্রনাথ বসু যা লিখেছেন, তার উদ্ধৃতি দিলাম 'আর একটি পুস্তিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই জানা ছিল না। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান নেতাদের অনেককে প্রশ্ন করেছি—কিন্তু কেউই সে বই দেখেননি। ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বেরুলো—'মুজঃফর আহমেদ বাজেয়াপ্ত'। 'শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'মুজঃফর আহমেদ' পুস্তিকা গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে এমন অ-রাজভক্ত মুসলমানও আছেন, যাঁহার বিষয়ে লিখিত বই বাজেয়াপ্ত হয়। 'মুজঃফর আহমেদ' নামে এই গ্রন্থের সংবাদ রাখেন বা প্রত্যক্ষ এ বই দেখছেন এমন কাউকে এখনও দেখিনি। এ সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।'[২৮]

ইম্পিরিয়ালিস্ট ওয়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়া' বইটি সম্পর্কে যে মামলা হয়, সরকারি ফাইল থেকে তার কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এই বইটি বাংলায়ও অনুবাদ হয়—'যুদ্ধবিরোধী কেন?' ছাত্র ফেডারেশনের অফিস সেক্রেটারি বিজনকুমার দত্ত সম্ভবত এটি অনুবাদ করেন।

মূল বইটি সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দণ্ডিত করে (কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দুইই) ২৪ পরগনার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৪০ সালের ৬ই জানুয়ারি এই মর্মে রায় দেন

'I convict Soumendranath Tagore under Rule 38(1) (e) and (5) of the Defence of India Rules and sentence him one year simple imprisonment and to a fine of Rs.1000/- in default to further simple imprisonment for a period of 6 months. I do not consider it necessary to pass away sentence for other offences under which he has been convicted.'

এই মামলায় বিজনকুমার দত্ত ও সুবীরকুমার দাশগুপ্তেরও ৩ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। 'যুদ্ধবিরোধী কেন?'—এই বাংলা অনুবাদ লেখার জন্য সম্ভবত বিজনকুমার দত্ত দণ্ডিত হন এবং সুবীরকুমার দাশগুপ্ত সম্ভবত প্রকাশক। ওই ইস্তাহারটি সম্পর্কে বিচারকের মন্তব্য

'I have given the pamphlet anxious consideration and I am satisfied that it is likely to cause consequence contemplated in (b), (e), (k), & (p) of Rule 34 of the defence of India Rule.'

'১৯৪০ সালের ৬ই জানুয়ারি ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক ভি এন রাজন বাংলা সরকারের আন্ডার সেক্রেটারিকে (স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, পুলিস শাখা) লেখেন

মহাশয়, ভারতরক্ষা বিধির ৩৮ এবং ৩৯ ধারা অনুসারে এবং ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের XXIII ১৮ (১) ধারা অনুসারে সম্রাট বনাম সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্য দুজনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, আমি তার রায়ের একটি কপি পেশ করছি।'

এর পরের দিনই বিচারক তাঁর সিদ্ধান্তের বিষয় বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগকে জানান।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সৌমেন্দ্রনাথের জন্ম ১৯০১ সালে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে সৌমেন্দ্রনাথ কর্মবহুল, বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ভারতের বাইরে রাশিয়ায়, জার্মানিতে, ফ্রান্সে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতে ফেরার পরও তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার শেষ ছিল না।

ইউরোপে যাবার আগেই তিনি দেশে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯২৬ সালে বেঙ্গল পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবং কমিউনিস্ট পত্রিকা গণবাণীতে নিয়মিত লিখতে থাকেন। এম এন রায়ের কাছ থেকে সোভিয়েট টাকা পেয়ে কমিউনিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্টির একটি গোপন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্য মস্কো ত্যাগ করতে বাধ্য হন। জার্মানিতে হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সি পি আই থেকে বেরিয়ে আসেন। নিজের একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন—আর সি পি আই, এই দল গণবাণী গ্রুপ নামে পরিচিত ছিল। শ্রমিক সংগঠনে নেমে পড়েন। প্রেস ওয়ার্কার্স যুনিয়ন, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স যুনিয়ন, এবং আরও কয়েকটি শ্রমিক যুনিয়নের তিনি নিজেই সংগঠক। তরুণ সংঘ ও অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট লীগের সংগঠনেও আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে উত্তেজক বক্তৃতার জন্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৫০৫বি ধারায় অভিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে মত পার্থক্যের জন্য বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল কৃষক সভার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন। 'ইম্পিরিয়ালিস্ট ওয়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়া' গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলসে অভিযুক্ত হন। আলিপুরের আদালতে এক বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড ও এক হাজার টাকার জরিমানা হয়।

নির্দেশিকা

১। কালীচরণ ঘোষ, 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২১
২। Fl. No. 274/1910, Home (Conf.) Beng. Govt.
৩। I bid.
৪। I bid.
৫। কালীচরণ ঘোষ, 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', ১ম খণ্ড
৬। 'নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন', শংকরীপ্রসাদ বসু, পনের, দেশ, 16.10.1982
৭। Freedom Fighters' compilation. Papers Preserved in State Archives, Writers Buildings Calcutta.
৮। I bid.
৯। 'নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন' শংকরীপ্রসাদ বসু, পনের, দেশ 16.10.1982
১০। Records Preserved in State Archives, Writers' Buildings.
১১। কালীচরণ ঘোষ, 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' ১ম খণ্ড, পৃ-২২১
১২। FL. No. 675/35. 1935 Home (pol.) Cont.
১৩। সাক্ষাৎকার চিন্মোহন সেহানবিশ
১৪। 'নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন'—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পনের, দেশ 16.10.1982
১৫। I bid
১৬। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, প্রধান সম্পাদক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৩৭
১৭। ভারতকোষ
১৮। FL. No. 394 (1-2)/ Home (Pol.) Con. Beng. Govt.
১৯। FL. No. 52, 1926, Home (Pol.) Cong. Beng. Govt. SL.I.
২০। অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এই ফাইল থেকে পাওয়া FL. No. 55/2 1939. Home (pol.), Confidential Beng. Govt.
২১। সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ-২১
২২। FL. No. 821, Home (Pol), Beng. Govt.
২৩। সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ-২২
২৪। FL. No. 29-2, 1932, Home (pol.), Beng. Govt.
২৫। 'সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ-[illegible]
২৬। I bid.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবের আহুতি

(টলষ্টয় অবলম্বনে)

'সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা', 'বিধবা বিবাহ',
'অস্পৃশ্যের মুক্তি' ও 'হিন্দুসংগঠন' প্রণেতা
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সংকলিত

INDIA OFFICE
LIBRARY
1932

তরুণ সাহিত্য মন্দির,
১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একাদশ অধ্যায়

নিষিদ্ধ উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসে যে কয়েকটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়, তার একটি স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত। গণ-আন্দোলনের বিপুল উন্মাদনা সাহিত্যকে প্লাবিত করেই। তার ভাব-তাৎপর্য কখনও কখনও কালজয়ী রূপ পেয়েছে। যেমন ফরাসী সৃষ্টি সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যেও স্বদেশী আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন, আজাদ হিন্দ আন্দোলন, যুদ্ধ, বাস্তুহারা সমস্যা ইত্যাদির পটভূমিতে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের সাহিত্যকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকরা — রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ওই আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' তার দৃষ্টান্ত। আর বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগেই 'আনন্দমঠ'-এ অতীত ঘটনার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের বিপ্লবাত্মক কর্মপদ্ধতির ছবি এঁকেছিলেন। এঁদের সমসাময়িক ও উত্তরসূরিদের মধ্যে আরও অনেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাস, গল্প রচনা করেছেন।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলন কেন্দ্র করে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন গোপাল হালদার (একদা), সুবোধ ঘোষ (তিলাঞ্জলি, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি), বনফুল (অগ্নি), তারাশংকর (পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা প্রভৃতি), সতীনাথ ভাদুড়ী (জাগরী), দীপক চৌধুরী (পাতালে এক ঋতু), সমরেশ বসু (বি টি রোডের ধারে, শ্রীমতী কাফে), বিমল কর (ত্রিপদী)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তো অধিকাংশ উপন্যাসেই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ছাপ আছে। তাঁর 'লালমাটি'তে জমিদার-প্রজা সংঘাত ও হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক বিরোধ, 'মন্ত্রমুখর' ও 'স্বর্ণসীতা', 'মহানন্দা', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'ট্রফি', 'কৃষ্ণপক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসেও কমবেশী রাজনৈতিক প্রভাব আছে।

বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এই ধারার উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দু'জনেই সশস্ত্র আন্দোলনের পটভূমিতে কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে দু-জনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রায় পরস্পরবিরোধী। শরৎচন্দ্র বিপ্লব আন্দোলনের সমর্থক, আর রবীন্দ্রনাথ তার সমালোচক। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করে লিখেছেন 'পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আত্মবিকাশের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিকতার আত্মঘাতী, অচেতন মন্ত্রশক্তির ন্যায় মূঢ় প্রচেষ্টার প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না, কাজেই তিনি ইহার দুর্বলতা, আত্মপ্রতারণা, সুকুমার অনুভূতি ও উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সহিত অসামঞ্জস্যের উপর শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে বিপ্লব দর্শনের পূর্ণ সমর্থন আছে কিন্তু ইহাতে বিপ্লবপন্থীর অন্তঃনিরুদ্ধ বহ্নিশিখা,তাহার হৃদয়ের তুষানলের পরিচয় নাই। সব্যসাচী পাষাণ দেবতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনুরাগ-বিরাগ তাহার বক্ষপঞ্জরে কোন কোলাহল জাগায় না। কোন্ নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাহার এই নির্মম ঔদাসীন্য দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, দুঃখের কোন্ কামারশালায় আগুনে পুড়িয়া হাতুড়ির ঘা খাইয়া তাহার হৃদয় অটল নিঃস্পৃহতার লৌহবর্মাবৃত হইয়াছে তাহার কোন ইঙ্গিত আমরা পাই না। আবার তাহাকে অনেকটা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির মত দেখান হইয়াছে। তাহার কর্মক্ষেত্রের অতি-বিস্তৃত পরিধি, বিধি-ব্যবস্থার অমোঘ শৃঙ্খলা। পুলিশের চোখে ধূলা দিবার অদ্ভুত কৌশল, অপ্রত্যাশিত ভাবে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইবার ঐন্দ্রজালিক শক্তি, অনুচর ও সহকর্মী সংঘের উপর সম্মোহন প্রভাব—এই সমস্তই তাহাকে সাধারণ মানবের বোধগম্যতা ও সহানুভূতির ঊর্ধ্বে অতিমানবের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। আদর্শবাদের শ্বেত দীপ্তি-বিচ্ছুরিত মসৃণ তুষার আস্তরণের নীচে তাহার মানব হৃদয়টি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বিদেশী শাসকের বিষনজরে পড়েছিল, বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। তবে এটিই প্রথম বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ বাংলা উপন্যাস নয়। পথের দাবীর আগে একাধিক বাংলা উপন্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া যায়।

ইংরেজ আমলে প্রথম যে বাংলা উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হয়, সেটি হল 'সোফিয়া বেগম'। লেখক মণীন্দ্রনাথ বসু। রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। তবে তা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা নয়, দূর অতীতের ঘটনা, সেদিক থেকে এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে। ১৯১০ সালের ২৩শে এপ্রিলের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে 'সোফিয়া বেগম' বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসটি ১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই বই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দফতরের ফাইলের মন্তব্য

'Manindra Nath Bose S/O Rajnarayan Basu was the author of the book and it was issued out of the press on the 11th Nov. 1909 but was proscribed by Government notification dated the 23rd April 1910, as being a revolutionary book.[১২]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে কয়েকজন উচ্চাভিলাষী ও নীতিহীন ব্যক্তির চক্রান্তের কথা এই বইয়ে আছে। নিজাম হওয়ার লোভে যুবরাজ বকতিয়ার শাহ নামে নিজামের এক আত্মীয় সদাশিব রাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সদাশিব ছিলেন ঝাঁসির রানীর শত্রু। এই সদাশিব নিজামের বিরুদ্ধে স্যর মিউরোজের কান ভারী করেন। রোজ ছিলেন হায়দরাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট। সদাশিবের মন্ত্রণায় রোজ বিশ্বাস করেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য নিজাম গোপনে দল পাকাচ্ছেন এবং নিজাম অন্যান্য রাজাদেরও উসকানি দিচ্ছেন।

নিজামের প্রধানা বেগমের সহচরী মেহেরবান বকতিয়ারের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রে সামিল হলেন। মেহেরবানকে বেগম করার প্রতিশ্রুতি দিলেন বকতিয়ার।

এই ঘোর দুর্দিনে নিজামের পাশে এসে দাঁড়ালেন কাউন্ট লালি নামে এক ফরাসী। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় তাড়াতাড়ি নিজামকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজামকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হল। ব্রিটিশ রেসিডেন্সি নিজামের বিরুদ্ধে যে সব নথিপত্র পেয়েছিলেন লালি সেই সব কাগজপত্র সংগ্রহ করেন।

নিজাম ও ঝাঁসির রানীকে ব্রিটিশেরা শত্রু হিসাবে গণ্য করে মারাত্মক ভুল করেছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। ব্রিটিশের সাহায্যে গদি দখলের জন্য ওঁদের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার চালানো হয় বলে বলা হয়েছে।

সিপাহীদের অন্যতম নেতা তাঁতিয়া তোপিকে সত্যকার দেশপ্রেমিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ভয়াবহ বিদ্রোহের ভয় দূর করার জন্য তিনি সবকিছুই করেছিলেন। যদিও তিনি নিজেকে সপ্তম পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে নিজাম ঝাঁসির রানীকে একটি পত্র লেখেন বলে অভিযোগ করেন সদাশিব রাও, তিনি সেটি স্যর হিউরোজের সমীপে পেশ করেন। পত্রটি হল : 'আমাদের ভারতকে দখল করে ফিরিঙ্গিরা আমোদ আহ্লাদ করছে—আমরা কি তা বরদাস্ত করতে পারি। যখনই আমরা অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করি, তখনই আমাদের এই অবহেলিত, অসুস্থ শরীরে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে...আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন,—ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে এগিয়ে আসুন। এগিয়ে আসুন আপনাদের নিজেদের দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে, নিজেদের মাতৃভূমির গৌরব ফিরে পাবার জন্য ও জাতীয় মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। আপনারা অনেকের সাহায্য পাবেন। সকলের অন্তরে এখন এই স্বাধীনতা স্পৃহা জেগেছে—সময় হয়েছে এখনই।'

ওই সময়ের ভারতে ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করে লেখক বলেন যে, সরল-হৃদয় নিজাম ব্রিটিশ সরকারের বন্দী হন মিথ্যা অভিযোগে। ব্রিটিশের কূটনৈতিক চালের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ডালহৌসির আমল থেকেই দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি কেড়ে নেবার নতুন নীতি চালু হয়। এই নীতির কবলে পড়ে বহু দেশীয় রাজা রাজ্যহারা হন এবং তাঁরা চরম দুর্দশায় পড়েন এবং বহু রাজমাতা পথের ভিখারী হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপসংহারে লেখক বলেছেন, নিজামের মত একটা ক্ষুদ্র পক্ষীর এই জালে পড়তে বেশী সময় লাগল না।

এই হল সোফিয়া বেগম উপন্যাসের মোটামুটি কাহিনী। মূল উপন্যাসটি আর পাওয়া যায় না। সরকারী নথিপত্রের পাওয়া তথ্য থেকেই ওই কাহিনী পেয়েছি। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে এটি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কিছু কিছু ছাপা হয়। উপন্যাসটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে যে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি বের হয়, তার তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ২৩শে এপ্রিল, ১৯১০ এবং ১৯৮পি।[৩]

'সোফিয়া বেগমে'র পর যে বাংলা উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম 'রাখীকঙ্কন'। ১৯১০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর লেখক শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ। 'রাখীকঙ্কন' কিন্তু পুস্তকাকারে বের হয়েছিল 'সোফিয়া বেগমে'র আগে। 'রাখীকঙ্কন' প্রথম সংস্করণ বের হয় ১৯০৭ সালে। এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৯০৯ সালের জুনে।

রাখীবন্ধন : বরিশালের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে 'রাখীকঙ্কনে'র কাহিনী রচিত। বরিশাল থেকে লেখক নিজেই এই বইটি প্রকাশ করেন। এই দেশাত্মবোধক উপন্যাসটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ বাতিল হয় ১৯৫২ সালে। তার বয়ান

"Government of Bengal, Political Department Notification No. 2466 P. D. dated the 5-9-1910, declaring all copies of the book to be forfeited to **His Majesty is hereby cancelled".**[৪]

এই বিজ্ঞপ্তি ১৯৫২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের। ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে ওই তথ্য পাওয়া যায়। উপন্যাস হিসাবে রাখীকঙ্কনের সার্থকতা অল্পই। এই বইটি সম্পর্কে এক সমালোচকের বক্তব্য 'বরিশালের প্রথম স্বদেশীব্রত গ্রহণ উপলক্ষে দৃঢ়ব্রত যুবক যুবতীদেরকে স্বদেশদ্রোহী আত্মীয়-স্বজন দ্বারাও যে কিরূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল, তাহারই চিত্র এখানে অঙ্কিত হইয়াছে।' মন্তব্য করেছেন প্রবাসীর ১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'মুদ্রারাক্ষস। রাখীকঙ্কন সম্পর্কে আর একজন সাহিত্য সমালোচক বলেছেন

'তবে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে লেখক উপন্যাসের মধ্যে যে একটা গতিবেগ আনতে সক্ষম হয়েছেন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। লেখার গোড়ায় 'আনন্দমঠে'র প্রভাব সুস্পষ্ট। রাখীকঙ্কন বইটির সাহিত্যমূল্য যে একেবারেই নেই একথা বলা চলে না, তবে তার চেয়ে বইটির ঐতিহাসিক মূল্যই বর্তমানে বেশি।'[৫]

যদিও প্রথম খণ্ডের রাখীকঙ্কনে দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটি আর বের হয়নি। তবে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়।

বইটি সম্পর্কে সরকারী রিভিউতে বলা হয়েছে 'প্রথম পর্যায়ের স্বদেশী আন্দোলনের সময় বরিশালের ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই বইয়ের কাহিনী রচিত।' সরকারী নথিপত্রে বইয়ের যেসব অংশ আপত্তিকর বলে গণ্য করা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল

"এই উপন্যাসে আচার্যের একটি চরিত্র আছে। আচার্য এক জায়গায় বলেছেন, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের পর ডাক্তার যদি কোন ব্যক্তির শরীরের অর্ধেকও কেটে নেয়, সে যেমন কিছু বুঝতে পারে না তেমন বণিকের জাত ইংরেজও তাদের মোহিনী শক্তি দিয়ে আমাদের এমন নির্বোধ বানিয়ে রেখেছে যে, আমরা বুঝতে পারছি না যে, তারা এমনকি আমাদের হাড়, মাস ও রক্তও বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে।

"লেখক বলেছেন, আপাত ব্রিটিশ শাসন ভারতের জনগণকে সুখী করেছে বলে দেখা যায়। কিন্তু আসলে এই শাসন দেশে এনেছে তীব্র দারিদ্র, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও ভয়ঙ্কর প্লেগ। এরপর লেখক তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে বাংলার প্রাক্তন গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের অর্ধেক কৃষকই বছরের পর বছর কী করে পেট ভরাবে তাই জানে না।' লেখক তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে ১৮৯৩ সালের মে মাসে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত পাইওনিয়রে যা লেখা হয়েছিল, তার উদ্ধৃতি দেন। 'ব্রিটিশ ভারতের প্রায় ১০ কোটি লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বসবাস করছেন।' ওই কাগজে আরও বলা হয়েছে,—'উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বছরে দুর্ভিক্ষের ইতিহাস আরও মর্মান্তিক, এই ২৫ বছরে আমাদের দেশ ১৮ বার বন্যার কবলে পড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়।'

"লেখক ওই কাগজ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, খাদ্য ও সম্পদের অভাবে কী করে ভারতীয়দের আয়ু ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ১৮৯১ সালের লোকগণনায় যশোহর জেলায় জনসংখ্যা ছিল ২৮,৮৮,৮৭২ জন। কিন্তু ১৯০১ সালের লোকগণনায় দেখা যাচ্ছে যে, লোকসংখ্যা কমেছে ৭৫,৭৩৭ জন। এবং ১৯০১-৪ সালে কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ২,৫৭,৯৯ জন। নদীয়া জেলার চিত্রও অনুরূপই। নাটোরে ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা কমেছে ২২,০৩৬ জন। মালদা, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলাতেও জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার বেড়েছে।

"১৯০১ সালের লোকগণনা অনুসারে ১০ বছরে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি বেশী কমেছে।

"লেখক আরও বলেছেন বিদেশী পণ্যের বিনিময়ে আমাদের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে। আমাদের ভেতর কোন সারবস্তু থাকলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের হাতেই থাকতো। আমরা কুম্ভকারের হাতের মাটির পুতুলের মতই এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছি যে, এই পদাঘাতের পর বেতন হিসাবে যাই দেওয়া হোক না কেন, অদ্ভুত কৌশলে পরক্ষণেই তা আবার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সমস্যার সমাধান হচ্ছে দৈনিক প্রয়োজনে বিদেশী পণ্যের বয়কট করা।"

"লেখক আরও বলেছেন ব্যবসার বিস্তারের জন্য ইংরেজরা (ইস্ট ইন্ডিয়া কোং) ভারতে চরম উৎপীড়ন চালিয়েছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বাংলার তৃতীয় গভর্নর মিঃ ভারলেস্ট এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন

'শুল্ক না দিয়েই ব্যবসা চালানো হয়েছে। এর ফলে সীমাহীন উৎপীড়ন করা হয়েছে। ইংরেজের এজেন্ট বা গোমস্তারা জনগণকে উৎপীড়ন করেই সন্তুষ্ট হত না। সরকারের অধিকার পদদলিত করতো এবং বাধা পেলে নবাবের কর্মচারীদেরও শাস্তি দিত। মীরকাসিমের সঙ্গে যুদ্ধের এটাই কারণ।'

"এই উপন্যাসে লেখক রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন এটা একটা সাধারণ সুতো হলেও এটিই বাঙালীদের রক্ষাকবচ। এবং কয়েকটি শপথ থেকেই এর সৃষ্টি। এই রাখী বাঁধার ফলের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির লাভ লোকসানও জড়িয়ে আছে। তাদের ব্যবসার পক্ষে প্রতিকূল কোন কাজে তারা শুধু অসন্তুষ্টই হবে না, সর্বশক্তি দিয়ে তারা তাতে বাধা দেবে।"

"জোলার তৈরী এক জোড়া ধুতি পরলেই রাখীর উদ্দেশ্য সফল হবে না। এর গভীরে মহৎ উদ্দেশ্য আছে। ৪০ কোটি মানুষের চোখের জলে বঙ্গভঙ্গের শিলান্যাস করে ঈশ্বর ভারতের জাতীয় নবজাগরণের সিঁড়ির প্রথম ধাপ তৈরী করেছেন। ধর্ম এর অবলম্বন, সত্য এর ভিত্তি এবং রাখী এই সবকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।"

এরপর লেখক একজন মুসলিম স্বদেশী যুবকের মুখ দিয়ে বলেছেন

'তুমি হিন্দুদের বিরুদ্ধে, তুমি ভালমন্দ বিচার শক্তি হারিয়েছ। তুমি ভেবেছ সরকারের পক্ষে গিয়ে, তুমি হিন্দুদের তুলনায় উচ্চতর পদে আসীন হবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি। অক্ষমের হাতে ইংরেজরা কোন কাজের দায়িত্ব দেবে না। মুসলিমদের মধ্যে দক্ষ লোক খুবই কম। হিন্দু বিরোধী মনোভাবের দরুন রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই এই অধঃপতনের কারণ।' লেখক বিচারক আমির আলির এই উক্তির উদ্ধৃতি দেন মুসলমানরা এ পর্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনা থেকে দূরে থাকায় তাদের ক্ষতিই হয়েছে।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও অত্যাচারের নগ্নরূপটি এখানে উপন্যাসটির কাহিনীর আড়ালে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন : "লেখক ইংরেজ শাসনের বহুল প্রচারিত চাকচিক্যের আড়ালে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে এবং তার ফলে স্বদেশী বাণিজ্যের ক্রমাবনতি, একটানা দুর্ভিক্ষ মহামারী ও লোকক্ষয় প্রভৃতি সর্বনাশা পরিণতির দিকে এ দেশের লোকেরা কি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এইসব কথাই যুক্তিসহ বর্ণনা করেছেন। লেখকের রচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সংখ্যাতত্ত্বের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে এই সর্বনাশকর পরিণতি এড়াতে হলে দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করতে হবে। লেখক রাখীকঙ্কন উৎসবের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, দেশবাসীকে লাঞ্ছনা সহ্য করেও স্বদেশী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সমাজের বিরোধিতা ও নিরপেক্ষ থাকার মনোভাবেরও তিনি সমালোচনা করেন। প্রাজ্ঞ মুসলমান লেখক আমির আলির বক্তব্য উদ্ধৃতি করে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেই মুসলমান জনসাধারণের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদেরও হিন্দুদের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে, কেননা চতুর ইংরাজ প্রয়োজনবোধে তাদেরও অবহেলা করতে পশ্চাৎপদ হবে না।"[৭]

ভৈরবী চক্র লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে 'ভৈরবী চক্র' নামে একটি নিষিদ্ধ উপন্যাস আছে। ওই লাইব্রেরীর নিষিদ্ধ পুস্তকের যে তালিকা আছে, তাতে এর নম্বর হল : 'পি পি বেন, বি-৬' (অর্থাৎ প্রসক্রাইবড পাবলিকেশান, বেঙ্গলি, বি-৬)। এটি একটি স্বদেশী উপন্যাস। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও (অধুনা ব্রিটিশ লাইব্রেরী) এই বইটি আছে।

বাংলা সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) অ্যাক্টের ১৯ ধারা অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ২৫শে এপ্রিল 'ভৈরবী চক্র' বইটি নিষিদ্ধ হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং বেঙ্গল ১১৮৯৪-১১৯০৪পি বইটি ছদ্মনামে লেখা। সম্ভবত ইংরেজ রাজশক্তির সমালোচনা করার জন্য এই স্বদেশী উপন্যাসের লেখক নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। বইটির লেখক শ্রীকাল ভৈরব। এটি অবশ্যই ছদ্মনাম। তবে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম আছে। হেমন্তকুমার সরকার বইটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

শ্রীকাল ভৈরব সম্ভবত প্রকাশক হেমন্তকুমার সরকারেরই ছদ্মনাম। সুভাষচন্দ্রের বাল্যবন্ধু মুক্তি সংগ্রামী হেমন্তকুমার সুলেখকও ছিলেন। 'সুভাষের সঙ্গে বার বছর,' 'বন্দীর ডায়েরী', 'বিপ্লবের পঞ্চঋষি' প্রভৃতি পুস্তকের তিনি প্রণেতা। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯২১ সাল স্বরাজ সংগ্রামে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে কারাবরণ করেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।কৃষ্ণনগরের অধিবাসী হেমন্তকুমার সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

নতুন দিনের আলো: 'নতুন দিনের আলো' নামে নিষিদ্ধ উপন্যাসের লেখিকা বিমলপ্রতিভা দেবী বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। বইটির মুদ্রাকর যামিনীমোহন ঘোষ, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭,মধু রায় লেন, কলকাতা। প্রকাশক কল্যাণী ভট্টাচার্য, ৬০, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) অ্যাক্ট অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি ১৯৩১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে (নং ৫৪৬ পি ৩-২-১৯৩৯) বলা হয় যে, ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হল। বাংলা সরকারের তৎকালীন সেক্রেটারি এইচ জে টুইমান এই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন।[৮]

'নতুন দিনের আলো' নিষিদ্ধ হবার আগে বইটি নিয়ে অনেক নোট বিনিময় হয়। সরকারী ফাইল-পত্র থেকে তার কিছু উদ্ধার করা গেছে। এই বিষয়টির প্রতি এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, ব্যাপারটি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক পর্যন্ত গড়ায়। তিনি তাঁর মন্তব্যে এই বইটি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষেই মত দেন। প্রথমে ২৪ পরগনার পাবলিক প্রসিকিউটর 'নতুন দিনের আলো' বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি বইটি সম্পর্কে যে নোট দেন, তা তুলে দিলাম :

"আমি মোটামুটি বইটি পড়েছি এবং সবুজ পেন্সিলে দাগ দেওয়া পাতাগুলি আমার পড়া। এই বইটির উদ্দেশ্য হল, কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্য হিসাবে গণ সন্ত্রাসের নীতি প্রচার করা। বইয়ে অঙ্কিত চরিত্রগুলির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ওই লক্ষ্য অভিব্যক্ত হয়েছে। এই বইটি পড়ে, বিশেষ করে এই বইয়ের ৯১, ১০৯, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৩, ২০১, ২১০, ২২৬, ২২৭, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪৬ এবং ২৫০ পাতা পড়লে একজনের এই ধারণা হতে বাধ্য যে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং আইনের শাসন এবং আইন শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ উৎসাহ দানের প্রবণতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত যে সব ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধে আইনের চোখে দোষী, তাদের কাজের অনুমোদন ও প্রশংসা করা এর উদ্দেশ্য।

"এই বইয়ে পুলিশ সম্পর্কে এই ইঙ্গিতও আছে যে, শ্রমিক ও কৃষকদের দমন করার জন্য তারা শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে পুঁজিপতিদের সাহায্য করছে এবং নির্দয়ভাবে তাদের হত্যা করছে। যদিও একথা বলা যেতে পারে, সাধারণভাবে বইটির কাহিনীর লক্ষ্য হচ্ছে, এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শ্রমিক ও কৃষকরাই সমাজের শাসক হবে, কিন্তু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যে পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমেই সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে। লেখকের পরিকল্পনানুসারে এই যে 'আন্দোলন' গড়ে উঠবে, তা কংগ্রেসের অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে যাবে। এবং তার চরম লক্ষ্য হবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটানো।

'আমার মতে এই বইয়ের বিষয়বস্তু ১৯৩২ সালের ভারতীয় প্রেস আইনের (জরুরী ক্ষমতা) ৪(১)(এ)(বি) এবং (এফ) ধারার আওতায় পড়ে। এবং এজন্য ওই আইনের ১৯ ধারানুসারে বাজেয়াপ্ত যোগ্য।'[৯]

তৎকালীন পুলিশ কমিশনার কলসন-ও 'নতুন দিনের আলো' উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে ১৯৩৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পত্র দেন। ২৪ পরগনার পাবলিক প্রসিকিউটরের ওই সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি লেখেন

'মহাশয়, প্রাক্তন রাজবন্দী ডঃ চারুচন্দ্র ব্যানার্জির স্ত্রী প্রাক্তন রাজবন্দী বিমলপ্রতিভা দেবীর বাংলা ভাষায় মুদ্রিত একটি বইয়ের একটি কপি পাঠাচ্ছি। এ বইটি আমাদের বিভাগের নজরে এসেছে। এই বই সম্পর্কে ২৪ পরগনা পাবলিক প্রসিকিউটরের অভিমতের একটি কপিও এর সঙ্গে দেওয়া হল।

এই অভিমত অনুসারে সংশ্লিষ্ট বইটির বিষয়বস্ত ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এবং জরুরী ক্ষমতা) আইনের ৪(১১)(এ) (বি) এবং (এফ) ধারার আওতায় পড়ে। উল্লিখিত আইনের ১৯ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারির জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।'[১০]

সরকার এই বইটিকে বিপজ্জনক মনে করেছিল, তাই এর দীর্ঘ রিভিয়ু ফাইলে মন্তব্য হয়। রিভিয়ুতে বলা হয়েছে এই বইয়ে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

পুলিশ কমিশনার এই বই সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তার সারাংশ দিলাম

বিমলপ্রতিভা দেবীর বাংলা উপন্যাস 'নতুন দিনের আলো'তে রাজনীতির বিভিন্ন ধারাগুলি নিয়ে বিশদভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং কমিউনিজমের প্রসঙ্গও এসেছে, শেষোক্ত ধারাটির প্রতি তাঁর সহানুভূতিও প্রকাশ পেয়েছে। ধীরেশ এবং তার ভাই নৃপেশ উচ্চ-শিক্ষার জন্য ইউরোপে গিয়েছিল। প্রথম জন রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং দ্বিতীয় জন হন চিকিৎসক। শিক্ষাশেষে তাঁরা দু'জনেই ফিরে আসেন ভারতে। ধীরেশের স্ত্রী সুরূপা ছিলেন অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, কিন্তু আন্তরিক উৎসাহ আর নিরলস চেষ্টায় তিনি অনেক কিছুই শিখেছিলেন। চলতি রাজনীতির ধ্যান-ধারণাও তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করত। তাঁরা যে ধনতান্ত্রিক শোষণের অসহায় শিকার, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। স্বামী ধীরেশের সাহায্য নিয়ে তিনি তাই শ্রমিকদের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

একজন আদর্শবাদী রাজনীতিবিশারদ হলেন রমেনদা —সাম্যবাদী রীতিনীতি এঁর নখদর্পণে, ইনি হলেন এঁদের পথপ্রদর্শক। ওদের অবশ্য সাহায্য করতেন আরও দুজন। একজন হলেন নৃপেশ, অন্যজন একজন শিক্ষিতা নারী কর্মী, নাম তার কৃষ্ণা। এরা দুজনেই পরস্পরকে ভালবাসত, কেবল তাই নয়, তাদের এক ধরনের বিবাহ হয়েছিল, যদিও সে বিবাহে ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। এরা সকলেই ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, শ্রমিকদের ধর্মঘটে উস্কানি দেয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এবং এরই জন্য কৃষ্ণা ছাড়া আর সবাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, জেল খাটল এবং শেষে মুক্তিও পেল। এই গল্প কাঠামোর মধ্যে দুটি করুণ কাহিনী বিবৃতি হয়েছে—একটি কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে শান্তা এবং সুধা নামের দুটি নারী কর্মীর কাহিনী, এবং অন্যটিতে রয়েছে পিলে একং কমলার কাহিনী, এদের খাদ্য জোটে না—এরা অসুস্থও।

'নতুন দিনের আলো'র কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সরকারী ফাইল থেকে পাওয়া যায়

"দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য 'নতুন দিনের আলো'য় সশস্ত্র গণ আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়েছে। ইউরোপে উচ্চ শিক্ষার পর ধীরেশ ও নৃপেশ দেশে ফিরেছেন। ওঁরা দুই ভাই। একজন বাংলার বাইরে অধ্যাপনা করেন। আর একজন কলকাতার কাছে একটা জুটমিলের ডাক্তার। ধীরেশের স্ত্রী সুরূপা শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার আদর্শে গঠিত একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী। স্বামীর অনুপস্থিতির সময় সুরূপা দলের নেতা রমেনের কথায় সমাজবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। রমেন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা। ইউরোপ ও রাশিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ের পর তিনি নতুন আদর্শে নতুন দল গঠন করেন। যে দলের উদ্দেশ্য হল দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সুগঠিত করা। ভারতের নানা রাজ্যে ওই দলের সভ্য-সভ্যারা আছেন। শান্তনু, কৃষ্ণা, মনোহরজী, বিনয়, দেবেন, তামসী, জংলা, সুধা প্রভৃতি দলের নামকরা কর্মী। কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্যে নতুন সমাজ গড়ে তোলাই এই দলের লক্ষ্য। অসহায় নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে তারা প্রথমে মিল ও কল কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারে নামলেন ও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তুললেন। তাদের অর্থনৈতিক দাবির সমর্থনে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট সংগঠিত হল। হঠাৎ ধরপাকড় শুরু হল। অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হলেন। বাংলায় ধীরেশ, রমেন ও বিনয় ধৃত হলেন। নৃপেশকে গ্রেফতার করা হল মাদ্রাজে। শান্তা ও দেবেন আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। রেল কুলিদের মধ্যে ধর্মঘট সংগঠনের সময় জংলা পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন। কৃষ্ণা, সুধা ও তামসী গোপনে কাজ চালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে নৃপেশের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে হয়েছে। শান্তনু আমেরিকা থেকে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। মাদ্রাজে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে এবার দলের প্রচার ও সংগঠন চললো। নৃপেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার দলের কাজে মন দিলেন।

"জেল থেকে কৃষ্ণাকে লেখা সুরূপার একটি চিঠি দিয়ে কাহিনীর শেষ। রবীন্দ্রনাথ-এর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তাতে বলা হয়েছে যে, জীবন উৎসর্গ না করলে মহৎ আদর্শ সফল হয় না। অত্যাচারের আগুন মানবতাকে ভস্মে পরিণত করেছে। সুরূপার বিশ্বাস, ওই ভস্মের চাপা আগুনে নতুন আলো জ্বলে উঠবে—নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। দেশের প্রয়োজন আলো আরও আলো"[১১] (অনূদিত)।

কাহিনী বলার সময় লেখিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের কথা আলোচনা করেছেন নানা চরিত্রের মুখ দিয়ে।

বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ফাইলে 'নতুন দিনের আলো'র একটি রিভিয়ুয়ে আছে, তাতে বইটির কয়েকটি অংশ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আপত্তিকর বলে বইটির নিম্নলিখিত অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পৃ ১৩৩-১৩৬:

সুরূপা বলছে—'দেবীবাবু, আপনাদের হিংসা ও অহিংসার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার আছে...জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে ধ্বংস করে আপনি তাদেরকে ভুলিয়েছেন তাদের আত্মমর্যাদা-বোধ। শাসনকারীরা এবং শাসকগোষ্ঠী যদি জানে যে, সংগ্রামীরা বরং মৃত্যুবরণ করবে তবু অস্ত্র হাতে নেবে না, এই যদি তাদের ধর্ম ও নীতি হয়—তাহলে শত্রুপক্ষ মেসিনগান চালিয়ে রক্তের বান বহাবে। এই ধ্বংসের খেলা আন্দোলনে যবনিকা আনবে। অস্ত্র ফেলে মেষশাবকের মত মরার জন্য তারা আর এগিয়ে আসবে না। বরং তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের বলবে দেশে ফিরে যেতে। এদেশে এ ধরনের উৎপীড়ন বারবার হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো দুর্বল দল আন্দোলন করার সময় প্রথমেই অস্ত্র হাতে নেবে না। প্রথম পদক্ষেপ হবে, সভা সমিতি ও মিছিল সংগঠন। কিন্তু সেজন্য কি আমরা প্রতিরোধের মুখেও অস্ত্র হাতে নেওয়া থেকে বিরত থাকবো এবং ধ্বংসের মুখে মেষপালের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষকে ঠেলে দিয়ে, অহিংসার জয় দেখার জন্য আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকবো। মেষপালের উপর যখন বাঘ পড়ে, তারা তখন একবারের জন্যও সিং নাড়ে না, এটাও ঠিক তেমনই। একেই তো বলে অহিংসা। গোটা জাতটা মেষপালের অনুকরণ করবে, তবু মানুষের মতো লড়াই করবে না।
দেবীবাবু নিরস্ত্র অহিংস মানুষের উপর সশস্ত্র আক্রমণ হানলে ইংরেজদের কি বিশ্বের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? গোটা জাতটাকে ধ্বংস করে তারা কি গাছ ও মাটির উপর রাজত্ব করবে?
সুরূপা শোষণের কথা বলবেন না, লিগ অব্ নেশন একটা তামাশা ছাড়া কিছু নয়। আজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য সমস্ত নৈতিক নীতি বিসর্জন দিচ্ছে। কার কাছ থেকে জবাব চাইবে, আর কেইবা বাধা দেবে?
দেবীবাবু তোমাদের হাতে কি অস্ত্রশস্ত্র আছে? সুরূপা জোরের সঙ্গে বলল দেখছি, অস্ত্র পাওয়ার প্রশ্নটা প্রথম থেকেই অহিংস আন্দোলনের মাথায় চেপেছে। এর কথা বরং একটু পরে ভাবুন। প্রথমে মিছিল সভা-সমিতির মাধ্যমে জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে জাগিয়ে তুলুন। পরে যখন সুযোগ আসবে, তখন অস্ত্রের জন্য মাথা ঘামাতে হবে না—রাশিয়ায় কি ঘটেছে আপনারা কি দেখেননি। সেখানে শ্রমিক নেতারা প্রথম থেকেই অস্ত্র নেয়নি। শুধু সভা-সমিতি ও মিছিল করার জন্য তাদের কী অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে,তীব্র কারা যন্ত্রণা এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও। উৎপীড়নের শাসনের অবসান ঘটানো দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যখন বিপ্লবী নেতারা এগিয়ে এলেন, তখন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁরা হটিয়ে দিলেন উৎপীড়কদের। সেদিন যদি নেতারা জনগণকে এই বলে নিরুৎসাহিত করতেন, নীরবে অত্যাচার সহ্য করে সংগ্রামী মনোবল ত্যাগ করো, তাহলে রাশিয়ার ইতিহাস আজ অন্যরকম হতো। সৈন্যদের আত্মীয়স্বজনরা হাতে অস্ত্র নিয়েছিল এবং তাদের সেই অস্ত্র দিয়েছিল জারের সৈন্যরাই, শ্রমিকরা শুধু ধর্মঘট ঘোষণা করে কলকারখানা থেকে বেরিয়েই আসেনি, লড়াই করার জন্য তারা কলকারখানা থেকে অস্ত্রও নিয়ে আসে[১২] (অনূদিত)।

এছাড়া নিম্নের অংশগুলিও আপত্তিকর বলে রিভিয়্যু বলা হয়
পৃষ্ঠা ১৫৩, ২৩৪-২৩৫, ২৪৮-২৪৯, ২৫৭-২৬০, ২৬১-২৬২।

পুলিশ কমিশনারের ওই রিভিয়্যুর ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র বিভাগে এই বইটি নিয়ে বিবেচনা হয়। এ সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে একজন পদস্থ আমলা এই নোট দেন

"The review submitted by C. P. may be seen. The P.P. consider that the bookcontainsmatter which come within mischief of 4(1) (a) (b) & (F) of I.P. (E.P) Act, 1931 L.R. & the Advocate General may at once be consulted as to whether the book should be proscribed under sec-19 of the said Act."[১২]

তারপর 'নতুন দিনের আলো' বইটি আপত্তিকর কিনা, তা পরীক্ষার জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরীতে পাঠানোর প্রস্তাব হয়

"The note on the previous page was based on precedent of 1935. It appears from recent precedent case put up below that the present practice is to consult the Librarian, Bengal Library in the first instance in order to be satisfied about the correctness of the review. This may there be sent to him first with a request to state whether the review of the translation of the portion of the book submitted by C.P. calcutta may be accepted as authorised views translation for consideration the question of proscription of the book."[১৩]

১১-১-১৩৩৯ তারিখে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান এ কে দত্তগুপ্তের নোট

'A copy of our own review of the book with a fuller and more accurate translation of the objectionable passages is put up below.'

এর পর স্বরাষ্ট্র বিভাগের (১৩-১-৩৯ তারিখে) অফিসার লেখেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"Note from P may be seen. L.R. Advocate General may now be consulted as to whether the book should be proscribed under. Sec. 19 of the IP (E.P.) Act, 1931."

এরপর বইটি সম্পর্কে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সের অভিমত নেওয়া হয়, তিনি 'নতুন দিনের আলো' বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে মত দেন।

'I agree that it comes under 4(b)(d)(f)(n) of The Ip (E.P.) act 1931 and **that action can be taken u/s 19. Advocate general will be consulted before action is taken. It is prepared to do so.'**
Sd. 14 Jan. 1939[১৬]

এরপর সম্ভবত হোম সেক্রেটারি বইটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে নোট দেন

'I support the recommendation that the book be proscribed u/s 19 of the Indian Press Emergency Act...' Sd 14.1.29 [১৭]

এর বইটি সম্পর্কে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের মত নেওয়া হয়। তিনি লেখেন

"The diatribes against the Congress are well deserved but the book certainly to be proscribed I agree with the orders proposed to be passed." F. Hug. 24/1[১৮]

এরপর বইটি 'নুতন দিনের আলো' বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি হয়—৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯।

পথের দাবী

বাংলার দুই প্রধান ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাস রচনা করেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবন ছাড়া সাহিত্যেও প্রেরণা দিয়েছিল। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমিতে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি লিখেছেন। বঙ্কিমের কাল-ভূমিকা অবশ্য সমসাময়িক নয়। অপরদিকে সমসাময়িক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিত্তিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হলেও এখানে একথা প্রমাণিত হয় যে, বৈপ্লবিক উন্মাদনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের দুজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্থায়ী সাহিত্যের উপাদান ও প্রেরণা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সশস্ত্র আন্দোলন সম্পর্কে খুব সশ্রদ্ধ ছিলেন না। শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী'তে বিপ্লব দর্শনের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। ১৩২৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৩৩৩ সালের বৈশাখে। বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বের হত এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তা পরিচালনা করতেন। 'পথের দাবী' বই আকারে বের হলে যে বাজেয়াপ্ত হবে, সে আশঙ্কা অনেকেরই ছিল। তাই এই বইটি প্রকাশ করতে বড় বড় প্রকাশকরা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই এর প্রকাশক হলেন।

'পথের দাবী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৩৩ বা আগস্ট ৩১, ১৯২৬ সাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৬, দাম তিন টাকা। মুদ্রাকর : সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কটন প্রেস, ৫৭ হ্যারিসন রোড, কলকাতা, প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৭৭, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড, ভবানীপুর, কলকাতা।

এই বইটির প্রকাশ সম্পর্কে উমাপ্রসাদ লিখেছেন "১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৬)। 'পথের দাবী' বই আকারে তার আগের দিন বার হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেই রাত্রিতে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে ছিলেন। দুজনে সারারাত জেগেছি। কাছে বসে কত গল্প করেছি, কত গল্প শুনেছি।"

'পথের দাবী' ১৩৩৩ সনে বই আকারে বের হবার পর বাংলা সরকারের 'year book'-এ বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে লেখা হয়েছিল **'the most powerful of sedition in almost every page of the book.'**

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করে পুলিশ কমিশনার ১৯২৬ সালের ২৩ নভেম্বর চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখলেন। চিঠির বয়ান 'বাংলার সুপরিচিত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের লেখা 'পথের দাবী' বইটি থেকে আপত্তিকর অনুচ্ছেদগুলি বিবেচনার এবং সরকারি আদেশের জন্য আমি পেশ করছি। বইটি ৫৭, হ্যারিসন রোডের কটন প্রেস থেকে সত্যকিঙ্কর ব্যানার্জি কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৭৭, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর কলকাতা থেকে উমাপ্রসাদ মুখার্জি কর্তৃক প্রকাশিত। কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামতের জন্য বইটির একটি মুদ্রিত কপি তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এবং তিনি এই অভিমত জানিয়েছেন যে, বইটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এর লেখক এবং মুদ্রাকরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। দেখার পর এই অনুচ্ছেদটি অনুগ্রহ করে ফিরত দেবেন।'[১৮]

চীফ সেক্রেটারিও পথের দাবীকে বিষময় বলে মন্তব্য করেন। ১৯২৬ সালের ২৫ নভেম্বর এই বইটি সম্পর্কে তিনি লেখেন 'এটা একটা বিষাক্ত সৃষ্টি। তবে যেহেতু ৯৯এ ধারা অনুসারে আদেশ জারি হলে হাইকোর্টে বৈধতার প্রশ্ন হতে পারে, তাই আমি মনে করি যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে বইটি অভিযুক্ত করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের উচিত অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত নেওয়া।'[১৯]

এরপর অ্যাডভোকেট জেনারেলের মত নেওয়া হয়। তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯২৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর এই বইটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বিস্তৃত রিপোর্ট দেন। তাতে তিনি বলেন যে, এই বই দেশদ্রোহকর এবং বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য। তিনি লেখেন

'আমি যত্ন সহকারে 'পথের দাবী' বইটি পড়েছি। এর লেখক বাংলার প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের একজন। তাঁর আগের উপন্যাসগুলি সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা। আমি যতদূর জানি এই বইয়েই প্রথম তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে লিখেছেন। উপন্যাস হিসাবে বইটি শিল্পগুণসম্পন্ন নয়। তবে এতে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক গুণও আছে। জোরের সঙ্গে ও দক্ষতা সহকারে কিছু রাজনৈতিক মতবাদ এতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বইটির গোড়ায় যে সতর্কতা দেখা যায় বইয়ের শেষে তা বজায় রাখা হয়নি।'

বইটির 'পথের দাবী' নামের ব্যাখ্যা আছে ১২৭ পাতায়। যার মানে বাধাহীন পথের অধিকার। '...ওদের (কুলি মজুরদের) ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এবং এই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যই আমার পথের দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয় হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরকাল পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ।...মানুষের চলার পথ মানুষ কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।'

'...মহামানবের মুক্তিসাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে এইত আমার স্বপ্ন। দীন দরিদ্রের জন্য বাধাহীন চলার সৃষ্টিই এই 'পথের দাবী' সংস্থার প্রতিজ্ঞা, যেকোন মূল্যে এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যই এই উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার বা সব্যসাচী 'পথের দাবী' গড়ে তোলেন। সুমিত্রা এর সভানেত্রী এবং ভারতী সম্পাদক। নায়ক এখানে ফেরার বিপ্লবী, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

তারপর রিপোর্টে উপন্যাসের তিনটি মূল ভাবধারার কথা বলা হয়েছে: প্রথম ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বিরোধ—ভারতীয়রা আদালতে সুবিচার পায় না। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় মিল মালিকদের অত্যাচার ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায়কে শোষণ করে চরম দারিদ্রের মধ্যে এনেছে। তৃতীয়ত, এদেশে ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পরিচালিত। ফলে এখানকার মানুষের উপর অমানুষিক শোষণ, এবং এদের চরম দারিদ্র ও অসহায় অবস্থার মধ্যে এনেছে। বইটির শেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নায়ক সমস্ত সংযম বিসর্জন দেন। এবং নির্ভেজাল বলশেভিকদের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, খ্রীশ্চান সভ্যতা ও পশ্চিমী সভ্যতার বিনাশ সাধনই তাঁর লক্ষ্য।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এই বইয়ের অনেক অনুচ্ছেদ আছে। সেখানে লেখক আইনকে এড়াতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নায়ক বলছেন, রাজঅফিসারদের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করতে চান না এবং এটা ভুল ধারণা যে, তাদের আঘাত হানা মানেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা, যে রাজশক্তির তিনি বিনাশ চান। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, রাজশক্তির অর্থ হল দারিদ্র্যের উপর সম্পদের, দুর্বলতার ওপর ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব। তাঁর মতে এটাই হল পশ্চিমী সভ্যতার ভিত্তি। এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব নয়।

আবার অনেক অনুচ্ছেদে তিনি ব্রিটিশ ভারতের সরকার থেকে ইংরেজ জনগণকে পৃথক করে দেখেছেন। কিন্তু বইটি পড়লে সামগ্রিকভাবে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, লেখক তার আসল উদ্দেশ্যটি ঢাকতে পারেননি। যা হল ভারতে ইংরেজ-স্থাপিত সরকারের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জাগানো।

আদালতের অবিচার সম্পর্কে 'পথের দাবী'র সভ্য রামদাস বলেছেন "একজন সাচ্চা মানুষ জানে যে, হালদার ও যোশেফের মধ্যে মামলা হলে ফল কী হবে"। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে ব্রিটিশ ভারতে আদালতে ভারতীয়রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুবিচার পায় না।

সমিতির আর একজন সদস্য অপূর্ব জোরের সঙ্গে বলেছেন 'মিথ্যা! ইংরেজ শাসনে মিথ্যা অভিযোগে এ পর্যন্ত কাউকেই জেলে পাঠানো হয়নি? কেন, সমগ্র প্রশাসনের মিথ্যার উপরই ভিত্তি।'

ভারতের কথা বলতে গিয়ে সুমিত্রা বলেছে, 'যে দেশে সরকার মানে ব্রিটিশ বণিক, এবং যেখানে সারাদেশের রক্ত শুষে নেবার জন্য এই বিরাট শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে…'

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সমগ্র পুস্তকে এই ধরনের মনোভাবের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে, বইয়ে যদিও পুঁজিবাদের কুফল, ইংরেজ জনগণের ঔদ্ধত্যের বিবরণ প্রভৃতি আছে তবে এর মূল লক্ষ্য ভারতীয় জনগণের দুর্দশার বিশদ বিবরণ দেওয়া। এখানে ব্রিটিশের বর্মাজয়ের ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ আছে। এবং বলা হয়েছে ব্রিটিশ জনগণের কল্যাণেই সেখানে সরকার গঠন করা হয়েছে। আর আছে ইউরোপীয় মিল মালিকদের কথা, এদেশে সরকার মানেই ব্রিটিশ বণিক এই বলে যা মন্তব্য আছে তা সরকারের পক্ষে অবমাননাকর।

এরপর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'বইয়ের ২৪৩ পাতায় আসলে মন্তব্য সরকারের বিরুদ্ধেই, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়। কারণ গ্রামের অসহায় মানুষদের ম্যাজিস্ট্রেট অস্ত্র নেবার অনুমতি না দেওয়াতেই ওই ট্রাজেডি ঘটে। এই ধরনের মন্তব্য আরো অনেক আছে বই জুড়ে, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩২৩ ও ৩২৮ পাতায়। ৩৪১-৩৪৬ পাতায় যেসব আপত্তিকর কথা আছে, সেগুলি ইউরোপীয় সভ্যতা নয়। সরকারের বিরুদ্ধেও বর্তায়। এখানে ব্রিটিশ বণিক ও সরকারকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। আবার ৪১৫ পাতায় আছে এদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার কথা।' রিপোর্টের পরিশেষে বলা হয়েছে, এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। পশ্চিমী শাসন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ও দ্রুত মুক্তি পাবার জন্য উপন্যাসের নায়ক বিপ্লবের কথা বলেছেন। এখানে কোনোই সন্দেহ থাকে না যে, এই বইয়ের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করা। এই বইয়ের সমিতি ভেঙ্গে দেবার কথা, বিপ্লবের উপযুক্ত সময় আসেনি—এসব যে আছে এগুলি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে—একথা বলে রিপোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই বইয়ে, সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেগ করার অপচেষ্টা যথেষ্টভাবে পরিষ্কার। সব শেষে বলা হয়েছে, 'আমি মনে করি এই বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারার আওতায় পড়ে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯-এ ধারানুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার যোগ্য।'

এরপরে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি, ১৯২৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর লিখেছেন

"The Advocate General's opinion may be read. The Government of Bengal in a letter in May 1925 in connection with Revolutionary Press propagandas in Bengal declared its intention to prosecute (the press)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

without regard to the probable success of the case whenever it appears to him that a definite offence has been committed. After perusing the letter I am satisfied that the Governor in Council was then considering really only the daily press periodicals. There is no such declaration about books. In the circumstance and in view of the Advocate-General's opinion I am inclined to proscribe this book "Pather Dabi" under section 99A CPC and not start a prosecution under section 124A IPC. The success of a prosecution is to my mind open to question not that I disagree with the Advocate General but because in a criminal case the court might give the accused the benefit of doubt. In a case under section 99B, supporting the order under section 99A is objected to, the proceeding will be before a Special Bench of three judges and no question of punishment of the author and the printer will arise and cloud the issue whether such a publication contains seditious matter." পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে, অ্যাডভোকেট জেনারেলের অভিমত এবং চীফ সেক্রেটারির এই মন্তব্যের পর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হতে আর বিলম্ব হল না। কিছুদিন পরই পথের দাবী বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি বের হল। ওই বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৯২৭ সালের ৪ জানুয়ারি। তবে ক্যালকাটা গেজেটে এটি ছাপা হয় কদিন পর—১৩ই জানুয়ারি ১৯২৭।

'In exercise of the power conferred by section 99A of the code of criminal procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal amendment Act 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled 'Pather Dabi' written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay, printed by Satya Kinkar Bandopadhyay,at cotton press,51,Harrison Road Calcutta and published by Sri Umaprosad Mukhopadhyay on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the government established by Law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code.'[১০]

'পথের দাবী' নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ হয়। আইনসভায় বাগবিতণ্ডা চলে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও সরকারের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়।

বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য মহারাজা ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় ১৯২৭ সালের ১৬ জানুয়ারি, চীফ সেক্রেটারি সাহেবকে লিখেছেন

"I find that the book 'Pather Dabi' by Sarat Chandra Chatterjee has been proscribed by governments. Could you kindly let me have a copy of the book to enable me to read it and let me know which portions have found objectionable ? If possible, I should like to see the police report on the book with Moberly's permission."

পথের দাবী পড়ে ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় এই বইটি বাজেয়াপ্ত করার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। এ সম্পর্কে ১৯২৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি সরকারের কাছে যে চিঠিটি লেখেন তার বয়ান সরকারী ফাইল থেকে পাওয়া গেছে। সেই পত্র

'Many Thanks. I have read the book 'Pather Dabi' and I must confess that I am greatly dissappointed in this production of its author who is a popular novelist. This book has hardly any literery or artistic merit. The author has made no secret, or has failed in doing so in preaching the doctrines of (1) rank sedition, (2) revolutionary ideals, (3) Labour strikes, (4) hatred against the English People and christianity (5)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Bolshevism and (6) disaffection against the Government. The Advocate General's criticisms are quite correct and its proscription is fully justified.

Apart from its political effect this book deals with matters that are idealistically quite repugnant to the traditions and sentiments of the Bengali People. To me it appears that the author has not been able to assimilate the teachingsof Western Culture which scientifically applied to the condition prevailing in the certain section of the Bengali people could produce that situation in which a moral ideal could be set up by the exposure of the unreal and nefarious. In other words, his whole production is crude, and to be mild non-moral. The teachings are indefinite and lead to nowhere while the preachings are loud and vehement in respect of a social upheaval and therefore very dangerous.

The entire idea of the book is one of diruption and not of construction.

I have an idea that this story first appeared as a serial in a Bengali monthly journal, which I do not, has been proscribed.[১১]

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে আইনসভায় প্রশ্নবানে সরকার নাজেহাল হল। সুভাষচন্দ্র, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একাধিক প্রশ্ন তোলেন। ১৯২৭ সালের ২৩শে আগস্ট কাউন্সিলে প্রশ্ন করেন হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

a) Will the Hon'able Member in charge of the political Dept be pleased to state whether any legal opinion was consulted before issuing the Notification No. 103 p, dated the 4th January, 1927, forfeiting all copies of the Bengali Novel 'Pather Dabi' written by Srijut Sarat Chandra Chattapadhyay.
b) If so, whose opinion was consulted?
c) Will the Hon'ble member be pleased to state whether the Advocate-General is consulted in such case?
b) If the answar to (c) is in the negative, what are the reasons therefore ?[১২]

এর জবাব দেন মোবার্লি। তিনি তখন রাজনৈতিক দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন।

"a) Yes.
b), (c), (d) Government are not prepared to give this information."[১৩]

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে সুভাষচন্দ্রও কাউন্সিলে প্রশ্ন করেন, ১৯২৭ সালের ২৫ আগস্ট।

a) Will the Hon'ble Member in charge of the political Dept. be pleased to state why the novel 'Pather Dabi' of SJ Sarat Chandra Chatterje has been proscribed?
b) Are the Government prepared to withdraw the order?
c) If the answar to (b) is in the negative, are the Government prepared to refer the book for opinion to a Board of litterateurs of international fame?[১৪]

এর জবাবে মোবার্লি জানান যে, সরকার 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত নন।

a) Because it appeared to Govt. to contain seditious matter.
b) No.
c) No.[১৫]

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সরকারকে ধিক্কার দেওয়া হয়। 'আত্মশক্তি' ১৯২৭ সালে ১৪ জানুয়ারি লেখে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"গত বুধবার সরকার এক ঘোষণাপত্রে জানাইছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস 'পথের দাবী' প্রচার আজ হইতে বন্ধ হইল এবং উহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইল কারণ ঐ ধারায় বর্ণিত রাজদ্রোহ করিবার ইচ্ছা পাঠকের মনে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে।

"পথের দাবী' দুই বৎসরের অধিককাল হইল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তখন উহা পাঠে রাজদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা হয় নাই। তারপর আজ প্রায় পাঁচ মাস হইল উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—এতদিন এ রাজদ্রোহের সম্ভাবনা হয় নাই; আজ হঠাৎ পৌষের শীতার্ত ঘন ঘটাচ্ছন্ন মলিন প্রভাতে চা পান করিতে করিতে ভারতে রাজদ্রোহ সংরোধের একমাত্র কর্তা শ্রীল শ্রীযুক্ত লাটসাহেব চিন্তা করিয়া দেখিলেন 'পথের দাবীতে' রাজদ্রোহের বীজ রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ পৌষের প্রভাতে কেন, চৈত্রের নিশাশেষেও যদি এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেন তাহা হইলে আপত্তির কথা ছিল না। কিন্তু সপারিষদ লাটসাহেব গৌরচন্দ্র আজ তিন বৎসর পর বহাল তবিয়তে থাকিয়াও যদি এরূপ দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং লজ্জার মাথা খাইয়া যদি তাহা গেজেট প্রকাশিত করিয়া থাকেন—তাহা হইলে যত না ভাবিত হইতে হয় গৌরচন্দ্রের জন্য তদপেক্ষা অধিক ভাবিতে হয় তাঁহার হস্ত, পদ, কর্ণ, চক্ষু সদৃশ গৌর আমলকে কালমাণিক বর্ণ ছটাচ্ছন্ন তাঁহার কর্মচারীদের জন্য। বৎসরের পর বৎসর যাহাদের রাজদ্রোহের বীজ অনুসন্ধান করিতে হয়রান হইতে হয় তাহাদের উপরই নির্ভর করে বাংলার শাসন ও প্রজাপালন। নমঃ গৌরচন্দ্রায়!

"শরৎচন্দ্র সত্যিই বলিয়াছেন আমাদের এ পরাধীন দেশে সাহিত্যের সম্যক স্ফূর্তি ও প্রকাশ সম্ভব নহে। সরকারের হস্তে তাঁহার এই প্রথম পরাজয়ে—কিংবা বিজয়ে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার লেখনী হইতে আরও দাবী প্রকাশিত হউক ইহাই আকাঙ্ক্ষা।"

বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র ফরোয়ার্ড পত্রিকা (সম্পাদক সুবিখ্যাত সত্যরঞ্জন বক্সী; সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) লেখেন

"সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে নিখুঁত দর্পণ বলে বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'পথের দাবী' আমাদের সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। এবং এই বইটি নিষিদ্ধ হওয়ায় আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পর্যায়, আমরা বাংলা বিপ্লব আন্দোলনের কথাই বলছি, কেবলমাত্র এই উপন্যাসেই স্থান পেয়েছে। শিল্প হিসাবেও বাংলা উপন্যাসের মধ্যে পথের দাবীর স্থান উঁচুতে হবে। বাংলার পাঠকরা তাদের সবচেয়ে প্রিয় লেখকের এই মহান সৃষ্টি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হবেন বলেই মনে হয়" (অনূদিত)।

'পথের দাবীর' উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯২৭ সালের ১৪ জানুয়ারি মন্তব্য করেছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সেই মন্তব্যের ইংরেজী অনুবাদ দপ্তরে রেখে দিয়েছে।

'We have nowhere found the bacilli of sedition lurking within the pages of this book. We want to know whether the Government consulted any expert in Bengali literature before they passed the order of proscription, or whether they relied merely on the report of the C.I.D. We hope our countrymen will not silently submit to this unjustifiable order of the government.'[২৬]

'অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৯২৭ সালের ১৫ জানুয়ারি লেখে যে, 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ায় আমরা বিস্মিত হইনি। এটা হৃদয়হীন এক আমলাতন্ত্রের সেই নীতিরই ফল যে নীতি অনুসারে বাংলার দু'শ যুবককে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে।

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হবার পর 'বেঙ্গলি' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে। ১৯২৭ সালের ১৫ জানুয়ারিতে বেঙ্গলিতে লেখা হয় যে,—এটা যদি উন্নত শিল্পকর্ম হয় তবে এ বই চিরন্তন হবেই। তা না হলে এ বইয়ের স্বাভাবিকভাবেই বিনাশ ঘটবে।

'পথের দাবী' বের হবার পর সমসাময়িক পত্রগুলিতে এর বিরূপ সমালোচনা বের হয়, তার কিছু কিছু সরকারী ফাইলে রক্ষিত। "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় (১৩৩৩-এর অগ্রহায়ণ ও পৌষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংখ্যায়) রাজেন্দ্রলাল আচার্য 'পথের দাবী'র যে দীর্ঘ সমালোচনা করেন, তাতে এর কোন প্রশংসা নেই। 'মানসী ও মর্মবাণী'র মাঘ সংখ্যায় লেখা হয়েছে পথের দাবী পুস্তক গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, উহার সমালোচনার শেষাংশ প্রকাশিত হইল না।"

"অর্চনা" পত্রিকায় কেশবচন্দ্র গুপ্ত 'পথের দাবী'র দীর্ঘ কটু সমালোচনা করেন ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনে। তা হল

"প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এক কলমের খোঁচায় কোন সাহিত্যকে, দার্শনিক কবির স্বাধীন চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার বহুদিন সরকার এদেশে নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যেকোন সন্দর্ভ বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা এখন আইনমূলক রাজশক্তির অন্তর্ভুক্ত। যাঁদের হাতে এই রাজ অধিকার ন্যস্ত, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা, বিচারক্ষমতা ও কল্পনার সাহিত্যিকের কল্পনা মুখাপেক্ষী। ইহার অনিবার্য ফলে হয় এক পক্ষের কল্পনা শৃঙ্খলাবদ্ধ, অপর পক্ষের কল্পনা উদ্দাম ও অসীম।

"শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। কথাসাহিত্যের তিনি "রথী" বলিয়া বর্ণিত হন। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গীতে বিশেষত্ব আছে। কাজেই তাঁহার পাকা হাতের লেখা পড়িবার জন্য বাঙ্গালী পাঠকের এত আগ্রহ। তাঁহার নিগ্রহের কথা তাই সকল কণ্ঠে এবং এই নিগ্রহ শরৎচন্দ্রকে আরও জনপ্রিয় করিয়াছে।

"সাহিত্যের দিক হইতে ধীরভাবে দেখিলে আমার মনে হয় যে 'পথের দাবী' লোপ পাইয়া শরৎচন্দ্রকে রাহুমুক্ত করিয়াছে। কারণ, এই পুস্তকের লেখক যদি "রথী" শরৎচন্দ্র না হইতেন, লোকে 'পথের দাবী'কে উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস বলিত না।...

"গল্পের নায়ক সব্যসাচী—অতিমানুষ। সে অতিমানবতার নিদর্শন তাহার ব্যবহারে, কথায়, মতে বা ইমোসানে কিছু নাই।...তাহার ব্যবহারে লেখক দেখাইয়াছেন তাহাকে একটা বে-আক্কেলী ভূতুড়ে জীবন, যাহার প্রবৃত্তির মূলে কোনও উচ্চতা নাই, কোনও জাতিপ্রিয়তা, দেশপ্রিয়তা বা গভীর সুকোমল বৃত্তি নাই—চরিত্রের অন্তস্থলে আছে কেবল হিংসা—ইংরাজের উপর দারুণ পৈশাচিক হিংসা, এত বড় অতিমানবের হিংসার কারণও অদ্ভুত। দেশের জন্য স্বজাতি উদ্ধারের জন্য সব্যসাচী ইংরাজদ্রোহী নয়। তাহার এত গভীর ইংরেজ দ্বেষের কারণ বিচিত্র। কোন্ জেলার কোন্ হাকিম তাহার দাদাকে একটা বন্দুকের পাশ দেয় নাই। তাহার দাদা ডাকাতের হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ভীষণ অন্যায়ের জন্য সে স্থানে স্থানে বিষ উদ্‌গার করিয়াছে। সে বিষ অপর কিছু না, হাটে বাজারে বক্তারা যে ভাষায় সরকারের নিন্দা করে, সেই বিষগুলা একত্র সংগৃহীত হইয়া কয়েকটা পৃষ্ঠায় সরস সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রবীণ পাঠক সব্যসাচীর চরিত্রের সঙ্গে সে কথাগুলি লইলে প্রলাপ ভিন্ন অপর কিছু মনে করিবে না। সরকারের বোধহয় এই জমাটি গালাগালিতে আসন টলিয়াছে। ছেলেছোকরার মাথা বিগড়াইবার ভয়েই বোধ হয় বাঙ্গলার আমলাতন্ত্র পুস্তকখানিকে বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। আমার মনে হয়, এই পাতা কয়খানাকে "বিষ" বলিয়া লেবেল মারিয়া বর্জন করিলে তাঁহাদের কার্যসিদ্ধ হইত। বাকি যাহা থাকিত, তাহাতে পাঠক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের উত্তেজক ডিটেকটিভ গল্পের রসোপভোগ করিত। ছায়াচিত্রে দেখাইলে ম্যাডেন কোম্পানীও মার্ মার্ কাট্ কাট্ শ্রেণীর একটি নতুন পালা দেখাইতে পারিত।...

"পথের দাবী" পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সুতরাং বহুদিন পুর্বে পড়া পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিলাম। আমি সরকারের সুখ্যাতি করিতেছি না। কিন্তু আমার আপশোষ যে, শরৎবাবুর পাকা হাতে এমন গল্প বাহির হইল..."

'মানসী ও মর্মবাণী' এবং 'অর্চনায়' প্রকাশিত 'পথের দাবী'র দুটি দীর্ঘ সমালোচনার ইংরাজী সারানুবাদ ব্রিটিশ সরকার গোপন ফাইলে রাখেন।[২১]

তরুণ প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মুখপত্র কল্লোল পত্রিকা কিন্তু 'পথের দাবী' উপন্যাসের শিল্পগুণের বিষয়ে কোন সন্দেহবোধ করেনি। কল্লোল লিখেছিল

"এতকাল পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসখানি সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাজেয়াপ্ত হইল। গত বুধবারের (১২ই জানুয়ারি, ১৯২৭) গেজেটে উহা বাজেয়াপ্ত হইল বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের একখানা উপন্যাসকেও শেষকালে খাসদখলে টানিতে হইল। বাংলা সাহিত্যের পরম ক্ষতি যে একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এরূপে বন্ধ হইয়া গেল (১৩৩৩ সালের মাঘ সংখ্যা)।

মর্ডান রিভিয়ু পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯২৭) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের নিষিদ্ধকরণ সূত্রে যে কথা লেখেন তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে রোমা রোলাঁর মন্তব্য উৎকলিত ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রোলাঁ বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রতিভা। সরকারি আদেশের তীব্র নিন্দা করে ও রোমা রোলাঁর মন্তব্যের উল্লেখ করে এখানে বলা হয় 'সুইজারল্যাণ্ডে এক সাক্ষাতকারে রোমা রোলাঁ আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ইংরাজী অনুবাদের থেকে ইটালিতে অনূদিত কাহিনীটি পড়েছিলেন। এবং তিনি মনে করেন, এই লেখক একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। ...কিন্তু বাংলা সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তি শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছেন। সুতরাং এটা এমন এক বই যা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। অথবা এটি আমলাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।'

বাংলা সরকারের ১৯২৬-২৭ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে

"The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land grabbing of the European power and the suspected political aims of various christian missions in Asia."

ওই রিপোর্ট সম্পর্কে 'ফরওয়ার্ড'য়ে ১৯২৮ সালের ৭ জুলাই লেখা হয় যে, ইউরোপীয় শক্তিগুলির ভূমি দখলের মতলব সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? আফ্রিকাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, সারা ভারতকেই তো লাল চিহ্নিত করা হয়েছে। চীনও সবে ইউরোপীয় শক্তিগুলির খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়েছে। কি করে এতগুলি ঘটনা সরকারী মুখপত্রের দৃষ্টি এড়াল?

এই প্রশাসনিক রিপোর্ট সম্পর্কে মডার্ন রিভিয়ুতে (আগস্ট, ১৯২৮) লেখা হয় যে, ইতিহাস দেখিয়েছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ে ব্রিটিশ ইউনিয়নের ভূমি দখলের মনোভাব কোনো অংশেই কম নয়।

এ সম্পর্কে প্রবাসীর মন্তব্য (শ্রাবণ ১৩৩৫):

"ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্য জাতির ভূমি দখল করিবার প্রবৃত্তি অতি সত্য কথা, ইহা মিথ্যা আরোপিত (alleged) দোষ নহে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। তদ্ভিন্ন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বলিতে শুধু ইংরেজ জাতিকে বুঝায় না। অন্য ইউরোপীয় জাতির দোষ ক্ষালনে আলোচ্য রিপোর্টে এত উৎসাহ কেন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একটি বাংলা প্রবাদ বাক্য হইতে অনুমিত হইতে পারে। খ্রীস্টিয়ান মিশন সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা তিনি প্রথমে বলেন নাই; বাইবেল ও ব্যাটালিয়নের পরে পরে আবির্ভাব সম্বন্ধে ইংরেজীতেই উক্তি আছে।"

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে সুরমা সাহিত্য সম্মেলনেও একটা প্রস্তাব তোলার চেষ্টা হয়েছিল। এই সম্মেলনে সেবার সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এটা রাজনৈতিক বিষয়, এই যুক্তিতে ওই প্রস্তাব তুলতে দেননি। এ নিয়ে বেশ বিতর্ক দেখা দেয়। এ কথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকায় রামানন্দবাবুর মনোভাবের সমালোচনা করা হয়। তবে পরে আবার রামানন্দবাবু ওই সম্পর্কে মত বদল করেন। প্রবাসীর ১৩৩৫ সালের আষাঢ় সংখ্যায় তিনি লেখেন: "কয়েকদিন হইল, আমার বয়স আরও এক বৎসর বাড়িয়াছে এবং আমি মৃত্যুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বদিন জীবনের অতীতকালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ শিলচরে সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচনা হইতে দিই নাই,তাহার বিষয় মনে পড়িল। মনে হইল, সাহিত্য বিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোন প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণতঃ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রাজনৈতিক বহি বটে কিনা, জানি না, তাহার আলোচনারও প্রয়োজন নাই,কিন্তু গভর্নমেণ্ট কর্তৃক উহা রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এবং বিনা প্রকাশ্য বিচারে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সাহিত্যের উপর গভর্নমেন্টের এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্য সম্মেলনীতে প্রতিবাদটি আলোচনা হইতে দিই নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই ; সাহিত্যসভায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়া অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক এই সাধারণ নীতি অনুসারেই আমি প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছিলাম। এখন যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তখন তাহা মনে আসিলে এই মীমাংসা করিতাম যে, প্রতিবাদটির আলোচনা সম্মিলনীর সভায় হইতে পারিবে, আলোচনা বা ভোট প্রদানের সময় সরকারী কর্মচারীরা ইচ্ছা করিলে সভা হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বা ভোট না দিতে পারেন। এখন আমি যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে আমার ভ্রম হইয়াছিল মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য আমার নাই কিন্তু কর্তব্যবোধে আমার বর্তমান মত প্রকাশ করিলাম।"[২৯]

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হন, কারণ এই বইটির প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, রবীন্দ্রনাথ যদি পথের দাবীর উপর সরকারের এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ জানান তাহলে হয়তো বইটি রাহুমুক্ত হবে। এই উদ্দেশ্যে একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথ সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একখানি বই উপহার দেন। এর কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এক পত্র লিখে 'পথের দাবী' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এখানে ওই পত্রখানি উদ্ধৃত করা হল

"কল্যাণীয়েষু তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কারণ লেখক যদি গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ রাজ ক্ষমা করেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম—একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না।

'তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধতার কথা লিখতে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূলে একেবারেই মাটি দেওয়া হয়। ইতি ২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

—তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানির উত্তর হিসাবে শরৎচন্দ্র একখানি পত্র খসড়া করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রবীন্দ্রনাথকে পাঠাননি। যদিও এ পত্রটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়নি এবং পত্র হিসাবে পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে এ স্পর্শ করে না কিন্তু পত্র লেখকের দিক থেকে বিশেষ করে এক্ষেত্রে—তাঁর মনোভাব জানবার সুযোগ ঘটে।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে বিচলিত ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। ঐ খসড়া পত্রে তিনি বলেছিলেন···

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাওড়া

"শ্রীচরণেষু

আপনার পত্র পেলাম। বেশ তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবার কথা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমান নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরেজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা, কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম তা হলে লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politician দের propaganda হত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি ও ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না, আজও নেই।"

"...কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরনের যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

"...আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি, এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

"আপনি বহুদিন দেশের কাজে লিপ্ত আছেন। দেশের বাইরে অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার কল্যাণ নেই,সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মানুষের ভুল হয়েছে মনে করতাম।

"আমি কোন বিরুদ্ধভা ব নিয়ে এ চিঠি লিখিনি। যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করে যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

"উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথা বা আচরণে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনি।

ইতি

সেবক

২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

'পথের দাবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ওই মনোভাবে শরৎচন্দ্র যে কত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তার আরও পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িকদের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন পত্রে। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লেখা এক পত্রে (সামতাবেড়-১০ই অক্টোবর ১৯২৭) শরৎচন্দ্র লেখেন— "...একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। 'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে গভর্নমেন্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরেজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে লেখেন,—"পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঠকের মন ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এ ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেন্টকে যা' তা' নিন্দাবাদ করা' সাহসের বিড়ম্বনা।"

"ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপানোর জন্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনি এই জন্যে যে এতবড় সার্টিফিকেট এখুনি স্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরাজী কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এ নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।"[৩০]

আরও একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্রের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তাতে তিনি লেখেন: "নানা কারণে 'পথের দাবী' রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগেনি। সে কথা জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, 'এই বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলেও মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্য দিয়া যাই বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবে না।' সুতরাং কবি যদি একে গল্পের বই মনে করে থাকেন ত এটা গল্পের বই।"

ওটি বিজলীর ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩শ সংখ্যায় ছাপা হয়। সুমুন্দ ভবনের শ্রীমতী সেনকে পত্রটি শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন।

প্রাসঙ্গিকবোধে 'পথের দাবী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠির বিষয়ে শরৎচন্দ্রের আর একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল

"সে কি উত্তেজনা। কি বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' পড়ে ইংরেজদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এ বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরাজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী'র যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।"[৩১]

লাহোর প্রবাসী বাঙালীদের অভিনন্দনের উত্তরে 'পথের দাবী'র উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেন, "একটা বই লিখলুম 'পথের দাবী'—সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলে। তার সাহিত্যিক মূল্য কি আছে না আছে দেখল না। কোথায় গোটা দুই সত্য কথা লিখেছিলাম সেইটেই দেখলে।"[৩২]

'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা'র লেখক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল লিখেছেন অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশন আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমিতির একজন উদ্যোক্তা হিসাবে শরৎচন্দ্রের কাছে গেছলুম তাঁকে এই অনুষ্ঠানে আহ্বান জানাতে। 'পথের দাবী' তখন সরকারি নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যেন আনমনা হয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন,—'আচ্ছা তোমাদের এটা তো সারা বাংলার লাইব্রেরীর ব্যাপার। তোমরা একটা কাজ কর না, আর তোমাদেরই তো এটা কাজ। এই যে সরকার আমার 'পথের দাবী'কে আটকে রেখেছে, এটা ছাড়াবার একটা প্রস্তাব সভা থেকে মঞ্জুর করাতে পার না? প্রকাশ্য সভা থেকে এর একটা প্রতিবাদ হলে অনেক কাজ হবে—সরকারের একটু টনক নড়বে। আমার আর পাঁচখানা বই যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করত তাহলে আমার এত দুঃখ হত না।'

এখানে উল্লেখ্য, শরৎচন্দ্রের ইচ্ছামত লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনে ওই সময় 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং সভায় দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তীব্র ভাষায় 'পথের দাবী'র উপর নিষেধাজ্ঞা জারি নিন্দা করেন।

বেদনার কথা শরৎচন্দ্রের এত আকুলতা সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশায় 'পথের দাবী'র উপর বাজেয়াপ্ত করার আদেশ উঠে যায়নি। 'পথের দাবী'কে রাহুমুক্ত করবার একটা বিশেষ চেষ্টা হয় তাঁর প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুবার্ষিক অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানের জন্য বাতায়ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'শরৎ স্মৃতি রক্ষা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্যোগে ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি আলবার্ট হলে শরৎচন্দ্রের প্রথম স্মৃতি বার্ষিক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতিরূপে অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রস্তাব করেন—'শরৎচন্দ্রের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার নাগরিকদের এই সভা বাংলা সরকারকে 'পথের দাবী' উপন্যাসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও 'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

এই সময় আবার আইনসভায় 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য নতুন করে দাবি ওঠে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ওই দাবি ক্রমে জোরদার হতে থাকে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি। এর কয়েকদিন পরই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সত্যেনচন্দ্র মিত্র কাউন্সিলে শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান

তিনি যে কথা বলেন, তা কাউন্সিল রিপোর্ট থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করছি

'Sarat Chandra belonged to Bengal in body, mind and spirit a typical Bengali of the era—that complex character who is not dead to his past, not blind to his future, who is passed by the mighty current raging the world over, is receptive to the forces of modern age, but who is still questing the ultimate value of it all. Sarat Chandra was a combination of all these forces. Indeed he had seen more of the different strata and sub-strata of our Bengali life than is usual with our literary men; and, has seen that, we are to remember, with those bright penetrating eyes which were his own and which welled up in sad tears of love and sympathy so frequently at what he had seen. This accounts for his sudden emergence from almost nowhere into great literary fame. As we read his first stories and novels, we saw that here was world, familiar to us all, but still never before unfolded in our concious apprehension by any literary talent. Only a genius can see the essentials of the life around him and a genius alone can present it again. It was left to Sarat Chandra to reveal this world of love and hope, aspirations and frustration to ourselves. We saw our truant boys and castaways, we recognised our sad tender womenfolk, that bloom and fade in unconscious grace and love within the fold of our joint family. Yes, we saw the tragedy of it as well. the small feelings, the crushing of the individuals, the slow poisoning of the fountains of human life, the denial of fulfilment of love and passion, except within the narrower bounds of orthodoxy and propriety. We saw them, but saw also that the picture, though true was tanged by a genial humour and lighted by deep sympathy and wide charity of heart. That was Sarat Chandra's key to our heart. He revealed us to ourselves as it were our problems and passion, and our valuations and re-valuations of life and love and society. The emotional re-action of the Bengalee to the reality of modern life and that of his own country, are mopped out for all time by a consummate artist, and thus his whole picture gellery at once become instinct with life.

But Sarat Chandra was more than an artist. He had above all a human heart. Shy and retiring, he would open to himself up to a few friends, and they alone could realise the greatness of man behind the artist. Long association and close intimacy which we developed from the day of the late Deshbondhu Chittaranjan Das had offered me this precious opportunity, and I do not know if I am to mourn for the literary genius

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

who enriched the world of letters with golden fruit of his mind, or if I am to silently bow to the blow of fate, against one of the finest specimen of humanity, whose talk was a delight to hear, whole whimsical traits were intersting to watch, and whose kindness and charity for the suffering humanity was an ennobling experience to witness. Sarat Chandra is no more but he will live all time to come in the heart of his country man."[৩৩]

স্পিকার খান বাহাদুর আজিজুল হকও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৯৩৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি অ্যাসেমব্লিতে বলেন : "Srijut Sarat Chandra Chatterjee's place in the field of Bengali Literature is such as for many years have delighted thousands of hearts and homes in this province and outside. He died in an age unlike the age when he was born and he has per excellence in his literary works given expression as to what he had in his time seen, heard and felt since the early dawn of 20th century. He escaped, what we sometime learn the terrible calamity of being a youthful prodigy. He began his life's career in circumstances which would have ordinarily chilled and choked the noble gifts of nature, but he succeded in finding for himself an abiding place in the literature of Bengal wherein he gave expression to what there is in the average life of a Bengali his joys and sorrows, his strength and weakness, his passion and emotion, his love and harted, his wisdom and weakness, not merely in broader streets, avenues of life but in the many narrow lanes and bylane in slums and bustees, in dismal and dark surroundings."[৩৪]

'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞাপ্রত্যাহারের জন্য আইন সভায় বার বার প্রশ্ন তোলা হয়। ওদিকে নাট্যনিকেতনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি. সি. গুহ প্রমুখের আবেদনের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র দফত্‌রের ফাইল চালাচালি হয়।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৩৮ সালের ৫ই আগস্ট এ সম্পর্কে আইন সভায় এই প্রশ্ন তোলেন (ক) স্বরাষ্ট্র (প্রেস) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কি অবগত আছেন যে, বিহার সরকার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন ? এই প্রশ্নের (খ) উত্তর যদি 'হাঁ' হয় তবে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি বাংলা সরকারও এ বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চান কিনা ?

(গ) নিষেধ আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলে মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন, কেন এ প্রদেশে বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে না ?

তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্যর নাজিমুদ্দিন জানান

(ক) আমার কাছে কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই।

(খ) এবং (গ) এই প্রশ্ন ওঠে না।

সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী প্রশ্ন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী অনুগ্রহ করে কি বিহার সরকারকে চিঠি লিখবেন এবং বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে এর ফলাফল আমাদের জানাবেন ?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের জবাব 'আমি মনে করি না যে, এর প্রয়োজন আছে।'

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রশ্ন করেন 'বিহার সরকার বইটি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন, এই কথা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী কি এখানেও বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবেন ?

নাজিমুদ্দিন বলেন 'না'

নাট্যনিকেতনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রবোধচন্দ্র গুহ পথের দাবী থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে চিঠি লেখেন ১৯৩৯ সালের ১২ই জানুয়ারি। তাতে বলা হয় যে, বিহার, আসাম সরকার বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওই চিঠিখানির উপর পদস্থ অফিসার এ. হাসান ১৯৩৯ সালের ১২ই জানুয়ারি এই নোট দেন। হাসান সম্ভবত তখন ডিরেক্টর অব পাবলিসিটি ছিলেন। তিনি লেখেন

"I feel that it is high time that the question of lifting the ban were considered by Government. If there is nothing really objectionable in the book, in view of the changed condition in the country, perhaps H, C.M, might like to examine,in conjunction with the Home Department, the advisibility of withdrawing the ban from it. If that course were decided upon we in the Department could exploit it to Government advantage."

হাসান ওই ফাইলটি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিবের কাছে পাঠান। তাঁর একান্ত সচিব মুরসেদ এই মর্মে নোট দেন

"H.C.M. will no doubt wish to consult the Home (Pol.), Dept. in the first instance. ১৩-১-৩৯"

ওই তারিখেই হক সাহেবের নোট

Will H.M. (Home) please advise? এর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সম্পর্কে চীফ সেক্রেটারির মতামত জানতে চান (১৬-১-৩৯)।

এরপর 'পথের দাবী' সংক্রান্ত আগেকার ফাইলগুলো তলব করা হয়। আর এইচ হাট এই বই থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে মত দেন

'I do not consider that the fact that the ban may have been lifted elsewhere forces us to do so,although it is naturally a ground for again examining the matter in the light of present condition.

'From the very full analysis begin by the Advocate General in 1926, it seems to me that the doctrine and tendency of the book, undoubtably actionable to law, is just as dangerous now as then, if not more so'...R.H. Hut, 20.1.29.

এরপর চীফ সেক্রেটারি তাঁর নোটে স্বীকার করেন যে, বিহার সরকারের কাজে 'পথের দাবী' থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়েছে। ২১-১-৩৯ তারিখের নোটে তিনি বলেন

"On the whole, I should be inclined to let the proscription drop if it is considered that any political advantage can be gained in showing that the Ministry takes a liberal view."

তৎকালীন মুখ্যসচিব এইচ এফ টুইম্যান তাঁর নোটে আরও বলেন যে, বিহার সরকার 'পথের দাবী' থেকে যদি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন, তবে কোন ট্রেনযাত্রী পাটনা থেকে কলকাতা আসার সময় তাঁর কাছে বাজেয়াপ্ত 'পথের দাবী'র কোন কপি থাকলে বাংলা সীমানা অতিক্রমের পর তাঁর বিরুদ্ধে এজন্য অভিযোগ আনাটা হবে 'অ্যানোমালাস'।

চীফ সেক্রেটারির এই নোট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। এরপর তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্মতি জানিয়ে ২২-২-৩৯ তারিখে লেখেন

"In view of the consideration stated above I agree the ban may he withdrawn. I do not consider that this will in any way help ministry."

স্বরাষ্ট্র সচিব পথের দাবীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের অনুমতিক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হয়। তারপর ১৯৩৯ সালের ১ মার্চ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ জারি হয়। আদেশটি সই হয় ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯। ৯ মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে ওই বিজ্ঞপ্তি বের হয়। এর কিছুদিন পরই স্বরাষ্ট্র সচিব আইন সভায় পথের দাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি জানান। ১৯৩৯ সালের ৮ মার্চ খান সাহেব আবদুল হালিম ও কামিনীকুমার দত্ত প্রশ্ন করেন

(ক) প্রখ্যাত বাঙালী লেখক শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে অ্যালবার্ট হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় 'পথের দাবী' বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে যে একমাত্র প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল, সরকার কি সে সম্পর্কে অবগত আছেন ?

(খ) সরকার কি জানেন যে 'পথের দাবী' থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য যুক্ত প্রদেশ ও আসাম সহ বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে অনুরূপ অনুরোধ জানানো হয়েছে। এবং এটা ঘটনা যে, কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই দাবি মেনে নিতে সম্মত হয়েছে ?

(গ) সরকার কি এই প্রস্তাবকে কার্যকর করতে চান ? যদি না চান কেন চান না ?

উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা নাজিমুদ্দিন জানান

'The order in question was recently rescinded'. 'Bengal Legislation Council Debates First Sessions, 1939 Vol I.P. 505.

কী অবস্থায় 'পথের দাবী' থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, গোয়েন্দা বিভাগ তা জানতে চান।

এর জবাবে গোয়েন্দা বিভাগকে জানানো হয় যে, পথের দাবীর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখার আর প্রয়োজন বোধ হচ্ছে না। তাই তুলে নেওয়া হয়েছে।

With reference to your letter No. 4224 dt. the 13th April to Saumarez Smith. I am to say that the ban of 'Pather Dabi' was removed because Government considered that its retention served no useful purpose."

'পথের দাবী'র উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে 'অ্যাডভান্স' ১৯৩৯ সালের ৯ মার্চ লেখে যে, দু বছর আগেই বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া উচিত ছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, একেবারে না হওয়ার চেয়ে বরং বিলম্বে হওয়া ভাল। ১৯৩৯ সালে ৯ই মার্চ ওই পত্রিকায় এই মন্তব্য করা হয়।

১০ই মার্চ ১৯৩৯ তারিখে 'নবশক্তি' লেখে

'বাংলা সরকার 'পথের দাবী' উপন্যাস হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। বহুতর সদ্‌গ্রন্থের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ইতঃ পূর্বে বাঙ্গালা সরকার দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উপর এবং সাহিত্যের প্রতি যে ঘোর অবিচার করিয়াছিলেন, 'পথের দাবী'র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে তাহা আংশিকভাবে স্খলিত হইয়াছে। সাহিত্যে হেতুহীন রাজরোষের যদৃচ্ছা প্রয়োগ শাসকের শুভবুদ্ধির চিহ্ন নহে, বরং আত্মিক দুর্বলতার পরিচায়ক। রাজরোষে আপতিত অন্যান্য গ্রন্থাদির উপর হইতেও সরকারী জুলুম অবিলম্বে উঠাইয়া লইতে আমরা বাঙ্গালা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।'

ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে 'পথের দাবী' থেকে বাংলা সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এবং অচিরেই দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়—বৈশাখ, ১৩৪৬ (২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯)।

'পথের দাবী' রাজরোষে থেকে মুক্ত হলেও এর অভিনয়ের উপর আবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। রাহুমুক্তির পর শচীন্দ্র সেনগুপ্ত পথের দাবী উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন এবং নাট্য নিকেতনে সেই নাটকের অভিনয় হয় ১৩ই মে, ১৯৩৯। কিন্তু এক বছর অভিনয় হবার পর সরকার 'পথের দাবী'র অভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ১লা মে, ১৯৪০। কারণ এই প্রকাশ্য অভিনয়ের মাধ্যমে নাকি দেশে বিপ্লববাদের সহায়তা করা হচ্ছে।

॥ আবার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব ॥

'পথের দাবী' আবার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব হয়। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার কয়েকমাস পরেই ওই প্রস্তাব করেন তৎকালীন পুলিস কমিশনার ফেয়ারওয়েদার। ১৯৪০ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে চীফ সেক্রেটারিকে লেখা এক পত্রে তিনি 'পথের দাবী'র উপর আবার নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে বলেন। কিন্তু সরকার ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি অর্থাৎ পথের দাবীর উপর আবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। সেদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে 'পথের দাবী'র বিরুদ্ধে আর একদফা যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার বিবরণ সরকারী ফাইলের জীর্ণ পাতা থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেছে। সরকারী দফতরে আজ তা মূল্যহীন অবহেলিত হলেও সাহিত্যপ্রেমিক মানুষের কাছে এগুলি এখনও অমূল্য। তাই কিছু কিছু ওই সব জীর্ণ ফাইল থেকে উদ্ধার করেছি। পুলিস কমিশনার ফেয়ারওয়েদারের চিঠিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Sir, I have the honour to refer to the Government of Bengal. Home Department notification 103P. dated 4-1-1927 banning the Bengali novel 'Pather Dabi' by Sarat Chandra Chattapadhyay, and to subsequent notification No. 1020P. dated 1-3-39 lifting the ban of a time when the political situation was on the whole normal.

The novel was latter dramatised and when the play was put on at the Natyaniketan, Calcutta, it attracted crowded houses. In view of the abnormal conditions prevailing on account of the outbreak of war Government prohibited the performance of this drama under rule 43 of the Defence of India Rule vide Government of Bengal Home Department Political (Press) order No. 1170P. dated 22-2-1940.

Revolutionaries continue to use this novel to obtain recruits. The 'Mandira' an organ of the Bengal Provincial Students Federation, published a critical review of the novel in its issue Jaistha, 1347 BS and the Editor was on this account warned by the special press adviser, vide Govt. of Bengal Home (Political) Department (Press) No 3120 dated 18-6-40.

The political situation is not improving and various revolutionary groups are trying their utmost to mobilise.

In these circumstances I request Government to be so good as to reimpose the ban on the novel 'Pather Dabi'.

পুলিশ কমিশনারের ওই চিঠির ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র দফতরে পদস্থ আমলাদের মধ্যে নোট বিনিময় হয় এবং ফাইল চালাচালি চলে। 'পথের দাবী'র বিষয়ে ভাল করে খতিয়ে দেখার পর বইটির উপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি অপ্রয়োজনীয় বলে মত ব্যক্ত করা হয়। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ফাইলে" এই মন্তব্য আছে

'it may be noted that 'Pather Dabi' was originally proscribed with this department Notification No 103P. dated 4.1.27. The order of proscription was later on rescinded with this department notification No. 1020P. dated 1.3.39. The reason for withdrawal of the order of proscription will be found in late c.s.s. note dated 31.1.39 confidental File 50/39. As soon as the ban was removed the book was dramatised by one Babu Sachindra Nath Sengupta and the managing Director of Natya Niketan applied for permission to stage the drama, C. P. Calcutta submitted a manuscript copy of the drama together with a review and expressed his opinion that it was most objectionable and should be banned. H.M. directed that version should be censored by the D.C.D.D. and D.P.I. and then an expurgated version if thought to be innocuous might be performed. This was accordingly done and the reaction of the audiance was observed. The D.C.D.D.(Mr. Jones) reported that the play could not be said to be causing any excitement but he at the same time also reported that 'The whole theme is the glorification of armed revolution', and suggested that the effect might be greater on less sophisticated villagers. Subsequently A.S. (Mr. Tufnell Barret) strongly recommended prohibition of the play under sec. 3(b) of the Dramatic performance Act. H.M. accepted the recommendation subject to the concurrence of the H.C.M. who however suggested that it would be better if the L.R. were consulted about the alleged objectionable passages and the file was referred to L. R. for his opinion. L.R. advised that the play which seemed to be hit by rule 34(6)(c) of the D.R. should be prohibited under rule 43 of the said Rules. H.M. agreed with his views and observed that at least during wartime that drama should not

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

be staged and that if any proposal to stage it was made it should be prohibited under rule 43 of D.I.R. latter on the Managing Director of the Natya Niketan Theatres Co. LTD. advised for the performance of the drama and that fact was brought to the notice of the Govt. by C.P. Calcutta with request to issue orders prohibiting the performance under rule 43 of D.I.R. In veiw of H.M.S observation stated alone, it was decided that the play should be prohibited straight way by a general notification forwarded to all district officers for information. This was done.

C.P. Calcutta now reports that revolutionaries continue to use this novel to obtain recruit and various revolutionary groups are trying their atmost to mobilize. He accordingly requests Government to reimpose the ban on 'Pather Dabi' novel.

In this connection it may be noted that the fact that the ban was lifted from the original novel was taken into account when the question of imposing the ban on the dramatised version of the novel was considered by Government. It will be seen from A.S.'s note dated 26.8.39 that while recommending prohibition of the play, he remarked that he did not wish to quarrel with the withdrawal of the ban on the book and observed that it was quite a different thing to intrude the play on the public stage which very probably would never take the trouble to read the book. Moreover the argument put forth by the late C.S. in his note dated 21.1.39 at the time of lifting the ban on the book still hold good. In view of this it is for consideration whether the ban should be reimposed on the original book 'Pather Dabi' as suggested by C.P. Calcutta.

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের পদস্থ আমলার ওই নোটের পর স্বরাষ্ট্র সচিবের মত নেওয়া হয়। ১৯৪০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরের নোটে আছে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তিনি এখন আবার বইটি নিষিদ্ধ করতে প্রস্তুত নন, কারণ—

(ক) এই নিষিদ্ধ করার আদেশ কার্যত ব্যর্থ হবে।

(খ) অবশ্যই জনগণের অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা হবে।

(গ) বিনা প্রয়োজনে এমন একটি বইয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে যা তাঁর মনে হয় নিয়মিত প্রদর্শিত অনেক ফিল্মের চেয়ে সম্ভবত অনেক কম প্রভোকেটিভ।

এই নোটটিতে পোর্টারের সইয়ের তারিখ ২৩-৯-৪০। তখন ইনি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ছিলেন।

'পথের দাবী'র উপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা নাজিমুদ্দিনের এই সুস্পষ্ট মনোভাবের পর পুলিস কমিশনারের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

এরপর পোর্টারের একটি পত্রে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) ফেয়ারওয়েদারকে সরকারের ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এই পোর্টার পুলিস কমিশনার সি. ই এস ফেয়ারওয়েদারকে লেখেন, বর্তমানে এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা না নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[৬৬]

'পথের দাবী' দ্বিতীয়বার বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব বাতিল হবার পরও এ নিয়ে সরকারী দফতরে নোট চালাচালি হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশ সরকার ও বোম্বাই সরকার বাংলা সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কেন 'পথের দাবী' থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে সিন্ধু সরকার নিম্নলিখিত পত্র লেখেন

From S.H. Raza esquire I.C.S.
Deputy Secy. to the Govt. of Sind.
Home Dept.

Sir, I am directed to request that should there be no objection, this

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

Government may be informed whether the novel 'Pather Dabi' by the late Saratchandra chatterjee has recently been proscribed by the Government of Bengal. It is understood that it was proscribed by the Govt of Bengal in 1927 but the proscription order was withdrawn.

এর জবাবে পথের দাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা স্বীকার করা হয়। বাংলা সরকারের স্পেশ্যাল প্রেস অ্যাডভাইসার এ বি চ্যাটার্জি ১৯৪১ সালের ২১ জানুয়ারি লেখেন যে, তবে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের করা এই উপন্যাসের নাট্যরূপটির অভিনয় ভারত রক্ষা বিধির ৪৩ রুলে নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৪০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ওই আদেশজারি করা হয়।

এরপর বোম্বাই সরকার এক পত্রে (৪ঠা জুলাই ১৯৪১) জানতে চান যে, কী কারণে বাংলা সরকার 'পথের দাবী' থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেন।

জবাবে বাংলা সরকারের পক্ষে ১৯৪১ সালের ২৩শে জুলাই জানানো হয়

"The book is known to practically every student of Bengali literature and to all who read Bengali literature for the sake of diversion. Proscription, therefore though it restricted some extent sale and purchase, did not effectivel y prevent perusal of the book. Government considered that it was on general grounds undesirable to use the law in a manner which must be ineffective. More over the proscription involved Government in certain amount of odium since the book is universally regarded as a Bengali classic. Finally it appeared to be useless to maintain the proscription of a book like 'Pather Dabi' whilst allowing on failing to suppress much greater degree of licence in present day speeches and writings.

I am to add that after the proscription was rescinded the novel was dramatised under the same name and the perfomance of the stage version was permitted after certain modification. During 1940, however, the question of permitting the play to be staged was reconsidered and it was prohibited by two orders under D.I.R. 43. The first of these referred explicitly to a performance which had been announced in a specified theatre and was passed on the 22nd February. The second, passed on the 1st May, 1940 was a general prohibition."

F.M.

বাংলা সরকার জানালেন যে, 'পথের দাবী' উপন্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও এর অভিনয় নিষিদ্ধ করে একাধিক আদেশ জারি হয়।

প্রচার বন্ধের জন্য ডাক বিভাগের ব্যবস্থা

'পথের দাবী'র প্রচার বন্ধের জন্য ডাক বিভাগও খুব তৎপর হয়। বইটি বাজেয়াপ্ত হবার পর ডাক বিভাগ থেকে বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ যায়। পি এম জি জেলায় জেলায় ১৯২৭ সালের ৭ই জানুয়ারি এই মর্মে সার্কুলার পাঠান

'১৮৯৮ সালের ইন্ডিয়ান পোষ্ট অফিস অ্যাক্টের ২৭বি ধারা অনুসারে আপনাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, ডাক বন্টনের সময় যদি সন্দেহ হয়, তাতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বই আছে,তবে তা আটক করবেন।

ডাকঘরগুলিতে আটক এই বইয়ের সব কপি কলকাতার ডি আই জি (পুলিশ) কে পাঠাতে হবে। এইসব আটকের ঘটনা ওই অফিসকে (পি এম জি) জানাতে হবে।'

APPENDIX

পুলিশ কমিশনার স্যর চার্লস টেগার্টের ২৩শে নভেম্বরের (১৯২৬) পত্রে 'পথের দাবী'র যে যে অংশ আপত্তিকর বলা হয়েছিল, তা হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Pather Dabi/objectionable portions

Page 19. A short discussion between Apurba and Tewari regarding the conduct of their lodger upstair proceeded thus

Page 48. Ramdas Talwarkar, a Maratta assistant of Apurba says- 'I knew of case before and I had no doubt of what would happen. You were speaking of (What) men (would say). One who is a man would know what happen in a court when a case between a Halder (an Indian) and Joseph (a Eurasian) crops up.

P 68. পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে সব্যসাচীর আসার কথা শুনে অপূর্বের মন্তব্য

P 69.

P 75. Apurba criticising the extravagance of police depart remarked...

P 81-82 When Apurba travelling in a first class compartment... Burmese sub-inspector's remark.

P 127. When Bharati asked Apurba to be a

P 134. In reply to Apurba's question as to whether they would have to go Bharati said : that is, to the

P 196. In course of propaganda among the workmen she continued that the real work of Pather Dabi could be done in that room.

P 148. Apurba expostulated with Bharati that these labourers might get drunk.

P 205. While going on a mass meeting of the workmen with Talwarkar, Apurba warned him of the unwisdom of a family man facing the great danger of joining a society like Pather Dabi.

P 211. Police officer-Sumitra talks.

P 213. In front of factory police officer, Sumitra, Apurba, Talwarkar etc.

P 215, 216, 225, 243, 244, 255, 301, 309, 322, 323, (Doctor said, No Bharati, I am trying really to frighten you, so that after I go away, you...) 324, 326, 328, 333, 335, 337, 339, 340-345, 348, 379, 395, 397, 399, 347 (said by the doctor in reference to the reform scheme which Apurba has mentioned as likely to take the wind out of the sails of the revolutionary ..Bharati, in my desire, in my devotion there is no room for self-deception. There are two paths only open to ending this devotion (of mine) one is Death, the other is India's freedom.[37]

Translated by K. D. Roy. 16-11-26

বিপ্লবের আহুতি লিও টলস্টয়ের উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'বিপ্লবের আহুতি' বাজেয়াপ্ত হয়। টলস্টয়ের 'হোয়াট ফর ' এবং 'দি ডিভাইন অ্যান্ড দি থ্রি মোর ডেথস্' বইয়ের অনুবাদ ও সংকলন এটি। অনুবাদক ও সংকলক বিনয়কৃষ্ণ সেন। ১৯২৮ সালের কলকাতার তরুণ সাহিত্য মন্দির থেকে বইটি প্রকাশিত। অনুবাদে লেখক ইংরাজি নামের বদলে অনেক রুশী নামের ব্যবহার করেছেন। টলস্টয় এই উপন্যাসে বিপ্লবীদের উপর রুশ সরকারের জুলুমের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ওখানে জারের কারাগারে আটক দুই রুশ বন্দীর জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। একালে সাইমন আর একজন তাঁর বন্ধু মার্টিন। যথেষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সাইমনকে ফাঁসিতে লটকানো হল। তারপর মার্টিন মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করলেন। বইটি সম্পর্কে একালে গবেষক লিখেছেন

'বিপ্লবী অন্ধকার নির্জন সেলের মধ্যে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। তার মনের অবস্থা কি হতে পারে ? সে কি মনের শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে, চিন্তার সংলগ্নতা থাকে না, তবে সে পাগল হয়ে যাবে। আবার এক এক সময় তার মনের বল ফিরে আসে। এ যেন সমুদ্রের মত ওঠে নামে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাইমন ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলতে যাচ্ছে, তার বয়স অল্প, সুন্দর স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দে সংসার করতে পারত। ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝোলার আগে তার মন কি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে ? কিংবা কোন বিপ্লবী যদি উপলব্ধি করে দেশের লোক তাঁর আদর্শ ও আত্মত্যাগকে ভুল বুঝেছে, দেশবাসীর ধারণা সে-বিপ্লব দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে দিয়েছে তখন কি বাঁচবার বাসনা হারিয়ে ফেলে ? আত্মত্যাগ করে নিষ্কৃতি চায় ? সেই দ্বন্দ্বের কথা লিখেছেন টলস্টয়।[৩৮]

টলস্টয় আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখার অনুবাদ গ্রন্থও ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করতে ছাড়েনি। 'বিপ্লবের আহুতি' বইটি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

'বিপ্লবের আহুতি'র অনুবাদক বিনয়কৃষ্ণ সেন সুপন্ডিত ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বাংলা ও ইংরাজিতে তাঁর অনেকগুলি বই আছে। ১৮৮৮ সালে খুলনা জেলার দামাদরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। টলস্টয়ের উপন্যাসের অনুবাদ ছাড়া তিনি নিজেও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর 'কালাপাহাড়' উপন্যাসটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত। তাঁর অন্যান্য বই : হিন্দু সংগঠন (১৯২৬), বিধবা বিবাহ (১৯২৬), স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা (১৯২৪), **William Tell or Swiss Independent (1917)**/ বাংলা ও ইংরাজিতে তাঁর মোট ১২টি বই আছে। ২৪ পরগনার বাসারে (কেওড়াতলা) তিনি বসবাস করতেন।

॥ চণ্ডীচরণ সেন ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক চন্ডীচরণ সেনও সরকারি কোপে পড়েছিলেন। কেউ কেউ লিখেছেন যে, তাঁরও একাধিক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। আমি সরকারী গেজেট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পাইনি যে তাঁর বই বজেয়াপ্ত হয়েছিল। তবে তিনি যে সরকারের বিরাগভাজন হন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কথা সাহিত্য সাধক চরিতমালায় আছে।

চন্ডীচরণ সেন বাংলা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন ১৮৮৩ সালে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবেই তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে সুবিদিত। কামিনী সেন (রায়) পিতার জীবন কথা লিখিয়াছেন

"টম কাকার কুটির' লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনে হইল মিসেস রিচার স্টো তাঁহার এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমেরিকার দাসত্ব প্রথার জঘন্যতা তাঁহার সরস চিত্রে যেরূপ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া এদেশের কুপ্রথা ও কুশাসন সকলের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস আবশ্যক। এই চিন্তা হইতে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। এতদর্থে তিনি নানা স্থান হইতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন।

...এই সকল পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার।'

সাহিত্য সাধক চরিতমালায় তাঁর লেখার প্রতি সরকারী কোপ প্রসঙ্গে আছে 'চন্ডীচরণের গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইহার সহিত তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বদেশ প্রেমিকতা মিলিত হওয়ায় তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছিল। নন্দকুমার, অযোধ্যার বেগম ও ঝাঁসীর রানীর কাহিনী প্রণেতাকে বাঙালী কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না।'[৩৯]

চন্ডীচরণের লিখিত গ্রন্থ অনেক টমকাকার কুটির ১৯২১, মহারাজ নন্দকুমার ১২২৯, দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিং ১৮৮৬, অযোধ্যার বেগম ১ম খণ্ড ১৮৮৬, ২য় খণ্ড ঐ, ঝাঁসীর রানী ১৮৮৮, চল্লিশ বৎসর (টলস্টয়ের উপন্যাসের অনুবাদ) ১৩১০।

এর মধ্যে তাঁর ঝাঁসীর রানী, অযোধ্যার বেগম, মহারাজ নন্দকুমার বইগুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বলে কেউ কেউ লিখলেও সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ভারত কোষ, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (বিজিত কুমার দত্ত) বা সরকারী গেজেটে কোথাও চন্ডীচরণের বই বাজেয়াপ্ত হবার তথ্য নেই।

অনাগত প্রফুল্লকুমার সরকারের 'অনাগত' উপন্যাসটি রাজরোষে পড়েছিল। এ বইটি নিয়ে সরকারী দফতরের ফাইল চালাচালি হয়। গোয়েন্দা বিভাগ এটিকে 'পথের দাবী'র ধাঁচের উপন্যাস বলে মত ব্যক্ত করেছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

The book is of the type of 'Pather Dabi' proscribed in 1927 and is calculated to encourage to the recruiting to the revolutionary party.

১৯২৮ সালের ৩রা মার্চ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের (কলকাতা) ডেপুটি পুলিস কমিশনার এস এইচ এইচ মিলস্ আই পি, জেপি চীফ সেক্রেটারিকে যে চিঠি লেখেন, তাতে ওই মন্তব্য আছে।[৪০]

প্রফুল্লকুমার সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস, কলেজ স্কোয়ার) লিখিত এই বইটির প্রকাশক হলেন হরিদাস চ্যাটার্জি (২০৩/১/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্সের)। আর মুদ্রাকর হলেন নরেন্দ্র নাথ কোঙার্ (ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৩/১/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) ১৩৩৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ এটি বের হয়।

অনাগত সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ফাইলে মন্তব্য করা হয়েছে

"Anagata is a story intended to depict the ideals and method of the extreme sections of Bengali revolutionaries and to give a picture of outrages and oppressions alledged to be committed on labouring classes by capitalists. It also incidentally condemns the inquitousness of a system under which the producer of the wealth die of starvation, while those exploiting them roll in wealth."

সরকারী ফাইল থেকে জানা যায় যে, বন্দী কেশব চক্রবর্তীর জন্য এক কপি 'অনাগত' কেনা হয় এবং তা থেকে বইটি বিভিয়্ন করা হয়। সরকারী ফাইলে সে তথ্য আছে।

Review of 'Anagata' written by Prafulla Kumar Sarkar purchased for delivery to the Keshab Chakraborty.

This book is written by Prafulla kumar Sarkar, Ananda Bazar Patrika Office, College Square, Calcutta. It is dated 5th Agrahayan, 1334 B.S. It is printed by Narendra Nath kongar, Bharat Barsha Printing Works, 203/1/1, Cornwallis Street, and published by Haridas Chatterjee of Gurudas Chatterjee & Sons of 203/1/1, Cornwallis Street.

The book 'Anagata' (meaning 'not yet come') is dedicated to the every young men of Bengal who have been blessed by sacrificing their lives for the country in every age.

This book, though written in novel form, depicts how a secret anarchical association is formed by Naresh, Mohit, Mohendra and others—how are Atal Behari is shot dead on suspicion of his being a police spy by some members of the anarchical association which aims at liberating the country by secret organisation—, how these youths rescued a 'coolie girl' from the lust of a European Manager of a Mill at the dead of night at the point of revolver—how Mohit broke into the house of the father of his lady-love Pratima at the dead of night and stole away two revolvers from the house for anarchial purposes,—how these youths used to meet at a room in secluded place in Calcutta, how Naren came into contact with a Police Inspector and subsequently betrayed the party, and got Kishore, an intimate friend of Mohit, arrested by the police after a thorough search of the house of Mohit where Kishore was putting up. Now Mohit came to know of his betrayal and offered himself for arrest, and took the whole responsibility of the party on his own shoulders, and got the release of Kishore. Now Mohit was trasported for life for his offence. How he expressed his satisfaction for the little service he had been able to do the country by his actions! Besides, in this book it is narrated how coolies are being repressed in this country by the capitalist for their selfish greed, without giving proper wages to the coolies.

The book also depicts as how Mohit's sister Anindita and Kishore,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

after imprisonment of Mohit took the vow of depicting the masses from their degraded position.

This book, I think gives ample food to youngmen to think over the anarchical organisations, and the ways in which they may be formed and developed.

It should not be passed for the perusal of the detenue. To my mind the circulation of this book is prejudicial to the public interest. Further, it is worth considering as to whether the book should be sent to the Bengali Translator reviewing and translating the passages whereas the above mentioned topics have been narrated, and further action on this book may be taken.

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ফাইল থেকে পাওয়া এই রিভিয়ুতে বইটি যে আপত্তিকর, তা সুস্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে। কোন রাজনৈতিক বন্দীর হাতে এ বই দেওয়া উচিত হবে না বলে মন্তব্য করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এই বইটি প্রচার জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

তবে অনাগত সম্পর্কে তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল বি এল মিত্রের মতামত চাওয়া হলে তিনি ১৬-৪-২৮ তারিখের নোটে এটি বাজেয়াপ্ত না করার পক্ষে মত দেন

'আমি মনে করি না যে 'অনাগত' বইটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৯০-এ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ করার যোগ্য। এতে সমাজতন্ত্র ও স্থূল ধরনের সন্ত্রাসবাদ প্রচার করা হয়েছে। এই বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ১৫৩এ ধারার আওতায় পড়ে না। আমিও পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে একমত যে, এই বইয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার নেই।

এর আগে Bengal Council-এর সদস্য অনুরূপ মন্তব্য করেন। ১৯২৮ সালের ৫ই এপ্রিল তিনি এ সম্পর্কে যে চিঠিটি লেখেন, তা হচ্ছে

"প্রিয় প্রেনটিস,

আমি পি কে সরকারের 'অনাগত' বইটি পড়েছি। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, একে আমার আকর্ষণীয় মনে হয়নি এবং বইটিতে কোন থ্রিল বা প্লট নেই।

সমাজতন্ত্র ও স্বাদেশিকতার কিছু থিয়োরি প্রচারে লেখক ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আমি একে দেশদ্রোহের লেখা বলে মনে করি না। এখানে দু-একটি অনুচ্ছেদে শ্রেণী বিদ্বেষের প্রশ্ন তোলার চেষ্টা হয়েছে।"

শেষ পর্যন্ত 'অনাগত' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের ২৪শে এপ্রিল স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ থেকে পুলিশ কমিশনারকে লেখা পত্রে ওই তথ্য জানা যায়।[৪১] তাতে বলা হয়েছে, বইটি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৯৯এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা চলে না। শেষ পর্যন্ত বইটি বাজেয়াপ্ত হয়নি।

ছোট গল্পের বই 'চলার পথে'

ইংরাজ আমলে নিষিদ্ধ ছোটগল্পের বইয়ের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। এ পর্যন্ত যে তথ্য পেয়েছি, তাতে দেখি অল্প কয়েকটি ছোটগল্পের বই সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। 'চলার পথে' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

'চলার পথে'র গল্পগুলি বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা। লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত এম এ। প্রকাশক শ্রীইন্দুভূষণ সরকার। ৯১/১, এফ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৩৬ সাল। মূল্য পাঁচসিকা।

প্রথমেই লেখক বলেছেন

'আরও চরম চাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আকুলিত চিত্তে যাহারা চলার পথ রচনা করিয়া যান, তাহাদেরই উদ্দেশ্যে আমার এই গল্পগুলি উৎসর্গ করিলাম।' —গ্রন্থকার

'চলার পথে'র ভূমিকা লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায় তিনি তাঁর 'পথের দাবী'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাজেয়াপ্ত হবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এর গল্পগুলি পড়ে শরৎচন্দ্রের কি মনে হয়েছিল, এই বইও রাজরোষে পড়বে ? তাঁর 'পথের দাবী'র মতো 'চলার পথে'র গল্পগুলিও বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা। শুধু তাই নয় এর লেখকও শরৎচন্দ্রের মতো একজন সক্রিয় দেশকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তাঁর কপালে কারাদণ্ডও জুটেছিল।

ভূমিকায় শরৎচন্দ্র লেখেন

"আপনার জন্মভূমিকে আন্তরিক ভালবাসার পুরস্কার ভুপেনের ভাগ্যে জুটেছে। সে আজ জেলে। চলার পথে বইখানির গল্পগুলি তারই পরিচয়। 'পথের দাবী' যখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন, তোমার বক্তব্য যদি প্রবন্ধকারে লিখতে তার মূল্য অল্পই থাকতো। কিন্তু গল্পচ্ছলে যা দিয়েছো দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই। ভুপেনের সম্বন্ধেও আমি এই আশীর্বাদ করি। এবং বলি বাঙলাদেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই বইখানি পড়ে দেখা উচিত। ইতি ২০শে অগ্রহায়ণ '৩৬।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

'চলার পথে'র গল্পগুলি সবই দেশাত্মবোধক কাহিনী এবং বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা। 'গানের সমাধি' বলে একটি গানও আছে। মোট ৯৪ পৃষ্ঠার বই। সূচীপত্র পরিচয়, মনের সাড়া, চলার পথে, কা'র ডাক, অভিসার, গানের সমাধি, বাদল ছন্দে, কষ্ঠি-পাথর।

প্রচ্ছদে ছিন্ন শৃঙ্খল হাতে লালপেড়ে শাড়ি-পরা এক নারীর ছবি। তার দু'পায়েও ছিন্ন শৃঙ্খল। ছবির ক্যাপসানে লেখা 'ভাঙ্গনের পালা সুরু হ'লো আজি—
ভাঙ্গ ভাঙ্গ শৃঙ্খল-'

বাজেয়াপ্ত 'চলার পথে' বইটি দিল্লিতে ন্যাশনাল আর্কাইভসে আমার পড়ার সুযোগ হয়। এ থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম। এর অন্তর্ভুক্ত 'চলার পথে' নামক গল্পের শেষাংশ : "... অনেক ভাবনার পর রেখা যেন একটা উপায় পাইল, তাহার মনটা খুশীতে ভরিয়া উঠিল। সাহেবকে একটু আব্দারের স্বরেই সে বলিল—

"Well, Mr. Robertson, would you go the upper deck? I can speak my mind to you if you come alone."

"সাহেব যেন হাতে স্বর্গ পাইল। রেখাকে সঙ্গে লইয়া উপরের ডেকে চলিয়া গেল। রেখার স্নিগ্ধ চাউনি, সুন্দর মুখখানায় ছন্দ-মধুর ভাব, আর তার চলিবার অপূর্ব ভঙ্গি। সাহেব-প্রাণেও দোলা দিল।

"উপরে উঠিয়া রেলিং-এর পাশে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইল। বিশাল সাগরবক্ষের সবুজ ঢেউগুলি তখনও নৃত্য-রসে চঞ্চল, আর রেখাও যেন সেই চঞ্চলের সঙ্গে নিজের প্রাণের ছন্দ জাগাইয়া চপল হইয়া উঠিতেছিল। রেখার ওষ্ঠে একটু মধুর হাসি খেলিয়া গেল—সাহেব সেই হাসির মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ-নারীর স্মিত হাসির অন্তরালে যে লাবণ্য-ঢল স্নিগ্ধতার অবলেপনে মায়ার সৃষ্টি করিতেছিল তাহাকে উপেক্ষা করার মত সামর্থ্য পুলিশ সাহেবের হইল না।...

"এমনি সময় রেখা একটু পিছু হটিল, তারপর আচম্বিতে সমুদ্রের অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল—সাহেবের কানে শুধু ভাসিয়া আসিল অতি মধুর কণ্ঠধ্বনি—'Good bye'. বিমূঢ়ের মত সাহেব অনেকটা শূন্য দৃষ্টিতে সুমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল... তারপর কত খোঁজ—কত ডুবুরি জলে ডুবিয়া সন্ধান করিল।...কিন্তু বৃথা।...

"অনন্ত সমুদ্রের বুকে যে অর্ঘ্য এই তরুণী আজ ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার সন্ধান করিতে পারে শুধু ভগবান, আর পারে সে, যে সত্যকে ঠিক এমনি করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে।"

রেখা বিপ্লবী দলে ছিলেন। তাঁর কাছে বিপ্লবীদের অনেক গোপন দলিল ও নথিপত্র ছিল। তিনি বর্মায় যাচ্ছিলেন। গোয়েন্দারা এই খবর পায়। তখন একদল পুলিশ উত্তাল সমুদ্রের উপর জাহাজেই তাঁকে ঘিরে ফেলে। রেখা দেখলেন, পুলিশ তাকে ধরে ফেলেছে, এবং সব গোপন তথ্য পেয়ে যাবে। ফলে বহু বিপ্লবীর এবং আন্দোলনেরও দারুণ ক্ষতি হবে। তাঁরা ধরা পড়বেন। তখন দেশপ্রেমী রেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবের ও বিপ্লবীদের সম্পর্কিত তথ্যও সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল। পুলিশের হাতে কোন কাগজই গেল না।

ভূপেন্দ্রকিশোরের 'চলার পথে' বইটি ১৯২৯ সালে কলকাতার যুগমন্ত্র পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বইটি নিষিদ্ধ হয়। বাংলা সরকারের ১৯৩০ সালের ৩রা মার্চের গেজেটে বইটি বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়। পরে সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। এই বই কলকাতায় কোথাও আছে কিনা জানি না। অন্ততঃ আমি পাইনি।

খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও লেখক ভূপেন্দ্রকিশোরের একাধিক বই আছে। বিভিন্ন নিবন্ধ ও গল্পের মাধ্যমে তিনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। বিপ্লব আন্দোলনেও তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। জীবনের দীর্ঘদিন তাঁর কেটেছে ব্রিটিশের কারাগারে। ছাত্র আন্দোলনের তিনি একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। বি পি এস এ'র একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে তিনি গণ্য হতেন। তাঁর একাধিক বই আছে। বিপ্লব আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বই 'বিপ্লবতীর্থ'। 'বেণু' ও 'চলার পথে' পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতের 'চলার পথে' বইটিতে সাহিত্যগুণ আছে। তা 'পথের দাবী'র মতো বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। শরৎচন্দ্রের মতো ভূপেন্দ্রকিশোর বিপ্লবীদের মনের গভীরে ঢুকেছেন। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। আর আছে প্রেম বিশ্লেষণের স্বাভাবিক শক্তি। বিপ্লব আন্দোলনকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের রূপ দেবার চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা কোন্ আবেগে আকাঙ্ক্ষায় চালিত ছিলেন তার কিছু চিত্তাকর্ষক পরিচয় আমরা পেয়েছি 'পথের দাবী'র লেখক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'চলার পথে'র বিপ্লবী লেখক ভূপেন্দ্রকিশোরের আলোচনার মধ্যে। এই লেখাটি আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যে বিপ্লব ভাবাপন্ন সাহিত্যিকদের মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত আছে। এর ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে এটিকে আমরা প্রধানাংশে নিম্নে উপস্থিত করছি।

'...কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন তিনি—আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার 'চলার পথে' বইখানা: ওর introductionও আমি লিখে দিয়েছি, ও বইয়ের মারফতে বাংলার মেয়েদের বিপ্লব পন্থিনী হবার জন্য direct appeal তুমি করেছ; কিন্তু বলতো সত্যি করে, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, ছেলেদের মতো মেয়েরাও ওসব কাজ করতে পারে?

'আমি বিপন্ন বোধ করলাম। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলার সাহস শরৎচন্দ্রই দিয়েছিলেন। তাই নির্ভয়ে বললাম, বাঙলার মেয়েদের আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল করেই আপনি চেনেন। আমার লেখাটুকু পড়বার ধৈর্যও আপনার হয়েছিল। বইখানার introductionও আপনি লিখেছিলেন এমন কোন ধারণা থেকে, যে ধারণা দিয়ে ওর মাঝে সেই সুরই খুঁজে বার করেছেন, যার প্রতি দরদ আপনার কম নয়। অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় আপনারই। মিষ্টি হেসে শরৎচন্দ্র বললেন র‍্যাঙ্ক সিডিশান ছড়ালে তুমি, আর প্রশ্নোত্তর দেব আমি? গম্ভীরতর কণ্ঠে আরও বললেন—'চলার পথে'র introduction লেখবার সময় এ প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল তখন তো তোমার কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি, তুমি যে রইলে জেলে?

'আমি বললাম এ আপনার আশা বা কল্পনা নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস থেকে গল্পগুলো লিখেছিলাম বলেই ওর জন্য আশীর্বাদ চেয়েছিলাম আপনার কাছে। নইলে সাহিত্য রচনার দাবি নিয়ে সাহিত্য সম্রাটের কাছে দাঁড়াবার স্পর্ধা আমি করিনি। আমার কথাগুলো সব তাঁর কানে পৌঁছল না। সুদূর অন্যমনস্কতায় সুগভীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি।... স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘরখানাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রৌদ্রস্নাত তরুবীথি উর্ধ্বে দীর্ঘশাখা প্রসারিত করে কাঁপছিল। আকাশের নীলোজ্জ্বল ভাষায় শুনছিল তার আহ্বান। রূপনারায়ণের কলোচ্ছ্বাস মাথা খুঁড়ে মরছিল তীরের বুকে। শরৎচন্দ্রের দূরবাহী দৃষ্টি গেছে চলে ভবিষ্যতের আবছায়া তটে, দ্রষ্টার দৃষ্টিদীপে দূরান্তের জগৎ বুঝি বা প্রতিভাত। একটু পরে প্রগাঢ় সহানুভূতির কণ্ঠে বাক্যমধুর হয়ে উঠলেন শিল্পী। দীর্ঘকাল অন্তে আজও সে কণ্ঠস্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার কানে বাজে। না পারলেও তাদের তাঁর কথাগুলো তেমন সাজিয়ে বলতে মর্মার্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। কারণ, আমি তা আজও ভুলতে পারিনি।

'বলে চললেন তিনি: দ্যাখো, এ দেশটাকে আমি ভালবাসি। ভাল যে বাসি, একথাটা লক্ষ বার বলতেও আমার এতো ভাল লাগে। এদেশের ছেলে মেয়েগুলোকে ভালবাসি আরও বেশি। কেন এত ভালবেসে ফেলেছি, জানো ? ছোট বয়সেই ঘরের কোণে বন্দী থাকা আমার পোষাত না। ঐ মাঠঘাট, ঝোপঝাড় —ওরা ছিল আমার বাল্যের খেলাঘর। ঐ নদীনালা দূর প্রান্তর ওরা ছিল আমার কিশোরকালের স্বপ্ন। ঐ নরনারী ঘরছাড়া পান্থ—ওরা প্রত্যেকে আজও আমার মনের সঙ্গী। গোটা দেশই তাই ঘর হয়ে আমার ধরা দিয়েছে। এ সব বাদ দিয়ে আমার মুহূর্তের কল্পনাও 'আমার কল্পনা' হয়ে ওঠে না।....

'কিছুক্ষণ পর আবার বলে চললেন—দ্যাখো, এ আমি ভাবতেই পারিনে যে, পরের পায়ের তলায় পড়ে থাকুক এ দেশটা, এমন কামনা কোন ভারতবাসীর হতে পারে ! তাই তো অত্যুগ্র আত্মসম্মানবোধ থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে পন্থাকে বিচার না করে, তাকে আমি পরম আত্মীয় মনে করি। যাঁরা তার তথাকথিত উত্তেজনাকে লক্ষ্য করে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেন তাঁদের শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে—হঠাৎ চমকে ওঠা পৌরুষের যে দ্যুতি দেখে তোমার আতঙ্ক হল, সে যে অনাগত সম্ভাবনার অধিকারী মানবশিশুর অপ্রতিহত দ্যুতিশিখা। দাসসুলভ কাপুরুষতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তুমি, তোমার চোখে এ আলোক তো সইবে না ! তুমি চোখ বুজে প্রণাম করো শুধু মানব-শিশুকে—প্রবন্ধ লিখে নিজের কলঙ্ক বাড়িয়ো না।

'বাণীচঞ্চল শরৎচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন।...একটু পরে কণ্ঠে তাঁর ভাষা ফিরে এলো—হ্যাঁ কেন থাকব পরাধীন ? অথচ থাকতেই যে হচ্ছে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে। কিন্তু পথ-কুকুরের এ জীবনে দুঃসহ ঘৃণাবোধ কই ? হ্যাঁ, এই যে দীনতা এর মূলে রয়েছে নিজেদেরই পুঞ্জীভূত ত্রুটি। বহু ত্রুটির মাঝে অন্যতম ত্রুটি হল নারীর প্রতি আমাদের ব্যবহার, তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা।... আজকাল অনেক কণ্ঠেই সাম্যের বুলি শুনতে পাই। তাঁরা উইমেন্স 'সাফ্রেজ' ও 'স্যালভেশানে'র কথায় মুখর দুঃখী-দরিদ্রের দুঃখমোচনে ব্যস্ত, মজুর-কৃষকের বেদনায় কাতর। তাঁদের কথাগুলো ভাল। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস করতে পারিনে বলেই যত দুঃখ। তাঁরা জাতির কল্যাণ করতে চান। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে কল্যাণ আশীর্বাদ জাতি গ্রহণ করে না। দয়া-দাক্ষিণ্যের দিন চলে গেছে বহুকাল। কেউ কারও উপর অন্যায় যদি না করে, তবেই তো বাঁচোয়া। কিন্তু সে হতেই পারে না—যতকাল— যাদের উপর অন্যায় করা হয় তারাই আপন হাতে সে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করতে পারছে। এবং এভাবেই যথার্থ কল্যাণ সূচনা সম্ভব।... নারী করবে তার নিজস্ব কল্যাণ, চাষী মজুর দুঃখী নির্যাতিত আনবে তাদের নিজস্ব মঙ্গল। তুমি আমি উপকার করবার শুভ বুদ্ধি নিয়ে তাদের মাঝে গেলে শুধু মিশনারীদের মতই অপকার করে বসব। তাদের গ্লানিকে নিজের গ্লানি না ভাবতে পারলে ইংরেজদের দেওয়া 'ডোমিনিয়ান্ স্টেটাস' প্রত্যাশী ভারতীয়ের মত মিথ্যে-সম্বল-সুখীই হবে তোমার নারী সমাজ কিংবা অপর যে কোন শ্রেণী, যাদের কল্যাণ তোমার কামনা।

'সহসা থেমে গিয়ে একটু লজ্জিত হয়েই যেন শরৎচন্দ্র শুধালেন কি গা, 'বোরিং হয়ে উঠছ কি ?... নাঃ আজ আর কিছু বলব না।' অদ্ভুত রসবোধ ছিল এই মহান শিল্পীর। শ্রোতাকে ভুলে যেতেন না কথা কওয়ার কালে। তার ভাল লাগছে কি লাগছে না সেদিকেও খেয়াল রাখতেন তিনি শ্রেষ্ঠ কথকের মত।

'আমি হেসে উত্তর দিলাম—না বলে আপনি পারবেন না। বলার মুড্ এসে গেছে আপনার। আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন মুডে আপনাকে আজ পেয়েছি। শরৎচন্দ্রের মনতলে তখনো চলছে প্রলয় নৃত্য। তিনি স্থির হতে পারবেন কেন ? বলে চললেন অভিভূতের মত দ্যাখো, এদেশটাকে গভীর করে আমি দেখেছি। এর মানুষগুলো আমার পরিচিত। শুধু বাঙলা নয়, এই ভারতবর্ষ কবে থেকে মরতে বসেছে, জানো ? যেদিন থেকে এর পুরুষগুলো হয়েছে স্বার্থপর। এরা ষড়যন্ত্র করল মেয়ে জাতটার বিরুদ্ধে। মেয়ে ভক্তি করা শুরু করল এরা কথায়, কিন্তু ঘৃণা করতে আরম্ভ করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাজে। ফলে, কল্পনার জগতে নারী পেল দেবী'র আসন, কর্মজগতে স্থান হল তার হেঁসেলে। ও দুটোর কোনটাই নারীর অর্জিত বস্তু নয়—পুরুষের ইচ্ছানুরূপ পদবী লাভ। পুরুষ রচনা করল শাস্ত্র। পুরুষ বানাল বিধান। সেই শাস্ত্র ও বিধান অপৌরুষেয় আদর্শ হয়ে বেঁধে ফেলল নারীকে লুব্ধ করে। পুরুষ-রচিত পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কিন্তু নারীও যেদিন গর্ববোধ করল তার দেবী মাহাত্ম্যে, সেদিন থেকে নাভিশ্বাস উঠে গেছে জাতির।

'...দ্যাকো, দেশকে বাঁচাতেই যদি চাও, তবে নেমে এসো মাটির পৃথিবীতে। দেবদেবীর আসনে পুরুষ ও নারীকে বসিয়ে যে দুর্লঙ্ঘ্য পথের স্বপ্ন দেখছ, অ একান্ত মিথ্যে, একান্ত বিজ্ঞান-অসম্মত। এই ভারতবর্ষ জুড়ে সুমিত্রা ভারতীর মত মেয়ের দল গড়ে তোলো দেখি। দেখবে, এমন নারীকে যারা কর্মের সঙ্গিনী করেছে তারা কখনো পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে অসহায়ের মত দুঃখ ভোগ করতে দেখে স্বস্তি বোধ করছে না। অমন নারী-পুরুষেরা দেবতা নয়, অতিমানব নয়, অসহজ নয়, তারা মানুষ। মহত্ত্বে, শৌর্য্যে তারা শুধুই মানুষ। সুতরাং মানুষের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাদের যে যাত্রা, সেখানে অমানুষের খুঁড়িয়ে চলা বিলুপ্ত হতে বাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা যাঁরা উড়িয়ে গেছেন, তাঁরা কেউ দেবতা বা দেবী ছিলেন না—তাঁরা সব্যসাচী ও সুমিত্রারই মতো আত্মস্থ নর ও নারী ।'[১২]

মায়ের ডাক : 'মায়ের ডাক' নামে একটি গল্পের বইও বাজেয়াপ্ত হয়। এর লেখক : মণীন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রকাশক নিরঞ্জন রায়। ৪৮, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ'র ভারতী সাহিত্য মন্দির থেকে বইটি প্রকাশিত ও বসুমতী প্রেস মুদ্রিত। ১৯৩১ সালের ১৭ই মার্চে গেজেট ঘোষণায় 'মায়ের ডাক' বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মণীন্দ্র রায় ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী। ১৯৩৮ সালে কামাখ্যা পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষের সময় তিনি ধৃত হন। দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থেকেছেন। এর আগে ১৯২৫ সালে কাকোরী রেল স্টেশনে যে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়, তার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন এবং 'কাকোরী ষড়যন্ত্র' নামে একটি বইও লেখেন। ১৯৩৬ সালে ওই বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। কাকোরী রায় নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন (আগেই, প্রবন্ধ অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি)। বিপ্লবী মণীন্দ্র রায় পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড পত্রিকায় তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেন। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের তিনি একজন প্রথম সারির নেতা। আদর্শনিষ্ঠ, মণীন্দ্রনাথ একজন স্বাধীনচেতা সাংবাদিক হিসাবেও খ্যাত ছিলেন।

নির্দেশিকা

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' পৃঃ ৫১৮
২। Records preserved in State Archives, Writers' Buildings, Calcutta.
৩। I bid
৪। I bid
৫। সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য'
৬। Records preserved in State Arehives, Writers Buildings, Calcutta.
৭। I bid
৮। Fl. No. 5s-2/39, 1939, Home Dept. Political Branch, Govt. of Bengal.
৯। I bid
১০। I bid
১১। I bid
১২। I bid
১৩। I bid
১৪। I bid

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫ । I bid
১৬ । I bid
১৭ । I bid
১৮ । ইন্দ্রমিত্র, ব্রিটিশ আমলে 'পথের দাবী', পৃ ২
১৯ । I bid
২০ । FL. No. 605/25 of 1926, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
২১ । FL. No. 605. K. W. of 1929
Bengal Legislative Council Proceedings ,26th session, 1927, PP 27-28.
২৩ । I bid
২৪ । I bid
২৫ । I bid
২৬ । Report on Newspapers and Periodical in Bengal for the week ending in January, 1927, P. 39
২৭ । Fl. No. 146/27, 1927, Home (Pol.) Beng. Govt.
২৮ । Report on Administration of Bengal, 1926-27, P. 249
২৯ । ইন্দ্রমিত্র, 'ব্রিটিশ আমলে পথের দাবী', পৃঃ ২৯ এবং প্রবাসী ১৩৩৫ শ্রাবণ।
৩০ । শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, দশম সম্ভার,
৩১ । অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা'
৩২ । উত্তরা, আষাঢ়, ১৩৩৭
৩৩ । Bengal Legislative Council, Official Report of the First Session, 1938. Vol. No. 1, P-2-3.
৩৪ । I bid
৩৫ । FL. No. 401/40, 1940, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.
৩৬ । I bid
৩৭ । I bid
৩৮ । হিরন্ময় ভট্টাচার্য, 'নির্বাসিত সাহিত্য', পৃ ১৪৯
৩৯ । সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২
৪০ । FL. No. 14-1, Home (Pol.) No. F/3659-C, Beng. Govt.
৪১ । F L. No. 141/28, Home (Pol.) Beng. Govt.
৪২ । ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব', পৃ ৩০৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ অধ্যায়: নিষিদ্ধ নাটক

স্বদেশী যুগে দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল প্রবন্ধ ও উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা গান, কবিতা, নাটকও। বাংলা নাটক ও তার প্রাণবন্ত অভিনয় জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যতটা প্রভাবিত করেছিল এমন আর কিছু করেনি। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা, তাতে নাটকের বিপুল প্রভাব ও অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে বলেছেন

"বস্তুতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময় বক্তৃতা যা করতে পারতো না, সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের একবার মাত্র অভিনয়ে তা সম্ভব হত।"

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তৎকালীন জনচিত্তে দুর্বার প্রভাব সৃষ্টি করে। তাঁর নাটকগুলিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বর্ণনা ছিল। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করেন। ইতিহাসের মর্যাদা রেখে তিনি অনেকস্থানে ইংরেজের প্রশংসা করেননি তা নয়, তবু তাঁর রচনায় ইংরাজের অপরাধ এতই গুরুভার যে তাকে ঢাকবার জন্য সরকার নাটকগুলির কণ্ঠরোধ করেন। ১৯১১ সালের ১৮ই জানুয়ারি গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি নাটক নিষিদ্ধ হয়—'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'। ১লা ফেব্রুয়ারির গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এ সম্পর্কে আছে

Whereas it appear to the Lieutenant Governor that Publications mentioned below contain words of nature described in Sec. 4, sub section (1), of the Indian Press Act, 1910 (1 of 1910), in as much as they have a tendency to bring into hatred and contempt His Majesty or the Government established by law in British India, or any Class or Section of His Majesty's subjects, or to Excite disaffection towards His Majesty or the said Government :

Now, therefore, in excercise by section 12, Sub-section (1) of the said Act, the Lieutenant Governor hereby declare the said Publication to be forfeited to His Majesty.

(১) ছত্রপতি শিবাজী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(২) মীরকাসিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(৩) সিরাজদ্দৌলা— "

ওই তারিখের গেজেট ঘোষণায় আরও ৮টি বই নিষিদ্ধ হয়। তার মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দুটি নাটকও (নন্দকুমার ও পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত) আছে।

১৮৪৪, ২৮শে ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্র বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। এন্ট্রান্স পাশ করতে না পেরে তিনি স্কুলের পড়া ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁর প্রবল অধ্যয়নস্পৃহা থাকায় তিনি বহু বই পড়েন। বাংলা-ইংরাজী দুই-ই। ১৮৬৭ সালে একটি যাত্রার দল গড়ে তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় করেন। বাগবাজারে তিনি একটি রঙ্গমঞ্চও স্থাপন করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেন। মৌলিক রচনার আগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী', মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' প্রভৃতির নাট্যরূপ দেন। তাঁর লেখা নাটক 'আগমনী' ১৮৭৭ সালে অভিনীত হয়। এর তিন বছর পর তিনি সওদাগরী অফিসের চাকুরী ছেড়ে পুরোপুরি অভিনয়ে যোগ দেন। স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনুর, প্রভৃতি থিয়েটারে তিনি পরিচালক, অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে আসীন ছিলেন। আমৃত্যু মিনার্ভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ৮০টির বেশী নাটক রচনা করেন। সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন 'দক্ষযজ্ঞ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'কালাপাহাড়', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি। তাঁর ম্যাকবেথের অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা হয়। তিনি বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য গিরিশচন্দ্র ১৯১২ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আগমন ও দেশাত্মবোধ বিকাশে তাঁর অবদানের চিত্রটি অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চমৎকারভাবে লিখেছেন প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি বলেছেন যে, জাতীয় জাগরণের এই যুগে (১৯০০-১৯০৭) গিরিশের অবদান কোন নেতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।[২]

জনমত গঠনে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর প্রভাবিত নাট্যশালার ভূমিকা সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য "লোকমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য ইংরাজের অনুকরণে এদেশে দেশীয় সংবাদপত্র যে-কাজ করিয়াছে—গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা তদপেক্ষা যে কত অধিক কাজ করিয়াছে, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসজ্ঞ সুধীমাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাংলায় এই দেশাত্মবোধ, এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে শত শত বৎসরের মোহাপসারণের চেষ্টা, ইহাতে অপাঙক্তেয় বাংলার নাট্যশালার কতখানি দাবি আছে, বাঙালীর প্রথম সাধারণ নাট্যশালার নাম নির্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার প্রথম নাট্যশালার নাম ন্যাশনাল থিয়েটার। ন্যাশনাল কংগ্রেস—ন্যাশনাল থিয়েটারের পরে সৃষ্ট। হেম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-বিলাপ', 'ভারতমাতা'—এই ন্যাশনাল থিয়েটরের মঞ্চ হইতে গিরিশচন্দ্রের দ্বারা শিক্ষিত অভিনেতৃমুখে উচ্চারিত হইয়া দর্শকহৃদয়ের যে লুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগাইয়া তুলিত—কে বলিতে পারে তাহারই ফলে সেই দর্শকবৃন্দের উত্তরপুরুষগণ আজ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী হইয়াছেন কিনা ? যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত—যদি গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহারা দর্শকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ না করিত—তাহা হইলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র এত সহজে, এত অল্লায়াসে আজ কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত আলোড়িত করিতে পারিত কিনা কে বলিবে ?"

এইরূপে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙালী জাতিকে, তাহার প্রাণের তারে যে সুর অনাহত অবস্থায় ছিল, সে সুরে সুর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছেন, মাতাইয়াছেন, আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাই যেমন বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র—দুই যুগাবতার।"[৩]

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯০৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। এর আগে 'বলিদান' নাটকটি গিরিশচন্দ্র সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর তিনি ঐতিহাসিক নাটক 'রানা প্রতাপ' লেখায় হাত দেন। ইতিমধ্যে ডি এল রায়ের 'রানাপ্রতাপের' রিহার্সাল স্টারে শুরু হয়। তখন তিনি 'রানা প্রতাপ' অসম্পূর্ণ রেখেই 'সিরাজদ্দৌলা লেখা শুরু করেন। এ সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন

'গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন, তিনি এই নাটক লিখিবার উদ্দেশ্যে তথা এবং অন্যস্থান হইতে তৎসাময়িক ইতিহাস আনাইয়া সিরাজ চরিত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাশি-রাশি পুস্তক অধ্যয়নের পর 'সিরাজদ্দৌলা'র লেখা আরম্ভ হইল।'[৪]

'সিরাজদ্দৌলা' ও মীরকাসিম'—এই দুই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দর্শনে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিরিশকে পত্র লেখেন। তাঁকে বলেন : "···মোটের উপর আপনি যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই,—লিখিতে লিখিতে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি, নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না। পড়িতে পড়িতে অশ্রু বিসর্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বর্ষণ করুন।"

সিরাজদ্দৌলা পাঠ করিবার পর 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি নবীনচন্দ্র অভিনন্দন জানিয়ে গিরিশচন্দ্রকে পত্র লিখেছিলেন (১৯০৬, ২৫ ফেব্রুয়ারি)।[৫]

সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলিতে লেখেন (১৯০৬, ২৩শে জুন)

'Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama, 'Mirkasem', which was put on the boards of the 'Minerva' Theatre for the first time on Saturday last, has been a phenomenon success, both from the historical and literary point of view.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'......Both the above dramas not only fetched fabulous sums of money, but contributed considerably to the growth of the national movements of Bengal. They change the mentality of the people who for the first time saw before our eyes 'what history of Bengal is and how uptill now we had simply committed to memory incorrect things that have been put to our mouths as to parrots'.

স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয় (১৭-২-১৯০৬)

"The company at this Theatre has been playing Serajud-Dowlah, by G. C. Ghose, for the past five months with unabated success. The author himself takes the part of Karim Chacha, Clive is represented by Mr. K. Mitter, and the remaining characters are well placed. s.c."

লোকমান্য তিলকও সিরাজদ্দৌলার অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। খাপরাদেকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০৬ সালের জুন মাসে তিনি মিনার্ভায় যান ওই নাটক দেখতে। এবং দুজনেই মুগ্ধ হন সিরাজদ্দৌলা দেখে।

দেশাত্মবোধ জাগরণে সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন নাট্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : 'স্বদেশীর সময় সভা-সমিতিতে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কতকটা যন্ত্রচালিতের মত। সকলে করিতেছে, গড্ডলিকা প্রবাহে আমিও করিতাম। বোধহয় শীঘ্রই ইহার মর্ম্ম ভুলিয়া যাইতাম, যেমন অনেকে গিয়াছে। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চ তা হইতে দেয় নাই। ...সেইবার সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের অভিনয় দেখিয়া প্রকৃত জাতীয়তার সন্ধান পাইলাম। বুঝিলাম মিথ্যা ইতিহাসে আমাদের চিত্ত কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে, আমরা মনে করি ইংরেজের ন্যায় এত উপকারী আমাদের আর কেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে 'স্বদেশী' ও জাতীয়তা ঠিক বুঝিতে পারিলাম, সেই অবধি এই চল্লিশ বৎসর সেই শিক্ষারই প্রভাব সমভাবে চলিয়াছে। জাতীয় হৃদয় লইয়া যে দেশবন্ধুর আহ্বানে তাঁহার পতাকাতলে সমাসীন হইয়াছিলাম...সবেরই মূলে গিরিশচন্দ্রের এই অমূল্য নাটক দুইখানি ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ।'[৪]

সিরাজদ্দৌলার বিপুল সাফল্যের পর গিরিশচন্দ্র 'মীরকাসিম' ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩১৩, ২রা আষাঢ় 'মীরকাসিম' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। সিরাজদ্দৌলার মত মীরকাসিমের অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

'মীরকাসিম' নাটক সাত মাস ধরে প্রত্যেক শনিবার 'মিনার্ভায়' অভিনীত হয়েছিল। দর্শকের ভীড়ে মীরকাসিম সিরাজদ্দৌলাকেও ছাড়িয়ে যায়। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও নবাব মীরকাসিমের পতন ও ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয় এই নাটক দু'টিতে চিত্রিত হয়েছে। ১৯১১, ১৮ই জানুয়ারি সরকার মীরকাসিমের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় মীরকাসিমের ভূয়সী প্রশংসা হয়। ১৯০৬, ২৩শে জুন 'বেঙ্গলী' লেখেন

"...The piece abounds with diverse and complex characters, all of them very skilfully marshalled to produce an excellent stage effect, which one must see to fully realise it."

'বসুমতী' গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাসিম' সম্পর্কে লেখেন (১৩১৩, ৩০ আষাঢ়) "গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্য সাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন ; এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমের পাকা সোনায় গঠিত।..."

এ সম্পর্কে নাট্য-সমালোচকের মন্তব্য 'Serajuddoula went on drawing each night crowds to its fullest capacity till 'Mirkasem', another powerful drama of Girishchandra was put on the board of the Minerva on the 16th June, 1906. The drama was also quite suitable for the time and was appreciated by the public.'[৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিরিশচন্দ্রের আর একটি নিষিদ্ধ নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী' মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয় ১৩১৪ সালের ৩২শে শ্রাবণ। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত তালিম দিয়ে তিনি কোহিনূরে যোগ দেন। মিনার্ভার পরবর্তী অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ছত্রপতি শিবাজী একই সঙ্গে মিনার্ভা ও কোহিনূরে অভিনীত হতে থাকে। এতে নাট্যজগতে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। কোহিনূরে আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় অতুলনীয় হয়। এ সম্পর্কে বঙ্গবাসী লেখেন 'তাঁহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ডলে।'

এই নাটক সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলীতে লেখা হয় 'Chhatrapati is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian stage.'

বসুমতীতে লেখা হয় (১৩১৪, ৪ঠা আশ্বিন) 'তাঁহার উর্বর কল্পনার লীলা কোথাও ইতিহাসের সত্যকে ব্যর্থ বা ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুদ্র লেখক অতিরঞ্জনের প্রলোভনে শিবাজীর প্রকৃত মূর্তি বিকৃত করিয়া ফেলিত। গিরিশচন্দ্র তাহা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। শিবাজীর কনিষ্ঠা মহিষী পুতলীবাঈ ও স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণ যুবক গঙ্গাজী গিরিশবাবুর নূতন সৃষ্টি ইহারা শিবাজী চরিত্রের দুইটি বিভিন্ন বিশেষত্ব—যেন শিবাজীর অন্তর হইতে মনুষ্যমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথাও তাঁহাকে কর্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছে, কোথাও মৌন ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছে। শিবাজীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন শিবাজী দেশবিশেষে, যুগবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ধরাতলে যখন অত্যাচার প্রবল হয়, দরিদ্র উৎপীড়িত হয়, দেবমূর্তি চূর্ণ হয়, সতীলক্ষ্মীগণ পাষণ্ডহস্তে নিগৃহীতা হন,—তখনই সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন, এইজন্যই শিবাজী শিবশক্তিসম্ভূত শঙ্কর অংশ। গিরিশবাবু শিবাজীজননী জিজিবাঈকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির মাতৃত্বের বরণীয় আদর্শ সেইরূপ মহনীয় হওয়া কর্তব্য। গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সংযত কল্পনার সকল শক্তি, সকল জ্যোতি ঢালিয়া এই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্র দেশনায়কের উজ্জ্বল চিরপূজ্য বরণীয় মহনীয় দেবমূর্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। নাটক কোনরূপেই ইহা অপেক্ষা ইতিহাসের অধিক অনুবর্তী হইত না।'

'স্টেটসম্যান'ও 'ছত্রপতি শিবাজী'র বিপুল জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে ১৯০৭ সালের ১৭ই নভেম্বর সংখ্যায়।

মারাঠী পণ্ডিত ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর সম্পাদিত 'হিতবাদীতে লেখেন "মহারাষ্ট্রীয়েরা ছত্রপতি শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার সহচর ও কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে। জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে ঐ সকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি সুসময়েই এই নাটকের প্রচার করিয়াছেন, বাঙালীর জাতীয় ভাব বর্দ্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।"

গিরিশচন্দ্রের এই তিনটি ঐতিহাসিক নাটকই রাজরোষে পড়েছিল। তিনটি নাটকেরই অভিনয় ও প্রচার নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি হয়। এই নাটকগুলি সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের কিছু কিছু নজির সরকারি ফাইল থেকে পাওয়া যায়। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে লেখা হয়

'This is a historical drama by Girish Chandra Ghosh. It narrates the event which culminated in the overthrow of Nawab Siraj- ud-Doulah the last independent Nawab of Bengal.'

মীরকাসিম—'This is a historical drama by Girish Chandra Ghosh. It depicts the tamultuous period that followed on the occasion of Mirkasim to the throne of Bengal and the strenuous fight which he had with the East India Company to protect indigenous industries.'

এবং ছত্রপতি শিবাজী—is a historical play delineating the life and character of Sivaji, the great founder of the Marhatta Kingdom of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Decan The author is Girish chandra Ghose.'

গোয়েন্দা বিভাগের (সি. আই. ডি) রাজনৈতিক শাখা দেশাত্মবোধক বাংলা নাটকগুলি সম্পর্কে ১৯১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মন্তব্য করেন। সেটি বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ফাইলে (ফাইল নং ৪৭/১২) আছে।[৭] তা হল ছত্রপতি শিবাজী—'The play protraying the life of শিবাজী in glowing colour, and containing objectionable allusions to the condition of India at present time. proscribed under Sec 4(1). Press Act and 3. Dramatic Performances Act (Notification Nos 79 N and 80 N of the 18th January, 1911). Legal Remembrancer also considers performances liable under Section 124 A and 153A, IPC.'

মীরকাসিম : 'The historical drama calculated to harmonise relations between Hindus and Muhammadans and excite hatred towards the British Nation. Some of the passages disloyal.

'Proscribed under Sec 5 (1) Press Act, and Dramatic Performance Act. (Notification Nos 79 N and 80N, dated the 18th Jan. 1911). Legal R. also considers performance liable under sec. 124A and 153A, IPC.'

সিরাজদ্দৌলা "Forfeited under the Indian Press Act, 1910. Performance has been prohibited under the Dramatic performance Act XIX of 1876."

এই তিনটি নাটকই 'held objectionable vide Government letter No.559P dated the 25th January, 1911 in which the Government further directed that if an attempt is made to stage the play resort should be had to section 3 of Act 19 of 1876.'[৮]

এই তিনটি নাটকেরই প্রকাশক ও মুদ্রক হলেন যথাক্রমে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী। কলকাতার ৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ছাপা তিনটি নাটকই।

এই নাটকগুলির অভিনয়ের উপরও শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি,। এর মুদ্রণ ও প্রকাশনাও নিষিদ্ধ হয়। ভারতীয় প্রেস আইনের (১৯১০) ৪ ধারার ১ উপ-ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[৯]

গিরিশচন্দ্রের এই বাজেয়াপ্ত নাটকগুলি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯৩০ সালের ৫ই আগস্ট আবেদন জানান। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সম্পাদককে লেখা এক পত্রে তিনি ওই আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ওই আবেদন রক্ষা হয়নি। ১৯৩০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের এক পত্রে তাঁকে জানানো হয় যে, সরকার ওইসব নাটক থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে চান না।[১০]

'Government are not prepared to withdraw the ban on three dramas.'

সেই পত্রের বয়ান

To
The Secretary
Government of Bengal
Political Department

Sir,

I beg to bring to your kind notice the following fact for your kind consideration:—

That I am the Author of Girish Prativa—a commentary of the life and writings of Late poet Girish Ch. Ghose, who is recognised as the greatest dramatist of Bengal and my book in English 'A History and Development of the Bengal Stage' is also now ready for the press.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

That the said dramatist Girish had a large number of dramas which are even now recognised as unique and they have a high place in the literature of Bengal.

That the said dramatist Girish was the author of three excellent dramas, Serajuddulla, Mirkasim and Chhatrapati Shivaji which were afterwards ordered to have been proscribed by the Government of Bengal.

That sometimes after three dramas of late Mr. D.L. Roy—Durgadas, Mevarpatan and probably Rana Pratap were also proscribed by the Government and were soon after allowed to be staged.

That the Government has no bias against the dramas is amply proved by the fact that as Biographer I asked Government's permission to allow me to read the above proscribed dramas in the Imperial Library and insert the commentary on the above dramas in the biography after previously submitting the same to the Government and when I submitted the commentary, Government allowed to have the whole thing printed. The same commentary by me on the proscribed dramas form now part a popular chapter of Girish Prativa which has been appreciated and patronised by even the Education Department, Bengal.

That the dramatic world loses the privilege of staging the three excellent dramas and I am sure that there is no apprehension of any excitement in the people if the three dramas are allowed to be staged, with any portion amended, altered or withdrawn as will be thought proper and suitable by the Government.

That a drama Gairik Pataka on the life of Shivaji is now being staged at the Monomohan Theatre and Girish's Chhatrapati on the same subject is not stronger in language nor can any exception be taken to its sentences.

That Babu Surendra Nath Ghosh (Dani Babu) the renowned actor of Bengal on the Stage is the only son and successor of the dramatist Girish Chandra and he has authorised me as will appear from the annexure to do the needful on his behalf in the matter and all correspondence may be addressed to me.

That if by arrangement any passage need be altered I may personally see the authority and settle everthing.

Under the above circumstances I most sincerely pray that you will be gracioulsy pleased to withdraw procscription of the above dramas and allow the books to be staged.

Dated the 5th August 1930

এই তিনটি নাটকের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারে গিরিশচন্দ্র অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। সেজন্য ইংরেজ সরকার বেসামাল হয়ে এই সবের প্রচার বন্ধ করে দেন। এগুলিতে তেমন তীব্র ইংরেজ বিরোধিতা ছিল না, ছিল কেবল দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগানোর ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের লেখনী ও অভিনয় কি বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল সমসাময়িক নানা মন্তব্যে তা সুস্পষ্ট। ভারতীয় নাট্যমঞ্চে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন 'ভারতত্যাগ কথায় সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্বে গিরিশের লেখনীতেই সেই বাণী প্রথম প্রচারিত হয়। জাতীয়তা আগের নাটকে থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম বিদেশীর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গিরিশই প্রথমে শিক্ষা দেন। আর সেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ব্যাপারে সম্বলিত ইতিহাসমূলক নাটক সেই যুগে একমাত্র গিরিশের লেখনী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল'।[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজীর পর গিরিশচন্দ্র আর একটি ঐতিহাসিক নাটক 'ঝাঁসীর রাণী' লিখিতে হাত দেন। কিন্তু সরকারের চাপে বন্ধ করেন। সে তথ্য পাই গিরিশ জীবনীকারের লেখায়

' বসন্তাগমনেশরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি 'ঝাঁসীর রাণী' নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। দুই অঙ্ক লেখা শেষ হইবার পর একদিন কোনও উচ্চতম পুলিশ কর্মচারী কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং গিরিশচন্দ্র 'ঝাঁসীর রাণী' লিখিতে বিরত হইয়া একখানি সামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।'[১১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মেবারের স্বাধীনতা সূর্যকে অমলিন রাখার জন্য রাণা প্রতাপসিংহ ও অন্যান্য রাজপুত বীররা মোগলদের বিরুদ্ধে যে নিরবচ্ছিন্ন ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন, পরাধীন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের কাছে তা ছিল প্রেরণাস্বরূপ। বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রতাপ যখন মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৭২) তার চার বছর আগেই রাজধানী চিতোর মোগল সম্রাট আকবরের দখলে চলে গিয়েছিল। এর আগে প্রতাপের বীর, স্বাধীনচেতা পিতা উদয়সিংহও মোগলদের সঙ্গে লড়ে যান মেবারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে। অন্য রাজপুত রাজারা একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রতাপের কাছেও আকবর তিনবার দূত পাঠালেন। তিনি ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন মোগলদের প্রধান সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহ। প্রতাপ এই যুদ্ধে (হলদিঘাটের যুদ্ধ ১৫৭৬) পরাস্ত হলেন। কিন্তু বশ্যতা মেনে নিলেন না। অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে সপরিবারে আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে রইলেন। মেবারের সব দুর্গ একে একে আকবরের কবলে গেল। প্রতাপ হাল ছাড়লেন না। অদম্য দুর্জয় প্রতাপ ভীত ও অধীন সামন্তদের নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। চিতোর ও মণ্ডলগড় ছাড়া সব দুর্গই তিনি মোগলদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন আবার। প্রতাপ ও অন্যান্য রাজপুত বীরদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক কবিতা, নাটক প্রভৃতি লেখা হয়েছে। ওইসব লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের প্রেরণা দিয়েছে। তাই বারবার ইংরেজদের কোপে পড়েছে।

রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর পটভূমিতে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের একাধিক নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। যেমন, রাণাপ্রতাপ, মেবার পতন ও দুর্গাদাস। ১৯১০ সালের ১০ জুন তারিখের আদেশানুসারে ওইসব নাটকের অভিনয় ও প্রচার নিষিদ্ধ হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে যেসব উক্তি আছে তাতে গোঁড়া মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয়। সরকার সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আদেশ জারি করেন

"The plays are not seditious but tend to promote hatred between Hindus and Muhammadan and fall within Sec. 153, Indian Penal Code and the Press Act. Pratap Singh. Mewar Patan and Durgadas have been written by D. L. Roy, Deputy Magistrate and it is a improbable that he intended by these writings to put class against class. It will probably be sufficient to tell the author to withdraw the book from circulation and direct the police to prohibit the performance of the play in Bengal and East Bengal Districts."

'মেবার পতন' সম্পর্কে নোটে বলা হয়েছে : 'May cause offence to Muhammadans and considered by Legal Remembrancer to fall within Sec. 4(1), Press Act, and 153A, Indian Penal Code proposed to ask the author to withdraw the book from circulation."

১৯০৫ সালের ২২শে জুলাই স্টারে রাণা প্রতাপ মঞ্চস্থ শুরু হয়। জনজীবনে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির অসামান্য সাফল্য ও প্রভাবই সরকারকে চিন্তিত করে তোলে। ইংরেজ শাসনের অবসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ও দেশাত্মবোধের যে প্রেরণা ওই নাটকগুলিতে ছিল, তাই আসল কারণ এগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগ অজুহাত মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি সে সময়ে কী দারুণ আলোড়ন তুলেছিল তা লিখেছেন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসকার। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, উত্তেজনা এত তীব্র হয় যে, প্রথম রজনীতে চারশ লোক হলে স্থান না পেয়ে ফিরে যান। তিনি আরও লিখেছেন এমন কি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের আগেই অমর রাজপুত দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ তৎক্ষণাৎ শিক্ষিত লোকেদের আবেগের কাছে আবেদন জানায়।

তাঁর 'রাণা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন' তিনটি নাটকেই দেশপ্রেমের আদর্শ মূর্ত। তাঁর 'মেবার পতন' সম্পর্কে ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এই নাটকটিরও বিপুল সাফল্য হয় এবং এর দেশাত্মবোধক গানগুলি দারুণ প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩-১৯১৩) কৃষ্ণনগরে জন্ম। ১৮৮৪ সালে এম এ পাশ করে কৃষি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। সেখানে কিছু ইংরেজি কবিতা লেখেন। প্রথমদিকে তাঁর বাংলা কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা মন্ত্র'। তাঁর 'আমার জন্মভূমি', 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানগুলি দেশকে মাতিয়ে তোলে। তিনি কয়েকটি নকসা ও প্রহসন লেখেন 'একঘরে', 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'আষাঢ়', 'হাসির গান' তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতার বই। 'পাষাণী' নামে একটি কাব্যনাট্যও তিনি লেখেন। তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলি : 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'রাণা প্রতাপ সিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), নূরজাহান' (১৯০৮), 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন'। অন্যান্য গ্রন্থ 'সীতা', 'ভীষ্ম (কাব্যনাট্য)','পরপারে', 'বঙ্গনারী (সামাজিক নাটক)', 'পুর্নজন্ম' (প্রহসন), 'সোরাব রুস্তম','সিংহল বিজয়' (পৌরাণিক নাটক), 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' (কাব্যগ্রন্থ)। কবি, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকগুলি ভাল নিবন্ধ লিখেছেন। প্রশাসক হিসাবে তিনি দক্ষ ছিলেন। ছাত্র হিসাবে ছিলেন মেধাবী।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এ যুগে আরও কয়েকজন নাট্যকার এগিয়ে এসেছিলেন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বেছে নেন নাটক ও নাট্যশালাকে। তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দেশবাসীকে জাগাতে একের পর এক নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। পদ্মিনী (১৯০৬) নাটকে তিনি ভীমসিংহের মুখে দেশের অনৈক্য ও বিভেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এবং পুরোহিতের মুখে তিনি জাতির মনুষ্যত্ব সাধনার কথা বলেছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' একই যুগের পটভূমিতে লেখা ইংরেজ শাসনের পত্তনের যুগ। এই যুগে বাঙালীর জাতীয় চিন্তার অভাবের কথা তিনি মীরকাসিমের মুখে বলেছেন।

'নন্দকুমার' নাটকে তিনি বাসুদেবের মুখে দেশে শ্রী ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন।

শুধু 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'নন্দকুমার', 'পদ্মিনী' বা 'প্রতাপাদিত্যেই নয়' 'বাঙ্গলার মসনদ'ও (১৯১০) তাঁর দেশপ্রীতির স্বাক্ষর।

ঐতিহাসিক নাটকগুলি ছাড়া 'দাদা ও দিদি' (১৯০৮) রঙ্গনাট্যেও ক্ষীরোদপ্রসাদ রূপকের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা এতই তীব্র ছিল যে, ইংরেজ সরকার নিজেদের দোষ চাপতে নাটকটির প্রকাশনা, মুদ্রণ ও অভিনয় বন্ধ করে দেন।

ইংরেজ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশার পটভূমির উপর এটি রচিত। এতে সমালোচনা করা হয়েছে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য

'ক্ষীরোদপ্রসাদ ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে 'দাদা ও দিদি রঙ্গনাট্য রচনা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশনেতাদের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশবাসীকে আপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুরবস্থা ও দেশের নিঃস্ব রূপটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইংরেজরা পূর্বে কি উপায়ে ভারতবাসীকে অবক্ষয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং সমকালেও একই উপায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে—তার চিত্রটি তিনি নিরাভরণভাবে তুলে ধরেন। রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে সমালোচকের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ তিনি নিপুণ হাতে নিক্ষেপ করেন।'[১৩]

শিক্ষিত বাঙালীদের বিদেশী পণ্য ব্যবহারের প্রবণতারও ব্যঙ্গ করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটকে। বিদেশী দ্রব্যের প্রতি লালসা দেশবাসীকে গ্রাস করছিল, নাট্যকার তার বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ করে দেন। দলাদলি কিভাবে ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধি করছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর চিত্র এঁকেছেন নিপুণভাবে, বিদেশীয়ানার নকলের সঙ্গে মদ্যপান বেড়ে যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে 'দাদা ও দিদি'তে ধিক্কার আছে। এই রঙ্গনাট্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশবাসীর অন্ধ প্রমত্ততা, হীন অনুকরণপ্রিয়তা, আলস্য ও পরনির্ভরতা এবং ফিরিঙ্গী বণিকদের শোষণের রূপটি তুলে ধরেছেন।

তাঁর 'দাদা ও দিদি' সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট 'one of the plays taken off the Calcutta stages by arrangement between the theatre managers and Calcutta Police in 1910. It is described as a thinly vested seditious allegory.'[১৪(ক)]

গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাঁর 'পদ্মিনী' নাটক নিয়েও ফাইল চালাচালি হয়। তবে L.R. এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না নেবার সুপারিশ করেন।

নন্দকুমার সম্পর্কে সরকারী ফাইলে আছে 'Proscribed by Govt. under Sec. 4(1) Press Act, and 3, Dramatic Performance Act. (Notification Nos. 79N and 80N, dated the 18th Jan 1911. Also considered by Legal. R to cons. under Sec. 124A and 153A I. P. C.

Based on incidents allged to have led to the execution of Maharaja Nandakumar. Taken off the boards by a Threatrical company in Calcutta by arragement with the Commissioner of Police.'

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) ১৮৬৩ সালের ১২ই এপ্রিল খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুচরণ ভট্টাচার্য শিরোমণি। ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন বিদ্যায় এম এ পাশ করেন। ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৫৮। তাছাড়া তাঁর বহু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর আলিবাবা (১৮৯৭) রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। তাঁর পৌরাণিক নাটক ভীষ্ম (১৯১৩) ও নর-নারায়ণ (১৯২৬) রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘদিন অভিনীত হয়। জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩) রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ্য রঘুবীর (১৯০৩), পদ্মিনী (১৯০৬), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), বাঙ্গলার মসনদ (১৯১০) সাজাহান (১৯১২), আহেরিয়া (১৯১৫), বঙ্গে রাঠোর (১৯১৭), আলমগীর (১৯২১)।

ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। 'অলৌকিক রহস্য' নামে একটি মাসিক পত্রেরও তিনি সম্পাদনা করেন। ১৯২৭ সালের ৪ জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন।

মুকুন্দদাস

মুকুন্দদাস প্রতিভাবান নাট্যকার নন। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামে কোনো গৌরবময় অধ্যায় লিখিত হবে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ তিনি তাঁর রচনা, অভিনয়, সঙ্গীত ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রচণ্ড দেশাত্মবোধের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রবলতা সন্ত্রস্ত করেছিল সরকারকে। সেজন্য তাঁর কণ্ঠরোধে ব্যাপক ব্যবস্থা সরকার করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথমত তাঁকে কারারুদ্ধ করে, দ্বিতীয়ত তাঁর নাটক ও অভিনয় নিষিদ্ধ করে। তাঁর সম্বন্ধে সরকার কতখানি বিচলিত ছিলেন, তার প্রমাণ দীর্ঘকাল তাঁকে কারাগারে আটক রাখা হয় এবং তাঁর কয়েকটি বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটি বিশেষ কারণে তিনি সরকারের কাছে অতিরিক্ত ভীতিপ্রদ হন। দেশাত্মবোধকে যাত্রার মাধ্যমে তিনি গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। যার ফলে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র জাতীয় জীবনের আন্দোলন হয়ে উঠছিল, কেবল শহরনিবদ্ধ কিছু বুদ্ধিজীবীর বক্তৃতা বিস্ফোরণ নয়।

মুকুন্দদাসের 'কর্মক্ষেত্র' নাটকটি ১৯৩২ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখের গেজেট ঘোষণায় নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারায় বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। বরিশালের আদর্শ প্রেসে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম থেকে লেখক মুকুন্দদাস কর্তৃকই বইটি প্রকাশিত।

কর্মক্ষেত্র (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ) ১৯৩২ সালের ১১ই জুলাইয়ের গেজেট ঘোষণায় নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কর্মক্ষেত্রের দ্বিতীয় সংস্করণটি বরিশালের অভ্যুদয় প্রেস এবং তৃতীয় সংস্করণটি বরিশালের বাসন্তী প্রেস থেকে ছাপা। দুটি সংস্করণেরই প্রকাশক লেখক মুকুন্দদাস কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম থেকে।

মুকুন্দদাসের 'পথ' নাটকটি ১৯৩২ সালের ২০শে এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে নাটকটি নিষিদ্ধ হয়। (বেঙ্গল নং ১১৬৬৮-৮০পি) এটি বরিশালের আদর্শ প্রেসে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম থেকে লেখক মুকুন্দদাস কর্তৃক প্রকাশিত।

এই মুকুন্দদাসের আরও দুটি বই বাজেয়াপ্ত হয়—কর্মক্ষেত্রের গান এবং পথের গান। ১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বরের গেজেট ঘোষণায় 'কর্মক্ষেত্রের গান' বইটি (তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ) বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা), ১৯৩১ আইনের ১৯ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বরিশাল থেকে লেখক মুকুন্দদাস কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ১৯৪৮ সালের ৫ই এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায় বইটি বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার হয়। 'পথের গান' বইটি নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে বই বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। বরিশাল থেকে মুকুন্দদাস কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ১৯৪৮ সালের ৫ই এপ্রিলের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে ওই বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার হয়।

মুকুন্দদাসের প্রথম যে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়, তার নাম 'মাতৃপূজা'। গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই এটি বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে 'মাতৃপূজা' নাটক প্রকাশের সুযোগ পায়নি। এই মাতৃপূজা যাত্রাভিনয়টি লেখার জন্য তাঁর তিন বছর জেল হয়।

'মাতৃপূজা'ই মুকুন্দদাসের প্রথম নাটকের বই। এর আগে তাঁর গানের বই 'সাধন-সংগীত' বের হয়। ১৩১০ সালে 'বরিশাল আদর্শ প্রেসে' এই গানের বইটি ছাপা হয়। তবে এর আগেই তিনি গান লিখতে শুরু করেন। মাতৃপূজা এর পর লেখা। ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা দেশ মেতে উঠেছে, তখন চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁর গান অভিনয়ের মাধ্যমে হাটে-মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-শহরে-প্রান্তরে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিলেন। 'আর সেই ব্রত পালনের জন্য বৈষ্ণব মুকুন্দের হৃদয়তন্ত্রী মাতৃমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। ফলে তিনি দেশকে জড় না ভেবে বাংলার আরাধ্যা চৈতন্যময়ী কালীদুর্গা মূর্তিতে অঙ্কিত করে 'মাতৃপূজা' রচনা করলেন। সুর-সংযোগে তিনি এমন অভিনয় করলেন যে, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার হৃদয়মন মেতে উঠল। তিনি গাইলেন

"জাগো গো জাগো গো জননী
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ তো জাগিবে না মা—
তুই না নাচালে কারো নাচিবে না ধমনী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাতৃপূজা সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার লিখেছেন '১৩১৩ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগে সভা-সমিতির বন্যাপ্লাবন হইতে দূরে রহিয়া মুকুন্দদাস সঙ্গোপনে সঙ্গীতাদি ও তাঁহার প্রথম যাত্রাভিনয় 'মাতৃপূজা' রচনা শেষ করিলেন। অভিনয়ের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও অশ্বিনীকুমারের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিলেন। আর স্বদেশী মন্ত্রে ও স্বদেশী গানে বাংলাদেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। বাংলার চারণকবিদের মত মুকুন্দদাস এইভাবে হইয়া উঠিলেন স্বদেশী যুগের কবি চারণসম্রাট।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ বরিশালের রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে অগণিত লোকসহ স্বয়ং অশ্বিনীকুমার মুকুন্দের 'মাতৃপূজা' অভিনয় শ্রবণ করিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইয়া মুকুন্দকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, 'বীর হও। অন্যায়ও যদি করতে হয়, বীরের মত করো।'

'১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ উত্তর সাহারাজপুরের দাদপুর স্টেশনের নিকটবর্তী নদীতে মুকুন্দের গমনশীল নৌকার গতি পুলিশ সাহেবের লঞ্চ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল এবং ১০৮ ধারায় দলসহ গ্রেপ্তার হইয়া মুকুন্দদাস বরিশালে আনীত হইলেন। পাঁচ হাজার টাকার জামিনে বাহির হইয়া পুনরায় ৭ই পৌষ তারিখে বরিশালের রাস্তায় ভ্রমণকালে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। কিছুকালের মধ্যে মুকুন্দের ভাই রমেশচন্দ্রও 'মাতৃপূজা' গানের প্রকাশক বলিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। দুইটি ধারায় মুকুন্দদাসের তিন বছর জেল ও তিনশত টাকা জরিমানা হইল। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার নির্বাসিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দদাসের প্রথম মোকদ্দমায় বরিশালের কোন উকীল পাওয়া যায় নাই। অবশেষে বিখ্যাত উকীল নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র সেন (স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি মহাশয়) মুকুন্দদাসের মামলা পরিচালনার জন্য বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"১৩১৭ বঙ্গাব্দে নির্দিষ্ট দিনে দিল্লির কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুকুন্দদাস অপরিচিত নগরীর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোথায় যাইবেন এবং কোথায় কি খাইবেন তাহা কিছু ঠিক নাই। তবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ ও কালীবাড়িতে প্রণাম করা—এই দুইটি মনে মনে স্থির করিয়া প্রথমে কালীবাড়ী পৌঁছাইয়া প্রণামান্তে মন্দিরের অদূরে বরিশালের ভৈরবী-মাতার দর্শনলাভ করিলেন। কথোপকথনে মুকুন্দদাস জানিলেন তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। 'জয় মা' বলিয়া মুকুন্দদাস যমুনায় স্নান করিলেন এবং মালব্যজীর বাড়ীতে কোনরকমে আহার সারিয়া পরবর্তী ট্রেনে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। কলিকাতায় একদিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া বরিশালে পৌঁছাইলেন।"[১৬]

মাতৃপূজা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন

'মাতৃপূজা' পালা-মধ্যস্থ সঙ্গীতাবলী দ্বারা ক্ষুদ্র একখানি গানের বই নোয়াখালিতে ছাপা হইয়াছিল। সেই পুস্তিকার একটি গানের পদ্যাংশ দ্বারা মুকুন্দদাসকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। বরিশালে 'দেশের গান' নামে বিভিন্ন রচয়িতার সঙ্গীতাবলী দ্বারা একখানি গানের বইতে মুকুন্দের 'মাতৃপূজা' সঙ্গীতাবলীর প্রায়গুলি স্থান পাইয়াছিল। তন্মধ্যে মুকুন্দের রাজদ্রোহকর নির্দিষ্ট গানটি থাকায় উভয় স্থান হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত বইগুলি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। কাজেই 'মাতৃপূজা'র গানগুলির সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যাইবে না। 'মাতৃপূজা' গানের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিও পুলিসের হাতে চলিয়া যায়।'[১৭]

১৯০৭ খৃঃ অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রধান সহকর্মী ভবরঞ্জন মজুমদার 'দেশের গান' সংকলনের জন্য দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুকুন্দদাস 'মাতৃপূজা' গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।[১৮]

'মাতৃপূজা'র একটিমাত্র গানের ক্ষুদ্র একটি ছত্র রাজদ্রোহকর বলে গণ্য হয়। সেটি হল

"বাবু বুঝবে কি আর ম'নে—
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে
করল সারা,
চোখের ওই চশমাজোড়া, দেখ না বাবু খুলে।"

এই একটি কথা 'শ্বেত ইঁদুরে করল সারা' অর্থাৎ ইংরেজকে 'শ্বেত ইঁদুর' বলায় মুকুন্দদাসের তিন বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আর দলের সমস্ত লোক বেতনভুক্ত কর্মচারী বলে বেকসুর খালাস পায়। নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুকুন্দের ভাই রমেশচন্দ্রের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মাতৃপূজার সঙ্গীতাভিনয় সারা দেশকে মাতোয়ারা করে তোলে। বিদেশী বাণিজ্যের শোষণ সংকট মূর্তির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মুকুন্দদাস মাতৃপূজায় গান—'দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম'—

'গর্ভাঙ্কে ও উপসংহারে এই মমির দেশের দৃশ্য-অদৃশ্য প্রাণশক্তিই যে ব্রহ্মময়ী আদ্যা মহাশক্তির বিকাশরূপে সম্মুখে প্রকটিত, দেশের পূজাই যে মাতৃপূজা, মাতৃপূজাব সিদ্ধিই যে সর্ববিধ মুক্তি, মায়ের দুয়ারে বলিদান, রক্তদান যে আত্মত্যাগ, সেই সুরে পালার গঠনকে সর্বজনরম্য উর্ধ্বগামী করার চেষ্টা হইয়াছে। উপসংহারে অসাম্প্রদায়িক আচণ্ডাল তথাকথিত শুচি-অশুচি সকলকে লইয়া সিদ্ধির দুয়ারে পূর্ণ প্রণতি দ্বারা অভিনয় শেষ করা হইয়াছে।'[১৯]

'মাতৃপূজা'র মত মুকুন্দদাসের 'পথ' নাটকটিরও কোন কপি পাওয়া যায় না। 'মাতৃপূজা'র মত ছাপার আগেই 'পথ' বাজেয়াপ্ত হয়নি। এ সম্পর্কে একজন গবেষকের মন্তব্য

'বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক 'মুকুন্দদাস গ্রন্থাবলী' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাহাতে চারণকবি মুকুন্দদাসের 'সমাজ', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', এবং 'কর্মক্ষেত্র'—এই চারটি যাত্রাগানের পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দদাসের প্রথম যাত্রাগ্রন্থ 'মাতৃপূজা'র পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করায় তাহা প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার মারফত মুকুন্দদাসের অপ্রকাশিত বা লুপ্তপ্রায় যাত্রা বা গান পাইলে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রহিল।'[২০]

'পথ' নাটকটির কোন কপি এদেশে পাওয়া না গেলেও একটি বই সযত্নে লনডনের ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত আছে। বইটির প্রচ্ছদের প্রথম পাতায় লেখা আছে 'প্রসক্রাইবড পাবলিকেশন। বেঙ্গল কোয়ার্টার্লি লিস্ট। ১৯৩১। পি বি বেন বি ৪১।"

(পি বি=প্রসক্রাইবড পাবলিকেশন। বেন—বেঙ্গলি) এই কথাগুলি কালো কালিতে হাতে লেখা। পরের পাতায় আছে একটি সিল। তাতে লেখা—'ইণ্ডিয়া অফিস'। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতেও 'পথ' নাটকের একটি কপি আছে। এই বইটি নিষিদ্ধ করে যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি বের হয়, তার একটি অনুলিপি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে। তাতে দেখা যায় ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারায় বইটি নিষিদ্ধ হয়।

এখানে উল্লেখ্য, মুকুন্দদাসের আরও কয়েকটি বাজেয়াপ্ত বই ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে কর্মক্ষেত্র (নাটক) ; কর্মক্ষেত্রের গান (গান)। ঐ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ এবং পথের গান (দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের বই)। 'মাতৃপূজা'র পর মুকুন্দদাস লেখেন : 'সমাজ', 'কর্মক্ষেত্র', 'পথ' এবং 'পল্লীসেবা'।

মুকুন্দদাসের 'কর্মক্ষেত্র' নাটকের শুরু মায়ের ডাক দিয়ে—

মা মা বলে ডাক দেখি ভাই
ডাক দেখি ভাই সবে রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে
মা কি পারে রইতে রে ॥

'কর্মক্ষেত্র' দেশাত্মবোধক নাটক, এতে দেশী পণ্য ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগের প্রেরণা আছে। 'কর্মক্ষেত্রে'র তৃতীয় দৃশ্যে ফেরিওয়ালা গেয়েছে

ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ী—বঙ্গনারী ;
কভু হাতে আর পরো না।
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না ;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে পরো না ॥
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম্ম সাথী,
জগৎ ভরে আছে জানা ;
চটকদার কাঁচের বালা, ফুফের মালা
তোমাদের অঙ্গে শোভে না ॥
নাই বা থাক্ মনের মতন, স্বর্ণভূষণ,
তাতেও যে দুঃখ দেখি না ;
সিঁথিতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী শোভনা ॥

এই নাটকে আদর্শ চরিত্র বাউল। এখানকার কর্মযজ্ঞের তিনি প্রাণপুরুষ। বাউল দেশী পণ্য কিনতে, দেশকে ভালবাসতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলি ছাড়াও মুকুন্দদাস আরও অনেক গান লিখেছেন। তাঁর গীতগুলি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। আগেই বলেছি, তাঁর দুটি গানের বই কর্মক্ষেত্রের গান ও পথের গান বাজেয়াপ্ত হয়। অধিকাংশ গীতই 'মুকুন্দ' ভনিতাযুক্ত ও মুকুন্দসুরযুক্ত। তাঁর অনেক গীত এখনও অনাবিষ্কৃত। মুকুন্দদাসের গানে কি প্রাণমাতানো শক্তি, কি উন্মাদনা ও উত্তেজনা, তা না শুনলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মুকুন্দ নিজে অভিনয়ের মাধ্যমে কম্বুকণ্ঠে গান গেয়ে দেশকে উজ্জীবিত করেছিলেন, দেশবাসীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন মাতৃমন্ত্রে। মুকুন্দের গানকে বলা হয়, 'সাধন সঙ্গীত'। রামপ্রসাদের মত মুকুন্দের গানেরও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এ তাঁর নিজস্ব সম্পদ, জীবন সঙ্গীত। একান্তভাবে মুকুন্দপ্রেমিক না হলে তাঁর গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আজও তাঁর গানগুলি গীত হলে দেশপ্রেমিকদের মানসচোখে ভেসে ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রামী মুকুন্দের সেই মরণপণ সংগ্রাম। তাই তাঁর নাটক-যাত্রাগুলির মত গানগুলিও রাজরোষে পড়েছিল। আর তাঁর কারাদণ্ড তো 'মাতৃভূমি'র একটি গানের জন্যই। তাঁর প্রথম সঙ্গীত গ্রন্থ 'সাধনসঙ্গীত' ১৯০৩ সালে বরিশাল আদর্শ প্রেসে ছাপা। তাঁর 'সাধনসঙ্গীত' যখন বের হয়, তখন তাঁর বয়স ২৫ বৎসর। মুকুন্দদাস সুর ও সঙ্গীতের জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। মুদির দোকান চালানোর সময়ই তিনি নিজস্ব কীর্তনের দল গড়েন। দোকানদারির পর গভীর রাত পর্যন্ত তিনি কীর্তনের সাধনা করতেন। 'কৃষ্ণনাম বড়ই মধুর, যে লয় সে বড়ই চতুর'। এই ধরনের কত কীর্তন যে তিনি মুদির দোকানে বসে লিখেছিলেন বৈষ্ণব হরিবোল গোঁসাইয়ের কাছে দীক্ষা নিলেও মুকুন্দদাস অনেক শাক্ত সঙ্গীতও লেখেন। এক কথায় তাঁর জীবন শাক্ত বৈষ্ণবের মধুর মিলন। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মোটেই গোঁড়ামি ছিল না। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রতিও তিনি সশ্রদ্ধ ছিলেন। বরিশালের প্রসিদ্ধ মোনাঠাকুরের কালীমন্দিরে তিনি ঘন ঘন যাতায়াত করতেন।

মুকুন্দ দাসই স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তক। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর এমনভাবে তিনি গানের মাধ্যমে মাতিয়ে তুললেন যে মুকুন্দদাসের যাত্রা হবে শুনলে জনসমুদ্রের সৃষ্টি হত। তাঁর যাত্রার রীতি একেবারে নতুন-গানের সঙ্গে বক্তৃতা, বক্তৃতার সঙ্গে গান লেখক, কবি, নাট্যকার মুকুন্দ অভিনয়েও সেকালের বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ছিলেন। যাত্রা নাটকেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে স্বদেশী গান গেয়ে শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করতেন। মেয়েদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর দুটি মনমাতানো গান

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল্।
মায়ের জাতি গ'ড়ে তোল্
সকল কাজের ঐ তো গোড়া,
আজ ভেঙে দেরে তাদের গোলমাল
মেয়েদের এইসব হাইস্কুলে,
মা হবে না কোন কালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই তোরা ভাই, সবার আগে,
মায়ের মন্দির গড়ে তোল্ ॥

তাঁর ওইসব গানের প্রতিক্রিয়া হত তীব্র। গানের শেষে দেখা যেত চিকের আড়ালে রাশি রাশি চুড়ি মেয়েরা ফেলে দিয়ে গেছে। গান, যাত্রা, নাটক, পালা কীর্তন, শাক্ত সংগীত ছাড়া মুকুন্দদাস 'আত্মপরিচয়' নামে একটি বই লেখেন। এটি তাঁর আত্মজীবনী। তবে বইটি কোনদিন ছাপা হয়নি।

মুকুন্দদাসের জন্ম ঢাকায়—১৮৭৮ সালে। মৃত্যু—কলকাতায়, ১৯৩৪ সালে ১৮ই মে। ঢাকায় জন্ম হলেও বরিশালই ছিল মুকুন্দের কর্মক্ষেত্র যজ্ঞক্ষেত্র। তাঁর পিতৃদত্ত নাম যঞ্জেশ্বর দে। রামানন্দ অবধূত হরিবোলানন্দের কাছে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মুকুন্দদাস নামে পরিচিত হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি তান্ত্রিক সাধক মোনাঠাকুরের শিষ্যত্ব নেন।

বরিশালের কর্মযোগী জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাব তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি মুকুন্দদাসকে স্বদেশী আন্দোলনে প্রভাবিত করেন। তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মুকুন্দদাস যাত্রাগানের মাধ্যমে দেশকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে নামেন। একাজে আর একজন তাঁকে প্রভাবিত করেন। তিনি হলেন স্বভাব কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই দুইজনের প্রভাব ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—এই তিনে মিলেই যঞ্জেশ্বর মুকুন্দদাসে পরিণত হল। বৈষ্ণব দীনতা হিসাবেই তিনি দাস উপাধি নেন। শৈশবে বরিশালের বি এম স্কুলে পাঠের সময়ই তিনি সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দেন। এই শহরেই পিতা গুরুদয়াল দে'র একটি মুদি দোকান ছিল। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই বিদ্যালয়ও তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয়। তবে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে যঞ্জেশ্বর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একসময় বরিশাল শহরের লোকেরা তাঁকে 'যজ্ঞগুণ্ডা' বলতো। তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খলতা যিনি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তিনি একজন ইংরেজ রাজপুরুষ। বরিশালের তখনকার জেলা শাসক বেল সাহেব। যজ্ঞেশ্বরের পড়াশোনা তেমন হয়নি। বাল্যেই ছাত্র অবস্থাতে তিনি ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। বাবার মুদির দোকান দেখাশোনা করতেন। এজন্য তিনি একসময় 'মুদি যজ্ঞেশ্বর' নামে খ্যাত ছিলেন। মুদির দোকান চালানোর সময়েই তিনি কীর্তনের দল গড়েন। নায়েব বীরেশ্বর গুপ্ত তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

অন্যান্য নিষিদ্ধ নাটক

মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' বইটি বাজরোষে পড়ে। এটি 'কলকাতা, ২০৩/২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে বসু এন্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত'।

প্রচ্ছদে নিচের দিকে আছে :

Calcutta

Cover Prined by Fakir Chandra Das at the 'Indian Patrion Press' 70, Baranasi Ghose's Street.

1915

মূল্য ১ এক টাকা।

পরের পাতায় আছে, বইটি 'কলকাতা, ২ নং গোয়াবাগান স্ট্রীট 'ভিক্টোরিয়া প্রেসে' শ্রীতারিণীচরণ আর্স দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র ১৩১১ সাল। খৃঃ মার্চ, ১৯০৫

প্রথমে আছে 'উৎকৃষ্ট উপহার'। এর তলায় কোন তারিখ নেই। তবে 'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন'-এর তলায় আছে—'চৈত্র, ১২৮৬ সাল'।

গোপন সরকারী ফাইল থেকে 'হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করলাম। ১৯১৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠিতে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার আর ক্লারক এই নাটকটি সম্পর্কে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

Sir,

I have the honour to report for the information of Government that Jatra Party belonging to Sri Charan Bhandari of Sankha Hooghly

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

recently staged the well known play 'Harish Chandra in the house of Rani Dinamani Choudhuri, the 6 anna Zamindar of Santosh, Tangail, Mymensingh. This Jatra Party has been traced at No. 16, Beniatola St. Calcutta and a copy of the Play they stage obtained. It appeared that this is no other than the 8th edition of the 'Harish Chandra Natak' on 'Raja Harish Chandra' mentioned on Page 36 of the list of dramas reviewed by the Intelligent Branch CID, Bengal completed upto the 31st July, 1912. As this Particular edition has been declared by the Legal Remembrancer to fall under Sec. 4(1) of the Press Act, I ask that Govt. may be pleased to proscribe this edition under Sec. 12(1) of the Act & may consider whether or not action under Sec. 3(2) of the Act may not be taken against the Keeper of the Victoria Press situated at 2 Goabagan St, where this edition was printed. This Press was declared on the 31st Aug. 1908 by Shama Charan Kabiratna and to this date has not come to our notice in connection with seditious printing matter.

হরিশ্চন্দ্র নাটকের আপত্তিকর অংশগুলির অনুবাদও এই সঙ্গে ছিল তার উদ্ধৃতি দিলাম সরকারী দফতরে ইংরেজি অনুবাদে যে অংশগুলিকে আপত্তিজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, আমি সেগুলির মূল বাংলা রূপ উপস্থিত করছি।

হরিশ্চন্দ্র নাটকের পঞ্চম অঙ্কেই আপত্তিকর অংশ বেশি। এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিলাম "মন্ত্রী, এখন সেইসব শাসনকর্তাদের বিনা দোষে পদচ্যুত করে বিদেশীয় শাসনকর্তার হাতে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান, প্রাণ সমর্পিত হচ্ছে। উচ্চ কর্ম্ম মাত্রেই তুঙ্গদ্বীপের লোক নিযুক্ত। তারা এদেশের কিছুই জানে না, আপনাদের খেয়ালে যেটা ভাল বোধ হয়, তাই করে। দেশীয় বিজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দিতে গেলে উড়িয়ে দেয়। ফলতঃ তারা দেশাচারে যেমন অনভিজ্ঞ, আত্মগরিমা আর স্বেচ্ছাচারে বেশি মত্ত। অধিক কি, অধীন জাতিকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না।

(৫ম অঙ্ক, পৃঃ ৯৪)

মন্ত্রী। ...কিন্তু নাগেশ্বরের রাজ্যে যেমন অমিতব্যয়িতা, অসুর জাতির রাজত্বকালেও তেমন ঘটে নাই ; কাজেই ভারতের লোক এমন দুঃসহ করভাবে আর কখনই প্রপীড়িত হয় নাই। নাগেশ্বরে যে কতবিধ কর, তার সংখ্যা করা ভার—প্রজারা কোন পুরুষে সেসকলের নাম পর্যন্তও শ্রবণ করেনি। নাগেশ্বরের সচিবগণ করগ্রহণে যেন সহস্রকর—তাদের নিয়ন্ত্রিত করের দায়ে ভারতে হাহাকার পড়েছে—যারে অসহ্য বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দশাই ঘটেছে। ঐ শুনুন, প্রজারা গীতচ্ছলে, বোধ হয়, সেই দুঃখই জ্ঞাপন করছে।

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিনী বিভাস—তাল একতালা।

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর। দে কর, দে কর, রব নিরন্তর,
করের দায়, অঙ্গ জর জর।
সিন্ধু বারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর
করদাহে নর নিকর কাতর,
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর। ১ ॥

ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর ?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর। ২ ॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল কর—
স্থলপথে আর সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচয়—
শূন্য বই গতি নাহি আরো। ৩ ॥

গো-অশ্ব-শকট-কর
বহুতর—
পশু, নর, কারো নাহিক নিস্তার।
নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর। ৪ ॥

আয়-কর শুনে, গায় আসে জ্বর।
অস্থিভেদী রথ্যা কর কি দুষ্কর।
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর।
কত আর কব মুনিবর। ৫ ॥

মাদকতা কর ছলে দেশময়,
মদ্যের বিপনি, নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়।
হাহাকার রব নিরন্তর। ৬ ॥
(উ পৃঃ ৯৭)

এই গীতে ব্রিটিশ শাসনে জনগণের উপর করের জুলুমই ব্যক্ত হয়েছে।

'মন্ত্রী। ...এখন তুঙ্গদ্বীপ হ'তে বস্ত্র এসে ভারতের সজ্জারূপে লজ্জা নিবারণ করছে। আর যদি সেই বস্ত্র আসা বন্ধ হয়, কাল্ পরিধেয় বসনের জন্য দেশে হাহাকার পড়ে যায় ?...বৎসর বৎসর এদেশের কোটি কোটি মুদ্রা লভ্যস্বরূপ নানা কৌশলে তুঙ্গদ্বীপে চলে যাচ্ছে, তাতে দেশ নিতান্তই নির্ধন হয়ে পড়ছে।

(পৃঃ ৯৮)

(নেপথ্যে গীত)
রাগিনী ভৈরবী—তাল একতালা।
দিনের দিন, সার দীন, হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তণু ক্ষীণ্।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য, বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে লীন্। ১ ॥

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন। ২ ॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্যগ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন। ৩ ॥

তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন সেনা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর—
হ'লো দেশের কি দুর্দিন। ৪ ॥

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন্‌বিনা কিসে রবে লাজ?
ধর্ব্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল্, টেনা, ডোর্, কপীন। ৫ ॥

ছুঁই, সূতা পর্যন্ত আসে আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশালাই কাটী, তাও আসে পোতে—
প্রদীপ্‌টী জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন। ৬ ॥ (পৃঃ ১০০)

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি নাটকে লেখক সুকৌশলে বিদেশী শাসকের সমালোচনা করেছেন।

সম্ভবত চীফ সেক্রেটারি এই নোট দেন এই নাটকটি সম্পর্কে

Mr. Vitch.

'Please see note and translation below of the play 'Harish Chandra'. The words themselves bear evidence that the present day administration is meant. The paper may be sent to L. R to consider action to be taken in connection the general question.

This 8th edition of the book was brought out in 1905. Frist edition came out 1880 A. D. but it is probable that objectionable passages did not appear in the former edition.'

Sd. Illegible
29.6.10

দীর্ঘদিন এই নোট চালাচালির পর অবশেষে 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯১৬ সালের ২ মে তারিখের আদেশে। এই আদেশে প্রকাশ্যে এই অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।[২১]

আরও কয়েকটি নাটকের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার মতো এই আদেশটিও গেজেটে বিজ্ঞাপিত হয়নি। পুলিশ কমিশনারকে লেখা চীফ সেক্রেটারির চিঠিতে তা জানা যায়।

'Sir,

With reference to your letter No. 1323C. dated the 15th Feb ; 1916, I am directed to forward herewith an order No. 137 P-D, dated May 2, 1916, which this Govt. here issued prohibiting the Performance of the play entitled 'Harish chandra Natak', 8th edition under Sec. 3 of the Dramatic Performance Act, 1876.

I am to draw your attention to the fact that it is not nec essary publish the order in the gazettes but a copy of the order can be served under Sec. 4 of the Act on the persons referred to in that Section ; and the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

order can also, if necessary, be notified by Proclamation, as provided in Sec. 5 IP these course are adopted, the penalties provided in Sec. 4 & 6 will become applicable in case of any breach of the order.'

১৮৭৬ সালের Dramatic Performance Act-এর ৩ ধারা অনুসারে প্রকাশ্যে এর অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।

এর পর বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সফল হয়নি, কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী ১৪-৭-১৯১৬ তারিখের চিঠিতে 'হরিশ্চন্দ্র নাটকের' উপর থেকে সরকারি আদেশ তুলে নেবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি।

সমাজ মনোমোহন বসুর 'সমাজ' নাটকটিও রাজরোষে পড়ে। পূর্ব নাটকটির মতো এটিও পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

এটি একটি সামাজিক নাটক। গরীবের মেয়ে কমলার সঙ্গে জমিদারপুত্র পরেশের বিয়ে থেকে নানা সামাজিক সমস্যা। সেই সঙ্গে অতুল, শরৎ ও কতিপয় যুবকের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের কথা ও বন্দে'মাতরম্ ধ্বনি।

'সমাজ' থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিলাম :—

তৃতীয় দৃশ্য। পথ ॥

অতুল, শরৎ ও কতিপয় যুবক

অতুল। ভাই সব। আমরা জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। কে কোথায় আছ বঙ্গবাসী, সকলে ছুটে এস, এই মন্ত্র গ্রহণ কর, সমপ্রাণে, সমতালে একবার প্রাণভরে বল বন্দে'মাতরং—

সকলে। বন্দেমাতরং।

সুরেশ। ওই দেখ আমাদের ভাগ্যাকাশ ঊষার বিমল বরণে রঞ্জিত হয়েছে। এ সময়ে, জীবনের এ সুমধুর প্রভাবে, আর নিদ্রিত থেক না। অলস নিদ্রা পরিত্যাগ করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। এস ভাই হিন্দু। এস ভাই মুসলমান। এস ভাই খৃস্টান। আমরা সকলে জাতিগত পার্থক্য ভুলে, মনের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে, ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন করি, সকলে মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হই। ভাইসব একবার প্রাণভরে বল, বন্দেমাতরং।

সকলে। বন্দেমাতরং।

অতুল। চল, চল, জাতীয় ধন ভাণ্ডারের জন্য আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করব। কে কোথায় স্বদেশহিতৈষী আছ, আমাদের ভিক্ষা দাও। ভাই সব, আর একবার প্রাণভরে বল, বন্দেমাতরং। তোমাদের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হতে আরও উচ্চে চলে যাক।

সকলে। বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং

[প্রস্থান]

রণজিতের জীবন-যজ্ঞ : এই নাটকটিও রাজরোষে পড়েছিল। এটি বাজেয়াপ্ত হয় ৭-৮-১৯১১ তারিখে। একই দিনে লেখকের 'দুর্গাসুর' নাটকও বাজেয়াপ্ত হয়। আগেই তা বলেছি। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের **ঐতিহাসিক নাটক** 'রণজিতের জীবন-যজ্ঞ' ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম পাতায় আছে

রণজিতের জীবন-যজ্ঞ

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ স্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স-এর পুস্তকালয় হইতে শ্রী[illegible]বন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞাপন

নবপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে 'পদ্মিনী' ও 'দুর্গাসুর' নামক দুইখানি নাটক লিখিত হইয়াছিল। বোধ হয় তাহাতে দর্শক ও পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকারকে নিন্দনীয় হইতে হয় নাই। এই ভরসায় সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের উপদেশানুসারে তৃতীয় চিত্র 'রণজিতের-জীবনযজ্ঞ' নামক নাটকখানি দর্শক ও পাঠকগণের নিকট বাহির করিলাম, নিজগুণেও তৃপ্তিলাভ করিলে গ্রন্থকারের সাহস অক্ষুণ্ণ থাকে।

'পদ্মিনী' প্রণয়নকালেই বলিয়াছিলাম, গ্রন্থকারকে সময়োচিত রুচিক্রমে নাটক লিখিতে হয়। বোধহয় সেই সময়োচিত রুচি অবলম্বনে পদ্মিনী লিখিতে হইয়াছিল বলিয়া, তৎকালে পদ্মিনী সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। বর্তমানে রুচি তাহাপেক্ষা যেন কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য আধুনিক রুচিসম্মত 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ' রচিত হইয়াছিল। সুসঙ্গত হইয়াছে কিনা, তাহা সাধারণের বিবেচ্য।

আরও একটি বিশেষ কথা, নাটকে যাহা পৌরাণিকত্ব দৃষ্ট হইবে অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' ও 'রাখালগণের অবতারণ' তাহা আমার কল্পনা-চিত্র নহে, ইহাও মূল ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ। তৎসম্বন্ধে যাঁহাদের সন্দেহ হইবে, তাঁহারা ভরতপুরের প্রতিপক্ষ বৃটিশ সৈন্যগণ কি বলিয়াছিল, তাহা Thrunton's East Indian Gazeteer, P-117 দেখিবেন।

রণজিতের জীবন-যজ্ঞের কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিলাম

ত্রৈলিঙ্গধর……

…আমি আত্মারাজ্যের রাজা হবার জন্য এই মাতৃচিতানল প্রজ্বলিত রেখেছি, আর তুমি জন্মভূমি জননী ভরতপুর রাজ্যের রাজা হয়ে আজীবন স্বাধীনতা হোমানলে মায়ের ভক্তি যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারবে না ? সন্তান ! তবে তুমি সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছ কেন ? মায়ের আনন্দভরা প্রভাত পদ্মবৎ হর্ষোৎফুল্লমুখখানি সতত নয়নের সম্মুখে রেখে একবার দাঁড়াও দেখি, তোমার জীবনের মহাযজ্ঞে স্বাধীনতা অগ্নি প্রজ্বলিত করে একবার আত্মসর্বস্ব দান কর দেখি সন্তান ! তখন দেখতে পাবে, অমরবাহিত স্বর্গধাম কোথায়।

(অন্তর্ধান)

(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক, পৃঃ ১৭, ১ম সং)

রণজিৎ…

…ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করে ভরতপুরের স্বাধীনতা রক্ষা করেছি বলে কি, তাই তাঁর ঘৃণা। কিন্তু উপায় কি ? আজকাল ইংরাজের প্রবল প্রতাপে ভারতের সমুদয় স্বাধীন রাজাই মস্তক অবনত করেছেন। যেদিন দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম্ সত্ত্বেও ইংরাজগণ কৌশলে পলাশীর যুদ্ধে সোনার বাংলা হস্তগত করেছে, সেইদিন ভারতের কোন্ রাজা না ইংরাজকে ভয় করে।

রণজিৎ……

অগ্নিস্তূপ। এরি নাম স্বাধীনতা অগ্নি। এ অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাক্‌লে সকল আততায়ীই ভস্মসাৎ হয়ে যাবে। সে স্বাধীনতারূপী অনলদেব। রণজিতের জীবন-যজ্ঞে তুমিই হোমানলরূপে চির প্রজ্বলিত থাক। আজ হতে ঋষিবাক্যে এক নবীনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেম।…

আমি আজ হতে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষারূপ মহাব্রত গ্রহণ করলাম, মাতৃসেবা মহাব্রত গ্রহণ করলাম। এ ব্রত আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ ব্রত উদ্‌যাপন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। এই মহাকার্য্যের একটি সরল সহজ নাম। 'রণজিৎ রাজার জীবন-যজ্ঞ'। এই অগ্নি স্পর্শ করে (অগ্নিতে হস্ত প্রদানপূর্বক) বলচি, এই প্রতিজ্ঞার নাম 'রণজিৎ রাজার জীবন-যজ্ঞ'।

সেবকগণ। এস এস এস, মাতৃভক্ত ভূপ, উন্মুক্ত ঐ কর্মপথ তোমার,
যাও বীরবর, ধরি ধনু শর, বীর-গৌরবে রাখ
স্বাধীনতা মা'র ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রাউনের জবাবে

রণজিৎ। যাও সাহেব, তুমি আমার গৃহে এসেছ, তাই তোমার চোখরাঙ্গানি সহ্য করলাম, তা না হলে দেখতে তোমার দেহ এতক্ষণে রণজিতের শাণিত তরবারে খণ্ড খণ্ড হয়ে যেত। অর্থের জন্য তোমরা না করো কি ? সোনারাজ্য বাঙ্গলারাজ্য ছারখার করেছ, সাধুস্বভাব প্রজাপ্রাণ মীরকাসিমকে দেশ ছাড়া করিয়েছ। অহো কি হৃদয়ভেদী কথা। আহা মা ভারতভূমি। কেন মা তুমি ইংরাজগণকে তোমার কোমল অঙ্গে স্থান দিলে। তোর কোমল কোল শ্মশান করলি না কেন মা ? বুক ফেটে যায় মা, বুক ফেটে যায়।

৪র্থ অঙ্ক। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক পৃ ২২১

ভারতমাতা।

কি ছিলাম কি হ'য়েছি আরও কি আছে কপালে।
শত শত কোটী সন্তান জননী একা কেন ভাসে নয়নের জলে॥
আমার যাতনা আমি ত ভাবি না, বাছাদের দশা
দেখিতে পারি না,
দেখিলে সে সুখ, ফেটে যায় বুক, পায় না খাইতে
ক্ষুধার কালে॥
পেটে অন্ন নাই পরনে বসন, পর অত্যাচারে ক্ষিণ্ণ মন,
মা হয়ে কেমনে, দেখি রে নয়নে, ভাসে দুনয়নে
পেটের ছেলে॥

রণজিতের জীবনযজ্ঞ প্রথম রজনীর অভিনয় ১০ই আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।
ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই'ও সরকারী রোষে পড়ে। এর দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রচ্ছদে আছে·

তারাবাই
ইতিহাসিক নাটক

মহাত্মা করলেন টড সাহেবের প্রণীত
রাজস্থান হইতে সংগৃহীত
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
কলিকাতা
ইং ১৯১৬

প্রথমেই ভূমিকা (উপহার) ছড়ায় আছে।

উপহার।

পতিপ্রাণা বীরাঙ্গনা তারার চরিত্র
নাটক-পটেতে তার করিয়ে সুচিত্র,
আদরে বঙ্গ-মহিলাগণেরি সদন,
উপহার রূপে করিলাম সমর্পণ।
প্রার্থনা করি গো আমি সবার নিকট,
দর্শন করেন যেন সকলে এ পট।
তারার মোহিনী মূর্তি ভরিয়ে অন্তরে,
'তারা' হতে সাধ যেন সকলেতে করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহ'লে হিন্দুর পুনঃ গৌরব-তপন,
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন।
সতীত্ব, বীরত্ব, দেশহিতৈষিতা আলো
জ্বালিয়ে, দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল।
হায়। কবে দেখিব রে ভরিয়া নয়ন,
বীরপত্নী বীরমাতা বঙ্গ যোষাগণ
হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্মণের একান্ত বাসনা ॥

তারাবাঈ নাটকের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিলাম

সুর।…"হায়। দুর্বৃত্ত, বিধর্মী যবনপীড়নে তারা যে কি ক্লেশই ভোগ করবে তা ভাবলে আমার অন্তঃকরণ আর কোন ক্রমেই ধৈর্যাবলম্বন করতে পারে না,—আমি অস্থির হই।

তারা…তুমি কবে সুপ্রসন্না হয়ে যবন অপহারকের গ্রাস থেকে আমার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে মা ? কবে গো মহিষাসুরমর্দ্দিনী। আমাকে শত্রু মর্দ্দনে শক্তি প্রদান করবে ?…

গীত

শক্তিনিধনে যবনদলনে দেহি দুর্গে শক্তি দে
সর্বশক্তিমানা তুমি আদ্যাশক্তি চণ্ডিকে ॥

রোহিণী।…

…আমাকে কেবল একমাত্র আশীর্বাদ করুন, যেন আমি হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুর কণ্টক বিধর্মী মুসলমান জাতির মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হই।

'একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?'

নামে এই প্রহসনটিও সরকারি রোষে পড়ে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এর লেখক হলেন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য। প্রকাশক হলেন 'বঙ্গ-রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র ঘোষ।' ১৯১৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত। মনে হয় কেউ ছদ্মনামে এটি লেখেন।

সরকারি নথিপত্রে পাওয়া যায় যে, মনোমোহন গোস্বামী নামেও একজন 'সমাজ' নামে একটি নাটক লেখেন-এঁর পরিচয়ে আছে যে, ইনি কলকাতার কাস্টম্‌সে কাজ করতেন। সমসাময়িক স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ফাইলে পাই যে, ১৯১১ সালের ১৬ই মে তারিখে 'সমাজ' সম্পর্কে স্টিভেনসন মুরকে এই মর্মে চিঠি লেখা হয়

'I am now to address you in regard to the play 'Samaj' No. 28 of the statement. Our Legal Remembrancer who was consulted has advised that this play is not objectionable, and, as it was one of these against which your Government has taken action, I am desired to request that, with the permission of the L. Governor in Council, we may be favoured with a copy of the opinion recorded by theLegal Remembrancer, Bengal, regarding this play in order that its proscription may be further considered.'

এর আগে মনোমোহন গোস্বামী সম্পর্কেMesurier-এর পত্র থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। চিঠিটি ১৯১০ সালের ১৬ মের।

'The play 'Samoy' regarding which E.De A. Govt. asks for our L. R's opinion is one of 11 plays above mentioned and one of 4 plays written by Babu Mon Mohan Goswami, a clerk of Calautta Customs House.

The fact that 4 of the plays held by the Govt. to be objectionable were written by Babu Mon Mohan Goswami was brought to the notice of the controller of customs with suggestion that the Babu might be warned

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

from publishing any other play of these type, and the controller has replied that he has warned the babu that the author has promised not to produce other similar plays.'

'পৃথ্বিরাজ' নামে একটি নাটকও রাজরোষে পড়ে। সে সম্পর্কে সরকারী ফাইল থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। কলকাতার পুলিস কমিশনার ১৯১৩ সালের ১১ এপ্রিল বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারিকে পত্র লেখেন। তখন 'পৃথ্বিরাজ' নাটকটি কলকাতার গ্রান্ড ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল। ওই থিয়েটারের ম্যানেজারকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, এটি আপত্তিকর। পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাম্প্রদায়িকতার। মেবার পতনের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল। পাবনায় পৃথ্বিরাজ মঞ্চস্থ (১৬-৩-১৯১০ তারিখ) হবার সময় মুসলমানরা আপত্তি তুলেছিলেন বলে সরকারি ফাইলে আছে।[২২]

কারাগার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটিও রাজরোষে পড়ে। এটি একটি পৌরাণিক নাটক। পঞ্চাঙ্ক। মন্মথ রায় কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৭১/১, মির্জাপুর স্ট্রীট কলিকাতা থেকে মুদ্রিত। 'বরদা-ভবন' বালুরঘাট (দিনাজপুর) হইতে প্রকাশিত। মোট পৃষ্ঠা-১৬৭। কারাগারের প্রথম অভিনয় হয় ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর। মনোমোহন থিয়েটারে এই অভিনয় হয়। এই নাটক রচনার পটভূমি লেখকের ভাষায়

"নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া তাহাদের জন্য একখানি নাটক লিখিয়া দিতে গত জুলাই মাসে আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী গত ১২ই আগস্ট আমি 'কারাগার' রচনায় ব্রতী হই ; এবং ২৫শে আগস্টের মধ্যে উহার প্রাথমিক গঠন শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর হস্তে সমর্পণ করি। নানা কারণে মিনার্ভা থিয়েটারে উহার অভিনয় সম্ভব হয় না। কিন্তু তথাপি এক নাটক প্রণয়নে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নিকট হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।"

মন্মথ রায়ের এই ভূমিকাটি ১৯৩০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর লেখা। তাঁর ওই ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, কবি কাজি নজরুল ইসলাম 'কারাগারে'র জন্য গান রচনা করে দেন। সুরও দেন।

স্বভাবতই 'কারাগার' নাটকটি গোয়েন্দাদের নজরে পড়ে। ১৯৩১ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের রাজনৈতিক বিভাগের নোটে বলা হয় যে, এই বইয়ে কিছু কিছু আপত্তিকর অংশ আছে। ওই দীর্ঘ নোটটি তুলে দিলাম।

Press Officer

I send herewith our File on 'Karagar' and the manuscript of same.

We have, as you know, as informal Censorship over the Indian Theatres conducted by the Detective Department and this has been in force for many years. While the commissioner of Police has no powers under the Dramatic Performance Act to prohibit dramatic performance, the D. D. have deleted objectionable passages in certain manuscripts and have sent up certain cases to Government for prohibition under Sec. 3.[২৩]

The same procedure was followed in this case. Fl. 'A' will show the report of the first officer S. L. S. K. Roy, who examined the manuscript. He suggested the delution of certain passages which borne the Present Political Situation under the clock of mythology and delution was ordered.

Fl. B—মনে করেন বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই

Fl. C—এর মতে the play might be passed with another deletion'. Fl. C shows an entirely independent opinion given by Inspector Madan

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Mohan Chakraborty of North District. He considered the play to be highly objectionable at the present time and was of opinion that everyone could easily understand the notice of this performance.

Following this report the Deputy Commisioner deputed Inspector Girija Roy, who is the head of the Press Section, to see the play. His report (Fl E) indicates that only an over-anxious critic could see any analogy between the acts of a mythological tyrant and the present Govt. and that the book was a study in Villiany and had very little bearing on politics.

I have no hesitation in accepting the opinion expressed by Inspector Madan Mohan Chakraborty and the editors (নবশক্তি, শিশির, দীপালি) of three Papers that the objective of the play is to portray the present state of affairs in which an oppressive Government with its armed forces is oppressing unarmed and downtrodden country and, therefore think that the drama comes within the Perview of Clause (b) Sec. 3 of the Dramatic Performance Act and should be prohibited by local Govt.

এই রিপোর্টের পর 'কারাগার' সম্পর্কে L.R.-এর মতামত জানতে চাওয়া হয়।

তাঁর মত :I am of opinion that it should be prohibited. It comes within the mischief of Sec. 3 (Rs) of the Act XIX of 1876.

K. C. Roy 22.1.31

এর পর 'কারাগারে' অভিনয় নিষিদ্ধ করে সরকারি আদেশ জারী হয়। ৩/২/৩১ তারিখে চীফ সেক্রেটারি এতে সই দেন।

এই আদেশটি কোন গেজেট বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে প্রচার করা হয়নি। পুলিস কমিশনারকে লেখা এক পত্রে ওই তথ্য আছে

১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে পুলিস কমিশনারকে ওই চিঠি লেখা হয়।

'কারাগারে'র বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সরকারের কাজের তীব্র সমালোচনা হয়। তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করলাম। ১৯৩১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভোটরঙ্গে লেখা হয়—আমাদের এটা আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

'শিশির'-এ ১৯৩১ সালের ১০ই জানুয়ারিতে এর রিভিয়ু বের হয়। সে তথ্য ফাইলে আছে। 'কারাগারে'র এই রিভিয়ু করার জন্য 'শিশির' পত্রিকার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। এই পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা, জানা যায়নি। তবে কারাগারের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।

পরে কারাগারের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চেষ্টা হয়। কিন্তু সফল হয়নি। কৃষ্ণনগর বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি ১৯৩১ সালের ৪ঠা অক্টোবরের পত্রে বলেন যে, কারাগার একটি পৌরাণিক ও ধর্মীয় নাটক। সুতরাং এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক।

মনোমোহন থিয়েটারের মালিক পি গুহও ১৯৩১ সালের ৯ই মার্চ তারিখে অনুরূপ আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা তোলা হয়নি। পি গুহকে জানানো হয় "In continuation of Previous communication regarding the application from the Proprieter, Natya Niketan, Calcutta for the permission to stage the play 'কারাগার' informing the Comm. of Police, Calcutta that Govt. have no objection to the Performance of the play in its amended form as recommended by him."

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জিকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ১৯৩১ সালের ১২ই অক্টোবরের নোটে বলা হয় যে, মূল 'কারাগারে'র উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। তবে সংশোধিত হলে এর অভিনয় করা যেতে পারে। পরে সংশোধিত আকারে কারাগারের অভিনয়ের অনুমতি মেলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'পেলারামের স্বাদেশিকতা' নামে একটি নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নাটকটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। এতে চাকুরি ও কলেজ বর্জনের এবং বিলাতী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলার ডাক দেওয়া হয়েছে।

১৯২২ সালের ২৯শে **জুলাইয়ে**. সংশ্লিষ্ট আদেশটি বের হয়। তাতে এর অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞাও গেজেটে বিজ্ঞাপিত হয়নি। তবে তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি জে দোলানভ আই সি এস ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট সকল জেলা অফিসারকে এই চিঠি দেন

Sir,

In continuation of this office letter No. 16112-39 P. dated the 19th Dec. 1917. I am directed to forward herewith an order prohibiting the performance of the play entitled 'Palaramer **Swadeshikata**' under Sec. 3 of the Dramatic Performance Act, 1876.

In doing so, I am to draw your attention to the fact that it is not necessary to publish the order in the Gagette, but a copy of the order can be served under Sec. 4 of the Act on the Persons referred to therein, and the order can also, if necessary, be notified by proclamation, as provided in Sec.5. If these courses are adopted, the penalties provided in Sec, 4 and 6 will become applicable in case of any **breach** of the **order.**

'পেলারামের স্বাদেশিকতা'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে এই বইটি নিয়ে দীর্ঘদিন ফাইল চালাচালি হয় স্বরাষ্ট্র দফতর ও পুলিশ বিভাগের মধ্যে। এসব ঘটনা ১৯২১-২২ সালের। ফাইলে কিছু কিছু মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিলাম

I. B. Note

The play should be taken at a whole

The General impression which is carried to the mind is that the play is objectionable to a degree in as much as that it seeks **preach** the Political doctrine of non-cooperation which has been **condemned** by all right-thinking responsible person. Anything calculated to keep alive the spirit fostered by non-co-operators in the past and to spread it by realistic representation of the same is most likely to create a very pernicious spirit among the population is open to serious **objection.**

Copy of the notes from Calcutta Police

Office File U. S. (Political Dept.)

The **proprietor,** Minerva Theatre, has submitted a Bengali drama entitled 'Palaramer Swadeshikata'. The book has been **reviewed** by an officer of this Dept. **who** says that the drama is of a very objectionable nature and preaches non-cooperation in violent manner and **hence** it is unsuitable for staging in a public theatre in these day of agitation.

Will you kindly ask the opinion of Mr. J. N. Roy Secy., Publicity Board of Bengali translation if the book should be passed. The book is placed below. We can take no action for proscription of the book, as it is not printed. We have got only a manuscript copy.

As to the staging of the drama, I shall inform the **proprietor** to the theatre on hearing from you.

5. 4. 1922 Sd. L. N. Bird for Com. of Police

পাবলিসিটি অফিসার জে এন রায় যদিও 'এতে আপত্তিকর কিছু নেই' বলে মত দেন, তবু এই মতানুসারে কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

কারণ পরে (২১-৭-১৯২২) তারিখের চিঠিতে পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে চীফ সেক্রেটারিকে জানানো হয় যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Sir,

I have the honour to inform you that Mr. U. K. Mitter of Minerva Theatre was warned today that the play 'Palarmer Swadeshikata' could not be staged again in Calcuta, as Govt. had reconsidered their original decision to sanction the play.

I attach a copy of a letter produced by him today for the information of Govt. and for such action as may be considered necessary.

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও মিনার্ভা থিয়েটার কর্তৃপক্ষ 'পেলারামের স্বাদেশিকতা' অভিনয় করেন। পুলিস কমিশনারের পক্ষ থেকে চীফ সেক্রেটারিকে লেখা ৩রা আগস্টের (১৯২২) চিঠিতে ওই তথ্য আছে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯১০ ও ১৯১১ সালে আরো অনেক নাটক বাজেয়াপ্ত হয়। যেমন অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'আশা কুহকিনী', সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'হোলো কী', হরিপদ চ্যাটার্জির 'দুর্গাসুর', মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল', কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলীর 'মাতৃপূজা', হারাধন রায়ের 'মীরা উদ্ধার', হরিপদ চ্যাটার্জির 'রণজিতের যজ্ঞ'। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়', নিখিলকান্ত রায়ের 'সোনার বাংলা'।

আশা কুহকিনী ১৯১০ সালের ২৬শে এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায় আশা কুহকিনী নাটকটি বাজেয়াপ্ত হয়। 'আশা কুহকিনী' একটি ঐতিহাসিক নাটক। ১৯০৯ সালে কলকাতায় এস এন কর্তৃক এটি প্রকাশিত। এর একটি কপি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। এর লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৯) বিশিষ্ট নাট্যকার। অভিনেতাও ছিলেন। সমসাময়িককালে দানীবাবু ছাড়া আর কোন অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথের মতো দর্শকচিত্ত জয় করতে পারেননি। স্টারে 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকায় তাঁর শেষ অভিনয়। অভিনয় করার সময় মঞ্চেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। নাট্যশালা দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় তিনি অনেক নূতনত্ব এনেছিলেন। নাট্যমন্দিরের তিনি ছিলেন সম্পাদক। তাঁর লেখা বিভিন্ন নাটক ও প্রহসন 'ঊষা', 'শ্রীরাধা', 'ঘুঘু', 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ', 'কেয়া মজেদার', 'প্রেমের জেপলিন' প্রভৃতি।

ক্লাসিক, গ্রান্ড, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। স্টার ও মিনার্ভাতেও তিনি ছিলেন। বাংলায় রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তিনি প্রথম সাময়িকপত্র বের করেন—'রঙ্গালয়'। তাঁর শেষ লেখা নেপোলিয়নের উপর নাটকটি ছাপা হয়নি। নাটক ছাড়া তিনি অনেক গীত ও রঙ্গনাট্যও লেখেন। তাছাড়া অনেক উপন্যাসেরও তিনি নাট্যরূপ দেন।

আশা কুহকিনীর প্রকাশক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রক এ· টি· সরকার। ১৩৩, চিৎপুর রোডের ফেব্রোডাইন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশের তারিখ ১৩১৬ সাল। এই নাটক সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের নোট Played at the Star Theatre, Calcutta. Has been proscribed by Govt. under the Provision of Press Act of 1910, Notification 1310 J. dated the 2nd May. 1910."

হোলো কী সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'হোলো কী'। নাটকটি ১৯১০ সালের ২১শে জুন তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নিষিদ্ধ হয়। কলকাতার এম সি বসু কর্তৃক প্রকাশিত। বইটি বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে লেখা।

'Represents fictitious incidents in the commencement of the boycott movement. Seditious. Has been Proscribed by the Govt. under Provision of Press Act 1910.

মীরা উদ্ধার হারাধম রায়ের 'মীরা উদ্ধার' নাটকটি ১৯০৮ সালের ২রা নভেম্বর প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালের ১৮ই জানুয়ারির গেজেট ঘোষণায় এটি বাজেয়াপ্ত হয়। মীরা উদ্ধার একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় নাটক। মীরাবাঈয়ের অতুলনীয় জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চিতোরের রাণী ছিলেন এই মীরাবাঈ তিনি একজন দয়ালু ও ধর্মপরায়ণ মহীয়সী ছিলেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাটকে রাণা কুম্ভ আকবরের মধ্যে বিষাদের যে কাহিনী আছে, তা কতটা ঐতিহাসিক সত্য, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এই নাটকের গানগুলিতে এবং নায়ক-নায়িকার উক্তিতে দেশাত্মবোধের প্রেরণা আছে। আর আছে মুঘল ও পাঠানদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য। এই নাটকে বারবার 'স্বদেশ','স্বদেশী', ও 'বিদেশী' কথাগুলি আছে। আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের উক্তিতে ব্রিটিশ বিরোধী মন্তব্য আছে। সরকারি ফাইলে তার যে ইংরাজি তর্জমা আছে, তা তুলে দিলাম

'Here after both Hindus and Muslims will have to suffer indictment at every step at the hands of some other alien foreigners. When that time comes, both the peoples will see their act of indiscrimination and under foreign subjection and oppression will strike their breast with hands and cry with despair. By quarrelling among ourselves we are running ourselves, knowing drinking poison and striking the axe at our own feet.'

এই নাটকটি সম্পর্কে গোয়েন্দাদের মন্তব্য

'There are several objectionable passages in the play, in which Hindus and Muhammadans are exorted to unite themselves, otherwise they will suffer further humiliation at the hands of foreigners.

Proscribed by Govt. (Notification No. 79 N. and 80IV. dated the 18th Jan. 1911) under Sec. 4 (1) Press Act, and 3, Dramatic Performance Act, Legal Remembrancer considers performers liable under Sec. 12A I. P. C.

It was performed by the Naria Arjya Sampraday of Faridpur. The Sub-Inspector allowed the play to be performed on elimination of objectionable passages.'[২২]

দুর্গাসুর হরিপদ চ্যাটার্জির 'দুর্গাসুর' নাটকটি নিষিদ্ধ হয় ১৯১১ সালের ৭ই আগস্টের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। এরপরও নাটকটি অভিনয় হয়েছে। এই নাটকের অভিনয় বন্ধের জন্য পুলিস কমিশনার ১৯১৩ সালের ১৫ই এপ্রিল 'স্টার' কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। সরকারি ফাইলে সে তথ্য আছে।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ'ও ওই একই তারিখে (৭-৮-১৯১১) বাজেয়াপ্ত হয়। মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল' নাটকটি ১৯১১ সালের ৭ই আগস্টের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলীর 'মাতৃপূজা'ও ওই তারিখে বাজেয়াপ্ত হয় ৭-৮-১৯১১। হারাধন বসুর 'সুরথ উদ্ধার' ১৯১১ সালের ৭ই আগস্টের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়।

কর্মফল মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল' নাটকটির মুদ্রাকর হলেন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক লেখক নিজেই। এ সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট

'Anti-Govt. This was one of the plays taken off the boards by the manager of a theatrical Company, Calcutta, in arrangement with commissioners of Police, performed at Chittagong and by the Party of Gour Mohan Kirtania at Mymensingh. Proscribed under Sec. 4(1). Press Act, and 3 Dramatic Performance Act. (Notification Nos. S. 79N and 80N dated the Jan. 1911).

Legal Remembrancer also considers Performers liable under Sec. 124A and 183A. Indian Penal Code.'

মাতৃপূজা মাতৃপূজার অভিনয়ের জন্য ১৯০৯ কলকাতায় এর লেখক মুদ্রাকর ও প্রকাশক দণ্ডিত হন। এ সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট 'A Seditious play spun around the legend of the war between the Gods and the demon. Author, Printer & Publisher convicted in Calcutta for performance in 1909. Proscribed under Sec 4(1), Press Act and 3. Dramatic Performance Act (Notification Nos. 79N and 83N dated the 18th Jan. 1910). Legal Remembrancer considers Performance liable under Sec. 124A and 183A Indian Penal Code.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

'শিখিপুচ্ছ' 'বিমলাসুন্দরী দেবীর **'শিখিপুচ্ছ'** নাটকটি ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারির গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার ২৩১-১বি, আপার আলিপুর রোডের কালী গঙ্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ফণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক বইটি প্রকাশিত। মুদ্রক চিন্তাহরণ মুখার্জি।

চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী, প্রতাপাদিত্য, আনন্দমঠ, প্রভৃতির অভিনয় নিয়ে যে আপত্তি উঠেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নিয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনায় সেকথা আগেই বলেছি। তেমনি দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে'র কাহিনী সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

প্রত্যাপাদিত্যের কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'র ছায়া আছে। 'প্রতাপাদিত্য' নাটকটি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব হয়। ১৯১২ সালের ২৭শে মার্চ কলকাতার পুলিশ কমিশনার ওই প্রস্তাব করেন। তবে তা কার্যকর হয়নি। সরকারি ফাইলে আছে যে, স্টারে প্রতাপাদিত্যের অভিনয়ের জন্য ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পুলিস কমিশনারের অনুমতি চান। তিনি এজন্য ২৯শে মার্চ (১৯১২) হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময়ে অভিনীত 'বসন্ত রায়ে'র কাহিনীও অনুরূপ।

এ সম্পর্কে একজন গবেষক লিখেছেন

"...রবীন্দ্রনাথের '**বউঠাকুরানীর হাটে**'র নাট্যরূপ অভিনীত হইল (১৯০১, ৬ এপ্রিল) এ কথা বলিলে বোধ হয় দুঃসাহসিক্তা হইবে না যে, 'বসন্ত রায়' বাংলার প্রতাপাদিত্যকে বাংলার শেষ বীর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নাট্যকারগণকে উদ্বোধিত করে। ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য (স্টারে, ১৯০৩, ১৫ আগস্ট) ...স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই অভিনীত হয়।"[১১]

নিষিদ্ধ না হলেও আরও কয়েকটি নাটক সেনসর বা অভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তার কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। যা এখানে উল্লেখ করছি

বঙ্গবিক্রম প্রকাশক বিহারীলাল দত্ত, মুদ্রাকর ভূতনাথ ঘোষ (১, চরকডাঙা, কলকাতা প্রেস)। এ সম্পর্কে সরকারি ফাইলে মন্তব্য 'ন্যাশনাল থিয়েটার পার্টি রংপুরে এটি মঞ্চস্থ করে। মুগলদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য বিক্রমপুরের কেদার রায়ের প্রচেষ্টা এখানে দেখানো হয়েছে। পর্তুগীজদের এই নাটকে জলদস্যু রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নাটকটিতে ইংরেজদের প্রকাশ্যে গালাগালি করা হয়েছে।'...

বাংলার শেষ বীর: (প্রতাপাদিত্য) এই নাটকে বিক্রমপুরের রাজার সঙ্গে পর্তুগীজদের যুদ্ধের চিত্র আছে এবং এই যুদ্ধে পর্তুগীজরা পরাস্ত হয়। নাটকে অনেক আপত্তিকর অংশ আছে।

ভারত গৌরব বা প্রতাপ সিং : নাটকটি রাষ্ট্রদ্রোহকর। আকবর ও রাণা প্রতাপের সময়ের কথা এখানে আছে। কয়েকটি গান ও বক্তৃতা দেশদ্রোহকর। একে মাতৃপূজার সংশোধিত রূপ বলা যায়। লেখক কেশবচন্দ্র ব্যানার্জি।

বৃত্রাসুর বধ হিন্দু পৌরাণিক নাটক। আজকের দিনের রাজনীতির কথা এতে আছে। লিগাল রিমামব্রান্সার মনে করেন যে, প্রেস আইনের ৪(১) এবং ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্টের ৩ ধারার আওতায় এটি পড়ে। কেবল এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। নাটকটি ছাপা হয় কিনা জানা যায়নি। কোন ছাপা কপি পাওয়া গেলে তা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চকে জানাতে হবে। যাঁরা এর অভিনয় করবেন তাঁদের ম্যানেজারদের জানাতে হবে যে, এর অভিনয় করা হলে তাঁদের ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হতে পারে।

খালাস : এখানে দেখানো হয়েছে যে, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বদেশীয় সম্পর্ক ত্যাগের যে আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট দেন, তিনি তা অগ্রাহ্য করে চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং দেশবাসীর কাছে বীর বলে গণ্য হন।

মুক্তি লেখক ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। সপারিষদ রাজ্যপাল মনে করেন যে, এই নাটকটি জনগণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে পারে। তাই ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্টের.. (১৮৭৬) ৩ ধারানুসারে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে এর অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুক্তি হচ্ছে পাঁচ অঙ্কের পৌরাণিক নাটক। লেখক এখানে মুক্তি বলতে পার্থিব স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোঝাননি, আত্মার মুক্তির কথা বলেছেন।

কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারেও অনেক আপত্তিকর নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে। এর সংখ্যা সাত শতাধিক। এর মধ্যে যেগুলি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম দিলাম 'পশুশাসন' (১৯০৯)—অতুলকৃষ্ণ মিত্র, 'জন্মাষ্টমী' (১৯০৪), —'সোমনাথ' (১৯১০)—দাশরথী মুখোপাধ্যায়, 'চিতোর ধ্বংস' (১৯১২)—মন্মথনাথ নিয়োগী, 'হাম্বির সিংহ' (১৯১৫)—নীলকান্ত রায়, 'আহুতি' (ঐ)—'বাহাদুর' (১৯১৬)—নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুক্তির স্বাদ' (১৯১৭)—সমরেশ মুখোপাধ্যায়, 'জয়-পরাজয়' (১৯১৮)—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, 'আঁধারে আলো' (ঐ)—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রত্নেশ্বরের মন্দির' (১৯২২)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, 'স্কন্দগুপ্ত' (১৯২৩)—পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, 'গোলকুণ্ডা' (১৯২০)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, 'বন্দে মাতরম' (১৯২৬)—অমৃতলাল বসু, 'সমুদ্রগুপ্ত' (১৯২৯)—সুধীর সাহা, 'শ্যামা মা' (ঐ)—শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ, 'শঙ্খধ্বনি' (ঐ)—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জন্মাষ্টমী' (১৯৩২)—অমরেশ ঘোষাল, 'সীতারাম' (১৯৩২)—অমরনাথ বসু, 'সোমনাথ' (১৯৩২)—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'রক্তক্ষুধা' (১৯৩৩)—হরগোবিন্দ সেন, 'নারীশক্তি' (ঐ)—বাঁশরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' (১৯৩৩)—সুধীরকুমার মিত্র, 'কেদার রায়' (১৯৩৪)—রমেশচন্দ্র গোস্বামী, 'মুক্তির মন্ত্র' (ঐ)—সুরেশচন্দ্র দে, 'বামন অবতার' (ঐ) ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, 'রক্তজবা' (ঐ)—নারায়ণচন্দ্র কোতাল, 'দেশাচার' (ঐ)—প্রবোধচন্দ্র সরকার, 'মারাঠা মোগল' (ঐ)—সুধীর লাহা, 'রত্নেশ্বর' (১৯৩৭)—ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, 'রাণী দুর্গাবতী' (১৯৪২)—মহেন্দ্রলাল গুপ্ত, 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৯৪৩) (ঐ), 'ধাত্রীপান্না' (ঐ)—শচীন সেনগুপ্ত, 'দুর্গেশনন্দিনী' (ঐ)—অতুল মিত্র, 'মহারাজ নন্দকুমার' (ঐ)—মহেন্দ্র গুপ্ত, 'রাষ্ট্রবিপ্লব. (১৯৪৪)—শচীন সেনগুপ্ত, 'নবাব মীরকাসিম' (১৯৪৪)—শশাঙ্ক বন্দ্যোঃ, '১৩৫০' (ঐ)—বিধায়ক ভট্টাচার্য, 'নরকের কন্ট্রোল' (১৯৪৫)—সন্তোষকুমার সেন, 'জাগরণ' (১৯৪৬)—অমূল্যবরণ ঘোষ, 'শহীদ' (ঐ)—অমিয়ময় দে, 'সীতারাম' (ঐ)—বীরেন ভদ্র, 'নতুন প্রভাত' (১৯৪৫)—মনোজ বসু, 'রক্তপিছিল পথে' (১৯৪৭)—গোবিন্দ বন্দ্যোঃ, 'মুক্তিসাধক' (ঐ)—প্রফুল্লকুমার বসু, '৯ই আগস্ট' (ঐ)—সন্তোষ শীল, 'বন্দী জাগো' (ঐ)—হরিপদ বসু, 'শ্রীদুর্গা' (ঐ)—'রক্তে যাদের এসেছে জোয়ার' (ঐ)—ফণি দত্তগুপ্ত, 'যুদ্ধ হল শেষ' (ঐ)—হরিপদ বসু।[১৮]

নাটকের যে সব পাণ্ডুলিপি নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার নাম কেবল উল্লেখ করলাম। আর অসংখ্য পাণ্ডুলিপি সেন্সর. হয়। মোট কথায় ব্রিটিশ যুগে নাটকের বিরুদ্ধে তিন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল

(ক) প্রেস আইনে নাটকের বই নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত,
(খ) ড্রামাটিক 'পারফরমেন্স আইনে অভিনয় নিষিদ্ধ,
(গ) একজিকিউটিভ ক্ষমতাবলে অভিনয় নিষিদ্ধ।

নির্দেশিকা : নাটক

১। H. N. Dasgupta, Indian Stage, Vol. IV, P 58
২। Ibid, P 57
৩। 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত। পৃঃ ২৬
৪। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 'গিরিশচন্দ্র', পৃঃ ৩৬৭
৫। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', পৃঃ ১৯০-১৯১
৬। Dasgupta, The Indian Stage, Vol-IV, P. 46.
৭। Fl. No. 47/12, 1912, Home (Pol.) Confidential, Bengal Govt.
৮। Prohibition of the performance of objectional plays in Eastern

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Secretary's Dept. Fl. No. 318 of 1910.

৯। Ibid.

১০। Fl. No. 7P—P. Proceedings B September, 1930.

১১। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', পৃঃ ১৮৯

১২। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র পৃঃ ৩৮৩

১৩। Bengal Plays noted in the Political Branch, CID, Complete upto 3.12.1910. Fl. No. 47/12, Home (Pol) Bengal Govt.

১৪। ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব' পৃঃ ৫৭০

১৫। Fl. No. 97, Serials 1—3, 1910, Home (Pol) Conf. Bengal Govt.

১৬। ডঃ জয়গুরু গোস্বামী, 'চারণ কবি মুকুন্দদাস' পৃঃ ৭২৫

১৭। ঐ, পৃঃ ৭৮

১৮। ঐ, পৃঃ ৬৯

১৯। ঐ, পৃঃ ৮০

২০। ঐ, ভূমিকা

২১। Political No. 187 P.D. dt. Darjeeling, 2nd May, 1915.

২২। Fl. No. 157 of 1913, Sl No. 1—6, Home (Pol.) Conf. Beng. Govt.

২৩। Bengal Govt. Political Dept. Order No. 7826—7853P. dated the 14th of August, 1925.

২৪। Fl. No. 130/31, 1931, Home (Pol.) B. Govt.

২৫। Records Preserver in writers' Buildings, Calcutta.

২৬। I bid.

২৭। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৪

২৮। স্টেট আর্কাইভস্, রাইটার্স বিল্ডিংস। ডঃ প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের মাধ্যমে লালবাজার থেকেও কিছু তথ্য পেয়েছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ (ক) অধ্যায়
দীনবন্ধুর নীলদর্পণ

দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান উপ-অধ্যায়ে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকের অনুবাদ নিয়ে যে মামলা হয়, তার কিছু তথ্য উপস্থিত করছি। ওই মামলা যদিও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য দায়ী রেভারেণ্ড লঙের বিরুদ্ধে, কিন্তু আসল অভিযোগ ছিল মূল কাহিনী সম্পর্কে।

নীলচাষীদের উপর কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও তাদের বিদ্রোহের পটভূমিতে বাংলার মরমী কথাশিল্পী দীনবন্ধু লিখলেন নীলদর্পণ (১৮৬০)। নদীয়া ও যশোহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সময় নীল উপদ্রব সম্পর্কে অনেক ঘটনা তিনি জানতে পারেন। কুঠিয়ালদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শুনে ব্যথিত হয়ে তিনি নীলদর্পণ রচনায় হাত দেন, নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের ভিত্তি। নীলকর কমিশনের রিপোর্ট বের হবার কিছুদিন পরই নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণে এই রিপোর্টের কথা আছে (৫ম অংক, ১ম গর্ভাঙ্ক) নীলদর্পণ বের হয় ঢাকা থেকে ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর-এর মাঝামাঝি (২রা আশ্বিন, ১২৬৭) বাংলা নাটকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না, লেখকের নামের স্থানে লেখা ছিল

নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেন কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীত। টাইটেল পাতায় আরও লেখা ছিল 'শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। ঢাকা।' তবে দীনবন্ধুই যে এই নাটকের লেখক তাও গোপন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা জানিয়েছেন : 'নীলদর্পণের গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন গ্রহণ করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা'।

প্রকাশমাত্র বইটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক বছরের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। নীলদর্পণের প্রকাশিত নীলচাষীদের দুর্দশার কথা শহর কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজকেও প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন "নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।"

নীলদর্পণ সম্পর্কে সে যুগের 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় ১৮৭৩, ৭ নভেম্বরের মন্তব্য "নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদীয়া ও যশোহর জিলার অনেক স্থান ভ্রমণ করাতে নীলোৎপাত সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা তিনি জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতে তিনি নীলদর্পণ রচনা আরম্ভ করেন।"

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) নাট্যকার হিসাবে বিপুল শক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটকটি নীলকরদের উৎপীড়নের ছবি ফুটিয়ে তোলে, সেকালে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং মিশনারি লঙ এর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নীলদর্পণ অভিনয়ের সময় দর্শকরা এত উত্তেজিত হয়ে যেতেন যে, সময় সময় মঞ্চে জুতোও ছুঁড়েছেন, রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখায় সে তথ্যও আছে :

'Some of the worst evils of British rule which deeply stirred the feelings of the people form the theme of dramas. The best illustration is the Nil-darpan by Dinbandhu Mitra which depicted the terrible oppression of the indigo-planters.

B. C. Pal writes in his autobiography "When it was put upon the board of the new Bengali Theatre, the audiance got wild with passion against

দুনিয়ার পাঠক এক হও

the white Planters, and sometimes they so far forgot themselves that they threw their shoes at the poor actor on the stage"'

জনশ্রুতি বিদ্যাসাগর মহাশয় মিঃ রোগের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অভিনয় দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি নিজের চটি খুলে তাঁর মাথায় ছুঁড়ে মারেন "In another occasion, it is said , Iswarchandra Vidyasagar was carried away by the play to the extent that he took one of his slipper and threw it at the head of Aurdhendu Sikar Mustafy who was playing the role of Mr. Rogue.'

নীলদর্পণের প্রথম অভিনয় ঢাকাতে 'পূর্ববঙ্গ ভূমি'তে। লেখক দীনবন্ধু মিত্রের উৎসাহেই তা হয়। কলকাতায় এর প্রথম অভিনয় হয় প্রায় বার বছর পরে এবং এখানেও দীনবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তারপর কলকাতায় নিয়মিত নীলদর্পণের অভিনয় হয়। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাবেই লিখিত হবার এতদিন পর নীলদর্পণ নিয়মিত অভিনীত হয়। কলকাতায় এই প্রথম অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অংশ নেননি। তাই এই অভিনয় দেখে দীনবন্ধুর মন ভরেনি। ক্ষুব্ধ হয়ে দীনবন্ধু বলেন : 'ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের actor যোগদান করেন নাই।' ১২৭৯.সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ স্যানাল ভবনে অনুষ্ঠিত এই অভিনয়ে দীনবন্ধু ছাড়া বহু সম্ভ্রান্ত দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

এর কিছুদিন পর মহা সমারোহে কলকাতার টাউন হলে নীলদর্পণ অভিনীত হয়, ১৮৭৩, ২৯ মার্চ। এবার উড সাহেব ভূমিকায় অভিনয় করলেন গিরিশচন্দ্র আর সৈরিন্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করেন ডাঃ আর জি কর। তোরাপের ভূমিকায় মতিলাল সুরের, রোগ সাহেবের ভূমিকায় অবিনাশচন্দ্র করের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। এই অভিনয় বিপুল সাফল্য অর্জন করে। নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যে এই অভিনয় হয়। এর বেশ কিছুদিন পরে ন্যাশানাল থিয়েটারে নিয়মিত নীলদর্পণ অভিনীত হয়।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ বের হবার কয়েক মাসের মধ্যেই এর ইংরাজী-অনুবাদ বের হয়। ১৮৬১ এপ্রিল মে মাসে। গ্রন্থের আখ্যান পত্রে লেখা ছিল

'Nil Darpan, or /The indigo Planting Mirror,/ A Drama / Translated from Bengali/ By/ A Native

এতে কলকাতার কাশীটোলার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং প্রেসের পক্ষে শুধু সি এইচ ম্যানুয়েলের নাম মুদ্রিত ছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা ছিল

"The original Bengali of this Drama—the Nil Darpan, or Indigo Planting Mirror—having excited considerable interests, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native ; both the original and translation are bonafide native production and depict the indigo planting system as viewed by Natives at large.'

ইংরাজী নীলদর্পণে কোথাও মুদ্রক ছাড়া আর কারো নাম ছিল না : নীলদর্পণের সমগ্র অংশ অনুবাদ করা হয়নি, এবং পরিবর্তন ও পরিবর্জনও হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ভূমিকাসহ ১০২। এই ইংরাজী নীলদর্পণ যেন মৌচাকে ঢিল মারে। বাংলা নীলদর্পণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও উপযুক্ত মহলে পৌঁছতে পারেনি, সেই অভাব এখন দূর হল সেকথা বিশপ কটন তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন 'The translation brust like a cyclone over Society' বিশেষ করে কলকাতায় ব্রিটিশ প্রেস তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। আর নীলকর তো ইতিমধ্যেই ক্ষেপে ছিল লঙ, সীটনকার, গ্রান্টের বিরুদ্ধে নীল কমিশন নিয়ে। এবার তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। ক্রোধে, আক্রোশে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠল। রেভারেন্ড লঙের বিরুদ্ধে রাগের কারণ, যে ইণ্ডিগো কমিশন, নীলচাষ সম্পর্কে তদন্ত করে নীলকরদের বিরুদ্ধে ও কৃষকদের পক্ষে রিপোর্ট দিয়েছিল--তাতে চাষীদের পক্ষ সমর্থনে সাক্ষী দিয়েছিলেন ইনি। উক্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডব্লু এস সীটনকার। বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার জন গ্রান্ট ও লর্ড ক্যানিং এই কমিশন নিয়োগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গরীব কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এই আইরিশ মিশনারি রেভারেন্ড লঙের সাক্ষ্যের জন্যই মূলত কমিশন কৃষকদের অনুকূলে রায় দেয়। সীটনকার ওই কমিশনের প্রধান ছিলেন, তাই তিনিও নীলকরদের বিরাগভাজন হন।

কিন্তু এই ইংরাজি নীলদর্পণের প্রকৃত অনুবাদক কে, আজও তা অজ্ঞাত।

১৮৬১, ২৫মে ইংলিশম্যানের সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট ইংরাজী নীলদর্পণের একটি কপি ল্যান্ড হোল্ডারস অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদককে, ডব্লু এফ ফার্গুসনকে পাঠান। লাহোর ক্রনিকেলের সম্পাদকের কাছ থেকে তিনি ওটি পান। ফার্গুসন তখনই এ সম্পর্কে বাংলা সরকারকে পত্র লেখেন। তাঁকে জানানো হয় যে, বইটি যখন ছাপা ও প্রচার হয়েছিল, তখন লেঃ গভর্নর কলকাতায় ছিলেন না। ভুল করে ও অনবধানতাবশত এ কাজ হয়েছে। সমিতির কৌঁসুলি বইটি 'লাইবেলাস' বলে মতপ্রকাশ করেন এবং তাঁর পরামর্শে এর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বইটির টাইটেল পাতায় কেবল প্রিন্টার সি এইচ ম্যানুয়েলের নাম ছিল। লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক—কারোরই নাম ছিল না। তাই নীলকরদের ওই সংগঠন ল্যান্ডহোল্ডার অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া প্রথমে মুদ্রাকর ম্যানুয়েলের নামে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন, ১৮৬১, ৬ জুন তারিখে। নীলদর্পণ নিয়ে এটিই প্রথম মামলা। বিচারের সময় জেমস্ লঙের পরামর্শে ম্যানুয়েল গ্রন্থের প্রকাশক লঙের নাম প্রকাশ করেন, নীলদর্পণ সম্পর্কে এই প্রথম লঙের নাম সরকারিভাবে উচ্চারিত হল। প্রকাশকের নাম প্রকাশ করায় মুদ্রক ম্যানুয়েলের দণ্ড সামান্য হয়—মাত্র দশ টাকা জরিমানা।

যখন জানা গেল এই ইংরাজি নীলদর্পণ প্রকাশের জন্য লঙই দায়ী, তখন সামান্য জরিমানা দিয়ে মুদ্রক ম্যানুয়েলকে রেহাই দেওয়া হয়, এবং লঙের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। রানী বনাম লঙ। এটাই ভারতের প্রথম স্টেট ট্রায়াল। ১৮৬১, ১৯ জুলাই জেমস্ লঙ কলকাতা সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগকারী ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও ইংলিশম্যান পত্রিকার ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার ও সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট, প্রধান বিচারক ভারত বিদ্বেষী কুখ্যাত মরডান্ট ওয়েলস। লঙের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এক, নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের দ্বারা তিনি ইংলিশম্যান এবং বেঙ্গল হরকরা পত্রিকাদ্বয়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা প্রচার করেছেন এবং দুই বাংলার নীলকর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনুরূপ কুৎসা প্রচার ও তাঁদের মর্যাদাহানি করেছেন।

মামলায় ব্রেটের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলী পিটার্সন তাঁর সওয়ালের শুরুতেই ঘোষণা করেন : দেশের সরকারের আজ বিচার হচ্ছে 'government of the country were on trial'

হিন্দু পেট্রিয়টের ২৫ জুলাই, ১৮৬১ তারিখের সম্পাদকীয়তে পিটার্সনের মুখের মত জবাব দেওয়া হয় 'না, এর চেয়ে বেশি···

"Nay", more than that, the defendants were more numerous than the court accomodate; and a few more important body than even the Government. They were the British nation which has always sympathised with ryot's wrongs, which has assisted him in his deliverance."

অভিযোগকারীদের পক্ষে অর্থাৎ ব্রেট পক্ষে পিটার্সন ছাড়া আর একজন কৌঁসুলি ছিলেন—ডেভিট কাউলি। পিটার্সন জুরী মামলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অ্যাডভোকেট। আর লঙের তরফের 'অ্যাটর্নিরা হলেন ইগলিন্টন ও 'নিউমার্চ।

নীলদর্পণের অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য লঙই দায়ী এই বলে অভিযোগ করা হয় যে, নীলকরদের সমর্থক দুটি বড় সংবাদপত্রের ইংলিশম্যান ও বেঙ্গল হরকরার সম্পাদকের বিরুদ্ধে এই বইয়ের ভূমিকায় কুৎসা করা হয়েছে এবং এতে নীলকরদের বিরুদ্ধেও কুৎসা রয়েছে।

মামলা চলাকালেই ইংরাজি নীলদর্পণ সম্পর্কে রেভারেন্ড লঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অন্যান্য নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্য জানা যায়। এই মামলা দায়ের হবার পরই প্রথম সরকারীভাবে লঙের নাম এর প্রকাশক রূপে উচ্চারিত হল। মুদ্রক ম্যানুয়েলের সাক্ষ্য ও সীটনকারের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, ইংরাজি নীলদর্পণ মোট ৫০০ কপি ছাপা হয়। ছাপার জন্য ব্যয় ৩০০ । লঙই এই টাকা দেন। ১৮৬১, এপ্রিল মে'র মধ্যে ছাপা শেষ হয়। বই ছাপার নির্দেশ লঙই দেন, প্রেসে পাণ্ডুলিপি তিনিই দিয়েছিলেন। ছাপার পর যাবতীয় প্রুফশিট ও পাণ্ডুলিপি লঙকেই ফেরত দেওয়া হয়। এবং ছাপার পর সব বই লঙের ঘরেই যায়। ছাপা এবং বণ্টনও গোপনে সতর্কতার সঙ্গে হয়।

লঙকে অভিযুক্ত করে আসল মামলাটি শুরুর আগে লঙ একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। কৈফিয়ত দিয়ে তিনি 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার একটি চিঠিও বের করেন। তাঁর এই কৈফিয়তে কিন্তু নীলকরদের মন গলেনি। মামলা রুজু হল। আসামী রেভারেন্ড জেমস্ লঙ। অভিযোগ নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের দ্বারা তিনি ইংলিশম্যান ও বেঙ্গল হরকরা পত্রিকাদ্বয়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা রটনা করেছেন। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে ১৯, ২০ ও ২৪ জুলাই এই মামলা চলে। লঙের মামলার ব্যয় বহন করেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং। তাঁর জামিনের জন্য দাঁড়ান দুই মিশনারি পুটন ও স্টুয়ার্ট। মামলার সাক্ষ্য দেন অভিযোগকারী ওয়াল্টার ব্রেট, নীলদর্পণের মুদ্রক ম্যানুয়েল, ফার্গুসন (ল্যান্ডহোল্ডারস্ অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক), হরকরা সম্পাদক আলেকজান্ডার কর্বেন, বাংলা সরকারের রেজিস্ট্রার—টমাস জোনস্ ও আর একজন সরকারী কর্মী সিমল ডিক্রুজ, নীল কমিশনের সভাপতি ও বাংলা সরকারের প্রাক্তন সচিব সীটনকারেরও সাক্ষ্য দেবার কথা ছিল। তিনি আদালতে হাজিরও ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। আদালতে লঙকে জেরা করা হয়নি। লঙের পক্ষে কোন সাক্ষীও নেওয়া হয়নি এমন কি লঙকে তাঁর বক্তব্য বলার পুরো সুযোগও দেওয়া হয়নি। নীলকরদের কৌঁসুলি পিটার্সনের ধারণা হয়েছিল যে, লঙ শুধু প্রকাশক নন, অনুবাদকও।

"That the author might have been some Hindu, but the translation could never have been made by a Hindu but an Englishman."

পরবর্তীকালেও ইংলিশম্যান পত্রিকা লঙকেই অনুবাদক বলেছেন (১৮৭২)। লঙ আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতে যে বিবৃতি দেন, তাতে তিনি বলেন যে, অনুবাদকর্ম ইত্যাদির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁরই। এই অনুবাদ সম্পর্কে পিটার্সন বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক আলেকজান্ডার ফর্বেসকে জেরা করেন

পিটার্সন আপনি কি লঙের হাতের লেখা চেনেন।
ফর্বেস: হ্যাঁ, চিনি।
পিটার্সন এই প্রুফগুলো দেখুন এবং আদালতকে বলুন যে, এগুলোয় যেসব লেখা, লঙের না অন্যের ?

ফর্বেস: বিভিন্ন অংশের সংশোধন হয়েছে।

এই ৫০০ কপি লেখাটি লঙের হাতের লেখা। ৫৪ পাতায় **'Bailiggs'**-এর বদল এই যে **'Peadah'** লেখা হয়েছে, সেই সংশোধনটি লঙের লেখা। ২০ পাতায় সংশোধন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। কারণ লঙের হাতের লেখার থেকে অনেক স্পষ্টভাবে এটা লেখা হয়েছে, অন্য লেখাগুলো সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহই নেই।

পিটার্সন তাঁর সওয়ালে বলেন যে, এই নাটকের বক্তব্য এই যে, নীলকররা গোষ্ঠীগতভাবে পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, হত্যা প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়েছে। এতে ইংরেজ নারীত্বের প্রতিও কুৎসা আছে।

লঙের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে অভিযোগ, সেটি মূলত নীলদর্পণের কাহিনীরই বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের প্রধান কৌঁসুলি পিটার্সন আদালতে নীলদর্পণ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, কী ভাবে এ বইয়ে নীলকরদের হেয় করার চেষ্টা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"The learned council read from Nil Darpan itself a large number of passages in which, as he showed, most serious and disgraceful, libels were perpetuated against a particular class, who as he would prove by the evidence he should lay before them, could be none other in intention of their reverend traducer than the indigo Planters. He read numerous passages, appealed not to their feelings, but to their reason on the libellous matters which he thus read to them, charging upon the indigo Planters every variety of crime held most abhorred amongst all civilised men, and which he had already detailed to them. The avowed object of Nildarpan was to describe certain state of Society, was it nothing with such an avowed object to represent, under the fictitious name of Wood and Roge, the whole body of Planters ? The story of the book commenced with the picture of a once happy valley,—happy in the production of rice, grain, pulse, seeds, oil, and fish. The women simple minded and happy in their allegiance to their husbands ; the ryots happy, no evil to complain of ; the ryot's daughter virtuous and therefore happy. But alas, a change came over the spirit of their dream ; the Indigo monster arrives : In the short period of three years, indebtedness, starvation, neglected fields, imprisonment, forgery, attempted violation, murder, sudden death and suicide came on the scene. The virtue of the Bengalee, his women and his ryots, remain unchanged until the closing scene, when death in some or other, puts an end to all their sufferings. But how is this brought about —by swarms of Mehratta horsemen ? By hordes of Tarters or some like calamity ? No, but by means of the introduction of the indigo monsters, represented by the dramatist persons, Wood and Roge. Bengalee dewans, once true, are converted into demons, amins, once harmless are converted into oppressers. The Planter's wife—and here he felt that he was no longer the mere councel,—he was the Englishman pursuing with a righteous indignation—the libeller who had dared to cast the deepest strain upon the fair game of his country women ; whom before the world he had assiduously represented as the means of satisfying the lust of the justice, for the purpose of making him the tool of the Planters. The ever virtuous sweetmeat-seller Podi Moyrani, who had fallen a victim of the older Sahib, who has no longer the power to continue his vile Practices, is made the fool for satisfying the lust of the chota (Younger) Sahib ; but even she has some reluctance, bad as she is, but neither of the Sahibs have any. The virtuous ryots all die or killed off under the oppression of triumphant vice, and the sole cause of all these misfortunes, is the indigo Planters ; If such be indeed the state of society, where was the Government that was powerless and like to restrain such vice, or see the effects of such picture of it ? If such be not the state of society , what right had any mischief-maker , under any guise-religious, fanatic, political, partizon, or what they would—to make it appear to be so ?" (Trial Report)

নীলদর্পণ সম্পর্কে পিটার্সন. সাক্ষী মিঃ ফর্বেসকে এই জেরা করেন

পিটার্সন	আপনি কি মনে করেন যে, নীলদর্পণ প্রকাশিত হওয়ায় ভাল মনোভাবের সৃষ্টি হবে ?
ফর্বেস	কখনই নয়। আমি মনে করি এর ফলে ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব আরও অনেক বাড়বে।
পিটার্সন	আপনি কি জানেন মূল নীলদর্পণটি কোথায় ছাপা হয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফর্বেস	আমাকে বলা হয়েছে ঢাকায়।
পিটার্সন	আপনি কি জানেন নাটকটি সেখানে অভিনীত হয়েছে ?
ফর্বেস	হাঁ, আমি তা শুনেছি। ঢাকা থেকে পাওয়া এক চিঠিতে আমি জেনেছি, নাটকটি সেখানে অভিনীত হয়।
পিটার্সন	কোনো বিবেচক ব্যক্তি এ ধরনের লেখা লিখবেন না।
আদালত	এর ফলে ইংলন্ডে কী প্রতিক্রিয়া হবে, আমি তা বলতে পারি না।
ব্রেট	এই বইটি (ইংরাজী নীলদর্পণ) সম্পর্কে তিনি প্রথম লাহোর থেকে জানতে পারেন।

আসামী পক্ষের উকিল মিঃ ইগলিন্টন নীলদর্পণের সমর্থনে বলেন যে, তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি বইটি একটি নাটক। এটা কোন প্রচারপত্র নয়, রীতিনীতি ও ঔচিত্যের দিক থেকে চরিত্রগুলি নাটকের ও কাল্পনিক। উড এবং রোগের মত দুর্বৃত্তের চরিত্র থাকতে পারে। কিন্তু দুর্বৃত্তের চরিত্র ছাড়া নাটক হওয়া শক্ত। কোনো আইনজীবী, যাজক বা ব্যবসায়ী যদি দুর্বৃত্ত হন, তাহলে সমস্ত আইনজীবী, যাজক বা ব্যবসায়ী দুর্বৃত্ত হবেন—এ রকম কোন যুক্তি হতে পারে না। এ কথা সত্য যে এই নাটকে আধ ডজনের মত দুর্বৃত্তের চরিত্র দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো এক শ্রেণীর একজন যদি দুর্বৃত্ত হয়, তাহলে সেই শ্রেণীর সকলেই দুর্বৃত্ত হবে ?

ইগলিন্টন তাঁর সওয়ালে আরও বলেন : নাটকে নাটকীয়তার জন্য ভাল ও খারাপ দুটো দিকই দেখতে হবে। এবং নীলদর্পণ নাটকেও ভাল দিকও আছে, সব নীলকরকেই দুর্বৃত্ত বলা হয়নি। কাজেই মানহানির অভিযোগ টেঁকে না।

এরপর বিচারক নীলদর্পণ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে এই বইটি শুধু নীলকরদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে মানহানিকর নয়, এতে ম্যাজিস্ট্রেট এবং নীলকরদের বিরুদ্ধেও কুৎসা আছে।

"After reading and commenting on the passages, he (Mr. Lordship) said it was for the jury to say whether it could bear any other interpretation than that suggested by Mr. Peterson, that the wives of the indigo Planters, of which the type was propounded in the drama, were persons who were in the habit of debasing themselves on the manner suggested for the purpose of forwarding the worldly interests of their husbands. It was argued that it only related to some exceptional instance, but the Jury would consider from the whole tenor of the pamphlet whether such were the case. Regarding some of the passages of this book and the following passage in the author's. preface:.

"I present the Indigo Planting Mirror to the Indigo planters' hands ; now everyone of them having observed his face, erase the preckle of the stain of selfishness from his forehead. It was impossible to speak of them otherwise than as filthy insinuation against a society of helpless ladies who, under the mask of general type, were cruelly stabbed in the dark. If it anything it was not merely a slander against the wives of Planters, but also against the Magistrate, and the Planters. The Jury, the civilians, the soldiers, the merchants in this country alike had their common origin from the middle class whose daughters were here so shamefully maligned." (Trial Report)

সুপ্রীম কোর্টে রেভারেন্ড লঙের এই ঐতিহাসিক (যা First of the State trials of India বিচার দেশে বিদেশে (ইংলন্ডে) বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, প্রভাবশালী বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং জমিদাররাই শুধু নয়, ইউরোপীয় ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, মিশনারী নীলকররা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারি কর্মীরা দিনের পর দিন আদালত কক্ষে উপস্থিত থেকেছেন এবং গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে বিচার কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখেছেন। নীলদর্পণের মূল লেখক দীনবন্ধুও আদালতে উপস্থিত থাকতেন। দীনবন্ধু-পুত্র ললিত মিত্র এ সম্পর্কে তাঁর বইয়ে লিখেছেন

"Amid the overwhelming crowd of spectators was one figure displaying the most eager and expectant look, and we can not pass him over. He was no other person than the author of the original Nil Darpan"

এটা বিচার নয়, বিচারের প্রহসন। জুরীদের সকলেই ইউরোপীয়, একজন কেবল পার্সী। ১৫ জন জুরীর মধ্যে ১২ জনই ইংরেজ। ১ জন পর্তুগীজ, ১ জন আর্মেনীয়, একজন ভারতীয়-পার্সী, মানিকজী রুস্তমজী। বিচারের উপসংহারে বিচারক ওয়েলস কীভাবে জুরীদের প্রভাবিত করেন, সে কথা কিং লিখেছেন। বিচারের শেষে ওয়েলস জুরীদের লম্বা পরামর্শ দেন। তিনি নাটকের ভূমিকাটি পড়েন ; তিনি বলেই দেন জুরীদের কি মত দিতে হবে।

"The Judge imputed that Long was actuated by 'other than pure motives and in publishing and distributing the book anonymously. If the Jury believed that the defendant had been actuated by a feeling of animosity towards the planters of lower Bengal, with a view of degrading, injuring this class into contempt and ridicule the verdict must be guilty."

জুরীরা সর্বসম্মতভাবে লঙকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। ১৮৬১, ২৪ জুলাই এই ঐতিহাসিক মামলার রায় বের হল। লঙের হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। এই কাজির বিচারের রায়

'...after an anxious consideration of all the circumstances of the case, you have been convicted for the offence of wil fully and maliciously libelling the proprietors of the Englishman and Harkura news-papers, and under the second court, of libelling with the same interest, a class of persons designated as the Indigo planters of lower Bengal...

The sentence of the court is, that you pay a fine of Rs. 1000 to our Sovereign Lady the queen, and that you be imprisoned in the common jail of Calcutta for the period of one calendar month, that you further imprisoned till the fine is paid."

লঙের অ্যাটর্নি রায় কার্যকর করা স্থগিত রাখার আবেদন জানান। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পিককের নেতৃত্বে গঠিত ফুল বেঞ্চে মামলাটির আবার সওয়াল হয়। এখানে লঙকে তাঁর বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে কিং লিখেছেন

'Long's attorney moved for arrest of judgment and on July 24th case was reargued before Full Bench, presided over by the Chief Justice, Sir Bernes Peacock. Before Full Bench Long was allowed to defend his Publication."

আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় লঙ বলেন যে, ভারতের জনগনের মতামত কর্তৃপক্ষকে জানানো তাঁর কর্তব্য। ১৮৫৭ সালে জনগণের মনোভাব জানা গেলে অনেক রক্তপাত এড়ানো যেত। তিনি বলেন : "যতদিন আমি বাঁচব যতদিন আমার চিন্তার ক্ষমতা থাকবে, ও লেখবার কলম থাকবে, ততদিন আমি জনগণের সামাজিক মুক্তির জন্য সওয়াল করে যাব···একে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলা হতে পারে···কিন্তু খৃষ্টমতবাদ তো সম্প্রসারিত অর্থে রাজনৈতিকই। (এখানে উল্লেখ্য, লঙের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেবার অভিযোগ ছিল। সে কথা ভেবেই লঙ এই মন্তব্য করেছেন) তিনি আরও বলেন নীলদর্পণের প্রকাশক হিসাবে আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। নীলচাষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সম্পর্কে এদেশীয়দের মনোভাব কী ইউরোপীয়দের তা অবগত করানোর জন্যই আমি এটির (ইংরাজি নীলদর্পণ) সম্পাদনা করেছি। দেশীয়দের প্রস্তাবমত এই বইটি লেখা হয়নি, এমন কি তারা এ সম্পর্কে কিছু জানেও না এবং তাদের মধ্যে এটি প্রচারও করা হয়নি। অন্যদের অনুরোধেই এটি করা হয়েছে।"

লজ্জার কথা, লঙকে তাঁর পুরো বক্তব্য বলতে দেওয়া হয়নি ; অন্যায়ভাবে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়।

লঙের এই বিচার নিয়ে দারুণ ক্ষোভ দেখা দেয়। মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের মত লঙের এই বিচারও পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ। ভারতীয়রাই নয়, বহু ইংরেজও এই বিচার পদ্ধতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে পদস্থ ইংরেজ আমলারাও আছেন। কিং তাঁর বইয়ে এ সম্পর্কে লিখেছেন " মিশনারীর এই কারাদণ্ডে কলকাতা ও ইংলণ্ডের জনমত ক্ষুব্ধ হয় এবং মানবতাবোধ ও নীলকর বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ দেখা যায়। ১৮৬১, ২৬ আগস্ট ; কলকাতার শোভাবাজারের নাট্য মন্দিরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের উদ্যোগে ভারত বিদ্বেষী ওয়েলেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়। প্রস্তাব নেওয়া হয়। জমিদার রাধাকান্ত দেব তাতে সভাপতিত্ব করেন। ওয়েলসের পক্ষপাতমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সভার উদ্যোক্তরা ২৩ সেপ্টেম্বর (১৮৬১) বিশ হাজার লোকের স্বাক্ষর সংবলিত এক অভিযোগপত্র ভারত সচিব সার চার্লস উডের কাছে পাঠান ওয়েলসকে বিদ্রূপ করে দীনবন্ধু একটি প্রহসনও লেখেন 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'। দীনবন্ধুর জীবিতকালে মানহানি মামলার আশঙ্কায় এটি প্রকাশিত হয়নি, এতে ওয়েলসকে 'বলদ পঞ্চানন' বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। লোককবি ছড়া লেখেন

'বলতে বুক বিদরে, ওয়েলস অবিচার করে
নির্দোষী লঙকে ধরে একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে'

কিং লিখেছেন, লঙের শাস্তি মকুব করার অনুরোধ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা সরকারকে একটি পত্র দিতে চান, কিন্তু মিশনারীদের বিরূপ মনোভাবে তা পরিত্যক্ত হয়।

পদস্থ ইংরেজ আমলারাও ওয়েলস-এর বিচারের তীব্র সমালোচনা করেন। ব্রাটেল ফ্রেরে বলেন—"never felt so ashamed of our Supreme Court Judge on the Bench."

পিককের লঙকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় বাধা দেওয়াকে ক্যানিং বলেছেন,'A discreditable exhibition' : উডের মতে বিচারকরা অন্যায় করেছেন। লর্ড স্টানলে মনে করেন, এই রায় হচ্ছে, 'Serious inroad on The liberty of the Press."

লঙ ছাড়া গ্রান্ট ও সীটনকারকেও নীলকররা শাস্তি দিয়ে হেয় করার চেষ্টা করেন। গ্রান্ট সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হন যে নীলদর্পণ বন্টনের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। কিন্তু সীটনকার দায়িত্ব এড়াতে পারেননি।

নীলদর্পণ মামলায় জেরা,সাক্ষ্য প্রভৃতি থেকে এই গ্রন্থটি প্রচারের ব্যাপারে সীটনকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও প্রকাশ পায়। ইংরাজী নীলদর্পণ ছাপা হবার পর লঙের বাড়ি থেকে সীটনকারের বাড়িতে সেগুলি পাঠানো হয়। সেখান থেকেই সরকারী ব্যয়ে বই বিলি হয়। সরকারী খামে সরকারী ডাক ও শিলমোহরে ডাক বিভাগের মাধ্যমে বই পাঠানো চলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও লন্ডনের নানাস্থানে ইংরাজি নীলদর্পণ পাঠানো হয়। মামলা শুরু হওয়ায় বই বিলি বন্ধ হয়ে যায়। সীটনকার তাঁর চিঠিতে স্বীকার করেন, তিনি ভারতে ও ইংলন্ডে পার্লামেন্ট সদস্য জনসেবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সংবাদপত্র প্রভৃতির কাছে ২০২ কপি ইংরাজি নীলদর্পণ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীটনকারকে আসামীর কাঠগোড়ায় তোলা যায়নি। ক্যানিংয়ের দৃঢ়তার জন্যই তিনি রেহাই পান। তবে তাঁকে বিভাগীয় ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এক বিবৃতি দেন (২৭-৭-১৮৬১)...পরে তাঁকে সরকারি পদ থেকে হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত করা হয়। তারপর তিনি ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ের কথা মূল বাংলা নাটকের বিরুদ্ধে কিন্তু লেখকের জীবনকালে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে এর অভিনয় নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ে নীলদর্পণের অভিনয়কালে ইংলিশম্যান আপত্তি জানায়; ২০ ডিসেম্বর ওই পত্রিকায় লেখা হয় "...Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month imprisonment for translating the Play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor and libellous part, been excised."

এই আপত্তিতে কিন্তু নীলদর্পণের অভিনয় বন্ধ হয়নি, ন্যাশানাল থিয়েটারের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক চিঠিতে ইংলিশম্যানকে জানান যে, নাটকটির আপত্তিকর অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর আবার অভিনয় চলে, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার কলকাতার ও দেশের বিভিন্ন শহরে নীলদর্পণ অভিনয় করেন। লক্ষ্ণৌয়ে নীলদর্পণ অভিনয়ের সময় রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ইংরেজ দর্শকরা হামলা চালায় ও অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

১৮৭৬ সালের মার্চে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হয়। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' এই প্রহসনটি কেন্দ্র করেই Dramatic Performance Control Bill জারি হয়েছিল। এরও অনেক পরে মূল নীলদর্পণ নাটকটি রাজরোষে পড়ে। লেখকের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯০৮ সালে 'ইংরেজ বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী' এই অভিযোগে নীলদর্পণের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। তবে নীলদর্পণ বইটি নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়নি। প্রেস আইনের ৪(১) ধারা এবং ড্রামাটিক পারফরম্যান্স আইনের ৩ ধারা অনুসারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় আপত্তিকর বলে ঘোষিত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-এ ধারা অনুসারে নাটকটির অভিনয়ও দণ্ডনীয় বলে জানানো হয়। এ সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের নোটে বলা হয়েছে: 'Hold British justice upto contempt. A reprint of play of 1860 Rev. Long was sentenced to fine Rs. 1000 for translation in English (1861). Considered by Legal Remembrance to come under the perview of Sec. 4(a) Press Act., 3 of Dramatic Performance Act, and Performance liable under 153A, IPC.'[১০]

মূল নীলদর্পণ নাটকটিও আপত্তিকর বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এক সরকারী সার্কুলারে এর অভিনয় considered objectionable enough to be stopped. যে সব নাটকের অভিনয় বন্ধের জন্য জেলা শাসকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল—নীলদর্পণ তার অন্যতম।

মূল নীলদর্পণের রচয়িতা দীনবন্ধুকেও নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়। সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রও লিখেছেন, সরাসরি না হলেও দীনবন্ধুকে পরোক্ষ বা গুপ্ত রাজরোষে পড়তে হয়েছিল।[১১] তাঁর মত একজন সুদক্ষ ও নিষ্ঠাবান রাজকর্মচারীর প্রতি যে অবিচার তা শুধু কালো চামড়া বলে, না নীলদর্পণের নাট্যকার বলেও? সে যুগে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যাদের দহরম মহরম ছিল, দীনবন্ধু যে তাঁদের বিষ নজরে পড়েছিলেন, এ মন্তব্যটিতে তা স্পষ্ট

'... at any rate as you are acquainted with the name of this friend of poor needy, keep on an eye upon the appointments and promotions in connection with the Post Office and you may be edified some morning.'

নীলকরদের মুখপত্র বেঙ্গল হরকরার জন্ম ২৯ জুন, ১৮৬১ তারিখে দীনবন্ধু সম্পর্কে ওই তির্যক মন্তব্যটি বের হয়। চাকুরি জীবনে তাঁকে বিরামহীনভাবে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বদলি করা হয়েছে। এমন কি অসুস্থতার সময়ও তাঁকে পাওনা ছুটি দেওয়া হয়নি। তাঁর প্রতি এই নির্মম ব্যবহার কেন? নীলদর্পণের লেখক বলেই নয় কি? নীলদর্পণের লেখক বলেই তো দীনবন্ধুর প্রতি এই রাজরোষ।[১২] এবং সেইজন্যই মাত্র ৪৪ বছর বয়সে বাংলার এই মানবদরদী মহান জীবনশিল্পীর জীবনাবসান। যে নীলদর্পণের জন্য তাঁর অকালমৃত্যু, সেই নীলদর্পণেই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা : নীলদর্পণ

১। R. C. Majumdar, 'History & Culture of Indian People, Vol X, Page. ২৪০,

২। **Nil Durpan, edited by Sankar Sengupta.**

৩। **Ibid P. iiic.**

৪। ১৮৬০ সালের 'অ্যাকট ইলেভেন' অনুসারে নীল কমিশন গঠিত হয়। সদস্যগণ হলেন আর টেমপেল, জে সেল এবং সি এম চ্যাটার্জি। ১৮ মে থেকে ৪ আগস্ট (১৮৬০) মোট ১৩৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়

৫। ১৮৬০, ১১ জুন বিচারপতি জ্যাকসন ওই রায় দেন

৬। **Indigo disturbance in Bengal, P. ৭৭,** দ্রঃ চতুষ্কোণ, ১৩৮৩

৭। **Trial Report, L. Mitra,** দ্রঃ চতুষ্কোণ, বৈশাখ, ১৩৮৩

৮। **Blair B Kling, The Blue Mutiny, P. 206**

৯। **Ibid.**

১০। **Bengali Plays noted in Political Branch, CID,—completed upto 3.12.1910**

১১। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২৬, ২য় সং

১২। এ সম্পর্কে সাহিত্য সাধক চরিতমালায় (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২) আছে : '...অতিরিক্ত পরিশ্রমে দীনবন্ধুর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১ নভেম্বর ১৮৭৩ তারিখে তিনি পরিবারবর্গকে অকূলে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন। ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের অবিচারের ফলেই তাঁকে অকাল মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ অধ্যায় নিষিদ্ধ কবিতা-গান

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে কবিতা, গান ও নাটকেই স্বদেশ চেতনার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। গল্প উপন্যাসের প্রভাব কম। প্রবন্ধে অল্পবিস্তর আছে। তবে অধিকাংশ প্রবন্ধই রাজনৈতিক আলোচনা জাতীয়। একদিক দিয়ে বলতে গেলে নাটকের চেয়ে দেশাত্মবোধক গান কবিতার আবেদন ব্যাপকতর। কারণ গান গেয়ে পথে পথে ঘোরা যায়। দেশবাসীর মনের দ্বারে সরাসরি আঘাত করা যায়। মনের দ্বার খোলে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ও পরবর্তীকালেও স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্গীত ও কবিতার প্রভাব তাই অত্যন্ত বেশি। নবীন সেনের 'পলাশী যুদ্ধে'র যুগ থেকে আধুনিক কালের নজরুল-প্রেমেন্দ্র, সুকান্ত পর্যন্ত এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক 'বঙ্গভঙ্গের আঘাতে বাঙালী হৃদয়ের আবেদনের মুক্তধারা দুর্বার হয়ে উঠলো বিশেষ করে সমসাময়িক কবিতা ও গানে'।[১]

স্বভাবতই কবিতা ও গানের বই সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েছে। অজস্র বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

১৯১০ সালে 'বন্দনা' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। 'বন্দনা'—প্রথম খণ্ডের লেখক হলেন পূর্ণচন্দ্র দাস। 'বন্দনা'—দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক হলেন হরিচরণ মান্না। ১৯১০ সালের ৮ই আগস্টের গেজেট ঘোষণায় বই দুটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দুটি গ্রন্থই কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'স্বদেশ গাথা' গ্রন্থটি ১৯১১ সালের ৭ই মার্চের গেজেট ঘোষণায় নিষিদ্ধ হয়। এর রচয়িতা হলেন কামিনীকুমার ভট্টাচার্য।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত অনল প্রবাহ কাব্য গ্রন্থটি ১৯১০ সালের ৮ই আগস্ট গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত হয়। এর প্রণেতা সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল সিরাজী। ২১০-৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতার নব্যভারত প্রেস থেকে 'অনল প্রবাহ' মুদ্রিত এবং ভূতনাথ পালিত কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯১০ সালের ভারতীয় প্রেস আইন ১ ধারায় বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয় (সাজা অধ্যায়ে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে)।[২]

মুসলিম বাংলার 'অগ্নিপুরুষ' সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'অনলপ্রবাহ' শুধু ইংরাজের বিরুদ্ধে অনল উদ্গীরণ করেনি তা রসোত্তীর্ণও বটে। আদর্শনিষ্ঠ, বাগ্মী সিরাজীর বাজেয়াপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'অনলপ্রবাহ'র প্রভাব বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পরবর্তীকালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর উদ্দেশ্যে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন

'কবি হিসাবে আমাকে অনলপ্রবাহ'র লেখক যে আদর দেখিয়েছিলেন,'তা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠতম পাওয়া। এমন আদর সারা বাংলার আর কেউ আমাকে করেছে বলে আমি জানি না। তিনি সিরাজগঞ্জ থেকে মনি অর্ডার করে দশটি টাকা আমাদের পাঠিয়েছিলেন এবং কুপনে লিখে দিয়েছিলেন—'এই সামান্য দশটি টাকা আমার আন্তরিক স্নেহের প্রতীক স্বরূপ পাঠালাম। এই টাকাটা দিয়ে তুমি একটা কলম কিনে নিও। আমার কাছে এর বেশী এখন নেই। যদি বেশী থাকতো তোমাকে আরও বেশী পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তা হলো না।'[২ক]

১৯২১ সালে 'খিলাফৎ কবিতা' ও 'মহাত্মা' গান্ধীর কবিতা' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। খিলাফৎ কবিতা বইটি শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত। এর প্রণেতা মুন্সী আবদুল হান্নান চৌধুরী। অসম সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন।

'মহাত্মা গান্ধীর কবিতা' বইটিও আসাম সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। এটি শিলচর থেকে প্রকাশিত। এর প্রণেতা চন্দ্রনাথ দাস।

১৯২২ সালে দুটি গানের বই বাজেয়াপ্ত হয়—'বন্দেমাতরম্' ও 'গানের তুফান'। 'বন্দেমাতরম্' বইটি দেশাত্মবোধক বাংলা গানের সঙ্কলন। ললিতমোহন সিংহ কর্তৃক এটি প্রকাশিত। বাংলা ও সেন্ট্রাল প্রভিনস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

'গানের তুফান' বইটির প্রণেতা : মৌলভী হাফিজুর রহমান। শ্রীহট্ট থেকে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯২৩ সালে 'কাইয়ের ঘাট হাঙ্গামার কবিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। শ্রীহট্ট থেকে এটি প্রকাশিত। এই বইয়ের লেখক হলেন মোবারক আলি। সেন্ট্রাল প্রভিনস ও বর্মা সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কর্তৃক এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯২৪ সালে 'রক্তরেখা' নামে আর একটি কবিতার বই নিষিদ্ধ হয়। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এর প্রণেতা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সেন্ট্রাল প্রভিনস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে।

বিশিষ্ট কবি ও দেশপ্রেমিক সাবিত্রীপ্রসন্নের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পল্লীব্যথা' তাঁর আরও কাব্যগ্রন্থ আছে : 'মাধবীলতা', 'মনোমুকুর', 'অতসী', 'বন্দনা', 'অনুরাধা', 'চিত্তরঞ্জন', 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র'। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি অসংখ্য দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস ও পাব্লিকেশন উপদেষ্টা বোর্ডের সচিব হন। তিনি বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকও। অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি যোগ দেন। তিনি একজন সমাজসেবীও ছিলেন।

১৯২৫ সালে 'আবাহন' নামে একটি গানের বই বাজেয়াপ্ত হয়। ১২ই জানুয়ারির এক গেজেট ঘোষণায় এটি বাজেয়াপ্ত হয়। (বেঙ্গল নং ৪২৩ পি)। সেন্ট্রাল প্রভিনস সরকারও বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। 'আবাহন' দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের একটি সংকলন, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত। জনাঘাট থানার সুলতানপুরের মহম্মদ এনাসুল হক হলেন এর প্রকাশক।

১৯৩০ সালে ৬ই অক্টোবরের গেজেট ঘোষণায় 'ডমরু' কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে 'ডমরু' বাজেয়াপ্ত হয়। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ডমরু'র প্রকাশক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে এম দাস কর্তৃক 'ডমরু' মুদ্রিত (বিজয়লাল সম্পর্কে প্রবন্ধ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)।

কালীকিংকর সেনগুপ্তের 'মন্দিরের চাবি' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩১ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। ২৮শে আগস্টের গেজেট ঘোষণায় বইটি নিষিদ্ধ করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের ৫ই জানুয়ারি বইটির উপর বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়। কলকাতার ৩৩এ, মদন মিত্র লেনের বাণী প্রেসে শান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বইটি মুদ্রিত এবং ১২৪-৪, মাণিকতলা স্ট্রীট থেকে কিংকরমাধব সেন কর্তৃক প্রকাশিত। এই বইটি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতেও আছে।

নগেন্দ্রনাথ দাসের পাঁচটি কবিতার বই নিষিদ্ধ হয় 'দেশভক্ত', 'দীনেশের শেষ', 'ফাঁসি', 'রক্তপতাকা', 'শোকসিন্ধু'।

'দীনেশের শেষ' বইটি ১৯৩১ সালের ১৬ই জুলাই তারিখের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারায়। কলকাতার ৪, দীননাথ মিত্র লেনের আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে নগেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নগেন্দ্রনাথ দাসের 'দেশভক্ত' গ্রন্থটি ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে। এটিও আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ছাপা।

তাঁর 'শোকসিন্ধু' বইটি ১৯৩১ সালের ৯ই এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে।

তাঁর 'রক্ত পতাকা' বইটি ১৯৩২ সালের ২১শে জানুয়ারির গেজেট ঘোষণায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও আদিত্য প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা এবং লেখক কর্তৃকই মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'হিজলির বন্দীশালা' নামে নগেন্দ্রনাথ দাসের আর একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে। কলকাতার ৪, দীননাথ মিত্র লেনের আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নগেন্দ্রনাথ দাসের পাঁচটি কবিতার বই লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরী ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। সেগুলি হল দেশভক্ত, দীনেশের শেষ, ফাঁসি,'রক্তপতাকা,' শোকসিন্ধু। নগেনবাবু বিপ্লবী ছিলেন। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাঁর লেখা দেশাত্মবোধক কবিতা ও নিবন্ধগুলি তরুণদের মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তাঁর লেখা বার বার রাজরোষে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য, নগেন্দ্রনাথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতার বইগুলি পুস্তিকা ধরনের, খুব কম দামে সে সব বই হাটে-বাজারে গঞ্জে বিক্রি হত। দেশ-প্রেমের প্রেরণা ও বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ওই সব কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি বার বার নিষিদ্ধ হয়েছে। শোনা যায়, তিনি নিজে সভা সমিতিতে এমনকি পথে পথে আবৃত্তি করে তাঁর কবিতার বইগুলি বিক্রি করতেন। তাঁর 'দীনেশের শেষ' বইটি বিপ্লবী দীনেশের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। ১৯৩০ সালে কয়েকজন অসীম সাহসী যুবক অতর্কিতে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে সারা ভারতকে চমকিত করে দেন, দীনেশ তাঁদের অন্যতম। বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ ওঁদেরই স্মৃতিপূত।

দীনেশের ফাঁসি হয় ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই। তিনি ও বিনয়, বাদল ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেন এবং গুলিতে সিমসনকে হত্যা করেন। এই অভিযান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দ যুদ্ধ বলে খ্যাত। আরও কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ ওই আক্রমণে গুরুতর আহত হন। এই অভিযানে তিন নায়ক বিনয়, বাদল, দীনেশ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের সভ্য ছিলেন। এই বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিছুদিন আগে জেলে সিমসন সুভাষচন্দ্রকে উৎপীড়ন করেন। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই আক্রমণ। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ওই অলিন্দ যুদ্ধে তিন বাঙালী তরুণ সেদিন যে অসম সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জুগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণা।

১৯১১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের যশোলাং গ্রামে বিপ্লবী দীনেশের জন্ম হয়। পিতা অবনী গুপ্ত। দীনেশ ছাত্র অবস্থাতেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ঢাকা ও মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। অলিন্দ যুদ্ধের পর পুলিসের হাতে ধরা পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে দীনেশ আহত হন। জেলে তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার হয়। বিচারের পর ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আলিপুর জেলে (মতান্তরে প্রেসিডেন্সী জেলে) তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর দুই সঙ্গীর আগেই মৃত্যু হয়।

নগেন্দ্রনাথের 'হিজলীর বন্দীশালা' কাব্যগ্রন্থটি হিজলী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর উৎপীড়ন ও সেখানকার অব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত। তাঁর এ বইটিও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশ্য তাঁর অন্য সব বইও তাই। সে জন্যই তাঁর বইগুলি একের পর এক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

'জাতীয় সঙ্গীত ও দেশের গান' নামে একটি সঙ্গীত গ্রন্থ ১৯৩২ সালে ৭ই এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়। (বেঙ্গল নং ১০২৬৮-৮০ পি) এটি ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ১৯ ধারায় বাজেয়াপ্ত হয়। এটি বাংলা জাতীয় সঙ্গীতের একটি সংকলন। এর লেখক হলেন: শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। মেদিনীপুরের বিজয় প্রেস থেকে কেরামত আলি খান কর্তৃক এটি প্রকাশিত। এবং বরিশালের পাংশা প্রতাপপুর থেকে শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৩২ সালে চারণ কবি মুকুন্দরাম দাসের দুটি দেশাত্মবোধক গানের বই বাজেয়াপ্ত হয়। কর্মক্ষেত্রের গান ও পথের গান। ১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বরের গেজেট ঘোষণায় কর্মক্ষেত্রের গান বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমার্জেন্সি) আইনের ১৯ ধারায় বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এটি বরিশাল থেকে মুকুন্দ দাস কর্তৃকই প্রকাশিত।

১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বরের গেজেট ঘোষণায় 'পথের গান' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমার্জেন্সি) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৮ সালের ৫ই এপ্রিল 'পথের গান' থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। বরিশাল থেকে মুকুন্দ দাস এটি প্রকাশ করেন। মুকুন্দ দাসের আরও অনেক বই রাজরোষে পড়ে। সেগুলি নাটক ও যাত্রা। সে সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে তার উল্লেখ করলাম না। (মুকুন্দ দাস সম্পর্কে নাটক অধ্যায়ে আরো আলোচনা আছে)।

১৯৩২ সালে: 'আবেগ সঙ্গীত' নামে দুটি গানের বই বাজেয়াপ্ত হয়। একটি ১৯৩২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়। এটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয়। (বেঙ্গল নং ৩১৪৭-৫৯ পি)। এই সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রণেতা : ধরণীধর প্রধান। মেদিনীপুরের রায় পাড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খোদমবাড়ির ক্ষীরোদচন্দ্র প্রধান কর্তৃক এটি প্রকাশিত। এবং অবসাদতলা বৈদিক প্রেসে এটি মুদ্রিত।

অন্য বাজেয়াপ্ত বইটি সম্ভবতঃ আবেগ সঙ্গীতের দ্বিতীয় ভাগ। এটি ১৯৩২ সালের ১০ই মে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয় (বেঙ্গল নং ১৭৪৫-৬৫ পি)। এই 'আবেগ সঙ্গীত' (দ্বিতীয় ভাগ কারাগার) বইটিরও প্রণেতা ধরণীধর প্রধান, এর প্রকাশক ক্ষীরোদচন্দ্র প্রধান এবং এটি 'বৈদিক প্রেস থেকে ছাপা'।

১৯৩২ সালের '**স্বরাজ সঙ্গীত**' নামে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩২ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের গেজেট ঘোষণায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বই বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারি এটি রাহুমুক্ত হয়। 'স্বরাজ সঙ্গীত' (দ্বিতীয় ভাগ) বইটি কলকাতার ৭, ভবানী দত্ত লেন থেকে এম ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং এর এ সি এম কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৩৩ সালে **স্বরাজ সঙ্গীত** নামে একটি গানের বই বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩৩ সালের ৯ই জানুয়ারীর গেজেট ঘোষণায়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সী) আইনের ১৯ ধারায় এটি বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার সরস্বতী প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত। লেখক হলেন অনন্তকুমার সেনগুপ্ত।

১৯৩১ সালেও '**স্বরাজ সঙ্গীত**' নামে একটি বই বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরের গেজেট ঘোষণায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারি বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

এই 'স্বরাজ সঙ্গীতে'র প্রণেতা হলেন প্রতাপচন্দ্র মাইতি। কলকাতার দামোদর প্রিন্টিং ওয়ার্কস (১০৪, আমহার্স্ট স্ট্রীট) থেকে এ সি মাইতি কর্তৃক এটি মুদ্রিত এবং ২০৮-৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে এ সি মাইতি কর্তৃক এটি প্রকশিত।

মায়ের ডাক লেখক যশোদালাল আচার্য। বরিশালের দামোদর প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ছাপার তারিখ ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩১।

এটি দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের সংকলন। এই বাজেয়াপ্ত বইটি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে।

মুক্তি পথে : প্রভাতমোহন মুখোপাধ্যায়। ২৪ পরগনার মহিষাবাথান থেকে ১৯৩১ সালের ১২ই মে লেখক কতৃক প্রকাশিত। বাজেয়াপ্ত এই কবিতা বইয়ের অনেকগুলি কবিতা জেলে লেখা। লেখক একজন মুক্তিসংগ্রামী। প্রভাতমোহন গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন। এই বইটিও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে।

সরকারী ফাইল ও নথিপত্র থেকে আরও সঙ্গীতের বই-এর নাম পাওয়া গেছে। অবশ্যই ওই সব সঙ্গীত গ্রন্থ সরকারী রোষে পড়েছিল। তবে বাজেয়াপ্ত হবার কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এই সব বই সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপ আলোচনা করছি :—

নবরাগ লেখক ও প্রকাশক শ্রীতারিণীচরণ দত্ত। গ্রাম-নগর কসবা, পোঃ আঃ মিরকাদিম, ঢাকা। (৩য় সংস্করণ) সন ১৩২৮; এর প্রথমে লেখা আছে :- 'বিক্রমপুর গৌরব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে উপহার প্রদত্ত'। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৪। বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতায় প্রাপ্তব্য।

দেশের ডাক (১ম ভাগ) শ্রীবিপিনচন্দ্র সরকার প্রণীত। রঘুনাথগঞ্জ, সন ১৩৩০ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১২। রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত কর্তৃক মুদ্রিত। জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতায় প্রাপ্তব্য।

স্বদেশ গাথা শ্রীবিহারীলাল বি এল প্রণীত। সিঁথি প্রেসে ছাপা মুদ্রক অধরচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা। প্রকাশকাল ১লা বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। ভূমিকায় লেখক জানাইতেছেন যে, এই পুস্তকের লভ্যাংশ জাতীয় ধনভাণ্ডারে দেওয়া হবে। বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতায় প্রাপ্তব্য।

জাতীয় গীতি যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯২১ সালে ঢাকা বনগ্রাম সন্তোষ প্রেস হইতে শ্রী মদনমোহন দে সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ঢাকা পাটুয়াটুলী হোমিওপ্যাথিক বিস্তার সমিতি থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ সঙ্গীত : সংকলক যোগেন্দ্রনাথ শর্মা ; আশ্বিন, ১৩১২ সাল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৭৬। বর্তমানে চৈতন্য লাইব্রেরী, কলকাতায় প্রাপ্তব্য।

জাতীয় সঙ্গীত : (প্রথম ভাগ) চতুর্থ সংস্করণ। ২১০/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতার ভিক্টোরিয়া প্রেসে ছাপা। মুদ্রক ও প্রকাশক বি এন ঘোষ। ১৮৪৪ সাল, মূল্য তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। এতে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর একটি গান আছে।

দেশের গান প্রণেতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এটি বিভিন্ন কবির গানের সংকলন গ্রন্থ। প্রকাশ শ্রীমহীন্দ্রনাথ হালদার, গোয়ালাপাড়া, আসাম। ৫ নং নীলমাধব সেন লেন, কলকাতার বণিকযন্ত্রে শ্রী আশু ঘোষাল কর্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩১২, মূল্য চার আনা। সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা—৭৪। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলকাতায় প্রাপ্তব্য।

জাতীয় সঙ্গীত অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি, ৪/১, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, সন ১৩১৩ সাল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারকারী যুবক দলের অগ্রগামী মাতৃভূমির কল্যাণার্থে আত্মত্যাগী ৺রমাকান্ত রায়কে উৎসর্গীকৃত (একখানি ছবি আছে)। পৃষ্ঠা ৫৬, কলকাতার আই ভি প্রেসে এ বি দাস কর্তৃক মুদ্রিত। চৈতন্য লাইব্রেরী কলকাতায় প্রাপ্তব্য। এই সংকলন গ্রন্থে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কয়েকটি সঙ্গীত আছে।

স্বদেশী গান : হিন্দু মেলা সম্পর্কে (তৃতীয় অধিবেশন)। ১৭৯০ শক। প্রাপ্তিস্থান : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।

স্বদেশী সঙ্গীত প্রকাশক বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, ভোলা। বরিশাল আদর্শযন্ত্রে নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। ভোলার শান্তি সেনাবৃন্দ কর্তৃক ৺ধীরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে বইটি উৎসর্গীকৃত। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সন, পৃষ্ঠা—১২। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য।

দেশের গান : প্রকাশক নলিনীরঞ্জন হোতা। হিতসাধন সমিতি, কল্যাণচক, মেদিনীপুর। প্রকাশক মুখবন্ধে বলেছেন, 'এই পুস্তক বিক্রীত উদ্ধৃত অর্থ কল্যাণচক হিতসাধন সমিতিতে প্রদত্ত হইবে।' ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল। তমলুক যুগল প্রেসে শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মাইতি কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯২৫ সাল, পৃষ্ঠা—২০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে (কলকাতা) প্রাপ্তব্য।

জাতীয় সঙ্গীত (সঙ্গীত কোষ থেকে সংকলিত)। সন ১৩৩৩ সাল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ২০১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, মোট পৃষ্ঠা—১০৪৪। এতে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র কটি কবিতা আছে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য।

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল,
সোনার ভারত আহা, ঘোর বিষাদে ডুবিল।
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি, কাঁদিতেছে অবিরল।
কে এখন নিবারিবে জননীর চক্ষুজল ॥" (সুরেন্দ্র বিনোদনী)

কলকাতার অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় সঙ্গীত' (উপেন্দ্রনাথ দাস সংকলিত) গ্রন্থ থেকে কয়েকটি গান উদ্ধৃত করলাম

'জাগ ভারতবাসী গাও বন্দেমাতরম্,
আজ কোটী কণ্ঠে কোটী স্বরে—
উঠুক বেজে বন্দেমাতরম্,
(বন্দেমাতরম্ বলে রে, কোটী কণ্ঠে)
পেলে জননীর কোন হতে হায়রে কি বিহ্বল,
মাকে দেখরে চেয়ে বুকখানি আজ অশ্রুনীরে প্লাবিত,
কোটী কোটী থাকতে ছেলে—দেখরে চেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এস এস সবে তাই, সে কাল নিশি আর যে নাই,
এই জীবনটা ভোর ঘুমিয়ে কেটে
ঘুমাবার সাধ তবু এখন।
(অচেতন হয়ে রে ভাই—এ জীবনটা ও 'রে—)
দেখ সোনার বাঙলার কি করিয়াছে হায়
কোথা বিদেশ হতে বণিক এসে
হরে নিল সকল ধন।
(দলে বলে ছলে যে—বিদেশ হতে)
বুকে সাহসেরি ডোর—তাই বাঁধ করে জোর,
প্রাণ থাকতে দেহে মায়ের ছেলে সইবে
কি মার নির্যাতন
(কোটী কোটী থাকতে ছেলে)

(অ্যান্টি পার্টিশান প্রসেসন পার্টি প্রচারিত)

কানে কানে প্রাণে প্রাণে
মায়ের নাম আজ কে শোনালে
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আট কোটী
প্রাণ কে মাতালে
বন্দেমাতরম্ মাতরম্ উঠেছে ধ্বনি কি মধু,
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল,
শক্তি মেলে মায়ের নামে
পাষাণ গলে মায়ের গানে।
ভক্তি রসলীলা এ যে নবীন বেশে দেখা দিল।
মরা প্রাণে ধরে আগুন, প্রাণ পেয়ে প্রাণ জ্বলছে দ্বিগুণ,
যা ভাবি নাই যা শুনি নাই
সে আগুন আজ কে জ্বালাইল।[৩]

নির্দেশিকা

১। সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', পৃষ্ঠা—৯।
২। F1. No. 360 of 1911, Home (Pol.), Beng Govt.
২(ক)। নজরুল স্মৃতি, পৃঃ ১০২
৩। Records preserved in State Archives, Writers Buildings, Calcutta, specially Freedom Fighters' Paper.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চতুর্দশ অধ্যায় নবীনচন্দ্র

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' রাজরোষে পড়েছিল, কিন্তু বাজেয়াপ্ত হয়নি এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষপর্বে তিনি দেশাত্মবোধের এক প্রধান কবি। সেই হিসাবে পঞ্চম অধ্যায়ে—বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিষয়ে আলোচনা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'প্রবাসের পত্র' নামক গ্রন্থটির প্রচার বন্ধের ব্যবস্থা হয়েছিল। এইসব বিবেচনায় নবীনচন্দ্র সেন একটি পৃথক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে নবীনচন্দ্র সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগৃতির দুটি মূল সুর শৃঙ্খল মোচন ও আত্মশক্তি উদ্বোধন। সে যুগে বাংলার সাহিত্যে, সমাজ সংস্কারে, জীবন সাধনায় ও রাষ্ট্রগঠনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রকাশ, নবীনচন্দ্র এই নবজাগরণের যুগের কবি। পরবশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীতে যে তীব্র আত্মগ্লানি ফুটে ওঠে তা দেশবাসীর মনে গভীর দাগ কাটে। এ কথা স্বীকার করেছেন বহু মনীষী—ঐতিহাসিক ও সাহিত্য সমালোচক। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, নবীনচন্দ্রের একাধিক কাব্যে দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি আছে।[১]

সাহিত্য সমালোচক সজনীকান্ত দাস বলেছেন যে, নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিদেশী শাসকদের বিচলিত করেছে।[২]

নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাষায় নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে' জাতীয় অন্তর্দাহ প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটি বাঙালীর জাতীয় কাব্যরূপের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যে বাঙালী হইয়া বাঙালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙালী জন্মই বৃথা'।

শুধু পলাশীর যুদ্ধেই নয়, নবীনচন্দ্রের অন্যান্য লেখাতেও পরাধীনতার এই জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে কবির বেদনা

'তেজোহীন, বীর্যহীন
ততোধিক পরাধীন,
আমাদের—হায়! কোন পাপের এ ফল;
করে ভিক্ষাপাত্র—কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।' (আর্য দর্শন—অবকাশরঞ্জিনী)

নবীনচন্দ্রের ভ্রমণকাহিনী 'প্রবাসের পত্রে'ও এই বেদনার সুরের অনুরণন আছে। দেশপ্রেম ও অতীত গৌরবের জন্য বেদনা বোধ নবীনচন্দ্রের সব রচনার সাধারণ সুর। তাঁর তিন মহাকাব্য 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক' ও 'প্রভাসে'ও সেই সুর রণিত অনুরণিত হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের একাধিক গ্রন্থ রাজরোষে পড়েছিল। যেমন, 'পলাশীর যুদ্ধ', 'প্রবাসের পথে'। তবে প্রবাসের পথের উপর সরকারী রোষ পড়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। 'পলাশীর যুদ্ধ'ই খ্যাতি ও বিড়ম্বনার কারণ হয় কবির জীবদ্দশাতেই। এই কাব্যগ্রন্থটি যেমন তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে, তেমনি তার চাকুরী জীবনে অবমাননার কারণ এটিই। ১৮৭৫ সালের ১৫ই এপ্রিল 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি পড়ে বঙ্কিম তাঁকে বাংলার বায়রন বলে সম্মানিত করেন। বাঙালির রোদনকে ভাষা দিয়েছিলেন বলেই চাকুরী জীবনে নবীনচন্দ্রকে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। সুদক্ষ সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল তাঁর পদোন্নতি স্থগিত ছিল। (নবীনচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি হন ৮ই ডিসেম্বরের ১৮৯৫ সালে। তাঁর একাধিক জুনিয়রের পদোন্নতি ঘটিয়ে প্রায় ৮ বছর পর ১৯০৩ সালের ৬ই জুলাই তাঁকে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। এই বিড়ম্বনার বিষয়ে নবীনচন্দ্র নিজেই 'আমার জীবনের' পঞ্চম ভাগে 'নিষ্কাম হিংসা ও রাজদ্রোহিতা' ও 'লাটের ক্রোধ' অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।)

আশ্চর্যের কথা, 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হবার ২২ বছর পর লেখকের উপর সরকারী কোপ পড়ে। নবীনচন্দ্র তখন চাকুরিজীবনের প্রায় সমাপ্তির মুখে। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামী ও সম্মানিত। ইতিমধ্যে 'পলাশীর যুদ্ধে'র দেশ জুড়ে অভিনয় এবং সরকারের শিক্ষা বিভাগ এটি পাঠ্য পুস্তক হিসাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোনীত করেছেন এবং বিভিন্ন স্কুলে দীর্ঘদিন পড়ানো হয়েছে। এতদিন পর সরকারের টনক নড়ল কেন ? সে কথা নবীনচন্দ্রের ভাষায় 'পরে শুনিলাম, ভারতীয় পণ্ডিত কুলতিলক তিলকের রাজদ্রোহিতা মোকদ্দমায় তাঁহার কাউন্সেল বম্বে হাইকোর্টে দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অনেক স্কুল পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায়। তাহাতে ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্জ্জন ভারতব্যাপী সমস্ত পাঠ্য পুস্তকে 'সিডিসন' খুঁজিবার আদেশ দিয়াছেন। অবশ্য তাহার আশঙকা, এতকাল পরে পাঠ্য পুস্তক তোপে ভারত হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা উড়িয়া যাইবে।'

পলাশীর যুদ্ধের যে সব অংশ সম্পর্কে আপত্তি ওঠে, তা এখানে দেওয়া হল

রানী ভবানী ষড়যন্ত্রকারীদের বলিতেছেন :—

'বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া আমরা, অদূরে
রাজবিপ্লব দুর্বার। নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতরিয়া,
ভাসি স্রোতহীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কাটি আনিবে কুমীরে ?
প্রদানিবে স্থির গৃহে স্বহস্তে অনল ?
বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর !
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর। (স্তবক ৪৯)

সেই রানী ভবানী বলিতেছেন :—

জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ।
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদৌল্লায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
সেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন—
থামিবে না এইখানে, হয়ে উগ্রতর
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর,
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে ;
পরিণামে ভেবে মম শরীর শিহরে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ—

এই কি পলাশীক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গণ ?
যেইখানে—কি বলিল ? বলিব কেমনে ?
স্মরিলে সে কথা হায় ! বাঙালীর মন
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে.—
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা-ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্ব্বল বাঙালী আজি, সজল-নয়নে,
গাইবে সে দুঃখ কথা।

সিরাজের মৃত্যুর বর্ণনা

কবি বলিতেছেন :—

সিরাজের ছিন্ন মু[illegible] চু[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়িল। ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তপন
ভারতের শেষ আশা—হইল স্বপন।

ওই আপত্তিকর অংশগুলি স্কুলপাঠ্য 'পলাশীর যুদ্ধ' থেকে বাদ দেবার জন্য বাংলা সরকারের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ১৮৯৯ সালের ২৮শে জুলাই নবীনচন্দ্রকে চিঠি দেন। পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হবার দীর্ঘ ২৪ বছর পর এই আপত্তি উঠল। এতদিন এই কাব্য-গ্রন্থ বিনা আপত্তিতে দেশ জুড়ে প্রচারিত হয়েছে। স্কুলের ছেলে মেয়েদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে। কর্মজীবনের প্রারম্ভে নবীনচন্দ্র যে কাব্যগ্রন্থ লেখেন, সে নিয়ে যখন আপত্তি উঠল, তখন তিনি কর্ম জীবনের শেষ প্রান্তে। এতদিন নির্বিবাদে পঠিত হবার পর এই লেখার জন্য তিনি সরকারের বিষ নজরে পড়লেন অবসর গ্রহণের প্রায় মুখে।

বাংলা সরকারের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি এফ এ স্লাক নবীনচন্দ্রকে এই মর্মে চিঠি দেন ঃ

Sir,

I am directed to inform you that the attention of His Honour the L. Governor has been drawn, by the report of the examiner appointed to enquire into the character of the books approved by the Text Book Committee to the objectionable nature of several passages quoted in the annexed sheet ; —of your book 'Palasir Yuddha'. I am to say that you will be held responsible for the elimination of these passages from the future edition of the book.

'পলাশীর যুদ্ধ'কে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল, কবি আগে তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি। কবি তখন চট্টগ্রামে। এদিকে কলকাতায় পাঠ্যপুস্তক কমিটির সভায় 'পলাশীর যুদ্ধ' নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। কবি এক শুভার্থীর চিঠিতে এই কথা প্রথম জানলেন। 'আমার জীবন' গ্রন্থে কবি সেই চিঠিটি পরে বের করেন।

এর কিছুদিন পরই তিনি সরকারী ভাবে সবকিছু অবগত হলেন। (১৮৯৯ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে লেখা শিক্ষা বিভাগের ওই চিঠির কথা আগেই উল্লেখ করেছি)।

ওই সরকারি পত্রের জবাবে নবীনচন্দ্র লিখলেন যে, পরবর্তী সংস্করণে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দেওয়া হবে।

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter No 2275 general Department, Education, dated the 28th ultimo and in reply to state that the passages of my book 'Palasir Yuddha' referred to in your letter will be eliminated from any future editions of the book.

At the same time I venture to submit that though the passages in question, some of which have not been properly translated, may seem objectionable when divorced from the context, and without regard being had to their dramatic propriety as put in the mouth of several characters in the poem, there is in reality nothing objectionable in them. The book I may mention here was twice considered by the Text Book Committee and four times prescribed as a text book for the Eastern Circle by Dr. Mortom the late Director of Public Instruction.'

'পলাশীর যুদ্ধে'র যে তৃতীয় অধ্যায়টি বাদ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেটিতে ছিল পাপের জন্য সিরাজের তীব্র পরিতাপ। শেষ পর্যন্ত লেখক কয়েক পৃষ্ঠা বদলে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য 'পলাশীর যুদ্ধ' টেক্সট বুক কমিটির কাছে পাঠালেন।

পরবর্তীকালে 'পলাশীর যুদ্ধে'র আরও অনেক পরিবর্তন পরিবর্জন করা হয়। উপরওয়ালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইংরেজের চাপে সরকারী আমলা নবীনচন্দ্রকে 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রথম সংস্করণের অনেক পাঠ বদল করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক সর্গের প্রায় প্রতি স্তবকের কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। নবীনচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে দশম সংস্করণ পর্যন্ত প্রত্যেক সংস্করণেই এই পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৭৫-এ প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ এবং ১৯০৭-এ প্রকাশিত দশম সংস্করণের উল্লেখ্য সংযোজন, বর্জন, পরিবর্তনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :—

'কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে ?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল
বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে'

বদলে হয়—

'সিংহাসন চ্যুত করি বঙ্গ ভূপতিরে,
জ্বালাইয়া বঙ্গে ঘোর বিপ্লব অনল,
হায় ! এইরূপে খড়্গ নবাবের শিরে'

'বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী উদরে
এইমাত্র কিম্বদন্তী ; আকারে, আচরে'
বদলে হয়—
(ইংরেজের পরিচয় সম্পর্কে)

'আমাদের সঙ্গে দেখ ভাবিয়া অন্তরে
কিবা ধর্ম্মে কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে'

'নন্দকুমারের রক্তে হইবে বিধান'
বদলে হয়—
'তোর হৃদয়ের রক্তে হইবে বিধান'
(রায়দুর্লভ সম্পর্কে)

'ইংরাজের রক্তে আজি করিব অর্পণ'
বদলে হয়—
'দেখাব ক্ষত্রিয় বীর্য দেখাব কেমন'

'পলাশীর যুদ্ধে'র অভিনয় নিয়েও আপত্তি ওঠে। তবে নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর, অনেক পরে এই আপত্তি উঠেছিল। ইতিমধ্যে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরে দেশ জুড়ে এর অভিনয় হয়েছে। নবীনচন্দ্র নিজেও বহুবার এর অভিনয় দেখেছেন। 'নিউ এরিয়ান থিয়েটার' সম্প্রদায় 'বেঙ্গল থিয়েটার' ভাড়া নিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রথম অভিনয় করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে অভিনীত 'পলাশীর যুদ্ধ' দেশে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তেমনটি আর হয়নি। এর নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রেরই এবং প্রথম রজনীর অভিনয়ে ক্লাইভের ভূমিকায় তিনিই অভিনয় করেন।

এখানে উল্লেখ্য, 'পলাশীর যুদ্ধে' অভিনয় করতে গিয়েই গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' রচনায় (যে নাটক আবার বাজেয়াপ্ত হয়) উদ্বুদ্ধ হন।

'পলাশীর যুদ্ধে'র অভিনয়ে আপত্তি উঠেছিল এর অনেক পরে। ১৯৩২-এর সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায় যে এর অভিনয়ে আপত্তি তুলে পুলিশ কমিশনার ১৯৩২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি চীফ সেক্রেটারিকে লেখেন যে, এই নাটকটি আপত্তিকর এবং সরকারের প্রতি বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে পারে।

'As this drama is of an objectionable nature and likelyexcitefeelings of disaffection to the government established by law in British India, I have the honour to request that the performance of this drama be prohibited under clauses(a) and (b) of sec[illegible] of the Dramatic Performance Act XIX of 1876.'

এর কিছুদিন পরই ১৪ই মার্চ, ১৯৩২ 'পলাশীর যুদ্ধে'র অভিনয় নিষিদ্ধ করে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই আদেশের বয়ান :—

"Whereas the Governor in Council is of opinion that the book in Bengali entitled 'Palasir Juddha' by the late Nabinchandra Sen as dramatised by Kshetra Mohan Mitra is likely to excite feelings of disaffection to the government established by law in British India, the performance of the said play is hereby prohibited in Presidency of Bengal under the power vested in the local government under sec 3 of the Dramatic performance Act of 1876 of (Act XIX of 1876)."[৮]

নবীনচন্দ্রের কর্মজীবনে যে দুর্ভোগ তার কারণ 'পলাশীর যুদ্ধ'—একথা আগেই লিখেছি। তাঁর অন্য যেসব লেখা সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ে, তার জন্য ব্যক্তিজীবনে কোন প্রভাব পড়েনি। কারণ এইসব ঘটনা তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। 'পলাশীর যুদ্ধে'র জন্য তাঁর চাকরি জীবনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার উল্লেখ তাঁর 'ক্যারেকটার বুকে'ও আছে। তাঁর ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত—এই দীর্ঘ কর্মজীবন সম্পর্কে উপরিওলাদের যেসব মন্তব্য আছে, তা আর্কাইভসে রক্ষিত সরকারী কর্মীদের 'ক্যারেকটার বুক' থেকে পাওয়া যায়। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ তারিখের একটি নোটে এই 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিষয় উল্লেখ আছে।

"Certain Passages in a book called 'Palasir Juddha' by Babu Nabin Chandra Sen, Deputy Magistrate, and Dy collr, having been found to be objectionable by the central Text Book Commitee, the Dy. Magt. has been informed by the genl. (Edn.) Department that he will be held responsible that the passages in question are expunged from any future edition of the book."

নবীনচন্দ্রের কর্মকুশলতা সম্পর্কে পদস্থদের আস্থা এবং ভূয়সী প্রশংসা সত্ত্বেও তাঁকে ন্যায্য প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। কেন? এর একমাত্র কারণ 'পলাশীর যুদ্ধ'। পদস্থ আমলারাও তা স্বীকার করেছেন।

১৯০১ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এফ এ স্লাক নবীনচন্দ্রকে লেখেন :—

Dear Sir,

With regard to your letter received today all I can say is that you appear to have forgotten the recent episode concerning your work 'The Battle of Plassey".

বোল্টনের পর বোডিনন চীফ সেক্রেটারি হন। নবীনচন্দ্রের দক্ষতা সম্পর্কে বোল্টন খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই প্রমোশনের ব্যাপারে নবীনচন্দ্র তাঁকে চিঠি দিলে তিনি লেখেন যে, তাঁকে ডিঙিয়ে কাউকে প্রমোশন দেবার কথা তাঁর মনে নেই। এ সম্পর্কে কবি তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনে' লিখেছেন ঃ

'বড় বিচিত্র কথা। তিনি কিছুই জানেন না, তাঁহার পরবর্তীরাও কিছু জানেন না? তবে কি আকাশ হইতে এই ব্রহ্মাস্ত্র আমার উপর পড়িয়াছিল। তবে কি ইহা স্বয়ং তদানীন্তন লেঃ গর্ভনর সার জন উডবার্নের কাজ? মিঃ মোরসেভ তাহার কাছে একখানি আবেদন পাঠাইতে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন। এখনও মিঃ কালিয়ার চট্টগ্রামের কমিশনার...তিনিও এক আবেদন পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে আবেদন গেল। মিঃ মোরসেভ আমার কার্যের বেশ প্রশংসা করিয়া আমাকে প্রমোশন দেওয়াবার জন্য লিখিলেন—'I have always considered Babu Nabinchandra Sen as an exceedingly able officer' কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।'[৯]

এরপর নবীনচন্দ্র তাঁর প্রমোশনের ব্যাপারে গর্ভনরের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পত্র লিখিলেন। এর জবাবে তিনি যা লিখিলেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ১৯০১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারির পত্রে জে ট্রেসি তাঁকে জানালেন

"...But as you wish to see his Honour you may call any Saturday, the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

day on which the L. Governor receives visitors. You should bring the letter with you."

প্রমোশন বন্ধ ছাড়া নবীনচন্দ্র আরও ২টি আশঙ্কা করেছিলেন। পেনসন বন্ধ করে দেবার এবং মূল 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের। লেঃ গর্ভনর উডবার্নের সঙ্গে দেখা হল। উডবার্ন কুমিল্লা সফরে আসলেন। সেই সাক্ষাৎকারের কথা নবীনচন্দ্র অননুকরণীয় ভাষায় লিখে গিয়েছেন

'...কি করিব, প্রাইভেট সেক্রেটারি মহাশয়কে 'এত্তেলা' দিয়ে আমি পার্শ্বস্থিত গৃহে গিয়া, মিঃ বাকল্যান্ডের কাছে 'কার্ড পাঠাইলাম'। অন্য দর্শকদের ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে 'সেলাম' দিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আমার কার্ডখানি হাতে রাখিয়া আমাকে আপাদমস্তক এরূপভাবে নীরবে দেখিতে লাগিলেন যে, আমি মনে করিলাম, গতিক ভাল নহে। তখন আমি নিজে বলিলাম,—

'দুই বৎসর যাবৎ যাহার প্রমোশন বন্ধ, আমি সেই হতভাগ্য কর্মচারী। তিনি আমার দিকে সেইরূপ স্থির নয়নে চাহিয়া বলিলেন :—

"আপনি না 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রণেতা ? বস। গৌরচন্দ্রিকা না হইতেই পালা আরম্ভ। আমাকে তখন বসিতে বলিলেন। আমি হাঁ আমিই সেই হতভাগ্য। তবে আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি তখন আমি তরুণ যুবক। এই বৃদ্ধ বয়সে কি তাহার জন্য দণ্ডিত হইলাম ? বাইস-তেইশ বৎসর যাবৎ উহা সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও সময়ে সময়ে হইতেছে। উহা বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণদাস পালের মত লোকের দ্বারা প্রশংসিত এবং চারিবার টেক্সট বুক কমিটির দ্বারা পাঠ্য বলিয়া নির্বাচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটির সভাপতি একজন হাইকোর্টের খ্যাতনামা দেশীয় জজ। তথাপি কি একজন অজ্ঞাতনামা পৃষ্ঠ দংশকের গুপ্ত কথায় এই 'পলাশীর যুদ্ধে'র জন্য এতকাল পরে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে 'ফাঁসি হইবে ?'"

এই ঘটনার কিছুদিন পর নবীনচন্দ্র প্রমোশন পান। ১৯০৩ সালের ৬ই জুলাই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং তার প্রায় এক বছর পর তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

এখানে উল্লেখ্য, এই 'পলাশীর যুদ্ধ' এর বিরুদ্ধে 'স্টেট প্রসিকিউসন' করার কথাও সরকার ভেবেছিলেন। সরকার কয়েকজন বিশিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতও নিয়েছিলেন। অনেকেই জানান, ২২/২৩ বছরের পুরাতন ও বহুল প্রচারিত একটি বইয়ের বিরুদ্ধে 'স্টেট প্রসিকিউসন' আনা ঠিক হবে না। তখন এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

'প্রবাসের পত্র' বইটির প্রথম সংস্করণ বের হয় ১৮৯৩ সালে। তার আগে 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই চিঠিগুলি ছাপা হয়। প্রকাশক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। প্রথম সংস্করণের সময় কোন আপত্তি ওঠার তথ্য নেই। বইটির সম্পর্কে আপত্তি উঠেছিল ১৯১৫ সালে যখন এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মন্মথনাথ রুদ্র বইটির বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে ১৯১৫ সালের ৩১শে আগস্ট নোট দেন। ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন আপত্তি তোলেন। আপত্তিকর অংশগুলি তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করে দেন। গোয়েন্দা বিভাগও এই বইটি সম্পর্কে আপত্তি জানান। প্রেস আইনে (১৯১০) এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, সরকারকে তা বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।

'প্রবাসের পত্রের' যে অংশ সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগ আপত্তি তোলেন, তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিলাম।

লখনউ

পৃঃ ১৬ 'ছলে কৌশলে বৃটিশ সিংহ বাহাদুর গরীব নির্দোষ ওয়াদিদ আলির রাজ্য কাড়িয়া লন।

পৃঃ ৬৪ 'ভারতীয় রাজারা দিন দিন ইংরাজ পলিটিকেল দ্বারা যেরূপ অপমানিত হন, ঝাল খাইয়াই সেই ঝাল নিবারণ করেন।'

পৃঃ ১০ (কানপুর) : 'তখন প্রতিহিংসায় মত্ত ইংরাজরা তোপের দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জলমগ্ন করিয়া নিহত করেন। কেবল এক পক্ষেই নৃশংসতার অভিনয় হয় নাই।'

পৃঃ ৪৫ (বর্তমান দিল্লি) 'যে ইংরাজ মোগলের দয়াতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আইসে, সে মোগলের সিংহাসনে বসিল। আকবরের উত্তরাধিকারী তাহার বৃত্তিভোগী হইয়া, সামান্য ব্যক্তির মত দিল্লি নগরে বসতি করিতে হইল। ময়ূর সিংহাসন নাদের শাহ লইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস বৃটিশ সৈন্যনিবাস হইল। বৃটিশ রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। রনজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। ভারতের মানচিত্র লাল হইয়া গেল।'

পৃঃ ৪৬ 'যদি নগরে অবরুদ্ধ হইয়া না থাকিয়া তাহারা বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিত ৪০,০০০ বিদ্রোহী এক ফুৎকারে ক্ষুদ্র ইংরাজ সৈন্য উড়াইয়া দিতে পারিত।'

পৃঃ ৪৭ 'তখন সেনাপতি হডসন এই শিশুদিগকে দিল্লিদ্বারের কাছে বন্দীভাবে লইয়া গিয়া, স্বহস্তে তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করেন।'

পৃঃ ৬৮ (পুষ্কর) : ইহার শ্বেত প্রস্তর নির্মিত দেওয়ানি আমে জাহাঙ্গীর প্রথম ইংরাজ রাজদূত টমাস রোয়ের সঙ্গে কুক্ষণে সাক্ষাৎ করেন। এইরূপে এইখানে দুইটি সাম্রাজ্যের ভাবী ইতিহাসের সূত্রপাত হয়, ভারতের দুইটি মহা ঘটনা এখানে আমাদের অদৃষ্ট গগনে সঞ্চারিত হয়। সেই সকল শ্বেত প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকাতে কমিশনার বিহার করিতেছেন এবং তাহাতে তাঁহার অফিস ও মিউনিসিপাল অফিস বিরাজ করিতেছে। জগতের কি বিচিত্র গতি বাদ্‌শাহ রমণীদের ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য যে 'মিনা বাজার' ছিল, এখন তাহা উদ্যানের কুলির নিবাস।'

পৃঃ ৭৪ 'চিতোর অমর, চিতোর ঊনবিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র, চিতোর ভারতের ভবিষ্যৎ আশা, সে বীরত্ব, সে সতীত্ব ভিন্ন ভারতের অন্য আশা নেই।'

পৃঃ ৭৬ (যোধপুর) 'আমরা জানিতাম যে কোন সিবিলিয়ানই বুঝি খোসামুদির প্রিয়। কিন্তু দেখিলাম, এ রাজাদের কাছে তাহারা কোথায় লাগে।'

পৃঃ ৯০ (বোম্বাই) 'ভারতের সুখ সূর্য আসিবে রে ফিরে। বাইরনের স্বপ্ন ফলিয়াছে ; গ্রীস্মের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি ?'

পৃঃ ৯৩ (পুনা) 'এই ত্রিমূর্তির বা ত্রিশক্তির সাধন দ্বারা শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মোগল রাজ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিলেন । এই মহাসাধন ভুলিয়া, তাঁহার কাপুরুষ উত্তরাধিকারী বাজিরাও, সেই সাম্রাজ্য হারাইলেন, ভারতকে ইংরাজ করে তুলিয়া দিলেন।'

পৃঃ ১০৪(নর্মদা) : 'এই ক্ষুদ্র গৃহটি পর্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু সেই নিরুপমা সুন্দরী, সেই দিল্লিশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বীর নারী আজ কোথায় ? হায় হায় ! দুর্গাবতীর কি চিরদিনের জন্য বিজয়া হইল ? আবার কি তাহার বোধন হইবে না ?'

প্রবাসের পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে দু' হাজার কপি ছাপা হয়। শ'খানেক বই ১৲ মূল্যে বিক্রি করা হয়। নবীনচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনের হয়ে এর ছাপা ও বিক্রির তদারক করতেন শরৎ বসু। তাঁর কাছে ছিল শ' দুই বই। বাকি বই ছিল দফতরির ঘরে। এই অবিক্রিত বইগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার প্রশ্ন ওঠে। যে করেই হোক সরকার এই 'প্রবাসের পত্রে'র প্রচার বন্ধ চান। এর বিরুদ্ধে কী আইনসম্মত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সে নিয়ে দীর্ঘ ফাইল চালাচালি চলে। নবীনচন্দ্রের একমাত্র ছেলে তখন বর্মায় ব্যারিস্টারী করতেন। সেখান থেকে তিনি সরকারের কাছে এক আবেদন করেন। সেটি Appendix-এ দেওয়া হল।

'প্রবাসের পত্রে'র এই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার পর এই বইটির প্রচার বন্ধের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে নিয়ে পুলিশ কর্তা ও আমলাদের মধ্যে দীর্ঘদিন মত বিনিময় হয়। গোয়েন্দা বিভাগ জানান, প্রকাশককে বইটির সমস্ত কপি সরকারের কাছে সমর্পণ করতে বললে ভাল কাজ হবে। সম্প্রতি এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ধরনের ব্যবস্থা অনেক আপত্তিকর পুস্তকের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। অন্য প্রস্তাবটি হচ্ছে, প্রেস আইন অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা। প্রথম প্রস্তাবে একটি ঝুঁকি আছে তা হল এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সিভিল স্যুট আনতে পারেন এবং এ ধরনের ঘটনাও ঘটেছে। 'ক্রুসেড ও জেহাদ' গ্রন্থটি পুলিশ 'ভলেনটারি সারেন্ডার' করতে বলায় দীন মহম্মদ দেড় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কলকাতার হাইকোর্টে সিভিল স্যুট'দায়ের করেন ১৯১৪ সালে।

প্রবাসের পত্রের এই সংস্করণটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারে আরও একটি সমস্যা দেখা দেয়। সরকারী নোটে তা আছে। ১৮৯৩-১৮৯৪ সালে এই বইটির আপত্তিকর কিছু আছে বলে মনে হয়নি। এখন বইটি নিষিদ্ধ করা হলে এই বিষয়টিই বড় হয়ে উঠবে। চীফ সেক্রেটারিও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এই অবস্থায় পুলিশ ও আমলারা মনে করেন, বরং প্রকাশকের সঙ্গে কোনরকম ব্যবস্থা করে বইটির এই সংস্করণটির প্রচার বন্ধ করা হোক। প্রকাশক সম্মত না হলে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। পুলিশ কমিশনার জানান, 'প্রবাসের পত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক শরৎকুমার বসু অবিক্রিত বইগুলি সরকারের হাতে তুলে দিতে রাজি আছেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনারের আশঙ্কা এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যদি সিভিল স্যুট দায়ের করা হয়। সেজন্য তিনি ভারতীয় প্রেস আইন অনুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করার দাবি জানান। চীফ সেক্রেটারিও এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যদি কোন ব্যবস্থা নিতে হয় তা হচ্ছে এই সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, বইটির আগের সংস্করণটি থেকেই যাচ্ছে। ২০ বছর আগে প্রকাশিত কোন বই কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করা যায় না। এরপর বিষয়টি লেঃ গভর্নরের গোচরে আনা হয়। তখন লেঃ গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এ সম্পর্কে ১৯১৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি একটি তাৎপর্যপূর্ণ নোট দেন। তিনি বলেন, এতদিন পর বইটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এর প্রতি আরও বেশী করে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে। তার মন্তব্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সেটি হুবহু তুলে দিলাম।

"I agree that action under the Press Act is preferable to attempts to obtain voluntary surrender.

But is action under the Press Act really desirable ? We have to remember that the statements were published first 23 years ago : They were repeated in a new edition 12 years ago :and were it not for the fact that the Librarian has brought them to our notice now, we would not, in all probability, have noticed them at all.

The extracts show that the author is not well disposed to the British in India : his reading of history is defferent in many respects from our. He is ready toimputethe worst motives. While we desire to believe that our predecessors were actuated by high Ideals. What is our policy in the matter ? Are we to treat the people as children and do all we can to prevent them from ever reading or hearing a word detrimentall to the British in India ? There are actions which we all regret, probably the shooting of the princes by captain Hodson is one of these. Are we to try to bring up Indians in the belief that no Britisher in India has ever done wrong ? Such a policy even if possible would be unsound if only for one reason : it would be the people to expect the impossible from a race of rulers who are not immaculate. If this is the policy of Government, then no doubt action under the Press Act in the present case will be consistence with our policy.

But if our policy is to be based on the presumption that we are dealing with intelligent men then our action should be guided by the danger to the country and its administration likely to arise from the publication of this book. For 23 years we have been unaware of the book : existence : and its popularity with public appears to have been small under these circumtances;, unless the new edition is for some reason likely to cause

দুনিয়ার পাঠক এক হও

wide spread disaffection and it does not appear that we are expecting this—might it not be better to refrain from giving the book advertisement which action under the Press Act would be certain to do ? Such action would I fancy make many people look up their copies of previous editions, which they have probably forgotten by now, they would hunt for the passages which we might be expected to look on as objectionable, and I should be afraid that in this way more harm would be done than if we leave the things alone."

লেঃ গভর্নরের এই মন্তব্যের পর চীফ সেক্রেটারি পরের দিনই এই মর্মে নোট দেন যে, প্রবাসের পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রচার খুবই অবাঞ্ছনীয় হবে। ৫-১-১৯১৬ তারিখে চীফ সেক্রেটারির নোটটির—

"I am afraid to accept H.E.'s description of the policy which he disapproves as entirely relevant to the proposal which made, which is to prevent the sale of 2000 copies of this work at the present time in cheap edition.. This edition will make the work for the first time accessible to large numbers of the existing younger generation, who would not otherwise read it or even feel of it.

And the extracts given, showing theresoluteattack made upon various classes of English officers generally, show that the author by no more confines himself to narrating historical facts detrimental to us or commenting upon them.

I think it is most undesirable that we should allow the issue of this new edition of this book, and I would ask for H.E.'s permission to take necessary action to suppress this edition, with the best possible publicity.".

তারপর বইটি প্রচার বন্ধ নিয়ে লেঃ গভর্নর ও চীফ সেক্রেটারির মধ্যে আলোচনা হয়। লেঃ গভর্নর চীফ সেক্রেটারিকে বলেন যে, তিনি যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন তাতে যদি ফল হয়, তিনি তা নিতে পারেন। তবে লেঃ গভর্নরের আশঙ্কা, এতে করে আরও বেশী লোকের মনোযোগ বইটির প্রতি আকৃষ্ট হবে। চীফ সেক্রেটারি ১১-১-১৬ তারিখের নোটে বলেন "Mean-while we should secure suspension of all publication and sale of the book". ২১-১-১৯১৬ তারিখে চীফ সেক্রেটারিকে এই মর্মে নোট পাঠানো হয়

"Lowman (তৎকালীন পুলিশ কমিশনার) has put the case to Kestevan who is of opinion that the petition submitted by N.C. Sen from Rangoon would be sufficient protection (vide the last para) against a suit for the seizure of *the books* from the agent and consider that a reply to the petition should be sent stating that Government accepts his proposal and are taking delivery of all copies of books surrendered by his agent, but the question of compensation cannot be considered.

If is decided not to proscribe the book may I obtain possession of the book."

সই অস্পষ্ট। তাই ওই নোটটি কার বোঝা যায় না, সম্ভবতঃ স্বরাষ্ট্র সচিবের। তবে শেষ পর্যন্ত 'প্রবাসের পত্র' নিষিদ্ধ হয়নি। রাজরোষে পড়লেও অন্যভাবে বইটির প্রচার বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। 'পলাশীর যুদ্ধে'র মত আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে প্রবাসের পত্রেরও নূতন সংস্করণ হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাইনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

॥ নির্দেশিকা ॥

১। History and culture of Indian people, Vol.X, Bharatiya vidya Vhawan, R.C. Majumdar, p. 173.

২। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, সম্পাদকীয় ভূমিকা।

৩। নবীনচন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ ভাগ, 'আমার জীবন'। ১ম সংস্করণ।

৪। Order of the Political Department Government of Bengal, No 8957 dated the 14th March, 1932.

৫। আমার জীবন ৫ম ভাগ, পৃ ৫৬৪।

৬। Ibid পৃ ৫৭৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Appendix

To the secretary to the Government of Bengal,
Political Dept.

Sir, I have the honour to state that my father, the late Mr. Nabin Ch. Sen, was first grade Deputy Magistrate, and retired after a long and faithful service for 35 years. He is considered to be one of the foremost Bengali poets, and his works occupy the very highest rank in Bengali literature. I am the only son and am practising at Rangoon. Being far away from Calcutta, I am unable to arrange for the publication of my father's books. My father anticipated this difficulty and a few months before his death he entrusted this work to Babu Sarat Kumar Basu, whose father was an intimate friend of my father, and who is known to us since his boyhood. Since the death of my father about 8 years ago, this gentleman has been very kindly taking a keen interest in the books by arranging for their printing and sale.

Recently one of my father's books 'Probasher-patra' was reprinted. This book I may mention has been in print for the last 24 years having been printed and published for the first time as early as 1299 (Bengali era) and has ever since been on sale on the market. The present edition of the book is merely a reprint without any alteration or addition whatsoever. I now understand from babu Sarat Kumar Basu that he was called by the Commissioner of Police Calcutta, and was informed that the government has considered certain passages of the book objectionable, and that he was asked whether he was prepared to surrender all unsold copies of the book. He first proposed to cut out the pages containing the objectionable passages and to deliver them to the authorities for destruction and then print the pages again after eliminating those passages. As however the Commissioner of Police gave Babu Sarat Kumar Basu to understand that it might not be practicable to give effect to the above proposal, the latter agreed to surrendering the copies as desired.

As Babu Sarat Kumar Basu has been looking after the books on my behalf and the proprietory right rests entirely with me, he informed me about his interview with Commissioner of Police. I therefore beg to inform you that when the book was written the author was a responsible officer of the government holding an important administrative post, and as such it was not possible for him to write any thing calculated to create *discontent* among the people or lower the Government in their estimation on the contrary, there are eloquent passages in the book entolling the benefits conferred upon India by the British Government and the manifold blessings of their long and unbroken peace reigning here under its wings.

If, however, it is now thought desirable that some passages in the book should not be published. I am quite willing to eliminate those passages from the book, and reprint it according to the direction of Government. I therefore earnestly hope that Government will kindly accept my prayer, as I am confident that it cannot be the intention of Government to supress altogether and forever a work of such high literary merit.

If my pray is accepted, I would propose that the pages containing the objectionable passages may be cut out from the present edition of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

book and delivered for destruction to any Government official authorised to receive them, and that the pages may be reprinted with those passages eliminated therefrom. I beg to mention here that the present edition has been got up at a considerable cost, with copious illustrations, it will mean great loss to me if the whole book is destroyed.

If, however my proposal is not accepted by Government I shall be ready willing to surrender all the copies that are on hand. At the same time may I not pray that Government will be pleased to take into consideration the great loss I shall put to direct recoupment of the same, particularly in view of the fact that the book has in existence for a long time and reprinted without any idea that any of itspassages had been or would be considered objectionable by Government?

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
N.C. Sen
Bar-at-Law

1, Barr street
Rangoon,
6-1-16.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পঞ্চদশ অধ্যায়: নজরুল

নবীনচন্দ্রের মতো একইভাবে যেহেতু নজরুলের কবিতা-গানের বইয়ের সঙ্গে গদ্য বইও বাজেয়াপ্ত হয়, তাই তাঁকেও একটি পৃথক অধ্যায়ের বিষয়বস্তু করা হয়েছে।

জাতি, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী—সবকিছু সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে যেমন দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, সাহি ত্য ক্ষেত্রেও তেমনি এনেছিলেন নতুনের জোয়ার। প্রচলিত নিয়ম নীতি ও গঠনকে যেন চুরমার করে দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'ধূমকেতু'র মত হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হলেন। আর তার কণ্ঠ বাণীহারা হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এই মাত্র পঁচিশ বছরে তাঁর অগ্নিস্রাবী লেখনী এদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা মেলা ভার।

নজরুলের রচনায় তখনকার যুগমানসই প্রতিবিম্বিত। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে এসেছে, শুরু হয়েছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে ঝড়ো হাওয়ার বেগে ছুটে এলেন নজরুল। বাংলা সাহিত্যে তিনি আনলেন চির বিদ্রোহের বাণী।

সৈনিক কবি নজরুলের হাতের লেখনী অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হয়ে দাঁড়াল ক্ষুরধার তরবারি। নজরুল আবার প্রমাণ করলেন কলম অসির চেয়ে শক্তিশালী। তাই তাঁর কণ্ঠকে বার বার স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাঁর পিছনে লাগিয়েছে গোয়েন্দা। বাজেয়াপ্ত করেছে একটার পর একটা লেখা—গদ্য পদ্য দুইই। বিদেশী শাসক তাতেও ক্ষান্ত হয়নি। কবিকে কারাগারেও নিক্ষেপ করেছে। এত অত্যাচার, উৎপীড়নও কবিকে শান্ত করতে পারেনি। কারাগার থেকেই তিনি ডাক দিয়েছেন কারার লৌহকপাট ভেঙে ফেলবার জন্য। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কারাগারে আমরা অনেকে যাই কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রভাব তাঁর লেখার অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। এতেই বোঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ।[১]

শুধু পরাধীনতার বন্ধনমুক্তি নয়, নজরুল একই সঙ্গে কুলিমজুরের গ্রামবাংলার, কৃষকের, সাম্যবাদী কবি। কবি তিনি—'বিদ্রোহী', 'বাঁধনহারা', 'অগ্নিবীণা,' 'দোলনচাঁপা', 'প্রলয় শিখা', 'ফণি মনসা', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান'-এর। 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল', 'নব যুগ', 'সেবক'-এর তিনি সাংবাদিক-লেখক। সশস্ত্র আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ,অসহযোগ বঙ্গভঙ্গ, খিলাফত প্রভৃতির পটভূমিতে জাগ্রত কবি-মানস অশান্ত হবেই। পরাধীনতার লাঞ্ছনা, অসহ্য দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট, সমাজের ভণ্ডামি, ধর্মের ও রাজনীতির নামে অসংখ্য রকমের শোষণ কবিকে ব্যথিত করেছিল। তাই কবিতা হয়ে উঠেছিল শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। তিনি যথাযথ জনগণের কবি। রাজনৈতিক, সামাজিক—সবকিছু অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সবকিছু শোষণ, উৎপীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

বাল্য পরিবেশ নজরুলের জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাল্যের অসহনীয় দারিদ্র্য তাঁকে করেছিল উৎপীড়িত ও শোষিতের প্রতি সহানুভূতিশীল। ছোটবেলার ঘর ছাড়ার নেশাই তাঁর লেখনীতে এনেছিল উদ্দামতা। নজরুল যে সর্বপ্রকার ভেদাভেদের উপরে উঠেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল বাল্যের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশের জন্যই। হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে বাল্য-বন্ধুত্ব তাঁকে একজন সত্যকার অসাম্প্রদায়িক কবি হিসাবে গড়ে তুলেছে। আবার বাল্যের ধর্ম-পরিবেশের জন্য তিনি পরিণত জীবনে সফল হয়েছিলেন অসংখ্য ইসলামী গান রচনায়। একই সঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য তিনি হিন্দু ধর্মসঙ্গীতেরও এক শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হয়ে উঠেছিলেন। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় এনেছিল দুঃসাহসিকতা। আবার এই সময়েই তাঁর অন্তরে অঙ্কুরিত হয় সাম্যবাদের বীজ। সৈনিক ব্যারাকে তিনি গোপনে রুশ পত্র-পত্রিকা পড়তেন। তখনই লাল ফৌজ ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব তাঁর উপর পড়ে। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এসে মুজফফর আহ্‌মদ প্রমুখের সখ্যে তাঁর ওপর এই প্রভাব আরও তীব্র হয়। তবে নিছক সাম্যবাদের কবি হলে নজরুল এত বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন না। ভারতবর্ষে তখন সবচেয়ে জরুরী সমস্যা পরাধীনতা—নজরুল সেই বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেই অচিরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশের সমগ্র জনসমষ্টির কাছে তখন সবচেয়ে বড় উৎপীড়ক হচ্ছে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী। তারা ধনতন্ত্রবাদী ও ভূম্যধিকারী অর্থাৎ···সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশ তখন রোষে ফেটে পড়ছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সুতরাং সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নটি উহ্য রেখে নিছক সাম্যবাদ দেশে সাড়া জাগাতে পারত না। এই সঙ্গে নজরুল এ দেশের ধনিক, মহাজন ও জমিদারদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। নিজের রচনায় সকল প্রতিবাদকে একত্র করেছিলেন বলেই প্রায় সকল শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের সমবেত উন্মাদনার কারণ তিনি হয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে সরকারী রোষও তাঁর উপর পড়েছে বারবার।

কেবল লেখার মধ্য দিয়েই দেশবাসীকে নজরুল অনুপ্রাণিত করেননি, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ যোগ। সুভাষচন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে তিনি সভা-সমিতিতেও গিয়ে মাতোয়ারা গান গেয়েছেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈপ্লবিক আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়, তার পিছনে তাঁর লেখনীর প্রেরণা অনস্বীকার্য। একদিকে এই রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও অপর দিকে···ব্যাপক জনপ্রিয়তা, সমকালীন আর কোন কবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এই দুই 'গুণ'ই নজরুলের সবচেয়ে বড় 'দোষ' হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসকের চোখে। তাই তাঁর .কণ্ঠরোধের জন্য তারা বার বার তৎপর হয়েছে। আমরা যতদূর জেনেছি, একক লেখক হিসাবে সমসাময়িককালে নজরুল ইসলামের রচনাই সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত। নিছক সংখ্যার দিক থেকে অন্য কোনো-কোনো লেখকের নিষিদ্ধ গ্রন্থের সংখ্যা অধিক হলেও নজরুলের মত তাঁরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। আর সেসব লেখার সাহিত্যমূল্যও নগণ্য। সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুস্তিকা ধরনের—প্রায়শই বক্তৃতাধর্মী।

'বিদ্রোহী' কি কবিতা? না আগুনের গোলা? প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে প্রায় এক সঙ্গে বের হল 'বিদ্রোহী'। সে এক চমকপ্রদ কাহিনী। সেদিনের সেই কথা নজরুল-বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের ভাষায় 'বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৩২৮ সালের পৌষ মাসের প্রথমার্ধে। কিন্তু তথ্যান্বেষী দেখবেন—'বিদ্রোহী'র প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে', সুতরাং তিনি ভেবে বসবেন, তাহলে বিদ্রোহী ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের আগেকার রচনা। ব্যাপারটা এই যে, সে সময় 'মোসলেম ভারত' নিয়মিত প্রতি মাসে বেরতো না। ঐ কার্তিক সংখ্যাটি বেরিয়েছিল পৌষের শেষের দিকে। আর মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে অংশবিশেষ বর্জিত হয়ে 'বিদ্রোহী' নামে উদ্ধৃত হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশের বিশেষ করে কলকাতার পাঠক-পাঠিকারা 'বিদ্রোহী'র প্রথম সাক্ষাৎ পেল 'বিজলী'তে। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের বিজলীতে 'বিদ্রোহী'র প্রথম প্রকাশ। শুনুন সে ইতিহাস।"কবিতাটি নজরুল আমাকে দেবে বলেছিল 'বিজলী'র জন্য। কিন্তু আফজল (মোসলেম ভারতের পরিচালক) এক রকম জোর করেই নজরুলের কাছ থেকে 'বিদ্রোহী'র পাণ্ডুলিপি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই 'মোসলেম ভারত' অফিসে। আফজল আমাকে দেখামাত্র বিজয়োল্লাসে মোসলেম ভারতের ছাপানো ফর্মাগুলি আমাকে দেখিয়ে বললে, "এই দ্যাখো 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়ে গেছে।" ফর্মাগুলি হাতে নিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। যতগুলি প্রবন্ধ কবিতা ছাপা হয়েছে, সব কটির শিরোনামা লিখে নিলাম আফজলের অজ্ঞাতসারে।

নজরুলের কাছ থেকে 'বিদ্রোহী'র একটি কপি পূর্বে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। কথা ছিল—উদ্ধৃতি হিসেবে কবিতাটি 'বিজলী'তে প্রকাশ করব। তাই করলাম, কিন্তু···'মোসলেম ভারত' বাজারে বেরোবার দু'তিন দিন পূর্বে ২২শে পৌষের 'বিজলী'তে প্রকাশিতব্য মোসলেম ভারতের একটি সমালোচনা প্রকাশ করলাম কাগজের বাঁদিকের পৃষ্ঠায় শেষ কলমের শেষ দিকে, ১২ পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ হলো 'বিদ্রোহী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে। লিখলাম 'কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছে যে, আমাদের স্থানাভাব হলেও তা 'বিজলী'র পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবার লোভ আমরা সংবরণ করতে পারলাম না,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঐ ড্যাশটি টেনে পৃষ্ঠাটি পূর্ণ করে পরবর্তী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কবিতাটি বেরিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, 'মোসলেম ভারত' তখনও বেরোয়নি। এই হিসাবে বিদ্রোহীর প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের 'বিজলী'তে।'

বিদ্রোহীর সেই আগুন-ঝরা লাইনগুলি

'মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রনিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।'

বাঙালীর শিরায় যেন বয়ে গেল তরল অনল। সবার মুখে এক প্রশ্ন, কে এই বিদ্রোহের কবি? বিস্মিত সকলে জানল-মাত্র একুশ বছরের তরুণ এক কবির লেখা এটি। অনুসন্ধিৎসুরা অবশ্য কিছুটা আগেই এঁর পরিচয় পেয়েছেন মোসলেম ভারতে ···প্রকাশিত 'ভাঙার গান' কবিতার মধ্য দিয়ে।

তবে 'বিদ্রোহী' কবিতার পরই নজরুল যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। "পূর্বের কিছু কিছু রচনায় রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।"

কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহীর মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ-কথা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পাবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।'—একথা বলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।'

'বিদ্রোহী' সেদিন বাঙালী তরুণ সমাজকে কী ভীষণ প্রভাবিত করেছিল, তা সমসাময়িকরা অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি একসঙ্গে 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের খ্যাতিতে বাঙালী সমাজ একেবারে টগবগ করে উঠল। তরুণ সমাজ তো বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। সকলের মধ্যে সেই মনোভাব—'আপনারে ছাড়া কাহারে করি না কুর্নিস।" সেদিনের কথা সমসাময়িক আর একজনের ভাষায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর রূপে দেখা গেল নজরুলের বিদ্রোহবাণীতে। একটি আত্মা জগতের সমস্ত জিনিসের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে করতে ছুটে চলেছে, তার কোথাও বাধা নেই, মুক্তির উদ্দাম আনন্দে সে আজ দিশাহারা। কিন্তু তবু মহাবিদ্রোহীর এই ছুটে চলার কি কোনো দিন ক্লান্তি আসবে না?···কিন্তু সে কবে

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন ভাষায় আর কোন বাঙালী কবি চ্যালেঞ্জ জানাননি। সমাজের উৎপীড়নে এমন শপথ আর কারো মুখে তো শুনিনি। Must fight to the finish মন্ত্রে দীক্ষিত আর কোনো বাঙালী কবি শত্রুপক্ষকে এমন আহ্বান জানাননি।'

রাজশক্তি স্বভাবতই সচকিত হয়ে উঠল। সব রকম অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কে এমনিভাবে গর্জে উঠেছে? বিদ্রোহীর লেখক কে? রক্তচক্ষু সরকারী আমলারা বেসামাল। আমলাদের সঙ্গে গোয়েন্দারা, সরকারি আইনবিশারদরা তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন আইনেই তো বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। আমলাদের সেদিনকার সেই অসহায় অবস্থার কথা লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে 'এ কবিতায় হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই এত পুরাণ প্রসঙ্গ ঢুকেছে যে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি একে রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত করতে পারল না। কখনো ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার বাজছে, কখনো বা ইস্রাফিলের শিঙ্গা থেকে উঠছে রণহুঙ্কার। কখনো বাসুকীর ফণা জাপটে ধরেছে। কখনো বা জিব্রাইলের আগুনের পাখা, কখনো চড়েছে 'তাজি বোররা'-য়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(পক্ষীরাজ ঘোড়া), কখনো বা উচ্চৈঃ শ্রবায়।'

একে রাজদ্রোহ বলতে গেলে ধর্মের উপরে হাত দেওয়া হবে।' বিদ্রোহীকে আইনের বেড়াজালে না পেলেও পরবর্তীকালে বিদ্রোহী কবির বহু লেখা, কবিতা ও প্রবন্ধ দুই-ই বার বার রাজরোষে পড়েছে। কবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বার বার ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে।

কিছুদিনের মধ্যেই নজরুলের উপর সরকারী রোষ নেমে এল। নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয়, তার নাম যুগবাণী। ১৯২২ সাল বাংলা সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বর্মা সরকারও যুগপৎ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ করে। বাংলা সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ২৩শে নভেম্বর, ১৯২২ এবং ১৬৬৬১ পি। এটি একটি নিবন্ধের বই। কলকাতার মেটকাফ প্রেস থেকে ছাপা। 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা নজরুলের কয়েকটি নিবন্ধের এটি সংকলন। 'যুগবাণী'র প্রথম সংস্করণটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তৃতীয় সংস্করণে কোথাও প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। তবে মুজফফর আহমদ-এর মতে প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে।

যুগবাণী বইটি পড়ার সুযোগ না হলেও এ সম্পর্কে সরকারী ফাইল থেকে কিছু কিছু তথ্য পেয়েছি। তার থেকে বোঝা যায় বইটি কেন রাজরোষে পড়েছিল। এই ধরনের একটি মন্তব্য তুলে দিলাম। মন্তব্যটি ১৯৪১ সালের।

I have examined the book 'Yugabani'. It breathes bitter racial hatred directed mainly against the British, preaches revolt against the existing administration in the country and abuses in the very strong language the 'slave-minded' Indians who uphold the administration. The three articles on 'Memorial to Dyer'. 'Who was responsible for the Muslims massacre?' and shooting the blackmen' are specially objectionable. I don't think it would be advisable to remove the ban on this book in the present crisis. On the whole it is a dangerous book, forceful and vindictive.

দেখা যাচ্ছে 'যুগবাণী' বই বাজেয়াপ্ত হবার প্রায় ২০ বছর পরও বইটি সম্পর্কে সরকারি মহলে কত শঙ্কা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের আমলাদের কাছে 'যুগবাণী' যে কত বিপজ্জনক বই ছিল, এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট।

'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯২২ সালে। এর এক বছর পরই নজরুল-এর দুটি কবিতার বই নিষিদ্ধ হয়। 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান'। এই বই দুটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, ১৯২৪ সালে। দুটি বই-ই ফৌজদারি বিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ হয়। 'বিষের বাঁশি'র প্রকাশক ছিলেন কবি নিজে।

'বিষের বাঁশি'র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদটি অপূর্ব। একটি রিক্তপাত্র কিশোর হাঁটু মুড়ে বসে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে। তাকে জড়িয়ে আছে তীক্ষ্ণ জিহ্বা বিশাল বিষধর। কিশোরের ভঙ্গিতে ভাবে ভয়ের বিন্দু-বিসর্গও নেই। সে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। আর তার বাঁশির সুরে জেগে উঠছে নতুন দিনের সহস্রাংশু সূর্য—যার আর এক নাম লোকচক্ষু, লোক প্রকাশক, ছবিটা এঁকেছেন কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, নজরুলের নিজের বর্ণনায়, 'প্রথিতযশা কবি-শিল্পী আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু।'

উক্তি উদ্ধৃত করেছেন অচিন্ত্যকুমার এই প্রসঙ্গে, "এই বিষের বাঁশির বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।"

'বিষের বাঁশি' বইটি নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন মাতৃসমা রহমান সাহেবাকে। এঁকে তিনি বাংলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে বলেছেন

"তোমার মমতা-মাণিক আলোকে চিনিনু তোমা[illegible]
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্বজননী। তোমার আঁচল পাতা[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা দহে
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে।"

প্রবাসীর মত অভিজাত পত্রিকাকেও স্বীকার করতে হল : 'কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ের প্রচণ্ড রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।'

শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত দাস, যিনি নজরুলকে 'গালির গালিচায় বাদশা করে বসিয়েছেন, তিনিও লিখলেন, 'স্বদেশী আন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হউক, তাঁহারা ঠিক সেভাবে সাড়া দেন নাই। এক মাত্র কবি নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন : পরবর্তী আন্দোলনের চারণকবি তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে।

'কবি নজরুল ইসলামের 'বিষের বাঁশি' এই থর থর প্রাণস্পন্দন যুগের গান। ইহার আঘাত সরকার সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই দীর্ঘকাল ইহার প্রচার রদ করা হইয়াছিল। জাতীয় জাগরণের সহায়ক হিসাবে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার একান্ত 'আবশ্যক'। ...বিষের বাঁশিতে প্রধান গান 'মরণবরণ' গান, প্রধান বাণী বিদ্রোহের বাণী। প্রথম বন্দনা 'বন্দী-বন্দনা'।'[৮]

বলাই বাহুল্য বাংলা সরকারের পক্ষে এটি নিষিদ্ধ না করে উপায় ছিল না। ১৯২৪ সালের ২২শে অক্টোবর-এর গেজেট ঘোষণায় (নং ১০৭২ পি) 'বিষের বাঁশি' নিষিদ্ধ হয়। তবে পরাধীন আমলেই 'বিষের বাঁশি' থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ উঠে যায়।[৯]

'বিষের বাঁশি'কে দেশ দ্রোহাত্মক বলে সরকারী নথিপত্রের মন্তব্য ও বিভিন্ন নোটগুলি আমরা দেখেছি। দেখা যায়, এই বইটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৎকালীন বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান বাবু অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। ১৯২৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর চিঠিতে তিনি 'বিষের বাঁশি' সম্পর্কে বাংলা সরকারের পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের কাছে লেখেন

Sir, I have the honour to enclose herewith a copy of a book entitled the 'Visher Vanshi' (the Flute of Venom) by one Kazi Nazrul Islam which was received in Bengal Library on the 21st August, 1924. The extracts translated (which also are enclosed herewith) will show that the publication is of a most objectionable nature, the writer revelling in revolutionary sentiments and inciting youngmen to rebellion and to law breaking. The ideas, though often extremely vague, have clearly a dangerous intent, as the profusion of such words as blood, tyranny, death, fire, hell, demon and thunder will show. I may add that the writer was once convicted of seditions, and is since being lionised by a section of people. I recommend that the attention of the Special Branch of Criminal Investigation Department may be drawn to this publication. The copy submitted herewith may kindly be returned to the office when done with.

আমরা দেখলাম, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত বইটি সম্পর্কে মতামত নেওয়ার জন্য গোয়েন্দা বিভাগে বইটি পাঠানোর সুপারিশ করেন। এর কিছুদিন পরেই এই সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবও 'বিষের বাঁশি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চীফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করেন। ১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবরের চিঠিতে টেগার্ট চীফ সেক্রেটারিকে লেখেন

Sir,

I have the honour to forward herewith a copy of a letter No. 559/17/24 dated the 24th September, 1924 from the Bengal Librarian to the Director of Public Instructor, Bengal, together with a copy of the enclosure on the subject of a book entiled 'Bisher Vanshi' by Kazi Nazrul Islam.

The writer was convicted last year under sec.124A and 153A I.P.C. and

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

sentenced to one year's R.I. in the Dhumketu sedition case. The contents of the book, as would appear from the extracts of translation, are dangerously objectionable and I recommend the immediate proscription of the same.

The Bengal Librarian's copy of the book in original is also sent herewith for reference and may be returned to him when done with.

পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব অবিলম্বে 'বিষের বাঁশি' বাজেয়াপ্ত করতে বলেন। কারণ গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী এর কবিতাগুলি মারাত্মক। কয়েক দিন পরেই তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি এ এন মবারলি বিষের বাঁশি বইটি বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করেন। ১৯২৪ সালের ২২শে অক্টোবর ওই গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

নিষিদ্ধ করেও বইটির প্রচার বন্ধ করা যায়নি। বিষের বাঁশির সুরে দেশ যেন মাতোয়ারা। ক্রোধে শাসক গোষ্ঠীও রক্তচক্ষু। তৎপর আমলারা। গোয়েন্দারাও। শুধু বাজেয়াপ্ত করলেই হবে না। যে করে হোক বন্ধ করতে হবে এর প্রচার। নিষিদ্ধ 'বিষের বাঁশি'র খোঁজে তল্লাসী চললো। ১৯২৪ সালের ২৯শে অক্টোবর চীফ সেক্রেটারিকে লেখা টেগার্টের চিঠিতে জানা যায় যে, ওই মাসেরই ২৩ তারিখে পুলিস বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালিয়ে 'বিষের বাঁশি'র ৪৪ কপি বই আটক করে। বাজেয়াপ্ত বিষের বাঁশির খোঁজে যে সব অঞ্চলে তল্লাসী চলে, তা হল (১) আর্য পাবলিশিং হাউস, ১৫/১৬, কলেজ স্ট্রীট, (২) ইনডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, (৩) কল্লোল পাবলিশিং, ২৭ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, (৪) ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, (৫) বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২৩৪ ঐ, (৬) সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, (৭) বরেন্দ্র এজেন্সী, ১২/১ কলেজ স্ট্রীট, (৮) বাণী প্রেস, ৩৩এ নং মদন মিত্র লেন।[১০]

বিষের বাঁশির খোঁজে যে সব অঞ্চলে তল্লাসী চালানো হয়, তার অধিকাংশই কলকাতায় অবস্থিত। টেগার্টের চিঠিতে আরও জানা যায়, হুগলিতে কবির বাড়িতেও তল্লাসী হয়। কিন্তু সেখানে 'বিষের বাঁশি'র কোন কপিই পাওয়া যায়নি।

মোট কথা নিষিদ্ধ করে সরকার নজরুলের বইয়ের প্রচার বন্ধ করতে পারেনি। বরং তরুণদের মধ্যে নিষিদ্ধ বই পড়ার উৎসাহ বেড়েই যায়। এ সম্পর্কে মুজফ্ফর আহমদ যথার্থ লিখেছেন 'নজরুলের দু'খানা কবিতার বই—বিষের বাঁশি ও ভাঙার গান—বঙ্গীয় সরকারের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব ছাপানো পুস্তক তো একসঙ্গে বাঁধানো হয় না, অন্তত আগেকার দিনে হতো না। ছাপানো ফর্মাগুলি কোনো দফতরীর গুদামে ক'টন কাগজের তলায় চাপা পড়ে থাকত তা জানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ছাপানো ফর্মাগুলি এইভাবে থেকে যাওয়ায় নজরুলের অনেক উপকার হয়েছিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে আমি যে গিরেফতার হয়েছিলাম তার পরে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের নানান জেলা ঘুরে ও স্বাস্থ্যের কারণে ক'মাস আলমোড়ায় বাস করার পর আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসের ২রা তারিখে। এসে জানতে পেলাম যে নজরুলের নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানা সংগ্রহের জন্য অনেকের, বিশেষ করে যবকদে‍র আগ্রহের অন্ত ছিল না। আমি তো বহু যুবককে এই বই দু'খানার জন্য আবদুল হালীমের নিকট আসতে দেখিছি। নিষিদ্ধ জিনিসের জন্য মানুষের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ হয়। আবদুল হালিম জানত, কোন দফতরীর নিকট নিষিদ্ধ পুস্তক দু'খানির ফর্মাগুলি আছে। আরও অনেক যুবক নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়ের ব্যাপারে নজরুলকে সাহায্য করেছেন। হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন দুর্দিনে এই পুস্তক দু'খানায় নজরুলের পরিবারের অনেক সাহায্য হয়েছে।[১১]

নজরুলের বাজেয়াপ্ত পুস্তকের প্রচার বন্ধে সরকারের এই ব্যর্থতার কথা অচিন্ত্যকুমারও উল্লেখ করেছেন : 'নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের কবিতার বই ক'টির বিক্রি বন্ধ করা যায়নি। নানা সভায়, সম্মিলনে প্রায় প্রকাশ্যেই বই বিক্রি হচ্ছে। কলকাতার অলিগলি ফুটপাথ তো আছেই। কিন্তু সে গোপন বিক্রির উদার মুনাফার একটি শীর্ণ অংশও নজরুলের হাতে এসেছিল কিনা সন্দেহ।[১২]

খোদ পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের চিঠিতেই জানা যায় যে, পুলিস বীরবিক্রমে কলকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানা স্থানে নিষিদ্ধ বিষের বাঁশির জন্য তল্লাসী চালালেও আসল জায়গায় খোঁজ করেনি। অতি দক্ষ পুলিসকর্তাও ভাবেননি যে, দফতরীর ঘরেই অধিকাংশ বই থাকতে পারে। ওই সব বই বাঁধিয়ে বিনা প্রচ্ছদে হাতে হাতে বিলি হত। অনেকের কাছেই এ কথা শোনা।[১৫] এখনও এই ধরনের দু'একটি বই কারো কারো কাছে আছে।

বিষের বাঁশির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য হুমায়ুন কবির আইন সভায় (বেঙ্গল কাউনসিলে) সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একই অনুরোধ করেছিলেন মৌলভী মহম্মদ ফজলুল্লাহ্। কিন্তু তা রক্ষিত হয়নি। পরে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে বলে এখানে এর উল্লেখমাত্র করলাম। ১৯৪৫ সালে বাংলা সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে 'বিষের বাঁশি' থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।[১৬]

'বিষের বাঁশি' বাজেয়াপ্ত হবার কিছুদিন পরেই, 'ভাঙার গান' নিষিদ্ধ হয়। তবে 'বিষের বাঁশি'র উপর নিষেধাজ্ঞা যেমন স্বাধীনতার আগেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল, 'ভাঙার গান'-এর ক্ষেত্রে তা হয়নি। 'ভাঙার গান'-এর কবিতাগুলি দারুণ আলোড়ন তুলেছিল।

'ভাঙার গান' সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের মন্তব্য, কলকাতা ...পুলিসের ও গোয়েন্দাদের মতামত কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, কারণ সংশ্লিষ্ট ফাইলটি বেপাত্তা।[১৭] সন্ধানে জানলাম, এই মূল্যবান তথ্যগুলি হয় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বা ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। (এখানে উল্লেখ্য, চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু ফাইল ঢাকাকে দিয়েছেন। তার মধ্যে নজরুল সম্পর্কে কিছু নথিও আছে।)

সৌভাগ্যের বিষয়, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে বাজেয়াপ্ত 'ভাঙার গান' বইটি সযত্নে রাখা আছে, তা আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি। এই বইটির নামপত্রে ১৯৩১ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখের স্ট্যাম্প আছে। (ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'যুগবাণী' বইয়েও একই তারিখের স্ট্যাম্প আছে।)

এখানে কয়েকটি তথ্য জানাতে চাই। আমি ১৯৭৫-এ লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (এখনকার নাম—ব্রিটিশ লাইব্রেরী) নিষিদ্ধ বাংলা বই সম্পর্কে সন্ধান করেছিলাম। জেনেছি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত অনেকগুলি নিষিদ্ধ বাংলা বইয়ের মধ্যে রয়েছে নজরুলেরই চারটি বই—ভাঙার গান, বিষের বাঁশি, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও ওই চারটি বাজেয়াপ্ত বই আছে। ভাঙার গান-এর প্রথম প্রকাশক ছিলেন কলকাতার ডি এম লাইব্রেরী এবং যুগবাণীর আর্য পাবলিশিং হাউস। এই দুটি বইয়ের প্রথম সংস্করণের টাইটেল পেজ-এর ছবি এখানে দেখানো হলো। আগেই উল্লেখ করেছি বিষের বাঁশির প্রথম প্রকাশক কবি নিজে। চন্দ্রবিন্দুর প্রথম প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরী।

'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয় ১৯২৪ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে। স্বাধীনতার আগে ভাঙার গানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি। ১৯৪৯ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। কবি তখন যদিও জীবিত, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য সব কিছু ভালমন্দের উর্ধ্বে।

ভাঙার গানের পর প্রলয় শিখা সরকারি রোষে পড়ল। ইতিমধ্যে কবির মনের জগতে তোলপাড় ঘটে গেছে। তা হয়েছে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু নিয়ে। ফুলের মত সুন্দর সজীব বুলবুল ঝরে পড়ল। কবি তখন দিশেহারা। সৈনিক কবি বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবী কবি কেঁদে কেঁদে আকুল। সে সময়ে যাঁরা তাঁর কাছে গেছেন, তাঁরা দেখেছেন, চোখের জল ফেলে ফেলে কবির বড় বড় চোখ দুটো যেন রক্তজবা। শোকে উত্তাল কবি শরণ নিলেন যোগীগুরু বরদাচরণের। এই সময়েই বের হল কবির প্রলয় শিখা। কে এই আগুন-ঝরা বই বের করবে? প্রকাশক হলেন কবি নিজেই।

যে আগুনে কবির বুক জ্বলছিল, তাকেই যেন ঢেলে দিলেন প্রলয় শিখার শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে। 'প্রলয় শিখা' ধাবমান হয়ে ছুটল দেশের সর্বত্র। পুলিস, গোয়েন্দা, সরকারী আমলারা বে-সামাল। নোটের পর নোট চালাচালি হতে লাগল।

'প্রলয় শিখা'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় মহামায়া প্রেস (১৯৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে, প্রকাশিত হয় ৫০-২এ, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট কলকাতা, থেকে। বাজেয়াপ্ত আদেশের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য সংকলিত।

'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩১ সালে। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি বের হয় ১৯৩০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর (নং ১৪০৮৭ পি)। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ১৫৩এ ধারানুসারে বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল।

বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার হয় ১৯৪৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে (নং ৮৫ পি আর)।

'প্রলয় শিখা' সম্বন্ধে সরকারি নথিপত্রের ভিতরে ঢুকবার আগে সেদিন সংবাদপত্রে যে প্রতিবেদন বের হয়েছিল, তার কিছু অংশ উৎকলন করতে পারি। ১৯৩০ সালেই ১২ই ডিসেম্বর, (বাংলা ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, শুক্রবার) আনন্দবাজার পত্রিকায় বড় বড় হেডিং-এ (৩৬ পয়েন্ট সিঙ্গল কলম) বেরিয়েছিল

"রাজদ্রোহের দায়ে
কাজী নজরুল
উভয় পক্ষের সওয়া স জবাব
রায়দান স্থগিত।"

"বর্মন পাবলিশিং কোম্পানী হইতে 'প্রলয় শিখা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করা সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল ইসলাম রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মামলা সম্পর্কে উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গিয়াছে।

"পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁহার সওয়াল জবাব প্রসঙ্গে বলেন যে, পুস্তকখানা গ্রন্থকারের অজ্ঞাতে প্রকাশ করা হয় নাই। সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি বর্মন পাবলিশিং প্রেসে প্রকাশের জন্য লেখাগুলি দিয়াছিলেন এবং উক্ত পাবলিশিং কোম্পানী হইতে আংশিক টাকা পাইয়াছিলেন ও উক্ত পুস্তকের একশত কপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। পাবলিক প্রসিকিউটর আরও বলেন যে, উক্ত পুস্তকে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাহা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারার আওতায় পড়িতে পারে। নব-ভারতের 'হলদি-ঘাট' শীর্ষক কবিতাটি (যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রমুখ কয়েকজন বাঙালীর সহিত বালেশ্বর পুলিসের লড়াইয়ের কাহিনী) সম্পর্কে পাবলিক প্রসিকিউটর বলেন যে, উক্ত কবিতায় এমন সব অসংলগ্ন ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা ব্রিটিশ ভারতে আইনত প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষের উদ্রেক করিতে পারে।

"আসামী পক্ষের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত কে সি গুপ্ত তাঁহার সওয়াল জবাবে বলেন যে, কাজী যদিও উক্ত কবিতাগুলির রচয়িতা তথাপি তিনি এগুলি প্রকাশের নিমিত্ত দায়ী নহেন, যেহেতু তিনি কাহাকেও এগুলি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করেন নাই।

"শ্রীযুক্ত গুপ্ত ইহাও বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর পরে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট পুস্তকখানি রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া বাজেয়াপ্ত করা সত্ত্বেও পাবলিক প্রসিকিউটর উক্ত পুস্তক প্রকাশের জন্য আসামীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেন যে, কাজী কবি···তিনি রাজদ্রোহ প্রচারক নহেন এবং রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

"ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন।"

ওই কাগজেই ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ (১লা পৌষ, ১৩৩৭) সংখ্যায় পাই, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কবির ৬ মাস জেল দেন এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে কবি হাইকোর্টে আপীল করেন। ওই প্রতিবেদনটির হেডিং ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'প্রলয় শিখা'র কবি
হাইকোর্টে জামীনের দরখাস্ত

বিবরণ 'প্রলয় শিখা' নামক একখানা রাজদ্রোহজনক কবিতার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার অপরাধে কাজী নজরুল ইসলাম গতকল্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট-কর্তৃক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

তাঁহার পক্ষ হইতে মিঃ সন্তোষকুমার বসু, মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও রামদাস মুখার্জী হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি গ্রাহামের এজলাসে আপীল সাপেক্ষে জামিনের দরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তিনি পুস্তকখানি মুদ্রিত প্রকাশিত করেন নাই অথবা মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিতে ব্রজবিহারী বর্মনকে ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। ব্রজবিহারীর সহিত কাজীর বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া ব্রজবিহারী কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট কাজীকে দণ্ড দান করিবার সময় বলিয়াছেন, আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কারণ তিনি একজন দেশভক্ত। যখন বলা হইল যে ব্রজও একজন দেশভক্ত, তখন উত্তর হইল যে, তাঁহার অনেক দণ্ড হইয়াছে আর দণ্ড চাহেন না, তিনি আসামীর উপর দোষ দিয়া রেহাই পাইতে চাহেন। সুতরাং এখন দ্রষ্টব্য যে, কোন দেশভক্ত রেহাই পাইবার চেষ্টায় আছেন।

"বিচারপতি আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন।"

নজরুলের এই কারাদণ্ড সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয় বলেই কবি মুক্তি পান। কথাটি মোটামুটি ঠিক হলেও মধ্যবর্তীকালের আরও কিছু সংবাদ যোগ করা যায়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরেই কবিকে সরাসরি অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। তিনি হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন।··· (আনন্দবাজারের বিবরণে তা দেখতে পাচ্ছি) সরকার পক্ষ ওই আপীলের শুনানীর সময় উপস্থিত হননি (অবশ্যই গান্ধী-আরউইন চুক্তির জন্য) তাই নজরুল মুক্তি পেয়ে যান। তবে সংশ্লিষ্ট বইটি সম্পর্কে বাজেয়াপ্ত আদেশ উঠে যায়নি। 'প্রলয় শিখা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (যা স্বাধীনতার পর বের হয়েছে) প্রকাশক তার উল্লেখ করেছেন।:

"বিপ্লবের অগ্নিযুগে 'প্রলয় শিখা'র প্রথম আর্বিভাব। সেদিন সমগ্র ভারত বিপ্লবোন্মুখ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা ভারতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। দিকে দিকে গণ জাগরণের অপূর্ব সাড়া পড়িয়াছে। সমস্ত বাধা বিপত্তি··· অগ্রাহ্য করিয়া সে অকুতোভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল মুক্তি সাধনার অগ্নি পরীক্ষায়। সেই সময় গণ-জাগরণের এই পুণ্য মুহূর্তে 'প্রলয় শিখা' তাহার জ্বালাময়ী অনলবর্ষিণী বাণী প্রচার করিয়া বিপ্লবকে সার্থক করিতে চাহিয়াছিল। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া প্রকাশকগণ ···বুঝিলেন যে, এই গ্রন্থের লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক কেহই বিদেশী সরকারের আক্রোশ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। বস্তুতঃ কোন প্রকাশক গ্রন্থ ছাপাইয়া সরকারী রোষের কবলে পড়িতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু বিদ্রোহী কবি নজরুল তাহাতেও দমিলেন না। তিনি নিজের নামে ও নিজের দায়িত্বে 'প্রলয় শিখা' প্রকাশ করিলেন—অর্থাৎ নিজেই প্রকাশক ও মুদ্রাকর হইলেন। কবির এই ত্রিমূর্তিরূপ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ব্যাপার।

"বাস্তবিকই 'প্রলয় শিখা' বাংলাদেশ প্রলয় সৃষ্টি করিল। তৎকালীন বিদেশী-সরকার ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অল্প দিনের মধ্যে রাজদ্রোহিতা প্রচারের অভিযোগে কবি গ্রেফতার হইলেন। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হইল। ইতিমধ্যে সরকার প্রলয় শিখা গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করিয়া দিলেন।

"মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া যে বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন, তাহা সমগ্র দেশকে কাঁপাইয়া তুলিল। সরকার ইহাতে বিচলিত হইয়া অবশেষে গান্ধীর সহিত একটা আপস রফা করিলেন। ইহাই ইতিহাসে বিখ্যাত 'গান্ধী আরউইন প্যাক্ট'।' এই চুক্তিনামার অন্যতম সর্ত ছিল যে, যে সকল দেশসেবক কারাগারে আবদ্ধ আছেন ও যাহাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক মামলা তখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই তাঁহাদের সকলকে বিনা সর্তে মুক্তি দিতে হইবে। এই চুক্তির ফলে বহু দেশসেবক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুক্তি পাইলেন। কবি নজরুলও বিনা সর্তে মুক্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রলয় শিখা সরকারী রোষের কবল হইতে মুক্তি পাইল না। তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াই রহিল।

"সম্প্রতি বাংলা সরকার ইহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। সেই জন্য স্বাধীনতা দিবসে ইহা প্রকাশিত হইল।"

স্বাধীনতা দিবস মঈনউদ্দীন হোয়সন।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৬ সাল।

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের বিভিন্ন ফাইল ও আইনসভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, কবির বহু লেখা বাজেয়াপ্ত হলেও মাত্র দু'টি ক্ষেত্রে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। প্রথমে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আগমনী' কবিতাটির জন্য। তারপর এই প্রলয় শিখা পুস্তকটির জন্য। কবিকে অভিযুক্ত করার জন্য কবির বিরুদ্ধে ফাইল তৈরী হয়। তাতে আমরা দেখি, 'প্রলয় শিখা সম্পর্কে তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটর রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। ১৯৩০, ৬ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে (লেটার নং ৪৮০) কলকাতা পুলিসের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারকে তিনি জানান

'I have carefully gone through the book 'Pralay Sikha' by Nazrul Islam, which has recently come out of press. There are several passages in it which come under the mischief of Section 153A and 124A of the Indian Penal Code. In the present case I would advise the immediate proscription of the book under Section 99A of the Criminal Procedure code. The best interest of the crown would be served by the immediate proscription of the said book.'

পাবলিক প্রসিকিউটের এই পরামর্শের ভিত্তিতে তৎকালীন পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট 'প্রলয় শিখা'কে অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করার জন্য ১৯৩০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর চীফ সেক্রেটারিকে জরুরী চিঠি দেন। শুধু 'প্রলয় শিখা'র বাজেয়াপ্ত নয়, তিনি কবিকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৯৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করার সুপারিশও করেন। বিধিটির বয়ান

Urgent 15th Sept. 1930

Sir,

I have the honour to forward herewith a Bengali book entitled "Pralay Sikha" by Kazi Nazrul Islam printed at the Mohamaya Press, 193, Cornwallis Street, Calcutta by the author himself together with its reviews The Public Prosecutor, Calcutta who was consulted in the matter, is of opinion that it should be immediately proscribed. I should therefore request that the book is proscribed under Sec. 99A of the criminal Procedure Code and sanction in the name of Inspector G. S. Roy be accorded under Section 196 Cr. P. c. to prosecute the said Kazi Nazrul Islam, the author, printer & publisher of the book under Section 124A and 143A I. P. C.

The book may be returned with an authenticated translation of the Bengali translation to Government.

চীফ সেক্রেটারিকে লেখা পুলিস কমিশনারের এই চিঠির দুদিন পরেই 'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে সরকারী গেজেট প্রচারিত হয়। আরোও কিছুদিন পর কবিকে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। পুলিস কমিশনারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে চীফ সেক্রেটারি ১১ অক্টোবর ১৯৩০, পুলিস কমিশনারকে লেখেন

মহাশয়,

আপনার ১৯৩০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের (লেটার নং ৫০৩০ ডি ভি পি) চিঠির উত্তরে আমি জানাচ্ছি যে, গভর্নর ইন কাউনসিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে'প্রলয় শিখা'র লেখক মুদ্রক ও প্রকাশক কাজি নজরুল ইসলামকে অভিযুক্ত করা মঞ্জুর করেছেন। উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য ইন্সপেক্টর জি এস রায়কে ক্ষমতা অর্পণ করে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তার একটি ডুপ্লিকেট আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। এই মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।' (অনূদিত)

এই একই তারিখে নজরুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও বের হয়। তা হচ্ছে :—

নির্দেশ নং ১১৪৯ পি স দার্জিলিং ১১-১-১৯৩০

গভর্নর অব কাউন্সিলের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, 'প্রলয় শিখা'র লেখক মুদ্রক ও প্রকাশক কাজী নজরুল ওই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে অপরাধ করেছেন। সেইজন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ধারা অনুসারে ওই অপরাধে কাজী নজরুল ইসলামকে অভিযুক্ত করার জন্য কলকাতার ডিটেকটিভ বিভাগের ইন্সপেক্টর জি এস রায়কে এতদ্বারা নির্দেশ ও ক্ষমতা অর্পন করা হল।

এরপর দেখা যায়, নজরুলকে অভিযুক্ত করা নিয়ে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, টেগার্ট সাহেব একের পর এক চিঠিতে চীফ সেক্রেটারিকে তা জানান। গ্রেফতার পরোয়ানা জারি হচ্ছে। চিঠির বয়ান

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট নং ৫৫২৬ ডি ডি পি

মহাশয়,

রাজনৈতিক বিভাগের১৯৩০ সালের ১১ই অক্টোবরের (লেটার নং ১১৭৮ পি এস ডি) পত্রের প্রসঙ্গে আমি সরকারকে জানাচ্ছি যে, 'প্রলয় শিখা' প্রকাশের জন্য এই ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর জি এস রায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের ২৫শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা পান। ১৯৩০ সালের ৬ নভেম্বর পরোয়ানাটি 'একজিকিউট' করা হয়। ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত মামলা মূলতুবি আছে।

এরপর নজরুলকে গ্রেফতার করার ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলে। পুলিস কর্তা টেগার্ট সাহেব পর পর পত্রে চীফ সেক্রেটারিকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। নজরুলকে নিয়ে সেদিন সরকারী পদস্থ মহলে কী তীব্র তৎপরতা চলছিল তার সাক্ষ্য স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের বিভিন্ন ফাইলে ছড়িয়ে আছে।

১৯৩০ সালের ১৪ই নভেম্বর কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে 'প্রলয় শিখা' নিয়ে নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা ওঠে। তার কদিন পর ২১শে নভেম্বর মামলার শুনানী হয়। এবং সরকার পক্ষের চারজন সাক্ষীর জেরার পর মামলা মূলতুবি হয়ে যায় ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত। এ সম্পর্কে টেগার্ট সাহেব ২৭শে নভেম্বর চীফ সেক্রেটারিকে জানান

মহাশয়,

সরকারের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে, ১৯৩০ সালের ২১শে নভেম্বর কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কাজি নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা শুনানীর জন্য নেন। সরকার পক্ষের আরও চারজন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। এবং আরও দু'জন সাক্ষীকেও জেরা করা হয়। তারপর ১৯৩০ সালের ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত মূলতুবি রাখা হয়।

১৯৩০ সালের ২৮শে নভেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলার অন্যান্য আসামীদের সাক্ষ্য নেন এবং ওই বছরের ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলা মূলতুবি ঘোষণা করেন। টেগার্ট সাহেব ২৯শে নভেম্বর (১৯৩০) চীফ সেক্রেটারিকে যে চিঠি দেন, তাতে ওই তথ্য আছে (চিঠি নং ৫৯৪২ ডি ডি পি)।

দেখা যাচ্ছে, ১২ই ডিসেম্বরের বদলে ১১ই ডিসেম্বর ওই মামলাটি আবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ওঠে। ওই দিনই দু'পক্ষর সওয়াল শেষ হয়। তারপর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন এবং তিনি নজরুলকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে অপরাধী সাব্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন। কবির ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। টেগার্ট সাহেব ১৯৩০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের চিঠিতে চীফ সেক্রেটারিকে ওই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করেন।

১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারির চিঠিতে পুলিস কমিশনার টেগার্ট চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের ওই রায়ের চার কপি চীফ সেক্রেটারিকে পেশ করেন।

'প্রলয় শিখা'র বিচারে নজরুলের যখন শাস্তি হয়, তখন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন টি রকস বুরগ। এই মামলায় যাঁদের সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রজবিহারী বর্মন, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক, মতিলাল দত্ত ও দেবজ্যোতি বর্মন। যে প্রেস থেকে 'প্রলয় শিখা' ছাপা হয়েছিল ব্রজবিহারী বর্মন ছিলেন তার (মহামায়া প্রেস) মালিক। কৃষ্ণেন্দুবাবু 'বৈতালিকে'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কাগজেই 'প্রলয় শিখা' কবিতাটি প্রথম বের হয়। আর মতিলাল দত্ত হলেন মহামায়া প্রেসের কমপোজিটার। তিনিই 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কম্পোজ করেন। সাক্ষী দেবজ্যোতিবাবু ব্রজবিহারী বর্মনের সঙ্গে নজরুলের বাড়ি গিয়েছিলেন। এবং ব্রজবিহারীবাবু তখন 'প্রলয় শিখা' বইটি ছাপানো সম্পর্কে কবির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

এই মামলায় নজরুলের পক্ষ সমর্থন করেন অ্যাডভোকেট কেশব গুপ্ত।

বিচারক রকস বুরগ তাঁর রায়ে বলেন যে, এই বইয়ের প্রলয় শিখা, যতীন দাস, পূজা অভিনয়, হবে জয়, জাগরণ নব-ভারতের হলদিঘাট প্রভৃতি কাব্যে বিদ্রোহাত্মক কথা তো আছেই। অন্য কবিতায়ও অনুরূপ স্তবক আছে। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলি দেশদ্রোহাত্মক নয় বলে প্রমাণের কোন চেষ্টাই হয়নি। আমার সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে, এই বইয়ের বিষয়বস্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারায় আওতায় পড়ে।

বিচারক তাঁর রায়ে আরও বলেন, আসামী পক্ষের উকিল বলেছেন যে, আসামী এই কবিতাগুলি ছাপাতে চাননি। কিন্তু আসামী যদি বাস্তবিকই ওই কবিতাগুলি ছাপাতে না চাইতেন, তাহলে তিনি সহজেই সেগুলি প্রেস থেকে ফেরত নিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। সেগুলির ছাপার জন্যই প্রেসে ছিল এবং তিনি সে জন্য অর্থও নিয়েছেন। এগুলির ছাপার দায়িত্ব তাঁরই।

সুতরাং আমি আসামী কাজী নজরুল ইসলামকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করছি এবং তাঁকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি। স্বাক্ষর টি রকস বুরগ তাঁর নিজের ভাষায়

"I, therefore, find the accused Kazi Nazrul Islam guilty under Section 124A of the Indian Penal Code, and sentence him of six months rigorous imprisonment.

Sd. T. Roxburgh,
19-12-30

এই মামলার অন্যতম সাক্ষী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিকের সঙ্গে আমি গত ১০ই ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করি। এখন চোখে তিনি ভাল দেখেন না। তবে এই মামলার কাহিনী এখনও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

তিনি জানালেন 'প্রলয় শিখা' কবিতাটি প্রথম 'বৈতালিক' পত্রিকাতেই বের হয়। তা ছাড়া ওই কাগজেই 'বৈতালিক' নামে নজরুলের আর একটি কবিতা বের হয়েছিল এবং সে জন্যও কাগজটি রাজরোষে পড়েছিল। তা ছাড়া নজরুলের কারাবাসের (১৯২৩) পর নবপর্যায়ে যে 'ধূমকেতু' বের হয়, আমিই তার সম্পাদক ছিলাম।

'প্রলয় শিখা' মামলায় সাক্ষ্যদান সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দুবাবু তাঁর সম্পাদিত 'স্বদেশ' পত্রিকায় ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখেছেন : "১০ নং বিডন স্ট্রীট থেকে নজরুলের লেখা প্রথম পাতার প্রথম কবিতা 'প্রলয় শিখা' নিয়ে সাপ্তাহিক 'বৈতালিক' আত্মপ্রকাশ করলো। লালবাজার প্রেস সেকশনের গিরিজা রায় মাঝে মাঝে মনমোহনে (থিয়েটারে) আসতেন। একদিন সেখান থেকে আমায় ডেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিয়ে একটি চায়ের দোকানে বসে গিরিজা রায় জানালেন, 'প্রলয় শিখা' কবিতার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হবেন নজরুল।

"আমি গিরিজা রায়কে সরাসরি কিছু বললাম না। ভাবতে লাগলাম—কি করা যায়। হঠাৎ কয়েকদিন পরে কয়েকটি ছেলে আমাকে শাসিয়ে গেল, আমি যেন নজরুলের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য না দিই। ব্যাপারটা ঠিক তখন বোধগম্য হল না। কে-ই বা তাদের পাঠালো বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম নজরুলকে সব কথা বলা উচিত। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ দরকার।

"পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ চলে গেলাম নজরুলের বাড়ি। নজরুলের তখন স্নান হয়ে গেছে। কোথায় যেন বেরুবেন। আমাকে দেখেই খুব খুশী। বললেন,—'চল, একসঙ্গে খাওয়া যাক। খেতে খেতে তোমার কথা শোনা যাবে।"

"হঠাৎ চলে গেছি, সংকোচ হল একটু। কিন্তু সকাল বেলা খাবার সময় না খাইয়ে নজরুল ছাড়বেন না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে খেতে বসতে হলো। সব কথা শুনে নজরুল বললেন এরজন্য চিন্তা কি আছে ? চলো, কেশববাবুর সঙ্গে একবার আলোচনা করা যাক।

"খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা দু'জনে গেলাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে অ্যাডভোকেট কেশব গুপ্তের বাড়িতে। শুনে তিনি বললেন : কবিতাটি নজরুলের হাত থেকে পেয়েছেন, তা বলবেন না। আপনি বলবেন, পোস্টে কবিতাটি এসেছে। নজরুলের নাম ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত যে কার লেখা, তা আমি জানি না।

"অল্প দিনের মধ্যে সমন এলো। ব্যাংকশাল কোর্টে হাজির হলাম। দেখি, বর্মন পাবলিশিং হাউসের একজন সরকার তরফের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত, তিনি সাক্ষ্য দিলেন তাঁর প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত নজরুলের গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি তিনি নজরুলের কাছ থেকে পেয়েছেন।

"পাবলিক প্রসিকিউটর তারক সাধু আমাকে জেরা করলেন। আমি সে কথাই বললাম :"লেখাটা ডাকে পেয়েছি, প্রকৃত কার লেখা আমি জানি না।"

"সরকার তরফের কৌসুলী আমাকে হোস্টাইল ঘোষণা করলেন। নজরুলের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হলো।"[১৫]

'প্রলয় শিখা' লেখার জন্য কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে নজরুলের হাইকোর্টে আপীল নিয়ে সঠিক তথ্য এখনও অপ্রকাশিত। সরকারী নথিপত্রে আমি মূল তথ্য কিছু কিছু উদ্ধার করেছি। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবুর্গের ওই রায়ের বিরুদ্ধে নজরুল হাইকোর্টে আপীল করলেন। তাঁর আবেদন বিবেচনার জন্য গৃহীত হল এবং কবিকে জামিনও মঞ্জুর করা হল। বিচারপতি উইলিয়াম ও বিচারপতি এস কে ঘোষের এজলাসে ওই আলীপ করা হয়। নজরুলের তরফে কৌসুলী ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী সন্তোষকুমার বসু। তাঁর সঙ্গে আরও ছিলেন মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ভোলানাথ রায়, রামদাস মুখার্জি ও পরিমল মুখার্জি। সরকার পক্ষ কোন আইনজীবী দেননি।

১৯৩১ সালের ১৩ই জানুয়ারি টেগার্ট এ সম্পর্কে চীফ সেক্রেটারিকে লেখেন

'Sir, In continuation of this office letter No. 6 DDP dated the 3rd January. 1931, I have the honour to report for the information of Government, that the accused Kazi Nazrul Islam who had been convicted under Section 124. I. P. C. is sentenced for 6, month, r.i., by the Chief Presidency Magistrate, Calcutta on the 16th December, 1930 preferred and appeal before the Hon'ble Mr. Justice Lord Williams and the Hon'ble Mr. Justice S. k. Ghose which has been admitted. The result of the appeal will be reported to Govt., in due course.

Bail was granted to the accused."

আগেও বলেছি, এই সময়ে হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি। সে চুক্তির শর্ত অনুসারে নজরুলকে মুক্তি দিতে হয়। তাই হাইকোর্টে সরকার পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি। ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চের লিবার্টিতে এই খবর বের হয়। তা হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

KAZI NAZRUL
Poet's Conviction & Sentence Set Aside

In this case the petitioner Kazi Nazrul Islam who earned the reputation of being one of the foremost poets in Bengal was convicted and sentenced to 6 months' r. i., by the Chief Presidency Magistrate of Calcutta on a charge under Section 124A I. P. C. for being the author, printer & publisher of a bookofpoemsentitled:"Pralay Sikha" alleged to be seditious.

Mr. Khundkar for the crown did not show any cause.

Accordingly the rule was made absolute and the conviction and sentence were aside and the petitioner was discharged from the bail,

Mr. Santosh Kr. Bose with Messrs, Manindra Nath Benerjee, Bholanath Roy. Ramdas Mukherjee, and Parimal Mukherjee appeared for the petitioner."

গান্ধী-আরউইন চুক্তিটি হয় ১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ। আর এই মামলাটি সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্টের রায় সম্ভবত ওই বছরের ৩০শে মার্চ দেওয়া হয়। তা না হলে ৩১শে মার্চের (১৯৩১) লিবার্টিতে এটি বের হত না। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলার খবর নিশ্চয়ই পরের দিনই সংবাদপত্রে বের হয়েছিল।

নজরুল মুক্তি পেলেও 'প্রলয় শিখা'র উপর বাজেয়াপ্ত আদেশ বহালই রইল। বাজেয়াপ্ত হবার পর সরকার 'প্রলয় শিখা'র প্রচার বন্ধ-এ তৎপর হলেন। বাজেয়াপ্ত 'প্রলয় শিখা'র খোঁজে পুলিস নানা স্থানে তল্লাসী চালায় এবং কিছু বইও আটক করে। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য চীফ সেক্রেটারিকে লেখা (১১-১০-১৯৩০)। টেগার্টের পত্রে আছে

'Sir, I have the honour to refer the political department endorsement No. 14089-92P dated the 17th September, 1930 on the subject of the forfeiture to His Majesty to all copies of the book in Bengali entitled, 'Pralay Sikha' by Nazrul and to report for...the information of Government, that on search 11 copies of the above book were found and seized."

'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত করার খবর সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ও ভারত সরকারকে জানানো হয়। এই বইটির প্রচার বন্ধে সকলে যাতে তৎপর হয়, সে জন্যই সম্ভবত এই সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য শুধু 'প্রলয় শিখা'র ব্যাপারে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত সমস্ত বইয়ের ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রচলিত ছিল।

'প্রলয় শিখা'র পর নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু'। এই বইটি কবি উৎসর্গ করেছেন দাঠাকুরকে। উৎসর্গপত্রে নজরুল লিখেছেন :' 'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ঠাকুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে'। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'চন্দ্রবিন্দু' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল—অক্টোবর ১৯৩১। 'প্রলয় শিখা' ও 'ভাঙার গানে'র সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর পার্থক্য আছে। এটি মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা। আমাদের সমাজ ও রাজনীতিগত ভুল-ত্রুটির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শ্লেষপূর্ণ হাস্যরসের নির্মম কশাঘাতে ফুটে উঠেছে এই কাব্যগ্রন্থে। দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলে নজরুলকে নানা উৎপীড়ন নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক চেতনা অন্য অনেক কবির চেয়ে বেশী। তাই দেখি হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীকে কেন্দ্র করে কবির 'প্যাক্ট গানটি কত সার্থক হয়েছে

"বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্ নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা করুণ চন্দ্রবিন্দু।"

*

"দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের, রাজা আংরেজ হারাম খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর।"

'কাফ্রি চেহারা ইংরিজি দাঁত,
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে,
ভীষণ বন্ধু চাষ করে ওরা
অস্ত্র আইন বাঁচাতে।'
'ডিম গোলাকার গোল টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিয়ে তায় ধাড়ির দল,
তা নয় দিলে, অন্ততঃ কিম ?'

দেখা যায়, এই গ্রন্থের লেখাগুলি দেশাত্মবোধক তীব্র ব্যঙ্গে ভরপুর। ইংরেজের সঙ্গে আপস করে হিন্দু-মুসলমান মিলন বা স্বাধীনতা কোনটাই সম্ভব নয়। হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের সুরে বারবার তা বলা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা নজরুলের ঘোষণা—

'বোমা মেরে মোর পায় না কো খুঁজে
আজও উদরে'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভা ষাঁড়ের
সহিত হানিবে টককর ?'

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা তামাসার ছবি লীগ অব নেশন, সর্দা বিল, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট। এ গ্রন্থ যে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী রোষে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

চন্দ্রবিন্দুতে দুঃখের গানও আছে

'আমার সুখের গৃহ শ্মশান করে
বেড়াস মা তায় আগুন জ্বালি।'

কিংবা

'আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
এবার ঐ চরণে শরণ দিও।'

এ পুত্রহারা পিতার দুঃখ।

নজরুল যখন 'চন্দ্রবিন্দু'র কবিতাগুলি লিখছিলেন, সে সময়ের কথা জসীমুদ্দিন লিখেছেন

বুলবুলের মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম না। কলিকাতায় আসিয়া শোকাতুর কবিকে ডি এম লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাইলাম। দোকানে বেচাকেনার হট্টগোলের মধ্যে এক কোণে বসিয়া তিনি হাস্যরসপ্রধান 'চন্দ্রবিন্দু' নামক বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলেন। পুত্রশোক ভুলিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, কবির সমস্ত অঙ্গে বিষাদের ছায়া। চোখ দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলিয়া গিয়াছে।[১৭]

'প্রলয় শিখা' নিষিদ্ধ হবার এক মাস পরেই 'চন্দ্রবিন্দু' নিষিদ্ধ হল। গেজেট ঘোষণার তারিখটি ১৪ অক্টোবর, ১৯৩১। গেজেট বিজ্ঞপ্তির নং—১৭৬২৫ পি। নজরুলের অন্যান্য নিষিদ্ধ বইয়ের মত এটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৯-এ ধারানুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। তবে 'প্রলয় শিখা'র মত 'চন্দ্রবিন্দু' লেখার জন্য কবিকে দণ্ডিত করতে চেয়ে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। অর্থাৎ 'প্রলয় শিখা'র ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারা অনুসারে মামলা আনা হয়েছিল, এক্ষেত্রে তা হয়নি।

'চন্দ্রবিন্দু'র উপর বাজেয়াপ্ত আদেশ ইংরেজ আমলেই উঠে যায়। বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের গেজেট ঘোষণা হয় ৩০-১১-৪৫ তারিখে। 'চন্দ্রবিন্দু'র প্রথম সংস্করণের একটি কপি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু—নজরুলের এই পাঁচটি নিষিদ্ধ গ্রন্থ ছাড়া আরও অনেক লেখা সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিল যদিচ সেগুলি শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি। যেমন, অগ্নিবীণা, ফণিমনসা, সঞ্চিতা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল প্রভৃতি।

অগ্নিবীণা অগ্নিবীণা নজরুলের প্রথম কবিতাগ্রন্থ।

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।
তাইত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন বেহাগ বাজে॥
দহন-বনের গহনচারী—
হায় ঋষি — কোন বংশী ধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নি-মরুর মাঝে।

অগ্নিবীণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিদ্রোহী'। তার কথা আগেই লিখেছি।

'অগ্নিবীণা' কি নিষিদ্ধ হয়েছিল?

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানস' গ্রন্থে লিখেছেন, হাঁ, অগ্নিবীণা বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি লিখেছেন, অগ্নিবীণা প্রথম প্রকাশ ১৯২২, সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৩।

কিন্তু সরকারী নথিপত্র ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তিগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও অগ্নিবীণা বাজেয়াপ্ত হবার পক্ষে কোন তথ্য পাইনি। দিল্লির মহাফেজখানা, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে বাংলা নিষিদ্ধ বইয়ের যে তালিকা আছে, তাতে অগ্নিবীণার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়া, ডঃ গুপ্ত লিখেছেন, অগ্নিবীণার প্রথম প্রকাশের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৩ সালে বের হয়। তাহলে কি বাজেয়াপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল? তা ছাড়া, ডি এম লাইব্রেরী ১৩৫৩ সালের কার্তিকে 'অগ্নিবীণা' একাদশ সংস্করণ বের করেছেন। নিষিদ্ধ হলে স্বাধীনতার আগে এতগুলি সংস্করণ কিছুতেই হত না।

অগ্নিবীণা নিষিদ্ধ হোক, আর নাই হোক—পুলিস যখনই এ বই পেয়েছে, তখনই আটক করেছে। একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জানিয়েছেন, বাল্যে তিনি একবার অগ্নিবীণা নিয়ে আসছিলেন। তখন পথে পুলিস তাঁকে ধরে থানায় নিয়ে যায় ও বইটি কেড়ে নেয়।[১৮]

সঞ্চিতা নজরুলের কাব্য সংকলন গ্রন্থ (সংকলন কবি নিজেই করেন) সঞ্চিতাও বাজেয়াপ্ত না হলেও সরকারের বিষনজরে পড়েছিল। তার প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগে ফাইল খোলা হয়েছিল সে ফাইলের নং ৫ এস-৩৪, প্রসিডিংস ৪৪৩-৪৪ (১২ বৎসর) নভেম্বর। তবে সেই ফাইলটি, যা থেকে অনেক তথ্য জানা যেত, এখন নাকি ঢাকায়। বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে "বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।" অগ্নিবীণা, দোলন-চাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্তনামা, সন্ধ্যা, চন্দ্রবিন্দু, চোখের চাতক, বুলবুল প্রভৃতির কবিতা ও গান এতে আছে।[১৯]

ফণিমনসা 'ফণিমনসা' স্বচ্ছন্দে রাজরোষে পড়তে পারত। যার মধ্যে নিম্নের কবিতা অংশগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

রয়েছে, তা অবশ্যই সরকারকে বিচলিত করতে সমর্থ।

'ওরে ভয় নাই আর দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাণ,
গৌরী শিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী।'

হিন্দু-মুসলিম কলহের কথাও কবি বেদনার সঙ্গে এ গ্রন্থে লিখছেন

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া।
সেই লাঠি কাল প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ-জেগেছে তো তবু-বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।

'নব-যৌবন- জলতরঙ্গ'র 'সব্যসাচী'র কবিতা গ্রন্থ ফণিমনসা যে সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কী ? এই বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশও হয়েছিল।

সরকারী নথি থেকে বইটির বিষয়ে এই সব আলোচনা পাই।

পাবলিক প্রসিকিউটর ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার 'ফণিমনসা' বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেছিলেন। তবু কপাল জোরে 'ফণিমনসা' বেঁচে যায় সরকারি কেউটের ছোবল থেকে। এ সম্পর্কে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার সি·ই এম ফেয়ারওয়েদার চীফ সেক্রেটারিকে ১৯২৭ সালের ১২ আগস্ট এই পত্র লেখেন

মহাশয়,

এই বিভাগের একজন অফিসারের রিভিউ সহ নজরুল ইসলামের বাংলা বই 'ফণিমনসা' (১৯৩, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ কলকাতার বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬৬, মানিকতলা রোডের প্রকাশ প্রেস থেকে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত) বইটি আমি পেশ করছি। কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি। তাঁর মতে, বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তাই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, সেই অনুসারে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এ ব্যাপারে কোন রকম মামলা দায়ের করা যায় কিনা, সে নিয়ে আমি পুনরায় পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে পরামর্শ করছি এবং তাঁর মতামত জানতে পারলেই আপনাকে জানাব।" (অনূদিত)

ফেয়ারওয়েদারের এই সুপারিশের পর স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ এ সম্পর্কে লিগ্যাল রিমামব্রান্সারের অভিমত নেন। এই দফতরের ফাইলে দেখা যায় যে, লিগ্যাল রিমামব্রান্সার 'ফণিমনসা'য় বাজেয়াপ্ত করার মত কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন।[২০] এরপর সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত না করার সিদ্ধান্ত নেন। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের ১৯২৭ সালের ৩০ আগস্ট তারিখের নোটে ওই সিদ্ধান্ত আছে।

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ থেকে ৩০ আগস্ট (১৯২৭) ফেয়ারওয়েদারকে জানানো হয়

"Sir, with reference to your letter No. 7/374C dated the 12th August, 1927 recommending the prosecution of the Bengali book entitled 'Fanı Mansa' by Nazrul Islam, I am directed to say that Government are advised that the book does not attract the operation of sec. 124A, IPC or sec. 99A Crpc" এবং এর জন্য সরকার **"not prepared to take steps to have it proscribed, or to institute a prosecution."**[২১]

পদস্থ পুলিস অফিসার ও গোয়েন্দারা চাইলেও শেষ পর্যন্ত ফণিমনসা বাজেয়াপ্ত হয়নি।

সর্বহারা কাজী নজরুলের আর এক কাব্যগ্রন্থ সর্বহারার ইতিহাসও একই প্রকার। তৎকালীন পুলিস-কর্তা স্যর চারলস টেগার্ট এবং পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু বইটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু তাঁদের সুপারিশমত সরকার 'সর্বহারা' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সর্বহারা'র প্রথম সংস্করণ বের হয় ১৩৩৩ সালের ১৬ ভাদ্র। এর প্রচ্ছদে দুই কৃষকের ছবি—একজন হিন্দু আর একজন মুসলিম। এটি বিরজাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গে লেখা আছে

'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)
শ্রীচরণারবিন্দে
সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার।

বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে ব্রজবিহারী বর্মন কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং মেটকাফ প্রেস (১৫, নয়নচাঁদ দত্তের স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক :শশিভূষণ পাল। বইটিতে ঠিকানা আছে ৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। সম্ভবত কবি তখন ওই ঠিকানায় থাকতেন।

ভাঙার গান, বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণার মত সর্বহারার কবিতাগুলিও সেদিন জনচিত্তে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল। তরুণদের মুখে মুখে ফিরত সর্বহারার লাইনগুলি

'মোদেরি বেতন-ভোগী চাকররে সালাম করি মোরা,
ওরে' পাবলিক সারভেন্টদেরে আয় দেখে যাবি তোরা!
কালের চাকা ঘোর্,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে-চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়—
সমবেত রাজকণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়।
(রাজা প্রজা, পৃ ৪৪)

সর্বহারার শুধু রাজা-প্রজাই নয়, এর ফরিয়াদ, কৃষাণের গান, ধীবরের গান, সর্বহারা প্রভৃতি কবিতাও সরকারের রোষের কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু লাইন তুলে দিলাম

'সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে,
এ নহে তব বিধান।'
(ফরিয়াদ, পৃ ৫১)

'কৃষাণের গান' কবিতায় কবি বলেছেন
'(ও ভাই) আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবাণী দিই জান,
(আর) সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।' (পৃঃ ৫১)

আবার 'ধীবরের গানে' আছে
ঐ আঁশ-বটিতে মাছ কাটি ভাই
কাটব অসুর এলে।
এবারে উঠবে রে সব ঠেলে॥"

এই বইয়ে নামকরণ যে সর্বহারা কবিতায় তাতে কবি ডাক দিয়েছেন

মাঝিরে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয় পথিক চলবি ফিরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দল্‌বি পাহাড় কানন গিরি।
হাঁকছে বাদল, ঘিরি ঘিরি
নাচছে সিন্ধুজল ॥
চলরে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল ॥

গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সর্বহারার প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই আছে বিপ্লবের সুর—

'Almost all the poems breathe a spirit of revolt.'

'সর্বহারা' গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করে কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু ১৯২৬ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতা পুলিসের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারিকে পত্র লেখেন। তাতে তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ১৫৩-এ ধারা অনুসারে 'সর্বহারা'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেন। কৃষাণের গান, ধীবরের গান, রাজা প্রজা, ফরিয়াদি ও সর্বহারা কবিতাগুলিতে আপত্তিকর ও রাজদ্রোহকর পঙক্তি আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন

I have gone through the book in Bengali 'সর্বহারা' by Nazrul Islam and published by Sri Braja Behari Burman Roy of Burman Publishing House of 193, Cornwallis Street, Calcutta and I am of opinion that the book does come within the purview of sec. 124A as well as of sec. 153A of the Indian Penal code.

I would draw special attention of the poems কৃষাণের গান at the pages 10 & 11, ধীবরের গান at the pages 16 to 19 and রাজা প্রজা and ফরিয়াদি at the pages 50 to 58,

পুলিস কমিশনার টেগার্টও 'সর্বহারা' বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য এবং কিছুদিন পর চীফ সেক্রেটারিকে চিঠি দেন। ১৯২৭ সালের ১৪ জানুয়ারি চিঠিতে টেগার্ট সাহেব সুপারিশ করেন

'Sir, I have the honour to forward herewith a book entitled 'Sarbahara' by Kazi Nazrul Islam, printed by Sasi Bhusan Pal at the Metcalfe Press, Calcutta and published by Sri Braja Behari Burman Roy of Burman publishing House, Calcutta together with a copy of the review of the same by an officer of this department. The Public Prosecutor, Calcutta, whom I have consulted, is of opinion that the book comes within the purview of 124A & 153A IPC. A copy of his opinion enclosed.

I am informed that 1200 copies of the book were printed and made over to the publisher on 25th October last. It is said that between 300 to 400 copies have been sold up to date.

I therefore, request action for the prosecution of the author, printer & publisher under sec. 124A & 153A I.P.C.'

পাবলিক প্রসিকিউটর ও পুলিস কমিশনারের সুপারিশ সত্ত্বেও 'সর্বহারা' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়নি। এবং এর প্রকাশক ও মুদ্রকের বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়নি। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের ফাইলে দেখা যাচ্ছে, পদস্থ আমলারা বইটি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে মত দেননি। সংশ্লিষ্ট ফাইলে বলা হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে আমি লিগ্যাল রিমামব্রান্সার ও কলকাতার পুলিস কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমি মনে করি বিষয়টি বাতিল করা যেতে পারে। ওই নোটটি ৬-২-২৭ তারিখের। হাতের লেখা ওই নোটের স্বাক্ষর বোঝা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত চীফ সেক্রেটারির 'ইনিসিয়াল'।[২২]

দেখা যাচ্ছে, পুলিস-কর্তা, গোয়েন্দা ও আইন বিশারদদের পরামর্শ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত 'সর্বহারা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাজেয়াপ্ত হবার হাত থেকে বেঁচে যায়।

রুদ্রমঙ্গল নজরুলের ছোট নিবন্ধের বই 'রুদ্রমঙ্গল'ও নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছিলেন পুলিস কর্তারা, গোয়েন্দা ও সরকারি আইন বিশারদগণ। এটি বাজেয়াপ্ত হয়নি যদিচ বইটির প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিয়েই সরকার ক্ষান্ত হন।

রুদ্রমঙ্গলে মোট আটটি নিবন্ধ আছে : আমার-পথ, মোহররম্, বিষ-বাণী, ক্ষুদিরামের মা, ধূমকেতুর পথ, মন্দির ও মসজিদ, হিন্দু-মুসলমান। বইটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি (রাজ্য মহাফেজখানায় এই বইটির প্রথম সংস্করণ আমি দেখেছি। তাতে বই প্রকাশের তারিখ বা উৎসর্গ নেই। তবে কোন পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেলে অন্য কথা।) গ্রন্থকার নিজেই এর প্রকাশক। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানা লেখা আছে। ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কসের (২, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা) শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য এর মুদ্রক।

রুদ্রমঙ্গলের ভূমিকায় আছে "নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মাঝে মাকে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে আর চাবকাচ্ছে যে দানব সে দানবও নয়, দেবতাও নয়। রক্ত মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায় ক্রন্দন, বোধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙেছে—' শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হুতাশ—শক্তি নাই, সাহস নাই।"

১৯২৭ সালের ১৭ আগস্টের চিঠিতে কলকাতার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ফেয়ারওয়েদার 'রুদ্রমঙ্গল' বইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য চীফ সেক্রেটারিকে পরামর্শ দেন।

(In the circumstances I request that government may be pleased to proscribe the book as early as possible)

এর আগে ৫ আগস্ট তারিখে পাবলিক প্রসিকিউটর টি এন সাধু 'রুদ্রমঙ্গল' বাজেয়াপ্ত করার জন্য মত দেন। তিনি লেখেন

I do not advise the prosecution of the author of this book under Sec. 124A IPC, but I do advise the forfeiture of the book under Sec. 99A (1) of the criminal procedure code.'

সৌভাগ্যের কথা, সরকারী উকিল কবিকে এবার আর অভিযুক্ত করার পরামর্শ দেননি। বইটি জনমানসে কী প্রভাব বিস্তার করেছে, স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ তা জানতে চান। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার এম এইচ এইচ মিলসের ১৯২৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের চিঠি দেখা যাচ্ছে, রুদ্রমঙ্গলের প্রথম সংস্করণে মাত্র ১০০ বই ছাপা হয়েছে। আন্ডার সেক্রেটারিকে তিনি আরও লিখেছেন 'আমি জেনেছি, লেখক কাজী নজরুল ইসলাম আরও ২০০ কপি বই ছাপতে চান। সরকার এই বইটি সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেন, তা দেখার জন্যই সম্ভবত তিনি খুব কম বই ছেপেছেন।"

এর পর স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে 'রুদ্রমঙ্গলের' আর কোন কপি না ছাপানোর জন্য নজরুলকে সতর্ক করে দিতে ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশ দেয়।

সরকারি নথিপত্রে দেখা যায়, নদীয়ার এস পি'র মাধ্যমে নজরুলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কাজী তখন কৃষ্ণনগরে বাস করছিলেন। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ১৮-৯-২৭ তারিখের নোটে আছে লেখক যদি সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করেন তখন বইটি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

"I think we should ask D.C.S.B. to warn the author not to publish any more copies, if he ignores to warning, we can then proscribe."

Sd. illegible
18-9-27

অর্থাৎ 'রুদ্রমঙ্গল' বইটি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ না দিয়েই সংশ্লিষ্ট ফাইলটি বন্ধ হয়ে যায়। ফাইলে শেষ মন্তব্য কোন ব্যবস্থা নয়। 'তাং ২৯-৯-২৭।'[২৪]

সুতরাং, রুদ্রমঙ্গলও সরকারি বিষ নজরে পড়লেও বাজেয়াপ্ত হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নজরুলের বাজেয়াপ্ত বইগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য অনেকে সরকারের কাছে অনুরোধ ও আবেদন জানান। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর এই দাবি জোরদার হয়। সভা-সমিতি, সম্মেলনে ছাড়া আইনসভাও এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। বেঙ্গল কাউন্সিলে এই দাবি তুলেছিলেন হুমায়ূন কবির ও আরও অনেকে। এ নিয়ে আইনসভায় তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা চলে। সেই সুবাদে এ ব্যাপারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, স্বরাষ্ট্র বিভাগের আমলা প্রেনটিস প্রমুখের মতামতও জানা যায়। আইনসভার কার্যবিবরণী ও স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের বিভিন্ন ফাইলে ওই সব মতামত এখনও আছে।

নজরুলের বইগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের যে চেষ্টা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে তার কোন ফল পাওয়া যায়নি। 'যুগবাণী', 'বিষের বাঁশি', 'চন্দ্রবিন্দু' স্বাধীনতার আগেই রাহুমুক্ত হলেও অন্যগুলি থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি। ওই তিনটি বই থেকেও বাজেয়াপ্ত আদেশ ১৯৪৫ সালের আগে প্রত্যাহার করা হয়নি।

বাংলা আইনসভার কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩০ সালের ১১ আগস্ট তারিখে 'বিষের বাঁশি' থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানান মৌলভি মহম্মদ ফজলুল্লাহ।

বিষের বাঁশি সম্পর্কে আইনসভায় সেদিনকার প্রশ্নোত্তর এখানে তুলে দিলাম প্রশ্ন মৌলভী মহম্মদ ফজলুল্লাহ

(ক) নজরুলের 'বিষের বাঁশি নিষিদ্ধ হয়েছিল কিনা, রাজনৈতিক বিভাগের মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

(খ) ইহা কি সত্য, ওই বইয়ে 'ফতেহা দোয়াজদাহাম' বলে একটি কবিতা আছে যে কবিতায় পবিত্র ধর্মগুরু মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যুর বিষয় রয়েছে এবং যা পুরোপুরি ধর্মীয় ব্যাপার?

(গ) মাননীয় সদস্য কি অবগত আছেন যে, মুসলিমরা এই মুদ্রিত কবিতাটি পুনপ্রকাশে আগ্রহী?

(ঘ) যদি (খ) ও (গ) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয় তাহলে কি মাননীয় সদস্য জানাইবেন যে, সরকার সংশ্লিষ্ট এই বিশেষ কবিতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পক্ষে বিবেচনা করছেন কিনা?

উত্তর মাননীয় মিঃ ডবলু ডি আর প্রেনটিস

(ক) হাঁ।

(খ) ওই বইয়ে 'ফতেহা দোয়াজদাহাম' বলে একটি কবিতা আছে। তবে সরকারকে জানানো হয়েছে যে, কবিতাটি পুরোপুরি ধর্মীয় নয়।

(গ) এ ব্যাপারে কোন সংবাদ নেই।

(ঘ) ওই কবিতাটি পৃথকভাবে ছাপাতে দেবার প্রশ্নটি সরকার বিবেচনা করবেন—যদি ওই জন্য আবেদন করা হয়। (অনূদিত)

এর কয়েক বছর পর নজরুলের বইগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের জোর দাবি তোলেন হুমায়ুন কবির। আইনসভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, ১৯৩৯ সালে হুমায়ুন এ নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। এবং নজরুলের নিষিদ্ধ বইগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান।[২৩]

স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিভাগের ফাইলে দেখা যায়, আইনসভার অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য হুমায়ুন কবির কয়েকটি প্রশ্নের নোটিশ দেন। সে নোটিশের তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯। ওই বছরই ১০ মার্চ প্রশ্নগুলি নিয়ে আইনসভায় আলোচনা হয়।

হুমায়ুন কবিরের প্রশ্ন (ক) কাজী নজরুল ইসলামের বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু ও যুববাণী বইগুলি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে কিনা স্বরাষ্ট্র দফতরের মাননীয় মন্ত্রী অনুগ্রহ করে কি জানাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তর হাঁ, বইগুলি দেশদ্রোহাত্মক বলে সরকার বিবেচনা করেন।

প্রশ্ন এই বইগুলি কখন বাজেয়াপ্ত হয় ?

উত্তর এ সম্পর্কে সভায় বিবৃতি দেওয়া হবে।

প্রশ্ন দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সরকার কি ওই বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের কথা ভাবছেন ?

উত্তর না। কারণ, শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেশে গণ-বিদ্রোহ ও সামাজিক বিপ্লব সংগঠনের ইচ্ছা এবং সাংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথ পরিহারের কথা ঘোষণা করেছেন।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব বেঙ্গল কাউন্সিলে ১৯৩৯ সালের ১০ মার্চ হুমায়ুন কবিরকে জবাব দেন যে, নজরুলের বইগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হবে না। নজরুলের নিষিদ্ধ বইগুলি সম্পর্কে ওই প্রশ্নের নোটিশ দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবির নিজেই ১৯৩৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রশ্নোত্তরের দিন (১০-৩-৩৯) তাঁর হয়ে প্রশ্নগুলি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত। সম্ভবত কবিরসাহেব তখন সভায় গরহাজির ছিলেন।

আইনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবের আগে এ বিষয়টি নিয়ে সরকারি মহলে পদস্থ আমলা, গোয়েন্দা, পুলিস প্রভৃতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে সব নোট চালাচালি হয়েছিল, তা স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের বিভিন্ন ফাইলে ছড়িয়ে আছে। এর পরও বিষয়টির ইতি ঘটেনি। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত নজরুলের বইপত্র নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্তাদের মধ্যে যে নোট চালাচালি হয়েছিল, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করলাম।

১৯৩৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আর এইচ হাচিংস (স্বরাষ্ট্র-রাজনৈতিক বিভাগ) তাঁর নোটে বলেন

"The books were all objectionable and seditious. The ban should not perhaps be removed."

এর কয়েক মাস পর স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ থেকে এ সম্পর্কে পুলিস কমিশনারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখা হয়। সেটি হুবহু তুলে দিলাম

To
The Commissioner of Police, Calcutta.
Issue No. 52 P. The 27th Aug. 1940

Sir,

I am directed to say that in connection with a council question asked by Mr. Humayun Kabir at the current session of Bengal Legislative Council for the withdrawn of ban imposed by government on certain books of Kazi Nazrul Islam, the Hon'ble minister gave an undertaking to re-examine the books in question.

I am, therefore to request you to furnish this department with the merginally noted books[(a)Bisher Banshi, (b) Pralay Sikha, c) Chandra Bindu, (d) Bhangar Gan] of Kazi Nazrul Islam which were proscribed by government. They will be returned to you as soon as done with.

I have etc,
Sd. (illegible)
20.8.40

নজরুলের বাজেয়াপ্ত বইগুলি সম্পর্কে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের একটি নোট বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি এই নোটটি দেন "Muslims complain and very naturally that worse books by Hindu authors have in many cases been released from proscription and they resent these orders in the case of Muslim authors."

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই বছরেরই ১৭ আগস্টের নোটে বলা হয়েছে, এই বইগুলি এখনও আপত্তিকর বলে বিবেচনা করা হয় এবং বর্তমানের এই জরুরী অবস্থায় ওই সব বই থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হবে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

১৯৪১ সালের ২৫ মার্চ তারিখের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দফতরের নোটে চূড়ান্তভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, এখন নজরুলের বইগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার সমীচীন নয়। মূল নোটটি হল

'We have failed to get copies of Bhangar Gan, Pralay Sikha & Chandra Bindu. The question of raising the ban on them is therefore, I submit academical and need not be further considered.

Jugabani was procribed in 1922 and both the L. R. and the advocate general considered it 'seditious' Bisher Ba: nshi was proscribed in 1924 and also considered to be seditious.

I suggest that it would be inexpedient to remove the ban during the war and that there is in any case good ground for retaining it.

Sd. illegible
25.2.41

দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের সময় নজরুলের নিষিদ্ধ বইগুলির উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের তীব্র আপত্তি জানানো হয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগের নোটগুলি থেকে জানা যায়, পদস্থ আমলাদের ওই অভিমত তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবও মেনে নেন। (Honourable Chief Minister has seen. No further action is called for the file which may now be closed after the book 'Bisher Banshi' is returned to C.P. Cal, as reproted in his letter dt. the 5.9.40)

এরপর এ নিয়ে আর কথাবার্তা হয়নি। এ বিষয়টির এখানেই ইতি ঘটে। তবে সেদিন এই প্রশ্নটি নিয়ে সরকারি মহলে যে তীব্র আলোড়ন উঠেছিল তার সাক্ষ্য আজও বহন করছে স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের বিভিন্ন ফাইল ও আইনসভার কার্যবিবরণী।

এই সব আবেদন-নিবেদন ও দাবিদাওয়ার দরুনই হোক বা আমলাদের সুবুদ্ধির উদয় হওয়ার জন্যই হোক, ইংরেজ আমলেই নজরুলের দুটি কাব্যগ্রন্থের উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। 'বিষের বাঁশির' কথা তো আগেই বলেছি। নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু'র উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে নেওয়া হয়—১৯৪৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের গেজেট ঘোষণায় অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত হবার প্রায় ১৫ বছর পর (Ban withdrawn vide notification No. 802. pr. dt. 30.11.45)।বইটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ১৯৩১ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে।

'বিষের বাঁশি' থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার হয় প্রায় ২২ বছর পর। বইটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর। আর এর রাহুমুক্তি ঘটে ১৯৪৫ সালের ২৭ এপ্রিল।[১৭]

নজরুলের নিবন্ধের বই 'যুগবাণী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা পরাধীন আমলেই তুলে নেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক মাস আগে বইটির রাহুমুক্তি ঘটে ১৯৪৭ সালের ৩ মার্চ।

'প্রলয় শিখা'র উপর বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার হয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর—১৯৪৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।[১৮]

তবে প্রলয় শিখার দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৩৫৬ সালের ৩০ শ্রাবণ।

নজরুলের তিনটি বইয়ের রাহুমুক্তি স্বাধীনতার আগেই এবং কবির সব ক'টি বই থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রত্যাহৃত হলেও কবি তা জানতে পারলেন না। তখন কবির কণ্ঠ রুদ্ধ। যে কবির কণ্ঠকে রোধ করার জন্য রাজশক্তি আইনের নানা বেড়াজাল বেঁধেছিল এবং কবিকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেও ইতস্তত করেনি। প্রকৃতির অমোঘ বিধানে কবির সেই কণ্ঠ হঠাৎ হল বাণীহারা সুরহীন। কবির বোধশক্তিও প্রায় লোপ পেল। ১৯৪১ সালের পর থেকে কবি ক্রমশ গুরুতর অসুস্থ হতে থাকেন। তাঁর সম্বিৎ আর ফেরেনি। তাঁর প্রিয় কাব্যগ্রন্থগুলি ও নিবন্ধের বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আদেশ উঠে যাওয়ায় তাঁর কোন প্রতিক্রিয়াই জানা যায়নি। অসুস্থ হবার পর কবি আমৃত্যু ভাবলেশহীন চোখে শুধু চেয়েই থাকতেন, মৃত্যুর আগেই তিনি সবকিছু ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন।

নজরুলই বাংলার প্রথম দণ্ডিত লেখক নন। তাঁর আগে বহু কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিকের উপর সরকারি রোষ পড়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য, মুকুন্দদাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর। কিন্তু নজরুলকে নিয়ে যেমন দেশ জুড়ে আন্দোলন, বিক্ষোভ হয়েছে, তেমন অন্য কারো ক্ষেত্রে হয়নি ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আগমনী' কবিতার জন্য নজরুলকে কারাদণ্ড দেওয়া হলে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এমন ব্যাপক প্রতিবাদের নানা কারণ আছে। যেসব বাঙালী কবির বই ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে নজরুল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কবি। আর জনপ্রিয়তায় তিনি তো সমসাময়িক সকলের উপরে ছিলেন। সে যুগে তরুণদের মুখে মুখে ফিরত তাঁর অগ্নিবীণার,ভাঙার গানের কবিতাগুলি। তদুপরি জেলের অবিচারের প্রতিবাদে কবি যখন দীর্ঘদিন অনশনে ছিলেন, তখন স্বতঃই সারাদেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখও তাঁর জীবনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। গোলদীঘিতে সভাও হয়। রবীন্দ্রনাথও তার পাঠান 'গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস ইউ।

নজরুলের কারাদণ্ড[১১] হয়েছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ী' নামে একটি কবিতা লেখার জন্য। এর আগে রাজরোষে কবির বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, কিন্তু কারাদণ্ড এই প্রথম। (তাঁর নিবন্ধের বই 'যুগবাণী' আগেই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এর পরেও কবি কারাদণ্ডের আদেশ পেয়েছিলেন—প্রলয় শিখা রচনার জন্য। তবে সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়নি এ কথা আগে আলোচনা করেছি)।

'ধূমকেতু' ১৯২২, ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি বের হয়। এই কবিতার জন্য কবির ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কলকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে কবির বিচার হয়। (বিচারক সুইনহোও কবি ছিলেন। তাঁর নামে কলকাতায় একটি রাস্তাও আছে) ১৯২৩, ১৬ জানুয়ারি সুইনহো মামলার রায় দেন। বিশিষ্ট আইনজীবী মলিন মুখোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে নজরুলের পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারক সুইনহো রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। যে কবিতার জন্য কবির কারাদণ্ড হল, সেটি এই :—

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল!
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?
মাদীগুলোর আদি দোষ ওই অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।
হান তরবার, আন মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দে মা।

নজরুল আদালতে যে সাক্ষ্য দেন, সেটিও এক অনন্য সৃষ্টি। ১৩২৯, ১৩ মাঘ (১৯২৩) সংখ্যায় 'ধূমকতে'তে সেটি ছাপা হয়

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি রাজকারাগারে বন্দী ও রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একাধারে রাজার মুকুট, আর ধারে ধূমকেতুর শিখা, একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর একজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।..."

ধূমকেতুর আরও অনেক লেখা নিয়েই নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারত, কী ধরনের লেখা সেখানে ছাপা হত তার নমুনা পাওয়া যায়। যথা, ১৯২২, ১৩ অক্টোবর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে কবির নিবন্ধের অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না। কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব,সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা,শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়র হাতে।'

দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে যাঁরা বিশ্বাস করতেন, ধূমকেতু নতুন করে তাঁদের অনুপ্রাণিত করল। বিপ্লবীরা স্বাগত জানাল 'ধূমকেতু'কে। 'ধূমকেতু'র অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় ও নিবন্ধগুলি থেকে বাংলার যুব সমাজ প্রেরণা পেল। এ সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদের মন্তব্য

'১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল, এ কথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দুটি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলেছিলেন যে 'ধূমকেতু' তাদেরই কাগজ'।[৩০]

বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি এল করলে ১৯২২ সালে বাংলাদেশে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারিকে একটি রিপোর্ট দেন, তাতে তিনি ধূমকেতুকে চরমপন্থী সংবাদপত্র বলে চিহ্নিত করেছেন

The whirl wind energy of the style and inflamatory character of the language had a great unsettling effect on premature and ill-balanced mind, with whom the paper was immediately popular. As a mattar of fact the paper was prosecuted more than once—'[৩১]

নজরুলের জেল হবার দু' সপ্তাহ পরে কাগজ বন্ধ থাকে। তারপর অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু পাক্ষিক হয়ে দু'সপ্তাহ বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। অনেক পরে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিকের সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'ধূমকেতু' বের হয়।

এই প্রসঙ্গে ধূমকেতু পত্রিকার সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে কিছু সংবাদ দেওয়া যাক। দেখা যাবে পত্রিকাটি বহুলাংশে বিদ্রোহাত্মক লেখায় পূর্ণ থাকত।

১৯২২ সালের ১১ আগস্ট ধূমকেতুর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় নজরুলের দুটি লেখা বের হয়। একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও অন্যটি ধূমকেতু কবিতা। সম্পাদকীয়তে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়, 'ধূমকেতু' অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত আশীর্বাণী

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েসু,

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ ১৩২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির নিজের হাতে লেখা এই আশীর্বাণী ধূমকেতুর প্রথম পাতায় ব্লক করে ছেপে দেওয়া হয়।

নজরুলের 'ধূমকেতু' সম্পর্কে অনেক বইয়ে কিছু কিছু তথ্য ভুল আছে। সবগুলি উল্লেখ না করলেও দু'জনের লেখার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁরা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাছাড়া 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে' অচিন্তকুমারও লিখেছেন 'আনন্দময়ী আগমনে' ২২ সেপ্টেম্বরে (১৯২২) ধূমকেতু বের হয়। কিন্তু আসলে তারিখ হচ্ছে ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯২২)। এমনকি সংবাদপত্রেও ভুল প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

নজরুলের জেল সম্পর্কে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'১৯২৩ সালের জানুয়ারি চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো নজরুলকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।'

(নজরুল স্মৃতি পৃঃ ১১)

ওই ঐতিহাসিক রায়ের তারিখটি হবে ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি (দ্রঃ আনন্দবাজার। ১৭ জানুয়ারি, ১৯২৩)।সংবাদপত্রের এই প্রতিবেদনে 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ'ও নজরুলের লেখা বলে ছাপা হয়েছে। এটি ভুল। এই নিবন্ধের লেখিকা হলেন অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্রের বোন—নজরুল নন।

এ ছাড়া মুজফ্ফর আহমদ তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশ ১৯২১ সালের ১১ ডিসেম্বর। আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ধূমকেতু'র দাম ছিল এক পয়সা ও কাগজটি ফুলস্কেপ চার পাতায় (দ্রঃ নজরুল স্মৃতি ৩-৭)।এর কোন তথ্যই ঠিক নয়। কাগজটির দাম ছিল এক আনা, কাগজটি ছিল অর্ধ-সাপ্তাহিক এবং ৮ পৃষ্ঠার। নজরুল সংক্রান্ত বইগুলিতে অসংখ্য ভুল তথ্য চোখে পড়ে। আমার মনে হয় সরকারি তথ্যই প্রামাণ্য। ওই সময় বাংলাদেশে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও পত্রিকা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন বের হয়, তাকেই ধূমকেতুর ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার প্রামাণ্য তথ্য বলে ধরা যেতে পারে।[২২]

এখানে উল্লেখ্য, ধূমকেতুর দ্বিতীয় সম্পাদক অমরেশ কাঞ্জিলালেরও কারাদণ্ড হয়েছিল।

'ধূমকেতু', 'নবযুগ' ছাড়া নজরুল আরও অনেক পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও লিখতেন, যেমন সেবক, লাঙ্গল, বৈতালিক, মোসলেম ভারত, বিজলী প্রভৃতি।

নবযুগের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন ফজলুল হক এবং প্রকাশক হচ্ছেন মুজফ্ফর আহমদ। ডিক্লারেশন নং ১১৩। ১৯২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। লাঙ্গলের স্বত্বাধিকারী ছিলেন নজরুল এবং সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল মণিভূষণ মুখার্জীর (ডিক্লারেশন নং ১৯২০ তারিখ ৪/১১/১৯২৫), মোসলেম ভারতের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন আবদুল কালাম মহম্মদ সামসুদ্দিন (ডিক্লারেশন নং ৩৪ তারিখ ৪/২/১৯২৪)। বৈতালিকের সম্পাদক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক (ডিক্লারেশন নং ১৭৫, তারিখ ৩/৩/১৯২৯), বিজলীর সম্পাদক ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (ডিক্লারেশন তারিখ ২৯/৭/১৯২৪)।

নজরুল ওইসব কাগজে নিয়মিত লিখেছেন। ওই কাগজগুলি বারবার সরকারি কোপে পড়েছে। কখনও কোন সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, কখনও বা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। বৈতালিকের সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুবাবু এক সাক্ষাৎকারে জানান, বৈতালিকের প্রথম সংখ্যায় নজরুল[২৩] 'বৈতালিক' নামে একটি কবিতা লেখেন। সেজন্য ওই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি একসঙ্গে মোসলেম জগৎ ও বিজলীতে বের (১৯২১) হয়েছিল। সরকার ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে বিজলীকে সতর্ক করে দেন বলে তখনকার চীফ সেক্রেটারির রিপোর্ট আছে। আর আপত্তিকর লেখার জন্য মোসলেম ভারতের সম্পাদক মহম্মদ মঈনুদ্দিনের ১৪/৫/১৯৮২ তারিখে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল'ও রাজরোষে পড়েছিল। কবির বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি লাঙ্গলের পাতাতেই প্রথম বের হয়।

এ ছাড়া দেশবন্ধুর 'বাংলার কথা', 'সওগত', 'নওরোজ', 'কল্লোল', 'গণবাণী' (পরে লাঙ্গলই এই নামে হয়)—সমসাময়িক সব কাগজের সঙ্গেই নজরুলের যোগ ছিল। এগুলিও রাজরোষে পড়ে।

কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক নজরুলই শুধু সরকারের রোষে পড়েননি, তাঁর গল্পও সরকারের কোপে পড়ে। তবে নজরুলের কোন গল্প বাজেয়াপ্ত হয়নি।

বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত নজরুলের 'কুহেলিকা' গল্পটি ১৩৩৪ সালের শ্রাবণে 'নওয়াজ' পত্রিকায় বের হয়। প্রমথ ও জাহাঙ্গীর এই গল্পের দুটি চরিত্র। এতে মুসলিম তরুণদের বিপ্লব আন্দোলনে আনার কথা আছে। এ সম্পর্কে সরকারি প্রতিবেদন

'Pramatha's initiation of Jahangir in the mantra of mother, Pramatha says, 'Mark you, I revere our leader Bajrapani Mahasaya, more than even God himself, but still I am much pained to accept that Moslem boys

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

of Bengal are unable to accept revolutionary ideals. Patriotism has not been roused in them because there is no leader among them"[৩৮]

গল্পটি সরকারি মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

॥ নির্দেশিকা ॥

১। নজরুল স্মৃতি, সাহিত্যম্, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২।

২। পরিমল গোস্বামী, 'আমি যাঁদের দেখেছি', পৃঃ ২৮১।

৩। নজরুল স্মৃতি, পৃঃ ৭৩।

৪। ঐ পৃঃ ৬।

৫। পরিমল গোস্বামী, 'আমি যাঁদের দেখেছি', পৃঃ ২৮৪।

৬। ঐ পৃঃ ১১৯।

৭। Fl. No. 58, 31/40, Home (Pol.) confidential, Bengal Govt.

৮। অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়', পৃঃ ১৭৫।

৯। Ban withdrawn, vide Notification No. 279 P. dated 27.4.45.

১০। চীফ সেক্রেটারিকে টেগার্টের ওই পত্রে লেখা হয়

"Sir, with reference to your endorsement No. 10724-27 P. dated the 22nd instant I have the honour to report for the information of Government that by virtue of search warrant issued by the Chief Presidency Magistrate, Calcutta, the marginally noted places were searched by the Calcutta Police on the 23rd instant resulting in the seizure of 44 copies in all of the proscribed book entitled 'Bisher Banshi.'

The house of author of Hooghly was also searched, but no copy of book was found."

1. Arya Publishing House
2. Indian Book Club
3. Kallol Publishing
4. D. M. Library
5. Barendra Library
6. Barendra Agency
7. Bani Press
8. Saraswati Library.

১১। মুজফ্‌ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', পৃঃ ৩২৫।

১২। জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃঃ ১৭৮।

১৩। সাক্ষাৎকার কালীচরণ ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক।

১৪। Withdrawn Notification No. 279, dated 27.4.45.

১৫। Fl. No. 55—3, (1930) proceedings No. B 126—127 Home (Pol.) Bengal Government.

১৬। Ibid.

১৭। নজরুল স্মৃতি, পৃঃ ৮৫।

১৮। সাক্ষাৎকার বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯। Fl. No. 55—34, Proceedings 44—43. Home (Pol.) Beng. Govt.

২০। Fl. No. 424/1—2/ 1927, Home (Pol.) Bengal Government.

২১। Ibid.

২২। Fl. No. 13 SP 1—3, 1922, Home (Pol) Cong. Bengal Government.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৩। Ibid.
২৪। Ibid
২৫। Bengal Legislative Council Proceedings, 1933. Vol. XXV, P. 53.
২৬। Fl. No. 12C—20/30, 13 December, 1939, Home (Pol.) Beng. Govt.
২৭। Ban Withdrawn Notification No. 396 dt. 31.3.47.
২৮। Ban Withdrawn Notification No. 85 Pr. dt. 9.2.48.
২৯। নজরুল স্মৃতি, পৃঃ ১৫।
৩০। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৯১।
৩১। Annual Report on Newspapers & Periodicals Published in Bengal during 1923.
৩২। Fl. No. 138, Sl. No.1—5, Home (Pol.) Bengal Government (Report by H. Greenfield, Spl. Asst., Intelligence Branch)
৩৩। সাক্ষাৎকার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক (১০-২-৭৯)।
৩৪। Report on Newspaper and Periodicals in Bengal. No. 36 of 1927. P 524.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ষোড়শ অধ্যায়: ইস্তাহার, পুস্তিকা প্রভৃতি

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইস্তাহার, প্রচারপত্র., পোস্টারের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। বিশেষ করে কণ্ঠরোধের কালে আন্দোলন সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ রাখতে এগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনেক বড় বড় বিপ্লবীরও হাতেখড়ি হয়েছে এই সব ইস্তাহার বণ্টন ও প্রচারে। এই সব ইস্তাহারই সে যুগে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো দেশবাসীকে সচকিত করে দিত। তাই রাজশক্তি অত্যন্ত তৎপর ছিলেন এ সবের প্রচার রুখতে। একের পর এক ইস্তাহার,প্রচারপত্র. বার বার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এসব বণ্টনের জন্য সাজাও হয়েছে অনেকের।

১৯১০ সালে অনেকগুলি ইস্তাহার, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, পোস্টার প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯১০ সালের ১লা মার্চের গেজেট ঘোষণায় 'ওম বন্দেমাতরম্' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ওই বছরের ১২ই মার্চ 'বিদায় দাও মা' কবিতা লেখা ধুতি, ২৪শে মার্চ 'স্বাধীন ভারত' নামে ইস্তাহার, ২৪শে মার্চ 'হত্যা নয় যজ্ঞ' ইস্তাহার, ২রা জুন, 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' ইস্তাহার, ২২শে অক্টোবর 'ওম বন্দোমাতরম্ মহাশক্তি' ইস্তাহার ও প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। 'স্বাধীন ভারত' (দুই সংখ্যা) নামে একটি প্রচারপত্রও ওই বছর বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯১১ সালেও অনেকগুলি ইস্তাহার, প্রচারপত্র, পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। স্বাধীন ভারত ১৯১১ সালের ৭ই মার্চ বাজেয়াপ্ত হয়। 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' আবার ঘুমাইলে?' 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত', 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' (মহাকালের আহ্বান), 'বন্দেমাতরম্ মা ভাই! মা ভাই! মা ভাই! স্বদেশীয় ছাত্রীবৃন্দ ইস্তাহারগুলি ওই তারিখেই বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ২২শে এপ্রিল, ১৯১১ তারিখে বাজেয়াপ্ত হয় 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত'। ওই বছরই বাজেয়াপ্ত হয় 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' নামে আরও একটি ইস্তাহার।

১৯১২ সালেও অনেকগুলি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ১৬ই জানুয়ারি 'বন্দেমাতরম্' (৩১০পি। অরিজিন্যাল), ১৬ই ডিসেম্বর বন্দেমাতরম্ যুগান্তর ও স্বাক্ষরিত বন্দেমাতরম্ (৬৩৮ পি। অরিজিন্যাল) বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯১৩ সালের ২০শে জানুয়ারি 'ওম স্বাধীন ভারত' (৬৬০৫ পি। অরিজিন্যাল), ২১শে ফেব্রুয়ারি 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' (১৬২৬ পি। অরিজিন্যাল), ১১ই মার্চ যুগান্তর সার্কুলার, 'দিল্লি হোম' এবং 'বন্দেমাতরম্' (২২৬৮ পি। অরিজিন্যাল), ২০শে মার্চ 'বন্দেমাতরম্ হরিত্তম', 'শান্তি শান্তি শান্তি' লেখা বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯১৩ সালে এইসব ইস্তাহারও বাজেয়াপ্ত হয়। ওম্ বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত, বিজয়া সম্ভাষণ, এবং স্বাক্ষরিত ত্রিগুণানন্দ (৩০শে মে। অরিজিন্যাল, ১৩৬২পি প্রবলেমস. অব্ লিবার্টি বাংলা কি ইংরাজি জানা যায়নি ৩০শে জুন। অরিজিন্যাল, ৪০৪৪ পি।—, 'ওম বন্দেমাতরম্' দিয়ে শুরু একটি অজ্ঞাতনামা ইস্তাহার (২১শে জুলাই, অরিজিন্যাল, ২৩১৮ পি)। এই অজ্ঞাতনামা ইস্তাহারের শেষে লেখা decendent of Bharat, I incarnate myself whenever religion is neglected and sin reign supreme.' এ বছর ৩০শে সেপ্টেম্বর 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' নামক একটি ইস্তাহার, ১৭ই ডিসেম্বর নামে আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯১৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর 'ওম বন্দেমাতরম্'। যুগান্তর! যুগান্তর!! যুগান্তর!!! তারা সবাই মানুষ হয়' লেখা একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ইস্তাহারের শুরুতে লেখা আছে 'যদ যদ যদ হি ধর্মস্য'।

ওই বছরের ২০শে নভেম্বর 'ওম বন্দেমাতরম্ স্বাধীন ভারত' আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ইস্তাহার শুরু 'কবি গাহিয়াছিলেন বলে।'

১৯১৫ সালের ৫ই মার্চ 'স্বাধীন ভারত' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। (অরিজিন্যাল, ২৮৮৪ পি)। ইস্তাহারটির শুরুতে আছে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'।

ওই বছরের ৬ই জুলাই 'স্বাধীন ভারত' নামে আর একটি ইস্তাহার (অরিজিন্যাল, ৭৫৫৯ পি) বাজেয়াপ্ত হয়। ইস্তাহারটির শুরুতে 'বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখেছিলেন' এবং শেষে 'লক্ষ সন্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলিদান আবশ্যক হইবে' লেখা।

১৯১৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি 'স্বাধীন ভারত' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ইস্তাহারের শুরু 'আমরা স্বাধীন ভারতের গত সংখ্যায়'।

ওই বছর ২৬শে সেপ্টেম্বর 'ওম্ যুগান্তর' নামে একটি ইস্তাহারও বাজেয়াপ্ত হয়। ইস্তাহারের শীর্ষে লেখা 'আমাদের আশা'। এর শুরুতে আছে 'মাতৃ মন্দিরে মায়ের বরাভয়াদায়িনী মূর্তির' এই কথা লেখা এবং শেষে আছে 'যুদ্ধ কৃতনিশ্চয়'।

২৪ নভেম্বর, ১৯১৬ সালের গেজেট ঘোষণা বাজেয়াপ্ত হয় 'সন্ধ্যায়'—রাম ঠেলা' নামে একটি ইস্তাহার। এর শুরু 'গেল গেল, হয়ে গেল' বলে এবং শেষে 'চালাও মৌসের কাতাকাত' বলে।

এই বছরের ১৫ই ডিসেম্বর 'ওম যুগান্তর' বলে একটি ইস্তাহারও বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। এই ইস্তাহারের শীর্ষে লেখা আছে 'সময় হয়েছে'।

১৯১৭ সালের ১০ই মার্চ 'স্বাধীন ভারত' নামে আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে লেখা আছে 'নতুন মন্ত্র ও নবীন সন্ধ্যায়' এবং শেষে আছে 'বন্দেমাতরম্'।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭-তে 'স্বাধীন ভারত' নামে আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে লেখা আছে 'বিশ্ব মানব শান্তি প্রয়াসী' এবং শেষে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ বন্দেমারতম'।

১৯১৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে 'দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯২০ 'লিফলেট' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির .৯৯এ ধারানুসারে এটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অল ইন্ডিয়া জেহাদ কমিটির সভাপতি মহম্মদ আক্রাম খান কর্তৃক এটি প্রকাশিত। দিল্লি ও বর্মা সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯২১ সালে অনেকগুলি ইস্তাহার, পুস্তিকা, প্রচারপত্র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চাঁদপুরের মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এটি নোয়াখালি কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। 'চাঁদপুরের দুর্ঘটনা নিবারণ' বলে আর একটি ইস্তাহার এ বছর বাজেয়াপ্ত হয়।

কংগ্রেস খিলাফত কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'হিন্দু মুসলমান কী জয়' এ সম্পর্কে আর একটি ইস্তাহার ১৯২১ সালে নিষিদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে আর একটি ইস্তাহার এ বছর বাজেয়াপ্ত হয়—"খিলাফত-উল-আকবর"। এটি শ্রীহট্ট থেকে মুন্সী ইরফান আলি কর্তৃক প্রকাশিত।

'নসরুত-উল-ইসলাম' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার এ-বছর যুগপৎ বাংলা, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বরমা, পাঞ্জাব, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, আসাম ও মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

'পাঞ্জাব বিভীষিকা ও জালিয়ানওয়ালাবাগ কাহিনী' পুস্তিকাটি ১৯২১ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতা থেকে যদুনাথ মজুমদার কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯২২ সালে 'স্বরাজ স্বর্গের সিঁড়ি' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এ এম দাস ব্রাদার্স কর্তৃক এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

'কানাইয়ের ঘাট হাঙ্গামার কবিতা' ইস্তাহারটি ১৯২৩ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। এটি মোবারেক আলি কর্তৃক শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত।

১৯২৪ সালে 'ক্ষুদিরাম' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতা থেকে ব্রজবিহারী বর্মণ রায় কর্তৃক এটি প্রকাশিত। বাংলা, সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বরমা কর্তৃক এটি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ২০ নভেম্বর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। নং ১০২৯।

১৯২৫ সালে 'বিপ্লব ও ছাত্রসমাজ' নামে একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা সরকারের ১লা মে'র আদেশ এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারের ৭ই মে আদেশে বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। বইটির লেখক হলেন শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক কলকাতার সরস্বতী প্রেসে এটি মুদ্রিত। কলকাতার সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে এ কে গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বইটির ভূমিকা লিখেছেন।

'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' নামে একটি ইস্তাহার ১৯২৫ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা সরকারের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২রা জানুয়ারির গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এবং যুক্ত প্রদেশ সরকারের ৭ই জানুয়ারির, সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারের ২২শে জানুয়ারির ও পাঞ্জাব সরকারের ২১শে ফেব্রুয়ারির আদেশে ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ওই ইস্তাহারটি বিশিষ্ট বিপ্লবী শান্তিপুরের শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নামে প্রচারিত হয়। পরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

১৯২৭ সালের ১৯শে মে রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। 'বরিশাল সুটিং ট্রাজেডি রিলিফ ফান্ড কমিটি' নামে এই ইস্তাহারটি রেঙ্গুনেই বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে প্রকাশিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারানুসারে বরমা সরকার কর্তৃক এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯২৯ সালে 'বাংলায় আইন অমান্য', 'বাংলার তরুণের প্রতি', 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা' নামে কয়টি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গেজেট ঘোষণায় বাংলা সরকার 'বাংলায় আইন অমান্য' নামে ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। এটি হাওড়ার পাতিহালের ষষ্ঠী সাধন গায়েন কর্তৃক লিখিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারানুসারে এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

এই বছরই ২২শে ডিসেম্বরের গেজেট ঘোষণায় 'বাংলার তরুণের প্রতি' ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারানুসারে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

এই বছর ২১শে সেপ্টেম্বর 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এতে একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়। তার শেষে ছিল 'যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো'। এটি ওই একই দিনে (১৬-৯-১৯২৯) কলকাতায় প্রচার করা হয়। এটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯৩০ সালের ৩১শে মে 'আগে চল, আগে চল ভাই' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরু 'হয় মরিব না হয় স্বাধীনতা লাভ করিব'। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও এটি ২৭শে জুনের ১৯৩০ আদেশে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

ওই বছরের ২৮শে জুলাই তারিখে 'বাংলার ছাত্র বন্ধুদের প্রতি' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১০ই জুলাই 'বাংলার ছাত্র সমাজের প্রতি' বলে আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। সাউথ ক্যালকাটা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ১৯৩০ সালের ৫ই আগস্টের গেজেট ঘোষণায় এটি সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকার কর্তৃকও বাজেয়াপ্ত হয়। দুই সরকারই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

২০শে জুন তারিখে বাংলা সরকারের গেজেট ঘোষণায় 'ভাই...মনে রেখো' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শেষে লেখা 'বন্দেমাতরম্'। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ১৫ই জুলাইয়ের গেজেট ঘোষণায় এটি বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯৩০ সালের ২৯শে মে 'বাংলার যুব বন্ধুগণ' নামে একটি ইস্তাহার বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ২৭শে জুন এটি বাজেয়াপ্ত করেন। এই ইস্তাহারটি বিপ্লবী কর্মীগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

'ভারতের কাপড়ের ইতিকথা' নামে একটি পুস্তিকা ১৯৩০ সালের ১২ই মে বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার ১১৬, বৌবাজার স্ট্রীটের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির অফিস থেকে কিরণশংকর রায় কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ৪৪, মানিকতলা স্ট্রীটের বোধোদয় প্রেস থেকে কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এটি মুদ্রিত।

'বাংলার যুববন্ধু ও শ্রমিক ভাইসব' নামে একটি ইস্তাহার ১২ই মে, ১৯৩০ বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ধান্দোরা নামে একটি ইস্তাহার ১৯৩০ সালের ২৮শে এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

'হে বরেণ্য জন সাধারণ' এবং শেষে 'জয় লাল ঝাণ্ডাকী জয়'। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকার ও ১৯০৯ সালের ২৩শে জুনের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

'হরতাল' নামে একটি বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ইস্তাহার ১৯৩০ সালের ১লা মে বাজেয়াপ্ত হয়। নৃপেন চৌধুরী কর্তৃক এটি যুগাবতার প্রেস)৪, ছকু খানসামা লেন থেকে মুদ্রিত এবং ৪১, হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৯৩০ সালের ২০শে জুন বাংলা সরকারের গেজেট ঘোষণায় 'কাল বৈশাখের প্রথম দমকা বাতাস' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শেষে লেখা 'বন্দেমাতরম্'। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ১৫ই জুলাই, ১৯৩০ এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন।

'কলিকাতার শ্রমিক, ছাত্র ও নাগরিকগণ' বলে একটি ইস্তাহার বাংলা সরকার ১৯৩০ সালের ২০শে জুন বাজেয়াপ্ত করেন। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ওই বছরের ১৫ই জুলাই ওটি বাজেয়াপ্ত করেন। এর শেষে লেখা 'বন্দেমাতরম্'।

'কলিকাতার শ্রমিক ছাত্র ও নাগরিকগণ' বলে আর একটি ইস্তাহার ১০ই এপ্রিল, ১৯৩০ বাংলা সরকার এবং ১৫ জুলাই, ১৯৩০ সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। এই ইস্তাহারের শেষে লেখা আছে 'গণতন্ত্র—দীর্ঘজীবী হোক'।

১৯৩০ সালের ১৫ জানুয়ারি 'মেসেজ আরভেনন' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। 'অনেক বক্তৃতা' বলে এর শুরু। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন।

১৯৩০ সালের ৯ই জুন 'নিবেদন' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩০ সালের ৪ঠা জুলাই সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও এটি বাজেয়াপ্ত করেন। এর শুরুতে আছে 'কলকাতার শ্রমিকগণ' এবং শেষে লেখা আছে: 'কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া কমিটি।'

'নির্যাতিতের আর্তনাদ' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৩০ সালের ২১শে আগস্ট যুক্ত প্রদেশ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। ওই বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ওটি বাজেয়াপ্ত করেন। এর শুরুতে আছে 'সহযোগের যুগ চলে গেছে' এবং শেষে 'এস ৩০ লাল পল্টন'।

'নাগ-পাশ' নামে একটি পুস্তিকা ১৯৩০ সালের ১৩ই অক্টোবর বাংলা সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। এর লেখক শশীভূষণ দাস, আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে এটি মুদ্রিত। কলকাতার ৪, দীননাথ মিত্র লেনের নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'ওই সেই রক্ত বিপ্লবের দিন' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৩০ সালের ১৩ই অক্টোবর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। এই ইস্তাহারের শেষে লেখা আছে 'বলশেভিক ভারতীয় রক্তবাহিনী'।

১৯৩০ সালের ২২শে নভেম্বর 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ওটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির অফিসার-ইন-চার্জ পরেশ দত্ত কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'রক্তবিনা হে দেশভক্ত দেশ মা স্বাধীন হবে' বলে একটি ইস্তাহার ওই বছরের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ১৫৩এ ধারানুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। এই ইস্তাহারটি সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ৩রা এপ্রিল, ১৯৩০-এর ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত করেন। এর শেষে লেখা আছে 'বন্দেমাতরম্'।

'স্বাধীন ভারতী' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারির গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয়। সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারও ১৯৩০ সালের ২৫শে মার্চ ওটি বাজেয়াপ্ত করেন। কলকাতার স্বতন্ত্র প্রেসে ওটি মুদ্রিত।

'বাংলার ছাত্ররা জেলে বন্দী ভাই বোনদের মনে রাখ—তোমাদের সাহায্য দেশের প্রয়োজন' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৩০ সালের জুলাইয়ে বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৩১ সালের অনেকগুলি ইস্তাহার—পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। ৩১ জুলাই তারিখে 'আমার দেশ' নামে একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। এটি দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি সার্ভিস প্রিন্টিং কোম্পানির (২০এ, গোপী বসু লেন, কলকাতা) ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ 'আগামী রক্ত বিপ্লব' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়।

এ বছর ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'অত্যাচারের চাই' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এই ইস্তাহারের শেষে লেখা 'যুগান্তর'।

'বন্দেমাতরম্' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ৭ই মার্চ বাজেয়াপ্ত হয়। সাঁওতাল পরগনা জেলা কংগ্রেসের ডিরেক্টর কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'বিপ্লব স্মরণে' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ২৬শে মার্চ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়।

'বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন ?' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই বাজেয়াপ্ত হয়। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কর্তৃক এটি লিখিত। কলকাতার ২০এ গোপী বসু লেনের সার্ভিস প্রিন্টিং কোম্পানিতে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র কর্তৃক এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'দেশের মুক্তি' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ২৪শে মার্চ বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বাবু অমূল্য গোস্বামী কর্তৃক এটি সম্পাদিত এবং রাণীগঞ্জ তরুণ প্রেসের বৈদ্যনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

'১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখের গেজেট ঘোষণায় 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মি ম্যানিফেসটো' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এই ইস্তাহারে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মি সভাপতি কর্তার সিংয়ের সই আছে।

এর কদিন পর ১১ই নভেম্বর হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের আর একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর গোড়ায় লেখা আছে : 'বাংলা আজ' এবং শেষে ইংরাজিতে লেখা 'এইচ. এস. বিএ. লিফলেট ইন বেঙ্গলি'। এটিও সংস্থার সভাপতি কর্তার সিং স্বাক্ষরিত।

১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'কালো ইংরেজ ডুবুক মাদার রক্তেতে' বলে একটি ইস্তাহার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে আছে 'আজো ভারতের সেদিন কোথাও' এবং শেষে আছে 'বলশেভিক ভারতীয় রক্তাশীষ'।

কাঁথি থেকে প্রকাশিত 'মুক্তি গাথা' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১২৪এ ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। এটি বাংলায় সাইকোস্টাইল করা। দ্বিতীয় দফায় ইস্তাহার।

১৯৩১ সালের ২৪শে নভেম্বর 'নভেম্বর বিপ্লব উৎসব' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ১৫৩এ ধারা অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে আছে 'রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব' এবং শেষে 'শ্রেণী সংগ্রামের জয়'। পণ্ডিত বিভুনারায়ণ মিত্র (স্টেশন রোড), গয়া ও দশাশ্বমেধ বারানসী সিটি) কর্তৃক প্রকাশিত। বারানসীর শ্রীশ্রী প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত

'পিস অব পানিসমেন্ট' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই একটি পোস্টারও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়। ওতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো ও বাংলা কবিতা লেখা আছে।

'পথের পণ' নামে একটি পুস্তিকা ১৯৩১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। এর লেখক শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যাবিনোদ। কলকাতার প্রেসে এটি মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা।

'রক্ত চাই, শুধু রক্ত চাই' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ৭ই নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে আছে 'মা ভৈরবী রবে' এবং 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'।

'স্বাধীনতার পঞ্চম অভিযান' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল বাজেয়াপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়। এর লেখক ধন বল্লভ।

'সাবাস মেদিনীপুর' বলে একটি পুস্তিকা ১৯৩১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়।

'সাবাস বিমল সাবাস' ইস্তাহারটি ১৯৩১ সালের ৩০শে জুলাই বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে আছে 'নবীন মন্ত্রে' এবং শেষে 'বন্দেমাতরম্'।

'তরুণ শহীদ—দীনেশ গুপ্ত পত্রাবলী' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। এটি শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীপ্রিয় দেবী কর্তৃক পল্লীচিত্র মেসিন প্রেসে ছাপা এবং বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত।

'হোয়ার ইজ পিস' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩১ সালের ২১শে মার্চ বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৩২ সালেও বেশ ক'টি ইস্তাহার ও পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ওই বছরের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'আবেদন' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। সাউথ ক্যালকাটা কংগ্রেস ওয়ার কাউন্সিল কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ঠিকানা ৭২এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর। এর শুরুতে লেখা আছে : 'বণিকের জাতি ইংরাজ' এবং শেষে 'ব্যবহার করিবে'।

এই বছরের ২০শে ফেব্রুয়ারি আপীল টু দি রেসিডেন্টস্ অব্ সাউথ ক্যালকাটা' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও প্রকাশিত হয় 'প্রভাতচন্দ্র মুখার্জি, পঞ্চম ডিরেক্টর সাউথ ক্যালকাটা কংগ্রেস ওয়ার কাউন্সিল, ৭২এ, 'আশুতোষ মুখার্জি রোড' ঠিকানা থেকে।

১৯৩২ সালের ১১ই জানুয়ারি 'বিপ্লবের ডাক' নামে একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে লেখা 'গোল টেবিল বৈঠক' এবং শেষে লেখা 'বলশেভিক ভারতীয় রাজবাহিনী'।

১৯৩২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি বুলেটিন স্বাধীনতা' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ওতে তারিখ আছে ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২।

৭ই মার্চ তারিখে বি· পি· সি· সি·-র আর একটি বুলেটিন—'বুলেটিন স্বাধীনতা' বাজেয়াপ্ত হয়। এটি প্রকাশের তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারি (২৪শে মাঘ—রবিবার)।

'কংগ্রেসের নির্দেশ' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩২ সালের ২৩শে জানুয়ারি বাজেয়াপ্ত হয়। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৩২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি, ২১ সেপ্টেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে আছে 'জগৎবরেণ্য' এবং শেষে 'বন্দেমাতরম্'। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত, ২ নং ডিরেক্টর, ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস কমিটি স্বাক্ষরিত এই ইস্তাহারটি প্রকাশের তারিখ ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারি।

১৯৩২ সালের ৬ই জানুয়ারি দুটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। (১) 'দৃষ্টান্ত বুরমানা—সি আই সি, ক্রমশ (২) হত ···সবরগ্রাম'। দুটিই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ওই তারিখেই 'জাগো জাগো শক্তি পূজার দিন আগত ওই' বলে আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়।

'খেতে পাই না কেন' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা ১৯০২ সালের ৩১শে মে বাজেয়াপ্ত হয়। ধুবরীর ধুবরী পাবলিশিং হাউস থেকে অমরেন্দ্র কৃষ্ণ সেন কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং ধুবরী বিজয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে এটি মুদ্রিত।

'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি প্রচার পত্র' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা ১৯৩২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।

১৯৩২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'ওরে বাংলার নির্জীব ঘুমন্ত তরুণ মুসলিমের দল' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শেষে লেখা আছে 'বেঙ্গল রেড অ্যান্টি ওয়ার কাউনসিল'।

৫ই ফেব্রুয়ারিতে 'পেশোয়ারের স্মৃতি দিবস' বলে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ইস্তাহারের শেষে লেখা আছে, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ক্ষত্রিয় সমিতি'।

২১শে জানুয়ারি 'রুদ্রের আহ্বান' নামে আর একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে লেখা 'ছাত্রবন্ধুদের প্রতি' এবং শেষে আছে 'বন্দেমাতরম্'। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পাবলিশিটি অফিসার কর্তৃক এই ইস্তাহারটি প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৩২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা' ইস্তাহারটি নিষিদ্ধ হয়। প্রেস আইনের ৪ ধারার (এ) এবং (বি) এবং উপধারা (১) অনুসারে। অন্য সবই কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা বলে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই ইস্তাহারে বিপ্লবী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর ফটো আছে।

১৯৩২ সালের ২৮শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এবং শুরু 'সমস্ত জাতির' এবং শেষ 'সঙ্কল্প পাঠ' দিয়ে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি ও ডিরেক্টর বিনয়কৃষ্ণ বসুর স্বাক্ষরিত ওই ইস্তাহারটি।

১৯৩২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি 'বন্দেমাতরম্' বলে একটি 'নিউজ সিট' বাজেয়াপ্ত হয়। খিদিরপুর ওয়ার কাউনসিলের ৪র্থ ডিরেক্টর ভুবনচন্দ্র বেরার নামে ওটি প্রকাশিত।

ওই বছর ১লা ফেব্রুয়ারি 'সত্যাগ্রহ সংবাদ' নামে আর একটি নিউজ সিট বাজেয়াপ্ত হয়। এটি ১৯৩২-র ১৬ই জানুয়ারি (২রা মাঘ) তারিখের সংখ্যা। তৃতীয় ইস্যু। প্রেস আইনের ৪ ধারার (এ) ও (বি) অনুচ্ছেদ এবং উপধারা (১) অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৩৩ সালে একটি মাত্র পুস্তিকা-ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ৬ই এপ্রিল 'গানের মারফৎ' (তত্ত্বদর্শন) একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। উর্দু ও বাংলা ভাষার ওই পুস্তিকাটি বসুমতী প্রেস (১৬৬, বউবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা) থেকে প্রকাশিত। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯এ ধারা অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালে বহু বাংলা পুস্তিকা, ইস্তাহার, প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। এত বাজেয়াপ্ত কোন বছর হয়নি।

১৯৪০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি 'চটকলের মজুর ভাইবোন' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ভারত রক্ষা বিধির ৪০(১)(বি) এবং (সি) ধারা অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

'লাল নিশান' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পারটির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা কর্তৃক এটি প্রকাশিত। এটি প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। ভারতরক্ষা বিধির ১০(১)(বি) এবং (সি) ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ওই তারিখেই 'লাল নিশানের' দ্বিতীয় ইস্যুও বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালের ২রা মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পারটির বেঙ্গল কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১) বি) এবং (সি) ধারানুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

ওই তারিখেই কমিউনিস্ট পার্টির আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। সেটি হল 'বাংলা দেশের প্রত্যেক নরনারীর কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন'।

১৯৪০ সালের ৫ই মার্চ 'ফাইট ফর সিভিল রাইটস', 'অ্যাজিটেড ফর দি ফাইট ফর ফ্রিডম, আপীল অব্ দি কমিউনিস্ট পার্টি' বলে একটি ইস্তাহার ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১)(বি) এবং (সি) ধারামতে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'জাহাজী পোর্ট অব্ ডক মজদুরের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪০ সালের ১৫ই মার্চ বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১)(বি) এবং (সি) ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯৪০ সালের ১৫ই মার্চ বাজেয়াপ্ত হয় 'ভারতরক্ষা আইনের প্রতিবাদকল্পে দেশবাসীর প্রতি ওয়ার্কার্স লিগের নিবেদন' বলে। ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১)(বি) এবং (সি) ধারানুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'লাল নিশান' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ওই তারিখেই নিষিদ্ধ হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা কর্তৃক ওটি প্রকাশিত। এটি প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা।

১৯৪০ সালের ১৩ই মে 'কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হোন' বলে একটি সাইক্লোস্টাইল করা বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনলের শাখা) বঙ্গীয় কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১)(বি) এবং (সি) ধারানুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালের ২৩শে মে 'কমিউনিস্ট পন্থা' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও সি পি আই-এর বাংলা কমিটি প্রকাশিত।

'চটকল মজদুর বুলেটিন' নামে একটি ইস্তাহারও ওই তারিখে বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জুট শাখা কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ৩১শে মে 'বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার' পয়লা মে নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের বলশেভিক পার্টির বাংলা সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত।

ওই একই তারিখে 'নারীদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন' বলে আর একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখার মহিলা উপসমিতি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালে ২৭শে জুন এই তিনটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয় : বলশেভিক (নং ৫, এপ্রিল, ১৯৪০), বলশেভিক (বিশেষ সংখ্যা, ১০-৫-১৯৪০), বলশেভিক (নং ১, তাং ৭-৫-১৯৪০)। এগুলি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।

এই বছর ১২ই জুলাই 'কমিউনিস্ট বুলেটিন' (নং ২ তাং ১৬-৫-১৯৪০) একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ওটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখার কলকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ২৭শে জুলাই বাজেয়াপ্ত 'বাংলা দেশের কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি রেভনিউশনারি সোসালিস্ট পার্টির নিবেদন' বলে একি ইস্তাহার। ওটি ৮, হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে অজিতকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং দেশান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত।

৩রা আগস্ট, ১৯৪০ 'জাতীয় ইস্তাহার' নং ১ বাজেয়াপ্ত হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ৯ই আগস্ট বাজেয়াপ্ত হয় 'রেডফ্রন্ট' নামে একটি ইস্তাহার। ভারতীয় লালফৌজ বাহিনীর এটি সাপ্তাহিক মুখপত্র। প্রথম সংখ্যার এই ইস্তাহারের প্রকাশের তারিখ ১৯শে জুলাই, ১৯৪০।

'অভিযান' নামে আর একটি ইস্তাহারও ওই তারিখেই বাজেয়াপ্ত হয়। এটি দ্বিতীয় সংখ্যার। একই সঙ্গে 'কমিউনিস্ট পার্টি ও ভাবী সংগ্রাম' বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

ওই বছর ১৬ই আগস্ট তারিখে 'বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার' বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের বলশেভিক পার্টির সাংগঠনিক কমিটি এটি প্রকাশ করেছেন।

ওই তারিখেই 'ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙো, ভাঙো শৃঙ্খল'বলে আর একটি ইস্তাহার। ইন্ডিয়ান রেড আর্মি হেড কোয়ার্টার্র থেকে এটি প্রচারিত।

২৪শে আগস্ট ১৯৪০ বাজেয়াপ্ত হয় 'বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

৩১শে আগস্ট 'রেভলিউশনিস্টস ইউনিয়ন' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়।

'সরকারের যুদ্ধে চাঁদা দিও না' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয় সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত।

'কল মজুরদের গলায় ফাঁসি' ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বাজেয়াপ্ত হয় 'সরকারের আঘাতের দায়' আপনাদের উপরও আসিয়া পড়িল' বলে একটি ইস্তাহার। এটিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।

'সিভিক গার্ড না বিভীষণ বাহিনী' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয় ২১শে সেপ্টেম্বর,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৪০।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ বাজেয়াপ্ত হয় 'কর্পোরেশান শ্রমিকদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন' বলে একটি ইস্তাহার। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় শাখার কলকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত।

'তোমার দেশ পরাধীন' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৪০ সালের ৭ই অক্টোবর।

ওই তারিখেই বাজেয়াপ্ত হয় 'বর্তমান যুদ্ধে ইংরাজের সর্বনাশ হইল' ইস্তাহারটি। দুটিই কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারিত।

'সংগ্রাম চালু করে দাও' ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত হয় ৩০শে অক্টোবর তারিখে। এটিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।

ওই তারিখেই বাজেয়াপ্ত হয় 'ছাত্র সমাজের কাছে বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার'—'সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তাকে সর্বতোভাবে বাড়িয়ে তোল'। ভারতের বলশেভিক পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত।

১৯৪০ সালের ২৫শে নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয় 'জার্মানির বোমায় লন্ডন ভস্মসাৎ' ইস্তাহারটি। এর শেষে আছে 'জয় বুদ্ধিমান ভারতবাসীর জয়, জয় বিপ্লবী ভারতবাসীর জয়'।

ওই তারিখেই বাজেয়াপ্ত হয় 'ভারতবর্ষের সমস্ত সোনা ও রূপা ইংরাজ বিলাতে লইয়া গেল' ইস্তাহারটি। এর শেষে আছে 'জয় স্বাধীনতা প্রেমী ভারতবাসীর জয়, জয় বিপ্লবী ভারতবর্ষের জয়'।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৪০ তারিখে বাজেয়াপ্ত হয় 'তবুও চাঁদা দেবেন ?' ইস্তাহারটি। এর শুরুতে আছে 'লাট সাহেব সপত্নী এখানে এসেছেন ?'

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ বাজেয়াপ্ত হয় 'মার্চ টু ভিক্টরি অর্ ডেথ্' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার। এর শুরু 'হুঁশিয়ার অত্যাচারী ইংরেজ-বণিকের দল' এবং শেষে 'আমাদের জয় অনিবার্য, ইনক্লাব জিন্দাবাদ'।

ভারতীয় সর্বহারা লালফৌজ বাহিনীর কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ৫ই ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত হয় 'কুলকবাদকে হটাও—বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার'। এর শুরু এই বলে 'মজুর, চাষী প্রভৃতি তোমরা করলে কি ?' এবং শেষ 'অত্যাচারের অবসান করো'। বলশেভিক পার্টির বঙ্গীয় কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'কমিউনিস্ট' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৪০ সালের ২৯শে জুন তারিখে। কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি এটি প্রকাশ করেন।

ভারতের বলশেভিক পার্টির বাংলা কমিটির একটি ইস্তাহার 'ইনটেনসিফাই ইন অলওয়েজ' বাজেয়াপ্ত হয় ২০শে নভেম্বর, ১৯৪০।

১৯৪০ সালের ১লা অক্টোবর বাজেয়াপ্ত হয় 'কল মজুরদের গলায় ফাঁসি' ইস্তাহারটি। ডিফেন্স অব্ বরমা রুলস-এ, ১৯৪০ (বি) এবং (সি) ধারা অনুসারে বরমা সরকার ওটি বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৪০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর 'সরকারের যুদ্ধে চাঁদা দিও না' ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও বরমা সরকারের আদেশ—ডিফেন্স অব বরমা রুলস, ১৯৪০-এ বাজেয়াপ্ত হয়।

ডিফেন্স অব বরমা রুলসে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ এই ইস্তাহারটিও বাজেয়াপ্ত হয়।—'অভিযান' (দ্বিতীয় সংখ্যা) এবং 'কমিউনিস্ট পার্টি ও ভাবী সংগ্রাম'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এর প্রকাশক।

ওই তারিখেই বরমা সরকারের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয় (১) 'বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার' (২) 'রেভলিউশনারিস্ট ইউনিয়ন'। এগুলিই ডিফেন্স অব্ বরমা রুলস, ১৯৪০-এর (বি) এবং (সি) ধারায় বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালের ২৯শে আগস্ট বাজেয়াপ্ত হয় 'ভাঙনের [redacted] আজি ভাঙো শৃঙ্খল'। ইন্ডিয়ান রেড আর্মি হেড কোয়ার্টার্র থেকে এটি প্রচারিত। এটিও আগের আইনে বরমা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই তারিখেই বরমা সরকারের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয় 'বলশেভিক পার্টির ইস্তাহার'। ভারতের বলশেভিক পার্টির বাংলা সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত।

বরমা সরকারের ১৬ই আগস্টের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয় 'জাতীয় ইস্তাহার নং ১ ফরোয়ার্ড ব্লক কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

একই তারিখে বরমা সরকারের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয় 'কমিউনিস্ট বুলেটিন নং ২'। এটি ১৬ই মে, ১৯৪০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখার কলকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত।

১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'বংলাদেশের সোসালিস্ট পার্টির নিবেদন' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। ডিফেন্স অব্ বরমা রুলসের (বি) এবং (সি) ধারানুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়। ইস্তাহারটি কলকাতার ২এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের দেসন প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ছাপা।

'কমিউনিস্ট পন্থা' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট বরমা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত। ১৯৪০ সালে ডিফেন্স অব বরমা রুলসের (বি) এবং)সি) অনুচ্ছেদের (১) ডপবিধিতে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হয়।

'চটকল মজদূর বুলেটিন' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট বাজেয়াপ্ত হয়। এটি ডিফেন্স অব বরমার (১৯৪০) (বি) এবং (সি) অনুচ্ছেদে ও উপবিধির (১) অনুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির জুট শাখা কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'নারীদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান' বলে একটি ইস্তাহার ওই তারিখেই বাজেয়াপ্ত হয় বরমা সরকারের গেজেট ঘোষণায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখায় মহিলা বিভাগ কর্তৃক এটি প্রচলিত।

'বলশের্ভিক পার্টির ইস্তাহার' পয়লা মে বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৪০ সালের ১৪ই জানুয়ারির বরমা সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের বলশেভিক পার্টির বাংলা সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক এটি প্রচারিত। এটি বরমা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। 'লাল নিশান' ইস্তাহারটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৪০ সালের ২৫শে মের গেজেট ঘোষণায়। এটি বরমা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৪০ সালের ২৫শে মে বরমা সরকার ডিফেন্স অব্ বরমা রুলে বাজেয়াপ্ত করেন 'ভারতরক্ষা আইনের প্রতিবাদকল্পে দেশবাসীর প্রতি ওয়ার্কার্স লিগের (বাংলা) নিবেদন' ইস্তাহারটি। ওয়ার্কার্স লিগের (বাংলা) সাধারণ সম্পাদক জে ব্যানার্জি কর্তৃক ওটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ১০ই এপ্রিল বরমা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন 'জাহাজী পোরট ও ডক মজদুরের প্রতি কমিউনিসট পার্টির আবেদন' বলে ইস্তাহারটি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখার কলকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ 'স্বাধীনতা দিবস' নামে একটি ইস্তাহার বরমা সরকারের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়। এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি পরিচালিত।

'চটকলের মজদুর ভাইবোনেরা' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪০ সালের ২রা মার্চ বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ২রা মার্চ বাজেয়াপ্ত হয় 'লাল নিশান্' (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) ইস্তাহারটি। এটিও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত। এটি বরমা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৯৯এ ধারানুসারে বিহার সরকার ১৯৪০ সালের ৬ই ডিসেম্বর 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত করেন। মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ 'বাংলাদেশের প্রত্যেক নরনারীর কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত করেন বরমা সরকার। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ বাজেয়াপ্ত হয় 'ফাইট ফর সিভিল রাইটস্ অ্যাজিটেট ফর দি ফাইট ফর ফ্রিডম' বলে একটি ইস্তাহার। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত। বরমা সরকারের আদেশে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ বাজেয়াপ্ত হয় 'লাল নিশান' (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত। এটি বাজেয়াপ্ত করেন বরমা সরকার।

'রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হও' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত করেন আসাম সরকার। ১৯৪০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯৩১ সালের ১০০ ধারানুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালের ১১ই অক্টোবর 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও আসাম সরকারের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়।

'স্বাধীনতা আহ্বান' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪০ সালের ১লা জুন বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত করেন আসাম সরকার।

১৯৪০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বাজেয়াপ্ত হয় 'ছাত্র সাংবাদিক' নামে একটি 'নিউজ সিট'। ওটি ২৫শে আগস্ট, ১৯৪০ তারিখের। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীহট্ট জেলা কমিটির ছাত্র শাখা কর্তৃক এটি প্রকাশিত। এটি আসাম সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। অনুরূপভাবে ছাত্র সাংবাদিকের দ্বিতীয় সংখ্যাটিও বাজেয়াপ্ত হয়। এটি ১-৯-১৯৪০ তারিখের সংখ্যা। ১৯৪০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৪০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশে 'কমিউনিসট পার্টির আবেদন' বলে একটি ইস্তাহার আসাম সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীহট্ট শাখার ছাত্র বিভাগ কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

১৯৪১ সালের ৩০শে মে 'ফরওয়ার্ড পিপলস গভর্নমেন্ট' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরু 'পঁচিশ বছরের মধ্যে' এবং 'শান্তি ও নূতন জগতের পথ প্রস্তুত করবে' দিয়ে। চট্টগ্রামের আহমদ কবির চৌধুরী কর্তৃক এটি মুদ্রিত এবং ননী সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। চট্টগ্রাম ইম্পিরিয়াল প্রিন্টিং হাউসে এটি ছাপা। ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলের ৪০ (১) (বি) এবং (সি) অনুসারে বাংলা সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা করবে' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪১ সালের ২৫শে জুন বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

'তবুও চাঁদা দেবেন ?' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাজেয়াপ্ত হয়। এর শুরুতে লেখা আছে 'লাট সাহেব সপত্নী এখানে এসেছেন ?' এবং শেষে আছে 'সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রের অবসান'।—'বন্ধু'। বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধিতে এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

'জাগো বিপ্লবীর দল' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৪২ সালের ২রা এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়। 'লড়াই-ও-আমাদের দ্বারা জয় এলো' বলে এর শুরু এবং শেষে আছে 'সুভাষবাবু জিন্দাবাদ'।—রেভলিউশনারি পিপলস পার্টি। বাংলা সরকার ভারত রক্ষা বিধি অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

'স্টাফোর্ড ক্রিপস্কে সুভাষচন্দ্রের খোলা চিঠি' নামে একটি ইস্তাহারের ১৯৪২ সালের ২১শে এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়। 'স্যার স্টাফোর্ড, আপনি এতদিন পর'—এই বলে এর শুরু এবং শেষে আছে, "পঞ্চায়েত গঠন করিয়া নেতার আদেশ পালন করুন। —ভারতীয় রেভলিউশনারি পিপলস পার্টি।" এটিও বাংলা সরকার ভারতীয় বিধি অনুসারে বাজেয়াপ্ত করেন।

'মিহিজাম কংগ্রেস সংবাদ' বলে একটি ইস্তাহার বিহার সরকার ১৯৪২ সালের ৯ই মে বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতরক্ষা বিধি বলে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

'রক্তগঙ্গা' (২য়) নামে একটি বাংলা পুস্তিকা ১৯৪৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বাংলা সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি) আইনে, (১৯৩১) বাজেয়াপ্ত হয়। এটি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (১৬৮/১সি রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৯) থেকে নগেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

'নোয়াখালিতে আগুন জ্বলে, হিন্দুরা যায় রসাতলে' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪৬ সালের ৮ই নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। এটিও নগেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (১৬৮/১সি, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে এটি মুদ্রিত। বাংলা সরকার ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

নোয়াখালি সম্পর্কে আর একটি ইস্তাহার ১৯৪৬ সালের ১৪ই নভেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। এটি হল 'নোয়াখালির মর্মন্তুদ বিবরণ ও আমাদের কর্তব্য। এটিও উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা) থেকে মুদ্রিত।

'এতদ্বারা সমস্ত মুসলমানকে' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা সরকার ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

'সংগ্রাম' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। এটি ৯-১২-১৯৪৬ তারিখের সংখ্যা। ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ১৯ ধারানুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

'রক্তের বদলে রক্ত চাই' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাজেয়াপ্ত হয়। ইউনাইটেড সোসালিস্ট পার্টির নামে এটি প্রকাশিত হয়। বিহার সরকার ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে, ১৯৩১ এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

'হিন্দুদিগের প্রতি সতর্কবাণী' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ৩রা জানুয়ারি বাজেয়াপ্ত হয়। বাংলা সরকার ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি বাংলা সরকার 'এতদিন যাবৎ লিগ গুণ্ডারা' নামে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত করেন। এর শেষে আছে 'হরতাল পালন করুন'।

'বিদ্রোহী নৌসেনা' নামে একটি পুস্তিকা ১৯৪৭ সালের ২৪শে এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়। রেভলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টির পক্ষে ননী ভট্টাচার্য কর্তৃক এটি প্রকাশিত।

'তেভাগার দাবি আদায় করো! জোতদার ও পুলিশের জুলুম বন্ধ করো'—বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ৮ই মে বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার গণশক্তি প্রেস থেকে এটি ছাপা। ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে বাংলা সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

'দমননীতি প্রতিরোধ করো, কৃষক হত্যা বন্ধ করো' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ৮ই মে বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার গণশক্তি প্রেস থেকে এটি ছাপা। বাংলা সরকার ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে, ১৯৩১ সালে এটি বাজেয়াপ্ত করেন।

বিপ্লবীদের ইস্তাহারগুলির ভাষা অগ্নিগর্ভ, যেন বারুদ। 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা', 'জাগো। জাগো॥' বা 'রক্ত চাই' পড়তে পড়তে তীব্র উত্তেজনা জাগে। এইসব ইস্তাহার, প্রচারপত্রের পিছনে কুশলী শিল্পীরা ছিলেন, এদের ভাষাই তা বলে দেয়। এ সবের সাহিত্য গুণ পাবার কোন অবকাশ নেই। তবে এগুলি পড়লে মনে যে দারুণ নাড়া দেয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'রক্তে আমার লেগেছে' এই ইস্তাহারটি সম্পর্কে সমকালের এক বিপ্লবীর মন্তব্য উল্লেখ্য

'শহিদ যতীন দাসের শবানুগামী শোক মিছিলের নয়নে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল ঐ ইস্তাহারের অক্ষরগুলো অগ্নিস্রাবী মূর্তি ধরে। সে আগুন স্তব্ধ, অন্তর্নিহিত। লক্ষ জনতার পরাণে শুধু অজ্ঞাতে লাগে 'সর্বনাশের নেশা।' হোক তা নির্বাক, হোক নিস্পন্দ।'...

'পাকিস্তানী দণ্ড ও হিন্দু শাসন কবিতা' পুস্তিকাটি ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে বাজেয়াপ্ত হয়। বরিশালের মহম্মদ শাহজাহান এটির প্রণেতা। ডঃ মণিরুদ্দিন আহমাদ কর্তৃক এটি প্রকাশিত। আগের আইনের এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'হিন্দু! জাগৃতি' নামে একটি বাংলা ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ১৫ই মে বাজেয়াপ্ত হয়। 'দিন আগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই' দিয়ে এটি শুরু এবং শেষ 'বন্দেমাতরম্' দিয়ে। এটিও বাংলা প্রেস আইনে (১৯৩১) বাজেয়াপ্ত হয়।

'আসাম ডাকিতেছে' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ২২শে মে বাজেয়াপ্ত হয়। এর লেখক হলেন সৈয়দ আসাদ-আদ্-দৌলা-সিরাজী। সিরাবাগ সিরা প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত। বাংলা সরকার এটি ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনে বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুন 'বাংলার হিন্দু সাবধান' বলে একটি ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত করেন বাংলা সরকার। আগের আইনেই।

ওই বছরের ৯ জুন তারিখে বাজেয়াপ্ত হয় 'কৃষক হত্যার জবাব চাই' পুস্তিকাটি। এর লেখক হলেন ভবানী সেন। এটি ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারা অনুসারে বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৪৭ সালের ৭ই জুন 'প্রস্তুত হোন' বলে একটি ইস্তাহার বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। এর শুরুতে লেখা আছে 'সভ্যতার বিরুদ্ধে' এবং শেষে আছে 'ভাবনাহীন'।

২৩শে জুন, ১৯৪৭ তারিখে বাজেয়াপ্ত হয় 'কৃষকে দরিদ্রের কায়দা' বলে একটি পুস্তিকা। এটি কৃষ্ণবিনোদ রায়ের লেখা। ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইন, ১৯৩১-এর ১৯ ধারা অনুসারে বাংলা সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

'এস ধরি হিন্দু যুবক পূর্ববঙ্গের অত্যাচারের প্রতিকার করো' বলে একটি ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ৮ই মে বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। এটিও ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়।

'নববঙ্গ' নামে একটি ইস্তাহার ১৯৪৭ সালের ১লা আগস্ট বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। 'বঙ্গ দেশকে বিভক্ত' বলে শুরু ওই ইস্তাহারের শেষে আছে 'ন্যু নরভৈরব'। এটিও ১৯৩১ সালের প্রেস আইনে বাজেয়াপ্ত হয়।

বাজেয়াপ্ত ইস্তাহারগুলির মধ্যে বহুবার 'স্বাধীন ভারত'-এর নাম পাওয়া যায়। এই 'স্বাধীন ভারত' বের করতেন অনুশীলন সমিতির সভ্যরা। বলাই বাহুল্য, গোপনে। এ সম্পর্কে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বইয়ে (পৃঃ ২৪৮) লিখেছেন

'অনুশীলন সমিতির কর্মীরা গোপনে দুইখানা সংবাদপত্র বাহির করিতে লাগিল, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরাজী। বাংলা পত্রিকার নাম 'স্বাধীন ভারত' ইংরেজীখানার নাম ছিল 'লিবার্টি'। সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ১২নং নবদ্বীপ ওস্তাগর লেনে একটি ছাপাখানা ছিল। তাহাদের এই গোপন ছাপাখানায় তাহারা রাত্রে গোপনে কাগজ ছাপাইত। পত্রিকা ছিল সাময়িক, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট তারিখে তাহা বাহির হইত না। পত্রিকা যখন বাহির হইত তখন কোন এক নির্দিষ্ট তারিখেই পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ তাহা প্রকাশ পাইত। স্কুল, কলেজে, আইন, আদালত গৃহে, রাস্তার দেওয়ালে, হোস্টেলে ছাত্রদের টেবিলের উপর, বিভিন্ন স্থানে তাহা দেখা দিত। কেহ কেহ ডাকযোগেও পাইতেন। স্বাধীন ভারত ও লিবার্টি যখন প্রকাশ হইত তখন পুলিশের কর্মতৎপরতা বাড়িয়া যাইত। পুলিশ বহুস্থানে খানাতল্লাস করিত, বহু লোককে ধরিয়া টানা হেঁচড়া করিত।'

নমুনা হিসাবে 'দেশবাসীর প্রতি আবেদন' শিরোনামার একটি ইস্তাহারের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা

(১) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব', পৃঃ ৩০১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট: পত্র-পত্রিকা

আমাদের আলোচনা পরিধির মধ্যে পত্র-পত্রিকা নেই। তবে নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকার যে তালিকা আমি সংগ্রহ করেছি, তা উপস্থিত করছি।

১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই বাংলা সরকারের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়, 'যুগান্তর' (১৩১৭ সাল, চতুর্থ বর্ষ) পত্রিকাটি। তাছাড়া সরকারের আদেশের ১৩১৬ সালের ১লা মাঘ তারিখের 'যুগান্তর' ওই দিনেই বাজেয়াপ্ত হয়। যুগান্তর (পঞ্চম বর্ষ) ১৬-১২-১৯১২ তারিখের, যুগান্তর (ষষ্ঠ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা) ২০-৩-১৯১৩'র গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯১১ সালের ৭ই আগস্ট বাংলা সরকারের আদেশে 'সন্ধ্যা' (দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ বর্ষ) বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯০৭ সালের ১৬ই জুন সংখ্যায় 'যুগান্তরে' 'ভয়ভঙ্গ' ও 'লাঠ্যৌষধি' নামে দুটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অভিযুক্ত হন। তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হয় এবং সাধনা প্রেস (ওই প্রেস থেকেই পত্রিকাটি ছাপা হত) বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 'যুগান্তরে' বিভিন্ন দিনে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য বসন্তকুমার ভট্টাচার্যকে ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও হাজার টাকার জরিমানায় দণ্ডিত করেন। ১৯০৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর যুগান্তরে 'হিন্দু বীর্য পঞ্চনদে' নিবন্ধের জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে বৈকুণ্ঠনাথ আর্যকে দু বছর সশ্রম কারাদণ্ডে ও হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট টি থ্রনবিল ১৯০৮ সালের ২৬শে মে ফণীন্দ্রনাথ মিত্রকে ১ বছর ১১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৯০৮ সালের ৪ঠা এপ্রিলের 'যুগান্তরে' একটি আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এছাড়া আরও বিভিন্ন দিনের লেখা সম্পর্কে যুগান্তরের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। যেমন, ১৯০৭ সালের ২রা জুনের যুগান্তরে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য বাংলা সরকার ভূপেন দত্তকে সতর্ক করে দেন।

যুগান্তরের বিরুদ্ধে প্রথম যে মামলা হয়, তাতে সারা দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আদালত কক্ষ লোকে লোকারণ্য থাকত। প্রতিটি সংবাদপত্রে এই মামলার পূর্ণ বিবরণ ছাপা হয়।

বাংলা সংবাদপত্র 'যুগান্তর' ১৯০৬ সালের মার্চে ছাপা শুরু হয়। ১৯০৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকাটি আমি দেখেছি। এটি সাপ্তাহিক। উপরে বড় অক্ষরে 'যুগান্তর' লেখা। তার তলায় দুটি তলোয়ার কোনাকুনি রাখা। তার উপর চাঁদ ও তারা। তলায় গোল ছাপ। এটি দ্বিতীয় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যার। মূল্য ১ পয়সা।

যুগান্তরের মামলায় রায় দেবার সময়ই কিংসফোর্ড প্রেস আইনের আমূল সংস্কার দাবি করেন।

সন্ধ্যা

১৯০৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ডি-আর-কিংসফোর্ড ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে মানবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে দণ্ডিত করেন। তাঁর ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯০৮ সালের ৭ জানুয়ারির 'সন্ধ্যায়' আবার যাই, উঠা ভাই নিবন্ধের জন্য এই দণ্ড হয়। মানবেন্দ্রবাবু স্বীকার করেন যে, তিনি এই কাগজের প্রিন্টার, প্রকাশক, সম্পাদক ও ম্যানেজার এবং এই নিবন্ধের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই।

'সন্ধ্যা'র আসল সম্পাদক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁকেও দণ্ডিত করার চেষ্টা হয়, তবে বিচার চলাকালেই তিনি মারা যান। এ সম্পর্কে সরকারী নথিপত্রে আছে From several correspondenceof the police during January 1907 it is clear that after making every preparation of prosecution of Brahma Bandhab Upadhya editor of Sandhya and other connected with it they sought the permission of the Govt of Bengal. But the Chief Secretary Mr. Carlyl e with the concurrence of the Governor Mr. Fraser by his letter dated 21st

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

January 1907 informed, "I think no action should be taken: It is desirable to ascertain facts and Govt of India may be informed. If we wanted to prosecute I believe there is hardly a week in which the 'Sandhya' does not publish some article which would justify our doing so".

'সাধনা' ২০-৩-১৯১৩'র গেজেট ঘোষণায় সাধনার একটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়।

এই বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাজেয়াপ্ত হয় 'হাবলুল মতিল'য়ের বাংলা সংস্করণের ১৩-৮-১৯১৩ এবং ১৭-৮-১৯১৩ তারিখের সংখ্যা দুটি। এ বছর বাংলা সরকার 'আল হিলাল', 'লিবার্টি'র একাধিক সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯২০ সালে মহম্মদ আক্রাম খান প্রকাশিত 'নবযুগ' পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয় দিল্লির আদেশে। নজরুল এতে লিখতেন।

'বলশেভিক' পত্রিকার ১৯৩৯ সালের ৭ই নভেম্বর সংখ্যাটি বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন ১৯৪০ সালের ৩রা জানুয়ারি। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা এটি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ভারতরক্ষা বিধির ৪০(১) (বি) এবং (সি) ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ওই বছরের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে 'বলশেভিক' পত্রিকার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৯ তারিখের সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। বাংলা সরকার উল্লিখিত ভারতরক্ষা বিধি অনুসারেই এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেন।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সংগ্রাম' পত্রিকাটি ১৯৪০ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে বাজেয়াপ্ত হয়। এটি ১৯৩৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বরের সংখ্যা। বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেন।

১৯৪০ সালের ১৬ই মে বাংলা সরকার 'বলশেভিক' পত্রিকার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০ (ভল্যুম ২, নং ৩) সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি এটি প্রকাশ করেন। ভারতরক্ষা বিধি অনুসারেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'অপ্রকাশিত সংবাদপত্র' (প্রথম সংখ্যা—১লা মে, ১৯৪০) বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন ১৯৪০ সালের ২৬শে জুনের আদেশে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি এটির প্রকাশক। ভারতরক্ষা বিধি অনুসারেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'শনিবারের চিঠি'র ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখ্যাটি বাংলা সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪২ সালের ২১শে এপ্রিল বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার ২৫/২, মোহনবাগান রো থেকে সৌরিন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এর বিরুদ্ধেও ভারতরক্ষা বিধি অনুসারেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

'আজাদ' পত্রিকার ১৯৪২ সালের ৩রা অক্টোবরের সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৪২ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের গেজেট ঘোষণায়। কলকাতার ৮৬এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের থেকে মৌলভী এ কে শামসুদ্দিন কর্তৃক এটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত। বাংলা সরকার বিধি অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

১৯৪৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের বাংলা সরকারের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ২৪শে নভেম্বরের (১৯৪৬) কাগজটি। বাংলা সরকার ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। বাংলা সরকার ১৯৪৭ সালের ১৫ই এপ্রিলের তারিখের গেজেট ঘোষণায় ওই আইনেই ২০শে ফেব্রুয়ারির ১৯৪৭ তারিখের 'স্বাধীনতা' কাগজটি বাজেয়াপ্ত করে।

১৯৪৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের গেজেট ঘোষণায় ২৩-১১-১৯৪৬ তারিখের 'প্রত্যহ' পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের ৩রা মে তারিখের গেজেট ঘোষণায় ১০-৪-১৯৪৭ তারিখের 'কৃষক' পত্রিকাটি বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ৮(১) ধারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুসারে এটি বাজেয়াপ্ত হয়।

ধূমকেতু ১ম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় (২৬-৯-২২) নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং ২৭-১-১৯২৩ সংখ্যায় 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বের হয়। দুটি সংখ্যাই রাজরোষে পড়ে। এটিই নজরুল সম্পাদিত শেষ সংখ্যা। পরবর্তী কালেও 'ধূমকেতু' রাজরোষে পড়ে। এর দ্বিতীয় সম্পাদক অমরেশ কাঞ্জিলালের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল ১৩-৩-১৯২৩ তারখের রায়ে।

বাজেয়াপ্ত না হলেও সরকারী রোষে পড়ে এমন আরো অনেক পত্র-পত্রিকা আছে। এখানে তার উল্লেখ করলাম।

অধিকার

বাংলা মাসিক। চট্টগ্রামের লয়াল রোডের আমির প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন এই কাগজটির ১৯৩৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যাটি রাজরোষে পড়ে। ওই সংখ্যায় একাধিক আপত্তিকর লেখা ছিল। এজন্য পত্রিকাটি সাসপেন্ড করা হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ৭ (৩) ধারা অনুসারে ১৯৩৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওই কাগজের প্রিন্টার ও পাবলিসার্সের কাছে ১০০০ টাকা জমা জামানত দাবি করা হয়। চট্টগ্রামের জেলা শাসককে ওই পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দিতে বলা হয়—১৫-৯-১৯৩৯ তারিখে।

অগ্রণী

বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক। ৭বি, যুগপাড়া লেন, কলকাতা প্রকাশিত এবং এক্সপ্রেস প্রিন্টার্স (২০এ, গৌর লাহা স্ট্রীট, কলকাতা) মুদ্রিত। বামপন্থী পত্রিকা। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। ১৯৩৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর সতর্ক করে দেওয়া হয় 'মজদুর' গল্প ছাপানোর জন্য। ১৯৩৯ সালের জুলাই সংখ্যায় ওটি বের হয়। ১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বরেও কাগজটি সতর্ক করে দেওয়া হয় ওই বছরের নভেম্বরে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের জন্য—'ট্রেড ইউনিয়ন ইন দি স্লেভ কানট্রি'। এর পরেও কাগজকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

অলকা

বাংলা মাসিক উগ্রপন্থী। ১৩৪৬ সালের বৈশাখে 'দি টিমিড ওয়ান' বলে একটি লেখা প্রকাশের জন্য ১৯৩৯ সালের ২০শে জুলাই পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া হয়।

আজকাল

বাংলা সাপ্তাহিক। ১২৪-১, মানিকতলা স্ট্রীট, কলকাতা থেকে চিত্র প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। উগ্রপন্থী। 'মিঃ ড্রুমন্ডস্ স্লিচ' নামে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৯৩৯ সালের ৩১শে অক্টোবর পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া হয়।

অমৃত

বাংলা মাসিক। বিদ্যামন্দির প্রেস (৬, মুরারীধর সেন লেন, কলকাতা) থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ধর্মীয় (হিন্দু) অমৃত সমাজের মুখপত্র। উগ্রপন্থী ধরনের।

অর্চনা

বাংলা মাসিক অর্চনা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে (৮, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা) মুদ্রিত। সাহিত্য পত্র। ১৯৩৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের (১৯৩৯) ৭(৩) ধারা অনুসারে প্রিন্টার ও পাবলিশারের কাছ থেকে এক হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়।

অতি আধুনিক

বাংলা মাসিক। ৩৪বি, সুকিয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং জুনো প্রিন্টিং ওয়ার্কসে (১২,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রামচন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা) মুদ্রিত। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া হয়। 'কাজ ফুরোলে পাজি', 'কায়েমী দ্বৈতগীতি' এবং 'বণিকের রাজদণ্ড' নিবন্ধ প্রকাশকের জন্য ১৩৪৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা।

বাহাদুর

বাংলা সাপ্তাহিক। ২, রামরতন বসু লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ভারতী প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং লিঃ (১১/৫, নর্থ রেঞ্জ, পার্কসার্কাস, কলকাতা) মুদ্রিত। ১৯৩৯ সালের ১৬ই জুনের সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন অ্যাফেয়ার্স' এবং'কমিউন্যাল রেসিয়ো ইন সারভিসেস' নিবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য ১৯৩৯ সালের ১২ই জুলাই পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৪০ আবার পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১-১-১৯৪০ তারিখের সংখ্যায় এই লেখাগুলি প্রকাশের জন্য (১) প্রেজেন্ট মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (২) অ্যান অ্যাপীল ইস্যুড বাই মৌলভী এক্রামুল হক (৩) মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সম্মেলনে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ।

বঙ্গশ্রী

বাংলা মাসিক। কলকাতার ৯০ লোয়ার সার্কুলার রোডের মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৯৪০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি পত্রিকাকে সতর্ক করে দেওয়া হয় ১৩৪৬ সালের মাঘে 'দি স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন অব ভিলেজ' নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য।

বঙ্গভাষী

বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিক। বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক মেশিন প্রেসে (২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা) মুদ্রিত, গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ১৯২৬ সালের ১৫ই জুন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৬২ ধারানুসারে এবং সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে ২৫০ টাকা করে জামানত দিতে হয়। ১৯২৫ সালের ১১ই আগস্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারানুসারে পুনরায় এর সম্পাদকের ৩৫০্ জরিমানা বা ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ১০০্ জরিমানা বা ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এর সম্পাদককে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৩-৩-১৯৩১, ৯-৫-১৯৩৪ এবং ১৪-১২-১৯৩৫ বিভিন্ন তারিখের কাগজে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য।

বাংলার দাবি

বাংলা সাপ্তাহিক, কুমিল্লার টাউন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এর ১৩৪৬ সালের ১লা আশ্বিন সংখ্যায় একটি আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য নোয়াখালির জেলা শাসকের মাধ্যমে পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয় ১৯৩৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর।

বরিশাল হিতৈষী :

সাপ্তাহিক। বরিশালের ন্যাশনাল মেশিন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য ১৯৩০ সালের ২০শে অক্টোবর সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস অর্ডিন্যান্সে II এর ৬(৩) ধারা অনুসারে ন্যাশনাল মেশিন প্রেসের মালিকের কাছে হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়। ১৯৩২ সালের ১৩ই জুলাই সতর্ক করে দেওয়া হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে সম্পাদকের সশ্রম দণ্ড হয়। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য মামলায় সম্পাদকের আবার তিন মাস জেল হয়। মুদ্রাকর ও প্রকাশকেরও (ধীরেন্দ্রনাথ সেন) আইন অমান্য মামলায় ১ বছর কারাদণ্ড হয়। আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৯৩৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যাও আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য এই পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দিতে ১৪-৯-৩৯ তারিখে বাখরগঞ্জের জেলা শাসককে বলা হয়।

ভারত

দৈনিক। ২০, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটের আর্ট [illegible]সে মুদ্রিত [illegible] প্রকাশিত [illegible] বিভিন্ন আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য এই দিনগুলি পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া [illegible] ১[illegible]২-১৯৩৯, ৮-১২-১৯৩৯,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯-১২-১৯৩৯, ৮-৭-১৯৪০, ৪-৭-১৯৪০, ৯-৭-১৯৪০, ৪-৯-১৯৪০।

ভারতের সাধনা :

মাসিক। সতর্কীকৃত।

ভারতবর্ষ

মাসিক। সম্পাদক : ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও এস এম চক্রবর্তী। ২৭-১-১৯৩১ এবং ৮-৬-১৯৩১ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

বিচিত্রা

মাসিক, সাহিত্যপত্র, রাজনৈতিক ব্যাপারেও থাকতো।

বর্ধমান বার্তা

সাপ্তাহিক। ১৯৪০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সতর্ক করে দেওয়া হয় ৫ই ফেব্রুয়ারির (১৯৪০) 'দঃ আফ্রিকা ও যুক্ত নিবন্ধের জন্য'। ১৫-৭-১৯৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয় ২০-৫-১৯৪০-এ প্রকাশিত নিবন্ধের জন্য।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

মাসিক। সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ বসু। ২১-১-১৯৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয় ১৩৪৬ পৌষের 'জাহাজী শিল্প' নিবন্ধের জন্য।

চাবুক

দ্বি-সাপ্তাহিক। ঢাকায় ৫২, জনসন রোডের বলরাম প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫-৭-১৯৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৭-৫-১৯৩৯ তারিখে বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিবন্ধ ছাপানোর জন্য।

চলার পথে

মাসিক, সম্পাদক : বি. পি. রক্ষিত রায়। ৮-৫-১৯৩৯ তারিখে পত্রিকাটির মুদ্রক ও প্রকাশকের কাছ থেকে হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়। কাগজের পক্ষ থেকে ওই টাকা জমা না দিয়ে প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ছাত্র অভিযান

বাংলা পত্রিকা। কলকাতার ১৭০, মানিকতলা স্ট্রিটের শ্রীহরি প্রেসে মুদ্রিত এবং ৬২, আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত। ৩১-৮-১৯৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়, ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত নিবন্ধের জন্য। ২-২-১৯৪০ এবং ২৪-৬-১৯৪০ তারিখের সতর্ক করে দেওয়া হয় যথাক্রমে ১৩৪৬ পৌষ এবং ১৩৪৬ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধের জন্য।

কংগ্রেস প্রচার পত্র

মাসিক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রকাশিত।

ঢাকা প্রকাশ

সাপ্তাহিক, সম্পাদক মুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী। ২০-৮-১৯৩০ সালে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

দেশ

সাপ্তাহিক, সম্পাদক বঙ্কিম সেন। উগ্রপন্থী। বিভিন্ন তারিখের ইস্যুর জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়—১৩-২-১৯৩৪ (৩রা ফেব্রুয়ারির 'রাশিয়ান ইয়ুথস্ ইন দি এনদিয়েডর ফর ফ্রিডম')

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০-৩-১৯৩৪, (৩-৩-৩৪-এর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অনশন ধর্মঘট), ১৬-৫-১৯৩৫ (৬-৪-৩৫-এর বাংলার কারা ব্যবস্থা), ৩১-৭-১৯৩৫ (৬-৭-৩৫-এর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস), ২২-২-৪০ (৩১-১-১৯৪০ সাম্রাজ্যবাদের তাৎপর্য)এবং ৯-৯-৩৯কেও সতর্ক করা হয়।

দেশের বাণী

নোয়াখালির বাণী প্রেস থেকে প্রকাশিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং ১৫৩এ ধারা অনুসারে সম্পাদক কে সি রায় চৌধুরী অভিযুক্ত হন এবং ১০০্ ও ৩০০্ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস ও ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৪-৮-৩০, ২১-৮-৩০, ৮-১-৩১ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। প্রেসের মালিকের কাছ থেকে ১০০০্ জামানত দাবি করা হয় আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য। কে সি রায়চৌধুরীর পর মথুরানাথ চক্রবর্তী এর সম্পাদক হন। তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারানুসারে ২৫-৯-৩১ তারিখে নোয়াখালিতে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০্ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হন। ১৯-২-৩১, ১৪-৮-৩২, ২১-২-৩৪, ২৫-১১-৩৬, ১৬-২-৩৮, ২৯-৮-৩৯ তারিখে এই পত্রিকাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

দেশের বাণী

সাপ্তাহিক। ১৭-২-১৯৩৬ তারিখে কাগজে লেখার জন্য ১৯-২-৩৬ তারিখে রাজশাহীর জেলা শাসকের মাধ্যমে কাগজটি সতর্ক করে দেওয়া হয়।

দিনাজপুর পত্রিকা

সাপ্তাহিক। ১৯৩০ সালের ভারতীয় প্রেস অর্ডিনান্সের II ৩(৩) ধারায় সংশ্লিষ্ট প্রেসের মালিকের কাছ থেকে ৫০০ টাকা জামানত দাবি করা হয়। ১৩৪৬য়ের আশ্বিনের সংখ্যায় 'সাহিত্য ও সমাজ' নিবন্ধের জন্য রাজশাহীর জেলা শাসকের মাধ্যমে পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

দুন্দুভি

সাপ্তাহিক। ১৯-১-৩৩য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। গান্ধীজীর প্রশংসায় নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৩-৭-৩৪, ১৪-৭-৩৭ এবং ২৩-৯-৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

গণশক্তি :

সাপ্তাহিক। উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ৩০-৭-৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

গায়ত্রী

মাসিক। খুলনার জেলা শাসকের মাধ্যমে ২৪-৯-৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৫-৯-৪০ তারিখের সংখ্যায় একটি লেখার জন্য।

হেদায়েত

মাসিক। ১৩৪৩ কার্তিক সংখ্যায় একটি লেখার জন্য ১৮-১২-৩৬ তারিখে খুলনার জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

হিন্দু মিশন

১৩৪২'র আশ্বিনে এবং শ্রাবণের দুটি নিবন্ধের জন্য ৬-১-৩৬ তারিখে পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া হয়। 'সিন্ধুর হিন্দু' নিবন্ধের জন্য ১৮-৩-৪০ তারিখেও সতর্ক করে দেওয়া হয়।

হিন্দুস্থান

সাপ্তাহিক। ১৫-৮-৪০ তারিখের সংখ্যায় একটি লেখার জন্য ১২-১০-৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২০-১২-৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৩১-১০-৪০ তারিখের সংখ্যায় একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিবন্ধ প্রকাশের জন্য—'নাড়াইলের হিন্দুদের ওপর জুলুম'।

হিতবাদী

সাপ্তাহিক। ১৭-২-১৯৩০ তারিখে এর মুদ্রাকরের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪এ ধারা অনুসারে। তাছাড়া ১-২-৩২, ৯-৩-৩৪, ৪-১০-৩৪, ২৮-৯-৩৪, ১৩-৮-৩৫, ১৯৩৫য়ের নভেম্বর এবং ৯-৯-৩৯ তারিখে পত্রিকাটি সতর্ক করে দেওয়া হয় বিভিন্ন সংখ্যায় আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য।

জাগরণ

সাপ্তাহিক। কৃষকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কুষ্ঠিয়া থেকে প্রকাশিত। ১৯২৩ সালে ম্যাজিস্ট্রেট সতর্ক করে দেন আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য। ১৯২৯ সালে প্রেস কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ, ১৫৩এ ধারা অনুসারে সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক দণ্ডিত হন। ১৮-৯-৩০ তারিখে সম্পাদকের ৬ মাস কারাদণ্ড হয়। ২-৭-১৯৩০ সতর্ক করে দেওয়া হয়। প্রেসের মালিকের কাছ থেকে ৫০০৲ জামানত দাবি করা হয়।

জনমত

সাপ্তাহিক। ১৯৩৩ সালের ১২ই জুলাই সতর্ক করে দেওয়া হয় 'বিপ্লব' নিবন্ধের জন্য এবং ২৪-৭-৩৩ তারিখেও সতর্ক করা হয়—'বেলডাঙ্গা' লেখাটির জন্য।

জয়শ্রী

মাসিক। মেয়েদের মুখপত্র। সম্পাদিকা লীলা রায়। মুদ্রক ও প্রকাশক সুশীলচন্দ্র নাগের কাছ থেকে ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের (১৯৩১) ৭(৩) ধারা মতে এক হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়। ২১-৭-৩২, ১০-১-৩৩ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ঢাকার জেলা শাসক নতুন প্রকাশকের কাছ থেকে ৩০০ টাকা জামানত দাবি করেন। ৩১-৭-৩৪, ১৩-১১-৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

খেয়ালি

সাপ্তাহিক। ১১-১১-৩২ তারিখের সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠি প্রকাশের জন্য ১৬-১২-৩২ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২২-১-৩১, ২৯-৯-৩২ তারিখেও সতর্কীকৃত।

খুলনাবাসী

সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ। আপত্তিকর কবিতা প্রকাশের জন্য ১৯১১ সালে ১০০ টাকা জরিমানা হয়।

কৃষক

সম্পাদক আবদুল মনসুর আহমেদ। ২৪-৭-৩৯ সংখ্যায় 'শক্তের ভক্ত' নিবন্ধের জন্য ২৯-৮-৩৯য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৩-৯-৩৯য়ে, ২০-৯-৩৯, ২৮-৫-৪০ তারিখেও সতর্ক করা হয়। ২৭-১১-৪০ তারিখেও সতর্ক করা হয় ২৩-১১-৪০ সংখ্যার লেখার জন্য।

মালদা সমাচার:

আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য ১৯৩০ সালের ভারতীয় প্রেস অর্ডিন্যান্সের ৩(৬) ধারা মতে ধন্বন্তরী প্রেসের মালিকের কাছ থেকে হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়।

মন্দিরা

মাসিক। কমিউনিস্ট পন্থী। ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ৭(১) ধারানুসারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১২-৭-৩৯ তারিখে এর মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের কাছ থেকে হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয় এবং ২-১০-৩৯ তারিখে তা জমা দেওয়া হয়। ১৩৪৬ সালে 'মজুর' কবিতা ছাপার জন্য ২-৬-৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৯-১১-৪০, ২৭-১১-৪০, তারিখে সতর্ক করা হয় ১৩৪৪ কার্তিক সংখ্যায় 'ঋণ পরিশোধ' এবং আর একটি আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য।

মেদিনীপুর হিতৈষী :

২২-১১-৩৯ তারিখে একটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য মেদিনীপুরের জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

মহম্মদী

সাপ্তাহিক। ব্রিটিশ বিরোধী প্রভাবশালী মুসলিম মুখপত্র। ৫-৮-১৯২০ তারিখে দেড় হাজার টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। আপত্তিকর লেখার জন্য ১৯১৫ সালে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৭-৯-২০ ফের ৫ হাজার টাকা জামানত দেওয়া হয়। তাও বাজেয়াপ্ত হয়। এবং আবার ৪০০০৲ জামানত দাবি করা হয়। আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে ১৪-৯-১৯১৮ তারিখে সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশকের উপর প্রি-সেন্সরশিপ আদেশ জারি হয়, এবং ৫ সপ্তাহ কোন কাগজ বের হয়নি। প্রাক্-সেন্সর আদেশ প্রত্যাহারের পর ২৫-১০-১৮ পুনরায় বের হয়। ১৪-১২-২১ তারিখে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এর মালিক মহম্মদ আক্রাম খাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আপত্তিকর লেখার জন্য ১৯২২সালে ফের সতর্ক করে দেওয়া হয়। ফৌজদারী বিধির ৫৩২ ধারা অনুসারে সম্পাদক ফজলুল হক দণ্ডিত হন। ৪-৬-১৯২৬এ তাঁকে এক বছরের জন্য মুচলেকা ও ৫০০ টাকা জামানত দিতে হয়। ২৮-৮-১৯৩০, ৪-১-৩১ তারিখে আবার সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২০-১-৩২, ১-২-৩২, ৬-৮-৩৫, ৯-৭-৩৬ তারিখেও সতর্ক করা হয়।

নয়া বাংলা

সাপ্তাহিক। কংগ্রেস সমর্থক। ২০-৮-৩৭য়ের সংখ্যায় 'আন্দামানে' 'লাঠিচালন' নিবন্ধের জন্য ১৫-৯-৩৭য়ে প্রেস অফিসার সতর্ক করে দেন। ২১-৭-৩৯য়ে 'রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট' নিবন্ধের জন্য ৩০-৮-৩৯য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

নয়া জমানা :

বাংলা-হিন্দী সাপ্তাহিক। ৯-৯-৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

নতুন নায়ক

দৈনিক। ২৭-১১-৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয় 'জনমতের জয়' নিবন্ধের জন্য এবং ২০-১১-৪০ ও ২১-১১-৪০-এর কাগজে সম্পাদকীয়ের জন্য।

পল্লী পয়গম

সাপ্তাহিক। উগ্রপন্থী। ১৯৩৯ সালের ৮ নভেম্বরের নিবন্ধের জন্য নোয়াখালির জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়। পত্রিকাটি নোয়াখালি থেকে প্রকাশিত।

পল্লী শিক্ষক :

অর্ধ সাপ্তাহিক। বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের মুখপত্র। ১৩৪৬য়ের ভাদ্র ও আশ্বিনের একটি কবিতা প্রকাশের জন্য রাজশাহীর জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

পাঞ্চজন্য

দৈনিক। উগ্রপন্থী। ৩-৩-৩১, ২-৩-৩৩, ৩-৮-৩৩ ১১-৮-[illegible] তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডুলিপি

মাসিক। আপত্তিকর কবিতা প্রকাশের অভিযোগ। কমিউনিস্ট পন্থী।

পাঠশালা

মাসিক শিশুপত্রিকা। ২৪-৬-৪০য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৭-৬-৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'যুদ্ধ ও বর্তমান পরিস্থিতি' নিবন্ধের জন্য সতর্কীকৃত।

প্রদীপ

মাসিক। সতর্কীকৃত।

প্রদীপ

সাপ্তাহিক। ১৩৪০, শ্রাবণের একটি নিবন্ধের জন্য ২৫-৮-৩৩ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৯-৩-৩৬, ৭-১০-৩৬ তারিখেও সতর্ক করা হয়। সম্পাদক অতুলচন্দ্র ঘোষ।

প্রজার কথা

পাক্ষিক, কমিউনিস্ট উগ্রপন্থী। ৩১-৭-৩৯, ১৬-১-৩১, ২৫-২-৩১, ৩-২-৩২, ১০-৭-৩০, ২৭-১১-৩৯ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। আপত্তি—১৭-১১-৩৯, ১৬-৫-৩০ ও ১৮-১০-৩২য়ের সংখ্যায় লেখার জন্য।

প্রণব :

মাসিক। ১৩৪৭, শ্রাবণ সংখ্যায় আপত্তিকর লেখার জন্য ২১-১০-৪০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়। সম্পাদক স্বামী বেদান্ত (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ)।

প্রবর্ত্তক :

মাসিক, উগ্রপন্থী। ৯-৮-৩৫ তারিখ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশের অনুমতি দেন ফরাসী কর্তৃপক্ষ। ১৯২২ সালে চন্দননগরের ফরাসী সরকার একে সতর্ক করে দেন। ১৯২৬ জানুয়ারি ৩ মাস সাসপেণ্ড করে দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় প্রেস অর্ডিনান্সের II ৩(৩) প্রকাশ প্রেসের মালিকের কাছ থেকে হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়। ১৯৩১ সালের ২৯শে জানুয়ারি আবার সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ৭(৩) ধারায় পত্রিকার প্রকাশকের কাছ থেকে ৫০০৲ জামানত দাবি করা হয় এবং তা জমাও দেওয়া হয়। পত্রিকাটি চন্দননগর থেকে প্রকাশিত।

প্রবাসী

মাসিক উগ্রপন্থী। ২৮-১-৩১, ৩-২-৩২, ৫-৩-৩৪ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

সচিত্র সোনার বাংলা

সাপ্তাহিক। ২-৯-৩৯ তারিখের কাগজের 'এখানে সেখানে' লেখার জন্য ১৯-৯-৩৯ তারিখে ঢাকার জেলা শাসককে বলা হয় এই কাগজটিকে সতর্ক করে দিতে। সম্পাদক ছিলেন নলিনী কিশোর গুহ।

সংবাদ

সাপ্তাহিক। ৩-৮-৩৯ তারিখের কাগজে 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' লেখার জন্য ১২-৯-৩৯ তারিখে বর্ধমানের জেলা শাসককে কাগজটিকে সতর্ক করে দিতে বলা হয়। ১১-৩-৪০, ১১-৫-৪০ তারিখের লেখার জন্য বর্ধমানের জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা

সাপ্তাহিক। ৬-১-৪০য়ের সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধের জন্য ১-৬-৪০এ সতর্ক করে দেওয়া হয়। সম্পাদক ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংগ্রাম

সাপ্তাহিক। উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট পন্থী। চট্টগ্রামের জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয় ১২-১১-৩৯-এর (বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা) এবং ২৫-১১-৩৯য়ে যুদ্ধ সম্পর্কে লেখার জন্য।

সঞ্জীবনী

সাপ্তাহিক। ১৭-৭-৩৫য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৩-১-৩৪য়ে আপত্তিকর শিরোনামা ছাপার জন্য। ৬-৯-৩৯য়ে সতর্ক করা হয় ১০-৮-৩৯য়ে প্রকাশিত নিবন্ধের জন্য।

সপ্তক

সাপ্তাহিক। ২৪-৫-৪০য়ে বাখরগঞ্জের জেলা শাসকের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৪-৫-৪০ সংখ্যায় মে দিবস সম্পর্কে লেখার জন্য।

রথদীপিকা

সাপ্তাহিক। ১৩-৮-৩৫য়ে সতর্কীকৃত। ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত।

সৎসঙ্গী (সাপ্তাহিক) পাবনা সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র মুখার্জি পি সি চক্রবর্তী	উগ্রপন্থী। 'মুক্তির পথ' নিবন্ধের জন্য ১২-৯-৩৫য়ে পাবনার জেলা শাসককে পত্রিকাটি সতর্ক করে দিতে বলা হয়।
শরিয়ৎ-ই-ইসলাম মাসিক সম্পাদক : হাজি আহমদা আলি এনায়েৎ পুরী	১৩৩৯, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখার জন্য ২১-৬-৩২য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।
সুনীতি (অর্ধ সাপ্তাহিক) চট্টগ্রাম সম্পাদক : এম. ও. আজিম	১৩-১০-৩১ চট্টগ্রামের জেলা শাসক কর্তৃক সতর্ক করে দেওয়া হয়।
স্বদেশ (সাপ্তাহিক) চট্টগ্রাম সম্পাদক : কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক ও মুরারী মোহন চ্যাটার্জি	১৩৪৩, পৌষ সংখ্যায় লেখার জন্য ২-৪-৩৭য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।
ভগ্নদূত (সাপ্তাহিক) সম্পাদক : শিশির কুমার বসু	৬-৯-১৯৩০ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয়।
ওয়ার্কার্স ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী সাপ্তাহিক। সম্পাদক কে. সি. মিত্র	শ্রমিক পত্র। ১৯৩৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর সতর্ক করে দেওয়া হয় ২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯ সংখ্যায় লেখার জন্য।
যুবক (মাসিক) সম্পাদক যোগানন্দ ভারতী	সতর্কীকৃত
চারুমিহির (সাপ্তাহিক)	৫-২-১৯৩১ তারিখে সতর্কীকৃত। মৈমনসিংহ থেকে প্রকাশিত।
চাষী (সাপ্তাহিক)	'চাষী' কবিতার জন্য ২৫-৮-১৯৩৯য়ে সতর্কীকৃত।

বসুমতী (দৈনিক)

উগ্রপন্থী। ১৯২০ সালে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৪-৬-[illegible]২[illegible] সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর দণ্ডিত হন। তবে হাইকোর্টে আপীলের পর মুক্তি পান। [illegible]-১৯৩০, ১৫-৭-৩০, ২-৭-৩০,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

২৩-৭-৩০, ১২-১-৩১, ২০-১-৩১, ২-২-৩১, ১৯-২-৩১, ৩-৩-৩১য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

৩-৪-৩২য়ে উত্তর প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট বের করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৯-৬-৩২য়ে পত্রিকার প্রকাশক ও বসুমতী প্রেসের কীপারের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে জামানত দাবি করা হয়। জামানত জমা দেওয়া হয়। ৯-১-৩২, ১১-১-৩২, ২-১-৩২, ১০-২-৩২, ১-৪-৩২, ১২-৫-৩২য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

৯-১২-৩২য়ে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রকাশক ও প্রেসের কিপারের কাছ থেকে নতুন করে তিন হাজার টাকা করে জামানত দাবি করা হয়।। হাইকোর্টে আপীল করা হলে রাজ্য সরকারের আদেশে খারিজ হয়ে যায়। ২৪-৭-৩২য়ে নদীয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি রিপোর্ট বের করার জন্য ১৯-৬-৩২য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এছাড়া ১৩-৬-৩৩য়ে (আপত্তিকর শিরোনামার জন্য) ১৮-৯-৩৩এ (১০-৯-৩৩য়ে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য), ২৮-১২-৩৩এ (৬-১০-৩৩য়ে আপত্তিকর শিরোনামার জন্য) সতর্ক করে দেওয়া হয়।

১৯৩৪য়ের ২রা জানুয়ারি সতর্ক করে দেওয়া হয় ২০-১২-৩৩য়ে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য। তাছাড়া (৩-১-৩৪এ আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ৬-২-৩৪এ (৩০-১-৩৪য়ে স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশের জন্য), ৭-৪-৩৪এ (২৯-৩-৩৪এ আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ১৬-৪-৩৪এ (৭-৪-৩৪য়ে আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ২৬-৬-৩৪ (২৭-৪-৩৪য়ে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য,) ১-৫-৩৪ (২১-৪-৩৪য়ে লয়ালপুরে গুলিবর্ষণ সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য), ৪-৫-৩৪য়ে (২৭-৪-৩৪ তারিখে আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ১৭-৫-৩৫য়ে (নোয়াখালির ঘটনা ও লেবংয়ে জুলুম সম্পর্কে যথাক্রমে ৮-৫-৩৪ এবং ১২-৫-৩৪য়ে নিবন্ধের জন্য), ১৭-৭-৩৪য়ে (১৭-১১-৩৪ তারিখের 'জনগণ ও পুলিশ' নিবন্ধের জন্য), ৪-১২-৩৪এ (১৭-১১-৩১য়ে গফুর খাঁ সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য) সতর্কীকৃত।

১৯৩৫য়ের ১১ই জানুয়ারি সতর্ক করে দেওয়া হয় ১৬-১২-৩৪য়ে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য। তাছাড়া ৫-৫-৩৫য়ে (৩০-৩-৩৫য়ে আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ২-৮-৩৫ (১১-৮-৩৫-এ সভ্যতা প্রসারের উপায় নিবন্ধের জন্য) সতর্ক করা হয়।

১৪-১০-৩৫-এ প্রকাশক ও প্রেসের কীপারের ৫০০ টাকা করে জামানত জব্দ হয়। এবং প্রত্যেক বর্ধিত হারে ৩ হাজার করে জামানত দিতে হয়। এর বিরুদ্ধে আবেদন প্রেস আইনের ২৩ ধারা বলে হাইকোর্ট বাতিল করে।

১৫-১-৩৬-এ সতর্কীকৃত ২৯-১২-৩৫য়ের নিবন্ধের জন্য, ২২-৫-৩৭য়ে সতর্কীকৃত ১১-৪-৩৭য়ের নিবন্ধের (বাংলা কাব্য ?) জন্য। ২৮-৭-৩৭য়ে জামানতের কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১০-৮-৩৭য়ে বর্ধিত হারের ৭৫০০ টাকার জামানত জমা দিতে হয় প্রকাশক ও কিপার প্রত্যেককে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন জানানো হলে সরকারী আদেশ বাতিল হয়ে যায়। এবং ১৪০০০ টাকা ফিরত দেওয়া হয়। ২০-১০-৩৯য়ে সতর্কীকৃত। আরও সতর্কীকৃত ৮-৭-৪০-এ (৩-৭-৪০-এ আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য,) ১৬-৭-৪০ এ (১২-৭-৪০য়ে 'ব্রিটেন ও দূর প্রাচ্য' নিবন্ধের জন্য), ১০-১-৪১য়ে (২০-৮-৪০, ১৯-৯-৪০ এবং ২৫-৯-৪০-এ সিভিক গার্ড সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য), ১২-১২-৪০-এ, ২৬-১১-৪০, ২৮-১১-৪০ (প্রতিশ্রুতির পর), ৩-১২-৪০ (সংবাদপত্র ও সরকার) এবং ৬-১২-৪০ ('সংবাদপত্র ও সরকার' নিবন্ধের জন্য)।

দৈনিক বসুমতীর ৯ই চৈত্র, ১৩৪০র সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয় ২৭-৩-১৯৪০য়ের গেজেট ঘোষণায়। ভারতরক্ষা বিধি বলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

যুগান্তর

দৈনিক-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখার্জি।

উগ্রপন্থী ২৫।১১।৩৭য়ে নারী কয়েদীদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধের জন্য ৮।১২।৩৫-এ সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৩।২।৩৮য়ে সতর্ক করা হয় ৩০।১২।৩৭ তারিখের কাগজে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুক্তবন্দীদের সংবর্ধনা রিপোর্ট ছাপানোর জন্য,২৩।৬।৩৯য়ে সতর্ক করা হয়২৮।৫।৩৯য়েএকটি ভাষণ বের করার জন্য। ৮।২।৩৯য়ে সতর্ক করা হয় ১৬।১০।৩৮য়ে একটি নিবন্ধের জন্য, ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ৭(৩) ধারা মতে বিজনকান্তি ঘোষ ও ধীরেন্দ্রমোহন সেনের (কিপার ও পাবলিশার্স) ২ হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয় ২০।৬।৩৯ তারিখে। পরে এই জামানতের দাবি প্রত্যাহার করা হয়। ৭।৯।৩৯, ১০।৯।৩৯, ১।১১।৩৯, ২০।১২।৩৯ (১৮।১২।৩৯য়ে 'সময়ের চিহ্ন' নিবন্ধের জন্য), ২৭।১১।৪০ (২২।১১।৪০য়ে মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার নিবন্ধের জন্য), ৬।১২।৪০ (আপত্তিকর শিরোনামার জন্য) সতর্ক করে দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের ২১শে এপ্রিলের গেজেটে যুগান্তরের ২১।৪।১৯৪২ তারিখের (কলকাতা সংস্করণ) কাগজটি বাজেয়াপ্ত হয়। ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে বাংলা সরকার এই ব্যবস্থা নেন।

ভারত (দৈনিক)

কলকাতার ২০, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীটের আর্ট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। উগ্রপন্থী।

১১।১২।৩৯য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৮।১২।৩৯য়ে রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্কে এবং ৯।১২।৩৯য়ে জিন্না সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য। ৮।৭।৪০য়ে (৩।৭।৪০য়ে আপত্তিকর শিরোনামা 'ব্রিটেনকে মার্কিন সাহায্য বন্ধ'র জন্য), ৪।৯।৪০ (২৯।৮।৪০য়ে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য) সতর্ক করে দেওয়া হয়।

কৃষক (দৈনিক)

সতর্কীকৃত—২৯।৮।৩৯য়ে।

নতুন নায়ক (দৈনিক)

সতর্কীকৃত—২৭।১১।৪০য়ে।

পাঞ্চজন্য (দৈনিক)

সতর্কীকৃত—৩।৩।৩১য়ে।

আনন্দবাজার

(দৈনিক, অর্ধ সাপ্তাহিক, ডাক সংস্করণ। কলকাতার ১ বর্মন স্ট্রীটের আনন্দ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।)

উগ্রপন্থী প্রভাবশালী সংবাদপত্র। বিদ্রোহাত্মক লেখার জন্য সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ধারা এবং ১১৭, ১৪৭ ও ১৪৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত হন এবং পরে মুক্তি পান ৭।১৩।১৯২৬ তারিখে। ১৯২৯ সালের ২৬শে মার্চ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের হাজার টাকা জরিমানা হয়। ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। গেজেট ঘোষণা থেকে জানা যায়, ওই পত্রটি ৭১/১, মির্জাপুর স্ট্রীটের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১২।১।১৯২৯, ২১।১।১৯৩১ এবং ১১।২।১৯৩১, ২০।১।১৯৩২, ৫।২।৩২, ৫।৬।৩২ তারিখে সতর্ক করে দেওয়া হয় আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য। ৮।১।৩২, ২৫।৭।৩২ এবং ৭।৯।৩২ তারিখেও সতর্ক করে দেওয়া হয়।

১৯৩১ সালের ২রা জুলাই কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। ভারতীয় প্রেস অর্ডিন্যান্স , ১৯৩০য়ের ৩(৩) ধারানুসারে আপত্তিকর লেখা প্রকাশের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের মালিকের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা জামানত দাবি করা হয়। প্রেসের মালিক (কিপার) বদল হয় এবং তিনি ২ হাজার টাকা জামানত দেন। ২৬।৫।৩২ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশক ও আনন্দ প্রেসের কিপারের কাছ থেকে হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টাকা করে জামানত দাবি করা হয়। ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ২৩ ধারানুসারে একটি আবেদন হাইকোর্ট করে দেন। ৮।৬।৩২ তারিখে জামানত জমা দেওয়া হয়। পরে জামানতের একাংশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। পুনরায় হাইকোর্টে আবেদন বাতিল হলে ২ হাজার টাকা করে বর্ধিত হারে জামানত দেওয়া হয়। এই বর্ধিত জামানতের একাংশও বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর পত্রিকার প্রকাশক ও প্রেসের মুদ্রাকর উভয়কেই ৫ হাজার টাকা করে আবার জামানত জমা দিতে হয় এবং আগের জামানতের বাজেয়াপ্ত না-হওয়া অংশও জমা রাখতে হয়। নতুন করে ডিক্লেরেশনও দিতে হয়। ১৯৩২ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ২৩ ধারা অনুসারে পত্রিকার প্রকাশক ও প্রেসের কিপারের আবেদনক্রমে হাইকোর্টে স্থানীয় সরকারের আদেশ খারিজ করে দেওয়া হয় 'মেদিনীপুরে পাইকারী জরিমানা' নিবন্ধের জন্য, ১৫।৮।৩৩য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৫।৮।৩৩ তারিখে 'গান্ধীজীর দণ্ড সম্পর্কে লেখা প্রকাশের জন্য, ১২।১২।৩৩ সতর্ক করে দেওয়া আপত্তি শিরোনামা প্রকাশের জন্য, ১৪।২।৩৪য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৬।২।৩৪য়ের কাগজে বাংলার মেয়ে সম্পর্কে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য, ১৭।২।৩৪ সতর্ক করে দেওয়া হয় ১১।২।৩৪য়ে মেদিনীপুরের ঘটনা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য, ৯।৩।৩৪ সতর্ক করা হয় ১৩।৩।৩৪য়ে হোলি সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য, ১৪।৩।৩৪ সতর্ক করা হয় ৪।৩।৩৪য়ে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য, ৯।৪।৩৪ এ সতর্ক করা হয় ৩১।৩।৩৪ ও ১।৪।৩৪য়ে আপত্তিকর শিরোনামার জন্য। ১৯৩৪ সালের ২৪ এপ্রিল (১।৩।৩৪য়ে 'ভারত সরকারের পরাধীনতা' নিবন্ধের জন্য),৭ই মে (২৭।৪।৩৪য়ে আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ২৯শে মে (২০।৫।৩৪য়ে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য), ২৭শে জুন (১২।৬।৩৪য়ে অর্থনৈতিক অধীনতা এবং ১৫।৬।৩৪য়ে সি আর দাস নিবন্ধের জন্য, ৩১শে জুলাই (২।৩।৩৪য়ে কুমিল্লায় রাজ্যপালের সফর নিবন্ধের জন্য) ৪ঠা ডিসেম্বর (১৭।১২।৩৪য়ে গফুর খাঁর ভাষণসহ আপত্তিকর শিরোনামার জন্য)।

১৯৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সতর্ক করে দেওয়া হয় ২৪।১০।৩৪য়ে কংগ্রেস সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য। ৩০।৪।৩৫ সতর্কীকৃত ১০।৩।৩৫য়ে 'দমননীতি' নিবন্ধের জন্য। তাছাড়া ১৮।৫।৩৫য়ে (১০।৫।৩৫য়ে জরুরী আইন সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য) ৬।৭।৩৫ (৩০।৬।৩৫-এ আপত্তিকর শিরোনামার জন্য), ২৭।৮।৩৫য়ে (৯।৮।৩৫য়ে গ্রাম বাংলা সম্পর্কে নিবন্ধের জন্য), ১৯।৯।৩৫য়ে (২৩।৭।৩৫-এ 'কালিম্পঙের রাজনৈতিক বন্দীরা' নিবন্ধের জন্য) সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৬।৭।৩৫ তারিখের কাগজে শহীদগঞ্জ গুরুদ্বার সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের জন্যও প্রেস অফিসার সতর্ক করে দেন।

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারি সতর্ক করে দেওয়া হয় ৭।১২।৩৫ তারিখে জমিদারদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধের জন্য। ৪।৪।৩৬য়ে আপত্তিকর নিবন্ধের জন্য, ৬।৪।৩৬ (২৬।৩।৩৬য়ে আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের জন্য)য়েও সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৭।৯।৩৬ পত্রিকা প্রকাশের এবং আনন্দ প্রেসের কিপারের কাছ থেকে হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৯৩১ সালে ভারতীয় প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স আইনে। ওই আইনের ২৩ ধারানুসারে যে আবেদন করা হয়, কলকাতা হাইকোর্ট তা খারিজ করে দেন। প্রকাশক ও প্রেস-কিপার বর্ধিত ৫০০০ টাকা করে জামানত জমা দেন। ১৯।৫।৩৭য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয় ৯।৪।৩৭ এ জাতীয় সপ্তাহ নামে এক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য।

১।৭।৩৭য়ে 'বাংলার স্বায়ত্ত শাসন' সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ১৯।১০।৩৭য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৮।৫।৩৯য়ে এম সি চক্রবর্তীর ভাষণ ছাপানোর জন্য ২৩।৩।৩৯য়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২৭।৫।৪০য়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ২৯।৬।৪০-এ সতর্ক করে দেওয়া হয়। ৩।৭।৪০য়ে 'ব্রিটেনকে' আমেরিকার সাহায্য বন্ধ বলে' একটি শিরোনামার জন্য ৯।৭।৪০-এ সতর্ক করে দেওয়া হয়। ১৬।১০।৪০-এ একটি নিবন্ধের জন্য ৫।১১।৪০-এ সতর্ক করে দেওয়া হয়। ২০।১১।৪০ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে শিরোনামা প্রকাশের জন্য ২৭।১১।৪০য়ে সতর্ক করা হয়। 'প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন ধর্মঘট' শীর্ষক ১।১২।৪০য়ে নিবন্ধের জন্য ১২।১২।৪০ সতর্ক করে দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের ৩০শে মের গেজেটে ঘোষণায় জানা যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার চার দিনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সংস্করণ বাতিল হয় ১১।১২।৪৬, ২৪।১।৪৭, ৪।৪।৪৭, ১৯৩১ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ১৯ ধারায় ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সোনার বাংলা, যুগান্তর ও নবশক্তি

প্রেস আইনের ১৫ ধারানুসারে প্রয়োজনীয় ডিক্লেরেশন ব্যতীত সোনার বাংলা, যুগান্তর ও নবশক্তি পত্রিকাগুলি ছাপানো ও প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের এজলাসে এই তিনজন অভিযুক্ত হন :—

(১) কেশবচন্দ্র সেন (কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কসের মালিক)
(২) শ্রীমন্তন রায়চৌধুরী (এই প্রেসের প্রিন্টার)
(৩) বাসুদেব ভট্টাচার্য (সোনার বাংলার সম্পাদক ও প্রকাশক)

সম্পাদক বাসুদেব ভট্টাচার্যের দুইশত টাকা জরিমানা হয়। অন্য দুজনও দণ্ডিত হন।

আপত্তিকর লেখার জন্য সোনার বাংলার ২টি সংখ্যার বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়। এই কাগজটি বেশিদিন চলেনি।

বন্দেমাতরম্

বন্দেমাতরম যদিও ইংরাজি পত্রিকা তবু বাংলা পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারী রোষ আলোচনার সময় এই পত্রিকাটিও এসে যায়। কারণ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অন্যতম কারণ 'যুগান্তরে' প্রকাশিত আপত্তিকর নিবন্ধগুলি। সে কথা বিবেচনা করে ইংরাজি হলেও 'বন্দেমাতরম' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে (ডি এন কিংসফোর্ড) তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তাঁরা হলেন অরবিন্দ ঘোষ (বন্দেমাতরম সম্পাদনার অভিযোগে), হেমেন্দ্রনাথ বাগচী (ম্যানেজার) ও অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত (প্রিন্টার) ১৯০৭ সালের ২৬শে জুলাইয়ে যুগান্তরের আপত্তিকর নিবন্ধগুলি পুনঃমুদ্রণের জন্য ও ২৭শে জুলাইয়ে 'পলিটিকস্ ফর ইনডিয়ান' নিবন্ধের জন্য ওই অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এই মামলায় প্রমাণাভাবে অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচী (প্রিন্টার) মুক্তি পান তবে প্রকাশক অপূর্ব বসুর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়—২৩।৯।১৯০৭ তারিখে।

যুগান্তরের যে সব তারিখের কাগজের আপত্তিকর লেখাগুলি বন্দেমাতরমে ছাপা হয়, তার মধ্যে আছে

১৯০৭ সালের ৭ এপ্রিলের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার ইচ্ছার বিকাশ। ৫ই মে'র বিভেদ সৃষ্টি ও শাসনের নীতি। ১২ই মে'র পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি। ২রা জুনের বিদেশী শাসনের বিনাশ। ৯ই জুনের স্বাধীনতার জন্য বলপ্রয়োগ পাপ নয়। ৯ই জুনের সংবাদপত্রের সম্পাদকের কারাদণ্ড। ১৬ই জুলাইয়ের লাঠি ও ভয় দূর কর। ৩রা জুনের দমননীতির বিরুদ্ধে সরকারকে সতর্ক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট: অশ্লীলতা

কল্লোল-কালি-কলমের যুগের কিছু কিছু তরুণ লেখকের লেখা অশ্লীলতার অভিযোগে সরকারী রোষে পড়েছিল, এ সব লেখা বাজেয়াপ্ত না হলেও, এ নিয়ে সেযুগে তুমুল বিতর্ক ও বাদানুবাদ হয়েছিল। এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অল্পবিস্তর জড়িত হয়েছিলেন। সরকারও কোনো কোনো লেখার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা রুজুও করেছিলেন। আবার কোনো কোনো লেখার লেখক বা প্রকাশককে পুলিশ লালবাজারে ডেকে সতর্কও করে দেয়। সাময়িকভাবে কোনো লেখার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কোনো লেখাই একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে পুনর্মুদ্রিত হয়। এসব লেখার উপর রাজরোষ পড়লেও তার দংশন মারাত্মক ছিল না, তবে এ নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল তার গুরুত্ব আছে সাহিত্যের ইতিহাসে।

যে সব লেখা নিয়ে এই অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল, তাতে উপন্যাস গল্প কবিতা সবই আছে, সেগুলি হচ্ছে

(১) 'যবনিকা পতন'—বুদ্ধদেব বসু (উপন্যাস)
(২) 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে'—বুদ্ধদেব বসু (গল্প)
(৩) পাঁক—প্রেমেন্দ্র মিত্র (উপন্যাস)
(৪) বিবাহের চেয়ে বড়—অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত
(৫) রজনী হল উতলা—বুদ্ধদেব বসু (গল্প)
(৬) গাব আজ আনন্দের গান—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (কবিতা)
(৭) পটলডাঙার পাঁচালি—যুবনাশ্ব (গল্প)
(৮) মাধবী প্রলাপ—নজরুল (কবিতা)
(৯) অনামিকা—নজরুল (কবিতা)
(১০) বন্দীর বন্দনা—বুদ্ধদেব বসু (কবিতা)
(১১) বেদে—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (উপন্যাস)
(১২) যাযাবর—প্রবোধ স্যান্যাল (উপন্যাস)
(১৩) চিত্রবহা—সুবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (উপন্যাস)
(১৪) শ্রাবণ ঘন গহন মোহে—নিরুপম গুপ্ত (গল্প)
(১৫) দিদিমণি—শৈলজা মুখোপাধ্যায় (গল্প)
(১৬) পোনাখাট পেরিয়ে—প্রেমেন্দ্র মিত্র (গল্প)
(১৭) নাগার্জুন—মোহিতলাল মজুমদার (কবিতা)
(১৮) পাপের ছাপ—নরেশ সেনগুপ্ত (উপন্যাস)
(১৯) বস্ত্রহরণ—সুরেশ চক্রবর্তী (কবিতা)
(২০) মুকুলদার মর্মকথা—(গল্প)
(২১) রমেশদার আত্মকথা—(গল্প)
(২২) শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত—(গল্প)
(২৩) প্রাচীর ও প্রান্তর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (উপন্যাস)

সেদিনের কথা এবং এসব লেখা নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, তার সাক্ষ্য আছে অচিন্ত্যকুমারেরই কথায়। তিনি ব্যঙ্গ করে লেখেন যে যুগের কথা

'এতসব ভীষণ দুষ্কাণ্ড, এর প্রতিকার কি ? সাহিত্য কি ছারেখারে যাবে, সমাজ কি যাবে রসাতলে ? দেশের ক্ষত্রশক্তি কি তিতিক্ষার- ব্রত নিয়েছে।

(কল্লোল যুগ, অচিন্ত্য পৃঃ ১২৫)

এ নিয়ে এমন কি সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে পর্যন্ত আর্জি পেশ করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"শ্রীচরণকমলেষু

প্রণাম নিবেদন মিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে, এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এযাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা Stanza, অক্ষর মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না। গল্পের Form সম্পূর্ণ আধুনিক, লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। বাধা সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তারা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণত প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী পুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্ক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেশবাবুর কয়েকখানি বই কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) 'কল্লোল' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটির (অর্থাৎ 'বন্দীব বন্দনা'), 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এ সব লেখার দু'একটা পড়ে থাকবেন, আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে শনিবারের চিঠিতে এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি আর অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এইসব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্বেই এই ধরনের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন···ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষা বলে হেলা পায়। আপনি কথা বললে আর যাই বলুক, ঈর্ষার অপবাদ কেউ দেবে না। আমার প্রণাম জানবেন। প্রণত শ্রীসজনীকান্ত দাস।"

এই সবের লেখক ও প্রকাশককে পুলিশের উৎপাত ও মামলায় পড়তে হয়, তার মধ্যে একটি ঘটনা

"অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের অভিযোগে কালি-কলম অফিসে পুলিশী হানাও হয়েছিল, কিন্তু কে জানত ভারতীয় দলের একজন প্রধান লেখকের উপন্যাসকে লক্ষ্য করে কালি-কলম অফিসে পুলিসে হানা দেবে! শুধু হানা নয়, একেবারে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। কার বিরুদ্ধে ? সম্পাদক মুরলীধর বসু আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগীর বিরুদ্ধে, অপরাধ ? অপরাধ অশ্লীল সাহিত্য প্রচার (কল্লোল যুগ, পৃঃ ১৬০)

সরকারী উকিল তারক সাধু এদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন আদালতে। তবে শেষ পর্যন্ত বেনিফিট অব ডাউটে এঁরা মুক্তি পেলেন। ওই মামলায় মুরলীধর বসু আত্মপক্ষ সমর্থন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলেন, 'আমাদের পক্ষে কোন উকিল নেই, একমাত্র ভবিষ্যতই আমাদের উকিল।'

রবীন্দ্রনাথ এই অশ্লীল সাহিত্য নিয়ে বিতর্কে তাঁর চিঠিতে লেখেন 'আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, 'নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে'।

সাহিত্য সম্মিলনীর ভাষণে শরৎচন্দ্রও এ প্রসঙ্গ তুলেছেন : 'আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি এখনও খেয়াল হয় নি এটা এসেছে হালে....'

সে যুগে এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র প্রতিবাদ তুলেছিলেন সজনীকান্ত দাস। তিনি দিনের পর দিন শনিবারের চিঠিতে এ নিয়ে লেখেন।

সে যুগের এইসব লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য '...সে জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো একশ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এসব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী আস্থামাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না, যেমনতরো কোনো সময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড পৃঃ ৪০৯)

এই অশ্লীল সাহিত্য নামে লেখকের বিরুদ্ধে পুলিসী জুলুম দিলীপকুমার রায় প্রমুখ সমর্থন করেন নি। সে যুগের এক তরুণী মনস্বিনী লেখিকা আশালতা সিংহ এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। বহুদিন পরে তিনি এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করলেন। এই লেখিকার কথা থেকে তা জানা যায়, '...এমন সময় পণ্ডিচেরী থেকে দিলীপকুমার লিখলেন আমাকে 'বুদ্ধদেব বসুর 'যবনিকাপতন' উপন্যাস ও 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে' গল্প গ্রন্থ লালবাজারের পুলিস অশ্লীল বলে বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে দিয়েছে। তোমার বলিষ্ঠ লেখনী দিয়ে লেখো এর প্রতিবাদ।'

(শারদীয় কথাসাহিত্য, কল্লোল যুগ, সন্ন্যাসিনী আশাপুরী ; পৃঃ ৬৩। পরে আশালতাই সন্ন্যাসিনী আশা পুরী হন)

(এই বই দুটি বাজেয়াপ্ত হবার কোন তথ্য কোথাও পাইনি)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংযোজন

বাজেয়াপ্ত বই পড়ে আইন অমান্য

ইংরেজ আমলে একাধিক সভা, অনুষ্ঠানে বাজেয়াপ্ত বই পড়ে রাজদ্রোহ বিধিভঙ্গ করে দেশপ্রেমিক তরুণেরা এবং মুক্তি সংগ্রামীরা কারাবরণ করেছেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো প্রথম সারির নেতাও বাজেয়াপ্ত বাংলা বই পড়ে আইন অমান্য করেন এবং কারাগারে যান। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির সভাপতি শচীন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেঙ্গল ন্যাশনাল মিলিসিয়ার সাধারণ সম্পাদক দুর্গাপদ দাশগুপ্ত প্রমুখও বাজেয়াপ্ত লেখা পড়ে কারাবরণ করেন।

১৯৩০ সালের ১২ এপ্রিল বাজেয়াপ্ত বই পাঠ ও বিক্রির জন্য কলেজ স্কোয়ারে এক সভা ডাকাও হয়। ওই সভায় পুলিশের গুণ্ডামি চরম ও বীভৎস রূপ নেয়। ছাত্ররা দলে দলে এতে যোগ দিয়েছিলেন। এর উদ্যোক্তা ছিল বেঙ্গল ন্যাশনাল মিলিসিয়া। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বই পাঠ ও বিক্রয়ের জন্য এই সভা আহূত হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ১২ এপ্রিলের আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে ওইদিনের সভায় পুলিশী জুলুমের বিবরণ পাই

"অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকার সময় সভা হইবার কথা ছিল, তাহার বহুপূর্বেই কলেজ স্কোয়ার পুলিশ কনস্টেবলদের লগুড়কন্টকে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়ে : কলেজ স্কোয়ারে লাল পাগড়ী সমারোহের দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছিল, কে যেন কতকগুলি লাল দিয়াশালাইয়ের কাঠি সারি সারি বসাইয়া দিয়া গিয়াছে, বহু সংখ্যক পুলিশ কনস্টেবলকে সিনেটের ধারে জমা রাখা হইয়াছিল।"

এই সভায় ছাত্র নেতা শচীন্দ্রনাথ মিত্র আনন্দবাজার পত্রিকার বাজেয়াপ্ত কংগ্রেস সংখ্যা পাঠ করেন। পুলিশ কর্তা গর্ডন তাঁকে সভাস্থলেই গ্রেফতার করেন। তার আগে পুলিশ এই সভা বেআইনী ঘোষণা করে এবং লাঠি চালিয়ে জনতা হটিয়ে দেয়। বহু আহত হয়। গুরুতর আহত ১৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যাঁরা গ্রেফতার হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন : শচীন্দ্রনাথ মিত্র (নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রেসিডেন্ট), অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সেক্রেটারি), দুর্গাপদ দাশগুপ্ত (বেঙ্গল ন্যাশনাল মিলিসিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি), শিশিরকুমার ব্যানার্জী, শ্রীপদ মজুমদার, প্রসন্নকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রমুখ।।

এর তিনদিন পর ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩০ তারিখেও বাজেয়াপ্ত বাংলা বই পাঠ ও বিক্রি করে আইন অমান্য করা হয়। ১৬/৪/৩০ তারিখের আনন্দবাজারে তা আছে

"আগামী মঙ্গলবার ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় দেশবন্ধু পার্কে এক জনসভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ ও বিক্রয় করিবেন (১) বৈদ্যনাথ সরকার (২) সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস (৩) ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (৪) বিজয়রত্ন সেনশর্মা (৫) কুমুদবিহারী দত্ত।"

ওই সভারও উদ্যোক্তা ছিল বঙ্গীয় জাতীয় সৈনিক বাহিনী। দেশবন্ধু পার্কের ওই সভায় রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গের জন্য পাঁচজন তরুণ বাজেয়াপ্ত বই পাঠ করেন। পুলিশ সভা ভেঙে দেয়। কাউকে গ্রেফতার করেনি।

বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ করে আইন অমান্য করার জন্য ১৯৩০ সালের ১৩ই এপ্রিল আবার কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে (এখনকার হেদুয়া) সভা হয়। এই সভায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'দেশের ডাক' পুস্তক পাঠ করলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই সভাতেই তারপর বাজেয়াপ্ত পুস্তকের কোনও না কোনও অংশ পাঠ করার জন্য সন্তোষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পি ঘোষ, সুরাজ কিষেণ ও বিভূতিভূষণ ভায়া ধৃত হন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার বিবরণ আছে :

"গত শুক্রবার কলেজ স্কোয়ারের সভায় স্থির হয় যে, কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে ছাত্রদের সভা হইবে। ২ ঘটিকার পর হইতে সভার জন্য কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে লোক সমাগম হইতে থাকে। ৩ ঘটিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সময় শ্রীযুত সেনগুপ্ত সভায় আগমন করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ইনি সভাস্থ লোকদিগকে বলেন, যাঁহারা গ্রেপ্তার হইবার জন্য প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা সকলে অন্যান্য লোক হইতে স্বতন্ত্র থাকুন। সভায় শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর শ্রীযুত সেনগুপ্ত শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'দেশের ডাক' নামক বাজেয়াপ্ত পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুলিশের ডেঃ কমিশনার তাঁহাকে বারণ করেন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত পাঠ আরম্ভ করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

দেশপ্রিয়কে লালবাজারে নিয়ে যাবার সময় তিনি বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ করে রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গ করতে বাংলার অধিবাসীদের অনুরোধ জানান। দেশবাসীর প্রতি তাঁর বাণীর বয়ান 'লবণ বিধি আইন ভঙ্গ করিবার জন্য, বেআইনী লবণ বিক্রয় করিবার জন্য এবং জনসভাসমূহে বাজেয়াপ্ত পুস্তক পুস্তিকা পাঠ করিয়া রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গ করিবার জন্য আমি বাঙ্গলার অধিবাসীদের অনুরোধ করিতেছি।'

বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ করে আইনভঙ্গের জন্য দেশপ্রিয়র ৬ মাস কারাদণ্ড হয়। দেশপ্রিয় ও তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩০ কলকাতা ও সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়।

বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ করে দেশপ্রিয়ের আইন অমান্যের পর সম্পাদকীয়ও লেখা হয়

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গ করিয়া ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত এই অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ সেনাপতির ন্যায় যে সাহস, ধৈর্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই যোগ্য। সমস্ত বাংলাদেশ গতকাল হরতাল প্রতিপালন করিয়া এই জাতীয় সংগ্রামে নিজেদের সহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের পরিত্যক্ত স্থান গ্রহণ করিয়া এই সংগ্রামকে পরিচালনা করিবার মত যোগ্য সেনাপতির অভাব হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চয় জানি।

(আনন্দবাজার, ১৬/৪/১৯৩০)

কলকাতা ছাড়া বাংলার অন্যান্য স্থানেও প্রকাশ্য সভায় বাজেয়াপ্ত বই পড়ে আইন অমান্য করা হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে ১৯৩০ সালের এপ্রিলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই পাঠ করে রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গ করেন বহু দেশপ্রেমিক। ১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল ঢাকায় নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এক সভায় ৮ জন বাজেয়াপ্ত বই 'দেশের ডাক' থেকে কোনো কোনো অংশ পাঠ করে রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গ করেন। সভায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়। যাঁরা বাজেয়াপ্ত বই পাঠে অংশ নেন, তাঁদের সকলকেই একে একে গ্রেফতার করা হয়। (আনন্দবাজার, ১৭/৪/১৯৩০)

এই বছরের এপ্রিলের ১৫ তারিখে ময়মনসিংহ শহরের টাউন হলের প্রাঙ্গণে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই পড়ে রাজদ্রোহ বিধি ভঙ্গ করা হয়। 'সভায় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রণীত দেশের ডাক' শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রক্ষিত রায় প্রণীত 'তরুণের অভিসার', শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রণীত 'পথের দাবী', এবং ডাক্তার স্যাণ্ডারন্যাগু কর্তৃক প্রণীত 'ইণ্ডিয়া-ইন-বণ্ডেজ' এই সব বাজেয়াপ্ত পুস্তক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে এবং পুলিশ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সর্বসাধারণকে পড়িয়া শুনান হয়।'

(আনন্দবাজার ১৭/৪/১৯৩০)

আনন্দবাজারে প্রকাশিত 'ফ্রী প্রেসে'র এক খবরে প্রকাশ, ১৯৩০ সালের ১৫ এপ্রিল টাঙ্গাইলের সূর্যকান্ত টাউন হলে এক বিরাট সভায় ৬০০০ লোক সমবেত হয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও জওহরলাল নেহরুর গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বাজেয়াপ্ত বই পাঠ করেন।

বাজেয়াপ্ত বই পড়া ছাড়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং ধ্বনি দেওয়ার জন্যও গ্রেফতার করা হয়েছে। গভর্নর স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার বন্দে মাতরম সঙ্গীত ও ধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সার্কুলার ইস্যুর পরই দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সরকারী রোষে পড়ে। ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বন্দে মাতরম সঙ্গীত ও ধ্বনি দেওয়ার জন্য পুলিশের লাঠিতে রক্তপাত ঘটে বরিশালের রাজপথে। পুলিশের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েও বন্দে মাতরম বলা থামাননি দেশপ্রেমিক তরুণরা। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দলে দলে তরুণেরা বন্দে মাতরম বলে পুলিশের লাঠিতে লুটিয়ে পড়েন বরিশালের রাস্তায়। বন্দে মাতরম সঙ্গীত ও ধ্বনির জন্য অসংখ্য দেশপ্রেমিককে পরবর্তী কালেও সারা দেশে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা দেশ জুড়ে ঘটেছে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে। দু-একটি প্রতিবেদন সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত করছি। ১৯৩০ সালের ২০শে নভেম্বর আনন্দবাজারে আছে "টাঙ্গাইল, ১৮ই নভেম্বর—বন্দে মাতরম ধ্বনির দ্বারা ময়মনসিংহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিরক্তি উৎপাদনের অভিযোগে মহাদেবচন্দ্র সাহা অভিযুক্ত হন, তাঁহার প্রতি ২০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় ১০ দিনের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।"

এমন কি নদীবক্ষে দেশাত্মবোধক গান করার জন্যও গ্রেফতার করা হয়। এ সম্পর্কে ৭/৩/১৯৩০ তারিখে সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়

"১২৪ক ধারা কিরূপ অদ্ভুত উপায়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সম্প্রতি জলপাইগুড়ির জনৈক বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট দেখাইয়াছেন। গত বিজয়ার দিন নদীবক্ষে নৌকায় রাজদ্রোহমূলক গান করা এবং প্লাকার্ড সাজাইবার অপরাধে ছয়জন যুবককে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তিনজনকে দুই শত টাকা করিয়া জরিমানা এবং তিনজনকে ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যে সমস্ত পুলিশ এই সব রাজদ্রোহের আসামীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, এবং যিনি তাহাদের বিচারে দণ্ড দিয়াছেন, সকলেরই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, পুলকিত।"

এই সময় নানাস্থানে আইন অমান্য পরিষদ গঠিত হয়েছিল, সেখানে দেশাত্মবোধক বাজেয়াপ্ত বইপত্র রাখা হত, পড়াও হত। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের লাইব্রেরীতে বাজেয়াপ্ত দেশাত্মবোধক বইপত্র থাকত। পুলিশ বাজেয়াপ্ত পুস্তকের খোঁজে হামেশাই ওইসব স্থানে হানা দিত। ১৯৩০ সালের ১৯ এপ্রিল পুলিশ হাওড়ায় আইন অমান্য পরিষদে হানা দেয়। সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন

'১৯শে এপ্রিল ১২-৩০ ঘটিকার সময় একদল ভারতীয় কনস্টেবলসহ সাব ইনস্পেক্টর শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত আইন অমান্য পরিষদের কার্যালয়ে আসিয়া খানাতল্লাস করে। দুই ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস চলিয়াছিল। অফিসের খাতাপত্র, কার্যবিবরণী প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া 'মরণ বিজয়ী যতীন দাস' ও 'স্বরাজ গীত' নামক গ্রন্থ লইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ মাইতির বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছিল। শ্রীযুত অগমনাথ দত্ত ও শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ মাইতিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।'

(আনন্দবাজার, ২১/৪/১৯৩০)

শেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও